ব. সেরগেইয়েভ

শারীরতত্ত্ব—সবাই পড়ো

ব.সেরগেইয়েভ শারীরতত্ত্ব-সবাই পড়ো
ИЗДАТЕЛЬСТВО·МИР·

ব. সেরগেইয়েভ

শারীরতত্ত্ব-সবাই পড়ো

ব. সেরগেইয়েভ
শারীরতত্ত্ব-সবাই পড়ো

শারীরতত্ত্ব — সবাই পড়ো

ব. সেরগেইয়েভ

শারীরতত্ত্ব—সবাই পড়ো

অনুবাদ: কান্তি চট্টোপাধ্যায়

মির প্রকাশন
মস্কো

মনীষা গ্রন্থালয়
কলিকাতা

Б. Ф. Сергеев

Занимательная физиология
(на языке бенгали)

Молодая Гвардия
Москва

B. Sergeev

Physiology for everyone

সূচীপত্র

জল — ব্যক্তিগত মহাসমুদ্র

যে পদার্থের কাছে আমাদের পৃথিবী তার অস্তিত্বের জন্য ঋণী

জ্যোতির্বিজ্ঞানী ভূ-পৃষ্ঠ থেকে দূরবীনের সাহায্যে যখন প্রতিবেশী কোন গ্রহ দেখতে থাকেন তখন তাঁর মনে এই ভাবনা নিশ্চয়ই জাগে যে সেই গ্রহে জল আর অকসিজেন আছে কি নেই। এই আগ্রহ খুবই স্বাভাবিক কেননা এই দুটি বস্তু যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে কোন গ্রহে থাকে তাহলে সেখানকার জীবনের প্রকৃতি পার্থিব জীবনের সদৃশ হওয়া সম্ভব। জলই আমাদের পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছে, তাকে বর্তমানের পরিস্থিতিতে বিকশিত করেছে আর তার বুকে প্রাণের সঞ্চার করেছে। প্রকৃতপক্ষে জল এই পৃথিবীর পরমাশ্চর্য একটি বস্তু এবং যতই এই বস্তুটির বিষয়ে আমাদের জ্ঞান বাড়ে ততই আমরা চমৎকৃত হই।

জলের অত্যাশ্চর্য গুণগুলির বিষয়ে মুষ্টিমেয় ব্যক্তি যথেষ্ঠ ধ্যান দিয়েছেন। এতে অবাক হবার কিছু নেই, কেননা জল সর্বত্র পাওয়া যায়। আমাদের এই গ্রহে জলের উপস্থিতি একটা সাধারণ প্রাকৃতিক ঘটনা। ভূ-পৃষ্ঠের চারভাগের তিনভাগই জলে ঢাকা রয়েছে। সমগ্র ভূমির এক পঞ্চমাংশ কঠিন হয়ে যাওয়া জলে আবৃত্ত (তুষার ও হিমকণা দিয়ে)। সর্বসময়ে ভূখন্ডের আধাআধিভাগ জলীয় বাষ্পের মেঘে বা সুক্ষ্ম জলকণায় আচ্ছন্ন। যেখানে মেঘ নেই সেখানেও বাতাসে জলীয়বাষ্প সবসময়েই রয়েছে।

আমাদের এই গ্রহে জল এমনই একটি নিত্য বস্তু যে আমাদের এই মানব শরীরেই আছে শতকরা একাত্তর ভাগ জল। আর যে বস্তু এতই সাধারণ তার বিষয়ে কেউই উৎসুক হয় না। এই সর্বব্যাপকত্বই জলকে করেছে অভিনব। অন্য কোন বস্তু এই পৃথিবীতে এত প্রচুর পরিমাণে আর সমকালে তিনটি বিভিন্ন অবস্থায় — কঠিন, তরল এবং বায়বীয় আকারে পাওয়া যায় না।

জল পৃথিবীর আবহাওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছে। জল যদি না থাকত তাহলে এই পৃথিবী বহুপূর্বেই শীতল হয়ে যেত, সকল প্রাণ-ই অন্তর্হিত হয়ে যেত। জলের তাপধারণ ক্ষমতা অস্বাভাবিক বেশী। উত্তপ্ত হোলে জল প্রচুর পরিমাণ তাপ আত্মস্থ করে থাকে আর ঠান্ডা হোলে সেই তাপ

ছেড়ে দেয় এবং বাতাস সেই ছেড়ে দেওয়া তাপ গ্রহণ করে আবহপরিমণ্ডলকে উত্তপ্ত রাখে।

মহাশূন্যের শৈত্য বহুকাল পূর্বেই পৃথিবীকে ভেদ করতে সক্ষম হোত যদি না উত্তপ্ত আবহাওয়ার গরম পোশক আমাদের গ্রহটিকে মুড়ে রাখত। এই আররণে জলীয় বাষ্পের ভূমিকা গরম পশমের। মরুভূমিতে বাতাসে জলকণা অতি বিরল তাই সেখানে এই পোশাকটি ছিদ্রবহুল। অরক্ষিত ভূপৃষ্ঠ সেখানে দিনমানে সূর্যের তাপে অতি প্রখরভাবে উত্তপ্ত হয় আবার রাত্রে সম্পূর্ণভাবে জুড়িয়ে যায়। এই কারণে মরুঅঞ্চলে দিন ও রাত্রের উত্তাপে তারতম্য এত বেশী। তা সত্ত্বেও পৃথিবী শেষ পর্যন্ত ঠাণ্ডায় জমে যেত, যদি না জলের অন্য একটি গুণ থাকত। সকলেই জানে অধিকাংশ বস্তু ঠাণ্ডায় সংকুচিত হয়, কিন্তু জল ঠাণ্ডায় প্রসারিত হয়। সঙ্কুচিত যদি হোত তাহলে বরফ জলের থেকে ভারী হোত এবং জলের মধ্যে ডুবে যেত। সমস্ত জল তখন ক্রমশঃ ঠাণ্ডায় জমে বরফ হয়ে যেত এবং পৃথিবীর আকাশে অত্যন্ত পাতলা হালকা একটি জলীয় বাষ্পহীন গ্যাসের চাদরের আবরণ মাত্র থাকত।

জলের আর একটি অস্বাভাবিক গুণ তার ঘনীভবন ও বাষ্পীভবনের জন্য প্রয়োজণীয় লীন তাপের অত্যন্ত উচ্চমাত্রা। এই কারণেই উত্তপ্ত আবহাওয়াতে বেঁচে থাকা সম্ভব। কেবলমাত্র শরীরস্থ জলের বাষ্পীভবনের সহায়তায় (এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে তাপ বর্জন করে) প্রানীরা এবং মানুষ পরিপার্শ্বের উত্তাপের থেকে শরীরের তাপ অনেক কম রাখতে সক্ষম হয়।

প্রকৃতিতে জলের ভূমিকা অনন্য কেননা জল ছাড়া প্রাণ থাকতে পারে না। জীবনের উদ্ভব হয়েছিল আদি যুগের সমুদ্রে দ্রবীভূত বস্তুনিচয় থেকে। সেই সময় থেকে, সকল জীব ও উদ্ভিদের প্রতিটি কোষে কোষে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে চলেছে দ্রবীভূত পদার্থের মধ্যে।

জলের অত্যাশ্চার্য গুণাবলীর মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে কম জানা আছে এমন একটি ক্ষমতার কথা যার ফলে জলের উপরের স্তরের অণুগুলির মধ্যে পরস্পরে প্রবল আকর্ষণী শক্তির বলে একটি সুদৃঢ় পর্দা তৈরী করতে পারে। জলের উপরিভাগের তলটান এতই দৃঢ় যে, যেসব পদার্থ জলে ভেসে থাকতে না পারার কথা তাদেরও ভাসমান রাখতে পারে। যদি ইস্পাতের একটা সূঁচ বা নিরাপদ ক্ষুর-এর একটা ব্লেড সাবধাণে জলের ওপর রাখা যায় যাতে এই পর্দাটি ছিঁড়ে না যায়, তাহলে সেগুলি ডুববে না।
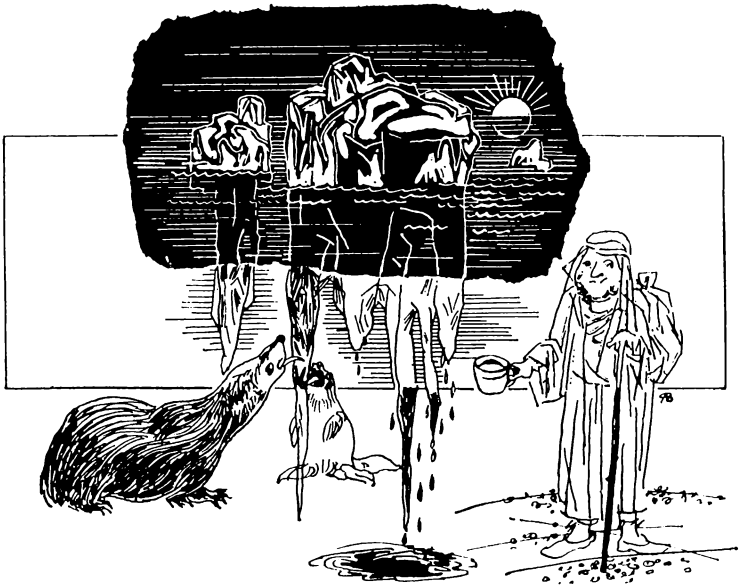
বহু পতঙ্গের জীবনযাত্রা এই উপরিতলের পর্দাটির সঙ্গে জড়িত রয়েছে। যেমন, জল-ফড়িং জলের উপরিতলেই বাস করে, তারা কখনো জলের ভেতরে যায় না বা শুকনো ডাঙ্গাতে উঠে আসে না। এরা ডুব দিতে বা সাঁতার কাটতে পারে না, কেবল জলের মসৃণ উপরিতলে পাগুলি ভালভাবে ছড়িয়ে দিয়ে পিছলে যেতে পারে, যেমন স্কী-করা হয় তুষারের ওপর। এরা এদের লোমশ পায়ের ডগাগুলি দিয়ে কেবল জল স্পর্শ করে। জলের উপরিতলের পর্দাটি এদের শরীরের ওজনে নেমে যায় কিন্তু ভেঙ্গে যায় না।

মশার শূককীট, জলজ গুবরে-পোকা আর নানা জাতের গেঁড়ি জলের ভেতরে থেকে এই উপরিতলের পর্দাটিতে নিজেদের শরীর সংলগ্ন করে রাখে। গেঁড়িরা তো কেবল এই পর্দায় ভিতর থেকে ঝুলেই ক্ষান্ত হয় না, কঠিন পর্দাথের ওপর দিয়ে চলার ভঙ্গিতে এই পর্দা ধরে ঝুলতে ঝুলতে গুটি গুটি চলতেও পারে।

বিজ্ঞানীরা অনেক আগেই লক্ষ্য করেছেন যে জল যত নির্ভেজাল বা খাঁটি হবে তত বেশী বল লাগবে এই উপরিতলের পর্দাটি ভেঙ্গে দিতে। জলের মধ্যে দ্রবীভূত পদার্থের অণুগুলি (প্রধানত গ্যাসীয়) জলের অণুর ফাঁকে ফাঁকে প্রবিষ্ট হয়ে থাকে এবং এরাই এই পর্দাটিকে দুর্বল করে

তোলে। এমনকি পরিশোধিত জলেরও এই আশ্চর্য শক্তি পুরোপুরি পাওয়া যায় না, কেননা কিছু না কিছু অন্য পদার্থের অণুর মিশ্রণ জলে থাকবেই। আড়াই সেন্টিমিটার ব্যাসের জলের একটি স্তম্ভ ভেঙ্গে দিতে 900 কিলোগ্রাম-বল-এর প্রয়োজন এবং যা কয়েক শ্রেণীর ইস্পাতের দৃঢ়তার সঙ্গে তুল্য। কিন্তু এইটেই শেষ সীমা নয়। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ জলের অনুরূপ একটি স্তম্ভ ভেঙে দিতে 95 টন বল লাগবে। পৃথিবীতে যদি বিশুদ্ধ জলের একটি হ্রদ থাকত তাহলে তার উপর দিয়ে হাঁটা, চলা এমনকি স্কেটিং করা সম্ভব হোত ঠিক যেমন করা যায় কঠিন বরফের উপর।

জীবন্ত জল

তোমরা কি জানো প্রায় সকল বস্তুই কেন উত্তপ্ত হোলে সম্প্রসারিত হয়? এটা বোঝা শক্ত নয়। উত্তপ্ত হোলে যে কোন পদার্থের অণুগুলি পূর্বাবস্থার থেকে বেশী সচল হয়। এই চলাফেরার জন্যে কিন্তু তাদের বেশী জায়গা নেই তাই তারা নিজেদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি শুরু করে। ফলে পদার্থটি প্রসারিত হয়। তাহলে, জল কেন ভিন্ন আচরণ করে? জলের একটি অণুতে আছে একটি অকসিজেন ও দুটি হাইড্রোজেনের পরমাণু। এই পরামাণুগুলি ত্রিভুজের ভঙ্গিতে সাজানো আছে। অকসিজেন আছে ত্রিভুজের একটি কোণে, আর হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াস রূপে দুটি প্রোটণ আছে অন্য দুটি কোণে, তাদের ইলেকট্রনদের কক্ষপথগুলি সম্পূর্ণ উলটো দিকে বেশীমাত্রায় প্রসারিত।

জলের উষ্ণতা যখন কমতে থাকে আর তার অণুগুলির তাপজনিত গতি যখন হ্রাস পায়, তখন জলের অণুগুলির মধ্যে পরস্পর তড়িৎ-চৌম্বক ধর্ম প্রবলতর হয় তার তাপজনিত গতির থেকে। ভিন্ন ভিন্ন অণু তখন পরস্পর মিলতে থাকে, যেন একজন অন্যজনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। দুটি প্রোটনের প্রত্যেক পড়শী অণুর এক একটি ইলেকট্রনকে আকর্ষণ করে, আবার তাদের ইলেকট্রনেরা ধরা পড়ে পড়শী প্রোটনের হাতে। প্রত্যেকটি জল-অণু অন্য চারটি অণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে অপূর্ব সুন্দর কেলাসের জাফরি সৃষ্টি করে, যার মধ্যে বড় বড় ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্রগুলির প্রত্যেকটির মধ্যেই অতি সহজেই একটি করে জল-অণুকে লুকিয়ে

রাখা যায়। অপর পক্ষে, উষ্ণতা যখন বাড়তে থাকে আর অণুগুলির মধ্যে তাপজনিত গতি প্রবলতর হয়, তাদের পরস্পরের মধ্যে বন্ধনীগুলি বেঁকে চুরে ছিঁড়ে যায় এবং বরফ গলে যায়। যে অণুগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তারা ওই ছিদ্রগুলির মধ্যে ঢুকে যায় এবং জলের আয়তন কমে যায়। তরল জলের মধ্যে অণুগুলির আচরণ কেমন? বিজ্ঞানীদের মধ্যে এই বিষয়ে অনুসন্ধান শুরু হয়েছে খুব বেশীদিন আগে নয় কিন্তু। সাধারণভাবে জল — বিষয়টি পদার্থবিদ বা জীববিজ্ঞানীর কাছে অর্ধ-বিস্মৃত একটি সমস্যা। তাই এটা আশ্চর্য নয় যে নব পর্যায়ের গবেষণা বৈজ্ঞানিকদের ধাঁধায় ফেলেছিল। দেখা যাচ্ছে বরফ-গলানো জল বহুকাল পর্যন্ত বরফের আণবিক আকার বজায় রাখে। কিন্তু সব জলই এই ধর্ম প্রকাশ করে না। গলানো জলের মধ্যে অসংখ্য ছোট ছোট জলের দ্বীপ রয়েছে যারা বরফের কেলাস-এর আকৃতি বজায় রাখে। এই সব বরফের টুকরোগুলি জলকে 30°C পর্যন্ত উত্তপ্ত করলেও গলে যায় না। উষ্ণতা এর থেকে বাড়ালেই কেবল

এদের সংখ্যা কমতে থাকে। এরা বেশ দ্রুত গলতে থাকে উষ্ণতা 40°C ছাড়িয়ে গেলে। উষ্ণতা যেমনই হোক না কেন দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে এরা আপনা আপনি মিলিয়ে যায়।

এইসব অদৃশ্য বরফের টুকরো জলের মধ্যে থাকার দরুন প্রাণীদের উপর কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়? এই সমস্যাটার মোকাবিলা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীদের অনেক গুলি প্রাচীন ধারণা শোধন করে নিতে হয়, যেসব ধারণা আগে ছিল ধোঁয়াটে কিন্তু যাদের নিয়ে বেশি মাথা ঘামানো হয় নি। যেমন ধরো, জীবাণুদের বংশবৃদ্ধির হার কেন অতি দ্রুত বৃদ্ধি পায় উষ্ণতার সেই অঞ্চলে যেখানে বরফ গলে জলে পরিণত হয়? কেনই বা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের বহু পতঙ্গের ডিম বা মূককীটেরা বিকশলাভ করতে পারে না তাদের প্রখর শৈত্যের মধ্যে না রাখলে? অথবা, পশুপক্ষীর শাবকদের বরফ-গলানো জল খাওয়ালে কেন তাদের বৃদ্ধি, পুষ্টি ত্বরান্বিত হয়, কেনই বা তাদের রোগ হয় অনেক কম? হয়ত, তাই এই ব্যাপারটা আকস্মিক ঘটনা নয় যে অনেক প্রাণীরা বাচ্চা জন্মায় বসন্তের শুরুতে আর আফ্রিকা, ভারত প্রভৃতি দূরদেশ থেকে পাখিরা উত্তরে চলে যায় ডিম ফুটিয়ে তাদের বাচ্চাদের বড় করে তুলতে। এই সব আপাতবিচ্ছিন্ন আলাদা আলাদা সমস্যাগুলির মধ্যে অভিন্ন একটা কারণ লক্ষ্য করা যায় — সেটা হলো শৈত্য, বরফ এবং বরফ-গলানো জল।

বিজ্ঞানীরা কোন অনুসন্ধান অর্ধসমাপ্ত রেখে থামেন না। তাঁরা দেখতে চাইলেন জীবিত প্রাণীর শরীরের অন্তস্থিত জলের স্বরূপটা কী রকম। আগে একটা ধারণা করা হোত যে এই জল শরীরের ভেতরে বড় বড় অণুগুলির ফাঁকে শূন্য জায়গাগুলি দখল করে থাকে। কিন্তু জানা গেছে যে সে ধারণা ভুল। দেখা গেছে যে প্রাণীশরীরের অধিকাংশ কোষের এবং বড় বড় জীবিত অণুর যে ত্বক সেটা জলের অণুর তুলনায় অনেক পাতলা এবং জলের অণুকে সেটা আকর্ষণ করে আর তাদের গাত্রে জলের অণুগুলিকে নির্দিষ্ট প্যাটার্ণে সাজিয়ে রাখে আর এই প্যাটার্ণ বরফের কেলাসেরই মতো। জীবকোষের কোন অণু যত বড় হবে তত পুরু হবে তার এই বহিরাবরণ। কোষের মধ্যাস্থিত প্রোটোপ্লাজম বা কোষগুলির গায়ে গায়ে প্রবাহিত তরল পদার্থে অনেকগুলি হিমশৈল ভেসে বেড়ায়। প্রাণীরা তাদের শরীরের মধ্যেকার জলের অনেকটাই জমিয়ে বরফ করে ফেলে। বরফ-গলানো জল যে প্রাণীর স্বাস্থ্যের পক্ষে

উপকারী তার কারণ হোল এই যে বরফ প্রাণীজীবনে অপরিহার্য এবং জল জমে গেলে জীবন্ত হয়।

এই 'জীবন্ত' জলের আর একটা বিশেষ গুণ আছে। দেখা গেছে যে প্রোটিন, শর্করা বা চর্বির অধিকাংশ অণুদের আকৃতি বরফের অণুর আকৃতির সঙ্গে বেশ মিল যায় আর তাই তারা সহজেই তাদের কেলাস-জাফরির মধ্যেকার ছিদ্রগুলির মধ্যে ঢুকতে পারে। সুতরাং জল জমে গেলেও এই কোষগুলি আহত হয় না।

যেসব অণু আকৃতির দিক দিয়ে বরফের অণুর সঙ্গে মেলে না তাদের ওপর জলের প্রতিক্রিয়া কিন্তু একেবারেই ভিন্ন। জল জমে গেলে সেটা বড় বড় অণুদের ভেঙ্গে দেয় এবং ছোটদের তাড়িয়ে দেয়। সুমেরু মহাসাগরের জমা বরফ তাই লবণমুক্ত, কারণ জমে যাওয়ার কালে জল লবণকনাগুলিকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

জীবিত প্রাণীর শরীরের অণুগুলির আকৃতি নানা করেণে বেশ কিছুটা বদলে যেতে পারে। সুতরাং এই প্রক্রিয়া যদি যথেষ্ট অগ্রসর হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আর সেই অণু তার শরীরের বাইরে বরফের আবরণ রাখতে পারবে না। ক্ষয়প্রাপ্ত অণুটিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বরফের টুকরোর সাহায্যে সারিয়ে তোলা যায়। বেঁকে যাওয়া অণুটির গায়ের উপর যদি জল জমে যায় তাহলে সেটি আবার সোজা হয়ে যাবে এবং তার পুরানো আকৃতি ফিরে পাবে।

প্রানীরা বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার একটা কারণ সম্ভবত এই যে তাদের শরীরে বহু ক্ষয়প্রাপ্ত অণুর সঞ্চয় হয়। এই ধারণা যদি সত্যি হয় তাহলে তাদের পুর্ণযৌবন দান করা সম্ভব হবে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে বরফের টুকরো যোগানো যায়। এজন্য জীবশরীরের উষ্ণতা কমাতে হবে যাতে শরীরের মধ্যেকার জল জমে বরফের সৃষ্টি হয় (প্রাণীদের উপর পরীক্ষা করে দীর্ঘস্থায়ী পুর্ণযৌবনের ফল লাভ করা গেছে) অথবা প্রাণীটিকে আগের থেকে তৈরী বরফের টুকরো যুগিয়ে যেতে হবে। অতএব বরফ-গলানো জল কি কারণে হিতকারী সেটা জানা গেল। এই দিক দিয়ে বিচার করলে ফোটানো জল পান করা সকল জীবের পক্ষেই উপকারী। বেশী উষ্ণতাপ বরফের কেলাস-জাফরি সম্পুর্ণভাবে ভেঙে যায় এবং জলের অণুগুলি অন্য ধরনের বন্ধনী তৈরী করে। ফোটানো জল জমাতে হলে প্রথমে এই নতুন বন্ধনীগুলিকে ভেঙে দিতে হবে যে কাজটা সহজসাধ্য নয়। মোটামুটি বিশুদ্ধ ফোটানো জল যদি তুমি হিমের মধ্যে বাইরে রেখে দাও তাইলে পাঠ্যপুস্তকে

যা লেখা আছে সেই শূন্য ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড উষ্ণতায় জমে যাবে না—সে জল জমবে শূন্য ডিগ্রির থেকে সাত ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড নিচে। জীবিত প্রাণীর শরীরস্থ জলের ক্ষেত্রেও তাই ঘটবে। আমরা যে চা পান করি তার জীবন্ত অণুগুলির মধ্যে বরফের কেলাস তৈরি হোতে গেলে প্রথমে সেই বন্ধনীগুলি ভেঙে যেতে হবে, জল ফোটানোর সময় যেগুলির সৃষ্টি হয়েছিল।

যে জল শূন্য ডিগ্রির নিচেও জমে না তাকে বলা হয় অতিশীতল জল। জীবদেহে অতিশীতল জল বেশী হোলে তা বিপাকের ফলে উদ্ভূত ক্ষতিকর পদার্থ জমা হোতে সহায়ক হয়। এর কারণ জমে গেলে জল পরিশুদ্ধ হয়ে যায় — ক্ষতিকর পদার্থগুলিকে তাড়িয়ে দেবার পরে। ফোটানো জল পান করার এটা আরো একটা অসুবিধা।

'জীবন্ত' জলের এই একটাই প্রধান বিশেষত্ব নয় কিন্তু। দেহকোষের মধ্যস্থিত হিমশৈল গুলি পেশীর কার্যকলাপে বিশেষ ভূমিকা নেয় বলে ধারণা করা হয়। জানা আছে যে পেশীসঙ্কোচের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি যোগায় ATP বা অ্যাডিনোসিন ট্রাই ফসফরিক অ্যাসিড, কিন্তু বস্তুত কি যে ঘটে সেটা একটা রহস্য। প্রাণীশরীরের অন্তস্থ জলের প্রকৃতি নিয়ে গবেষণার ফলে পেশীসঙ্কোচ প্রক্রিয়ার বিষয়ে নতুন আলোকপাত ঘটেছে। কোন পেশীর কার্যকর হোল একটি প্রোটিন মাইওসিন যার শৃঙ্খলাটি পুঁতির মালার মতো অনেকগুলি প্রোটোমাইসিন দিয়ে গড়া। এদের পরস্পরের বন্ধনীগুলি বেশ মজবুত — কেবল যে নিজেদের দৃঢ়ভাবে ধরে তাই নয়, এরা সমুদয় প্রোটোমাইওসিনের শৃঙ্খলাটিকে সঙ্কুচিত ক'রে আঁটোসাটো আকারে ধরে রাখতেও পারে। পেশীর প্রসারিত অবস্থায় যে বল তাদের ধরে রাখে সেটা জলের কেলাস-জাফরি অর্থাৎ মাইওসিন-অণুর আচ্ছাদনী বরফের বর্ম। এই বর্ম যদি দ্রুত ভেঙে যায় তাহলে প্রেটোমাইওসিনের ছড়িয়ে পড়া শিকল গুটিয়ে যায়, ঘন হয়ে পিন্ডের আকারে কাছাকাছি চলে আসে। আসলে গুটিয়ে যাওয়ার কাজে নয় বরং এই বরফের আবরণটি ভাঙ্গতেই সেই শক্তি খরচ হয় যেটা পাওয়া গিয়েছিল অ্যাডিনোসিণ-ট্রাই-ফসফরিক অ্যাসিড থেকে। সেই বরফের মতো আবরণটি আবার ফিরিয়ে আনে মাইওসিন-এর একটি অণু। বরফ আবার প্রোটোমাইওসিন-এর শিকলকে প্রসারিত করে দেয় এবং পেশী পুনর্বার অনাড়ষ্ট হয়ে যায়।
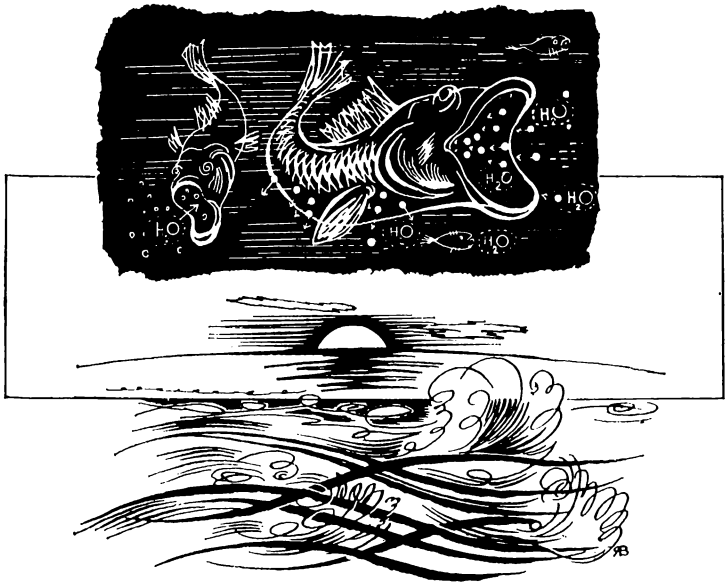
বরফের আবরণের ভেঙে যাওয়াটা ঘটে যায় চট করে। যদি একটা মুক্ত প্রোটন হিমশৈল-র খুব কাছাকাছি এসে যায়, একটি জল-অণু তাকে ধরে ফেলবে। কিন্তু যেহেতু একটি অণুতে কেবল দুটি প্রোটন থাকতে পারে সুতরাং সেই জল-অনু তার একটি প্রোটন সন্নিহিত কোন অণুকে দিয়ে দেবে। পড়শী অণু সেটা নেবে আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের একটা প্রোটন পাশের জনকে দেবে। এই বিক্রিয়া তড়িৎপ্রবাহের মতো চলতে থাকবে জল-অণুর সারি বরাবর এবং হিমশৈল দ্রুত গলতে শুরু করে (অণুরা একত্রে থাকে প্রোটনদের দ্বারা গড়ে তোলা বন্ধনীর সাহায্যে। সেই বন্ধনীগুলি ভেঙে যায় যখন প্রোটনের এক অণু থেকে অন্য অণুতে স্থানান্তর ঘটে)।

মৃত জল

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের নাটকীয় ঘটনাবলীর মধ্যে তিনটি বিশেষ রহস্যজনক ঘটনা অজানা থেকে যায় বা বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি।

প্রথমটি ঘটেছিল ফ্রান্সে। 1940 সালের 16 মে নাৎসীসেনারা যখন প্যারিস শহরের ওপর টহল দিচ্ছিল তখন জোলিও-কুরি বিজ্ঞানাগারের দুজন বিজ্ঞানী যাচ্ছিলেন দক্ষিণ ফ্রান্সের দিকে। তাঁদের সঙ্গে ছিল কয়েকটি বন্ধ-মুখ পাত্র যার মধ্যে ছিল একশ পঁচাশি কিলোগ্রাম জল। বোর্দোতে পাত্রগুলি বৃটিশ জাহাজ ব্রামপারক্-এ তোলা হয়। ডেকের উপর একটা ভেলা তৈরি করে সবগুলি পাত্র তার সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়। জাহাজটি যদি শত্রুর জাহাজের গোলায় ধ্বংস হয়েও যায় — ওই পাত্রগুলি বিনষ্ট হয়ে যাবে না। সেবারের জলযাত্রা ভাগ্যক্রমে সফল হয় এবং বমাল নিরাপদে গ্রেটবৃটেনে নিয়ে আসা হয়।

দ্বিতীয় রহস্যজনক ঘটনাটি ঘটে ডেনমার্কে — তৎকালে জার্মান সৈন্যদের অধিকারে। এক ঝড়বৃষ্টির রাত্রে বিশিষ্ট পদার্থবিদ নীলস বোর ছোট একটা জলযানে চড়ে সুইডেনে পালিয়ে যান। তাঁর মালপত্রের মধ্যে সবচেয়ে দামী বস্তু ছিল একটা বীয়ারের বোতল যেটার প্রতি তাঁর যত্ন ছিল অসীম। বীয়ারের বোতলটা ছিল ছদ্ম আবরণ, সেটা ভরা ছিল বিশুদ্ধ জল দিয়ে।

নরওয়েতে যা ঘটেছিল সেটাও কম রহস্যজনক নয়। 1942 সালে নরওয়ের ছোট শহর রিউকান আক্রমণ করে বৃটিশ ছত্রী সেনারা। এই ধাঁধা জাগানো অভিযানের উদ্দেশ্য বহুকাল গোপন রাখা ছিল। যুদ্ধ শেষ হবার অনেক পরে জানা যায় যে বিপজ্জনক অভিযানটির ঝুঁকি নেওয়া হয়েছিল একটি ছোট কারখানায় এবং সেখানে গুদামজাত চারশ লিটার জল নিশ্চিহ্ন করার জন্যে। এই দুর্বোধ্য ঘটনাগুলির প্রকৃত কারণ ছিল আসলে ভারী জল।

ভারী জল আবিষ্কৃত হয়েছে খুব বেশী দিন নয়। কিঞ্চিদধিক চল্লিশ বছর আগে আমেরিকান বিজ্ঞানী ইউরি দেখেন যে স্বাভাবিক হাইড্রোজেন ছাড়াও আছে ভারী হাইড্রোজেন যার পরমাণুগুলি সাধারণ হাইড্রোজেনের থেকে দ্বিগুণ ভারী। বিজ্ঞানীরা এমনই বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন যে তাঁরা এই নতুন হাইড্রোজেন নাম দিলেন ডিউটেরিয়াম, যেন সেটা হাইড্রোজেন আদপেই নয়, বরং অন্য কোন পদার্থ।

জানা আছে যে জলের একটা অণুতে আছে দুটি হাইড্রোজেন এবং একটা অকসিজেনের পরমাণু। সেইজলের অণুতে যদি ভারী হাইড্রোজেন থাকে তাহলে সেটা হবে ভারী জল। আরো সাম্প্রতিক কালে আবিষ্কৃত

হয়েছে যে আরো ভারী হাইড্রোজেন আছে যার নাম ট্রিটিয়াম এবং দু'প্রকারের ভারী অকসিজেনও আছে। জলের অণুগুলি এইসব পদার্থের বিভিন্ন সংযোগ দিয়ে গঠিত হয়। অর্থাৎ যে কোন জল আঠারটি বিভিন্ন যোগের মিশ্রন যার মধ্যে সতেরটি হোল নানা প্রকারের ভারী জল।

সাধারণ জলে ভারী জলের অনুপাত উপেক্ষণীয়। সবচেয়ে ভারী যে অকসিজেন তা থাকে প্রতি দশ লক্ষ অণুতে একটি, ডিউটেরিয়াম থাকে প্রতি দশলক্ষে দু'শটি। খাঁটি ভারী জল সর্বপ্রথম তৈরী করা সম্ভব হয় যুদ্ধের ঠিক আগে। অ্যাটমবোম তৈরির কাজে এই ভারী জল অপরিহার্য। সেই কারণে মিত্রশক্তি সতর্ক হয়েছিলেন যাতে এই বস্তুটি নাৎসীদের হাতে না গিয়ে পড়ে।

এই ভারী জল বস্তুটি কেমন? ডিউটেরিয়াম বিশিষ্ট জল নিয়েই বেশী গবেষণা করা হয়েছে। স্বাদ, বর্ণ বা গন্ধের বিচারে সাধারণ জল থেকে এর প্রভেদ ধরা যাবে না। এই জল জীবিত প্রাণীর পক্ষে মঙ্গলের নয়। এইভাবে জীবন্ত ও মৃত জল নিয়ে লোকপ্রচলিত কাহিনী গড়ে উঠেছে। ভারী জল আক্ষরিক অর্থে মৃত বলে প্রমাণিত হয়েছে কারণ এই জল জীবন প্রবাহ ধরে রাখতে পারে না। উদ্ভিদের বীজ ভারী জলে রাখলে অংকুর বেরোবে না। মাছ, এককোষী জীব, এমনকি জীবাণুরাও অচিরেই মরে যায়। ছোট বা বড় ইঁদুরকে এই জল পান করালে অল্পকালেই তারা মারা পড়ে। ভারীজল যদি তাদের দেওয়া হয় অন্য জলের সঙ্গে মিশিয়ে তাহলে তারা বাঁচবে কিন্তু অশেষ তৃষ্ণায় ভুগবে। ভারী জল সর্বদা মৃত্যু টেনে আনে। এমন অভিমতও দেওয়া হয়েছে যে বার্ধক্যের কারণ — শরীরে ক্রমশ জমা হওয়া ভারী জল। কিন্তু এই মতের স্বপক্ষে অকাট্য প্রমাণ এখনো পাওয়া যায় নি। যে কোন জলের মধ্যে অত্যল্প পরিমাণে ভারী জল মিশ্রিত থাকে সেটা কি আমাদের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক? নিঃসন্দেহে, তা নয়। বস্তুত খুব সামান্য পরিমাণে ভারী জল মাণুষের শরীরের পক্ষে উপকারী, কারণ এই কয়েকটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শারীরপ্রক্রিয়াকে ত্বরাণিত করে থাকে, আবার পরিমাণে বেশী হয়ে গেলে এই প্রক্রিয়াগুলিই শ্লথ হয়ে যায়। ভারী জল প্রাণীজীবনের পক্ষে সংহারক নয় কিন্তু প্রাণকর্মের মহত্বপূর্ণ প্রক্রিয়াগুলির লক্ষণীয় অবদমন নিশ্চিতরূপে, মর্মান্তিকরূপে বিপজ্জনক।

তোমার বা আমার ওজন কত?

তোমার ওজন কত জান কি? প্রশ্নটা খুব সোজা বলে ধরে নিও না এমনকি যদি তুমি খুব সম্প্রতি নিজের ওজন নিয়েও থাকো। তোমার কোন আন্দাজ আছে কি যে তোমার ওজন একদিনে বা এক সন্ধ্যায়, এক ঘণ্টায়, এমনকি দশ মিনিটে কত বদলাতে পারে?

মানুষের শরীরের ওজন নিত্য কম বেশি হচ্ছে। সহজবোধ্য কারণগুলি, যেমন খাদ্যগ্রহণ ছাড়াও অন্য কারণ আছে যারা নিত্য, ধীরে ধীরে, অলক্ষ্যে ওজনের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। এই ব্যাপারটা সর্বপ্রথম লক্ষ করেন স্যাংটোরিয়া*, প্রায় তিনশ বছর আগে। তিনি বড় বড় দাঁড়িপাল্লা তৈরী করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাতে চড়ে বসে থাকতেন — নিজের ওজনের পরিবর্তন লক্ষ্য করতেন। তাঁর পরীক্ষার ফল এমনই বিস্ময়কর ছিল যে অসংখ্য অভ্যাগত তাঁর ল্যাবরেটরিতে ভিড় করে দেখত তাদের চোখের সামনে কেমন করে প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকের ওজন কমে যাচ্ছে। পরিবর্তনগুলি ছিল লক্ষণীয়। এক রাত্রিতে স্যাংটোরিয়াসের ওজন কমত এক কিলোগ্রামের মতো।

ওজন কমতে পারে অনেক কারণে। শরীর থেকে পরিত্যক্ত কার্বন ডাইঅকসাইডের পরিমাণ চব্বিশ ঘণ্টায় প্রায় 75 থেকে 80 গ্রাম। এটা তো অতি সামান্য যখন তুলনা করি ফুস্‌ফুসের মাধ্যমে বাইরে নির্গত বাষ্পীভূত জলের ওজন প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় 150 থেকে 500 গ্রাম, ত্বক থেকে বেরিয়ে যাওয়া ঘামের ওজন আরো বেশি। যে কোন ব্যক্তি সব সময় ঘামছে, যদিও সব সময়ে শরীর বেয়ে বড় বড় ফোঁটায় সেই ঘাম ঝরে পড়ছে না।

ত্বকের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য স্বেদগ্রন্থির ছিদ্র দিয়ে সূক্ষ্ম স্বেদকণা নিয়ত বেরিয়ে আসছে যা শুধুমাত্র অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেই দেখা যায়। বাতাস যদি শুকনো থাকে তাহলে সেই স্বেদকণা বাষ্পীভূত হয়ে যাচ্ছে গ্রন্থিমুখে পরবর্তী বিন্দুটি জমা হওয়ার আগেই, তাই ত্বক শুকনোই থেকে যাচ্ছে। শীতল আবহাওয়াতে 250 থেকে 1700 গ্রাম জল বাষ্পীভূত হয়ে যায় ত্বক থেকে। যে সব ব্যক্তি কঠোর কায়িক শ্রম করে তারা

---

* স্যানটোরিও স্যানটোরিওস (1561-1636), ইতালীয় চিকিৎসক, পাডুয়াতে চিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যাপক, গ্যালিলিওর সহাধ্যায়ী।

শুষ্ক উষ্ণ আবহাওয়াতে 24 ঘণ্টায় 10-15 লিটার ঘাম ত্যাগ করে, কখনো কখানো ঘণ্টায় লিটার পর্যন্ত। এমনকি এক্ষেত্রেও ত্বক শুষ্ক থাকতে পারে। কম করে ধরলেও দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীরা সত্তর বছরের জীবনকালে সত্তর থেকে একশ পঞ্চাশ টন ঘাম ত্যাগ করে। এই পরিমাপ তিনটি বড় বড় রেলের ট্যাঙ্কওয়াগণকে ভর্ত্তি করে দেবে।

ঘামের উপযোগিতা কী? কেনই বা প্রানীরা এত প্রচুর পরিমাণে ঘর্মত্যাগ করে থাকে? ঘর্মত্যাগ হচ্ছে শরীরের সেই যান্ত্রিক ব্যবস্থা যার দ্বারা মানুষ তার দেহকে অতিরিক্ত উত্তপ্ত হওয়া থেকে বাঁচায়। বাষ্পীভবন প্রক্রিয়াতে অনেক তাপ ব্যয়িত হয়। এক কিলোগ্রাম ঘামের জন্যে ছয় শত ক্যালোরি। এই তাপের সমস্তটা যদি শরীর থেকে নেওয়া হোত তাহলে শরীরের উত্তাপ কমত 10°C। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের শরীরের অন্তস্থিত তাপের সামান্য একটা অংশ শরীর ব্যয় করতে পারে বাষ্পীভবন কার্যে, যে কারণে ঘর্ম-নির্গমনের সাহায্যে শরীর শীতল আমরা করতে পারি না তবে শরীরকে অত্যধিক গরম হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে পারি। স্বাভাবিক শরীরের উত্তাপ প্রায় 37°C (বগলে)। একে রক্ষা করা সম্ভব হয় ফুস্‌ফুস্‌ এবং ত্বক থকে বাষ্পীভবনের ফলে — এমন কি তখনও যখন বাইরের বাতাসের উষ্ণতা 40°C থেকে 50°C পর্যন্ত।

ঘাম হওয়া সব অবস্থাতে যে ভালো তা নয়। যখন আর্দ্রতা বেশী থাকে তখন ঘাম বাষ্পীভূত হয় বেশ ধীরে। এই ঘাম বড় বড় ফোঁটায় জমা হয়ে ত্বকের গা দিয়ে ঝরে পড়ে, কষ্টের লাঘব কিছুই হয় না কারণ বাষ্পীভবন ছাড়া শরীর জুড়োয় না। এই কারণে শুষ্ক মরুঅঞ্চলে উত্তপ্ত আবহাওয়া ক্রান্তীয় অঞ্চলের জঙ্গলের ভ্যাপসা আবহাওয়ার তুলনায় সহনীয়।

খুব বেশি ঘাম-হওয়া কি ক্ষতিকর? তিন থেকে পাঁচ লিটার জল ত্যাগ তা যে ভাবেই হোক, অসহ্য তৃষ্ণা এনে দেয়, কিন্তু এর ফলে মৃত্যু হয় না, যদি সময় মতো পরিপূরণ করে দেওয়া হয়। ফ্রান্‌সে 42 সালে ঘটেছিল একটি বিখ্যাত ঘটনা যখন একটি যুবক আমৃত্যু কিছু পান করবে না এই সংকল্পে অবিচলিত থাকে। জীবনমৃত্যুর লড়াই চলে সতের দিন। ছেলেটিকে বাঁচানো যেত যদি এমনকি তার এই অত্যাশ্চর্য উপবাসের পঞ্চদশদিনেও পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করানো যেত।

ঘামের এই এত জল আসে কোথা থেকে? জল খাওয়ার পরে সেই জল কোথায় আমরা সঞ্চয় করে রাখি? স্বেদগ্রন্থি জল আহরণ করে রক্ত থেকে।

কিন্তু যতক্ষণ ঘাম হওয়া অত্যধিক না হয়, রক্ত ঘনতর হয় না বা তার আয়তনের হ্রাস ও ঘটে না। রক্তের জলের ভাগ যেই কমে যায় সম পরিমাণ জল রক্তবহা নাড়ীর মধ্যে চলে আসে সঞ্চিত ভাণ্ডার থেকে (জল সঞ্চয়ের মুখ্য স্থানগুলি হোল চামড়ার নীচের কলাস্তরে, পেশীতে ও অন্যান্য দেহযন্ত্রে)। অপর পক্ষে জল পান করার পরে অন্ত্র থেকে সেই জল রক্তের মধ্যে শুষে নেওয়া হয়, সেই পরিমাণ জল তৎক্ষণাৎ ভাণ্ডারে পরিবাহিত হয়।

বিশেষ করে পাখিদের এবং উড়তে পারে এমন পতঙ্গদের ক্ষেত্রে জল সঞ্চয় করে রাখার পরিমাণ সীমিত। তাদের শরীরে যে জল থাকে সেটা এক বা দুই দিনের পক্ষে কোন রকমে চলতে পারে, এমন কি ঠাণ্ডা আবহাওয়াতেও। কিন্তু প্রাণীদেহে জলের ভাণ্ডার একটা থাকতেই হবে। জল ধরে রাখবার এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করেছে মৌমাছিরা। কোন মৌমাছি পরিবার যাতে আছে হাজার খানেক বয়স্ক পতঙ্গ এবং অনেক শুককীট, জল ছাড়া বাঁচতে পারে না। এদের শিশুদের কি অবস্থা হয়, আবহাওয়া যখন ওড়ার পক্ষে অনুপযোগী থাকে? মৌমাছিরা একটা রাস্তা বার করেছে। একটা মৌচাক খুললে দেখতে পাবে অনেকগুলি কর্মী মৌমাছি নিস্তব্ধ হয়ে চাক ধরে ঝুলছে। এরা সব জীবন্ত জলের চৌবাচ্চা। মৌমাছি রাজ্যের ভিস্তিরা জল এনে এনে এই সব কর্মী মৌমাছিদের গলায় ঢেলে দিচ্ছে যার ফলে তারা ওড়া দূরে থাক হাঁটতেই পারে না। ওড়ার পক্ষে অনুপযোগী আবহাওয়া দু'এক দিনের মধ্যে কেটে গেলে তাদের পেটগুলি আবার স্বাভাবিক আকারের হয়ে যায়, চৌবাচ্চাও খালি হয়ে যায়।

কুমিরের অশ্রু

শান্ত, উষ্ণ সমুদ্রের ঢেউগুলি অলসভাবে ছুঁয়ে যায় তীর, আর গাছের ছায়াঘেরা পাথুরে জমিতে হরিণ চরে বেড়ায় সারাদিন জলের কিনারায়। তারা ওক আর পাইনের বিস্তৃত ছায়ায় ঠাণ্ডা বাতাস সেবন করতে আসে। এইসব সুদেহী শিংওয়ালা জন্তুদের পায়ের কাছে তরঙ্গ আছড়ে পড়ে, কিন্তু সমুদ্র তাদের কাছে আকর্ষণীয় নয়। পিপাসা পেলে এই হরিণরা পাহাড় বেয়ে ওঠে, খুঁজে বেড়ায় ছোট ছোট গর্ত যেখানে জমা আছে ঘোলা জল, গ্রীষ্মে সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায় যে ঝরনা তারই বাসি জল।
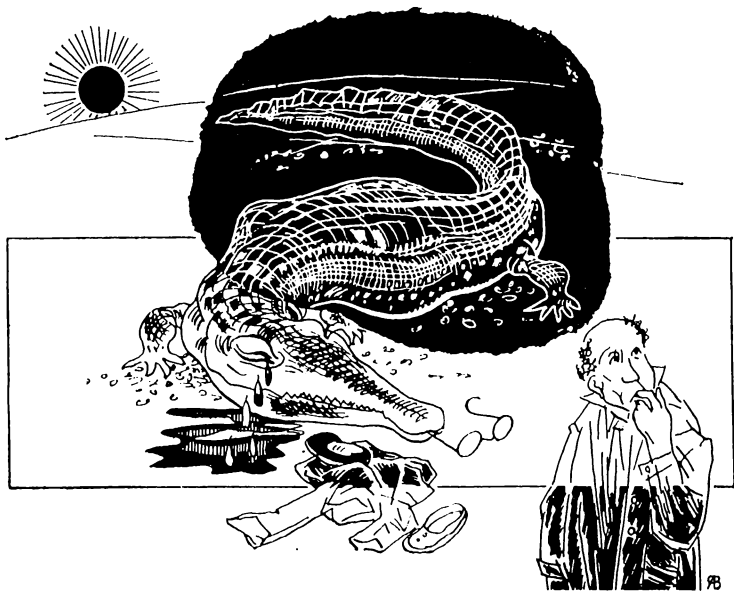
হরিণ বা অন্য কোন ডাঙার প্রাণী পিপাসার্ত হোলে কখনোই জল খেতে যাবে না সমুদ্রে। মহাদেশের আঁকা বাঁকা তীর, হাজার হাজার মাইল দীর্ঘ মহাসাগর দিয়ে ঘেরা। কিন্তু তার কোন অঞ্চলে তুমি দেখতে পাবে না জন্তুদের পায়ে চলার দাগ, কেননা ডাঙার পৃথিবীর কোন জন্তু সমুদ্র থেকে তৃষ্ণা মেটায় না।

জাহাজ ভেঙ্গে গেলে মানুষ তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে মরে অপার লবণাক্ত সমুদ্রের মাঝখানে। সমুদ্রের জল পানের অযোগ্য কেননা নানা প্রকারের লবণ তাতে গোলা রয়েছে। প্রতি লিটারে পঁয়ত্রিশ গ্রাম, যার মধ্যে 27 গ্রাম সাধারণ লবণ। সমুদ্রজল পানের অযোগ্য কেন?

বয়স্ক লোকের প্রতিদিন তিন লিটার পর্যন্ত জলের প্রয়োজন, খাদ্যের মধ্যে গৃহীত জল ধরে নিয়ে। সমুদ্রের জল যদি পান করা হোত তাহলে শরীরে ঢুকত প্রতিদিন একশ গ্রাম লবণ। এই লবণের সবটাই যদি রক্তে মিশত তাহলে তার ফল হোত বিপজ্জনক। রক্ত সাধারণত প্রয়োজনীয় লবণের স্বাভাবিক মাত্রার অতিরিক্ত লবণগুলিকে বর্জন করে। রক্ত পরিষ্কারের জন্য মুখ্য দেহযন্ত্র হোল বৃক্কদ্বয়। বয়স্কলোক প্রতিদিন দেড়লিটার পর্যন্ত

প্রস্রাব ত্যাগ করে (অর্থাৎ গৃহীত জলের অর্ধেক) এবং সেই সঙ্গে ত্যাগ করে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম ও অন্যান্য ক্ষতিকর পদার্থ। দুর্ভাগ্যক্রমে সমুদ্রজলে এই সব লবণগুলির ঘনত্ব প্রস্রাবের তুলনায় বেশি। সেজন্য সমুদ্রজল পান করলে অতিরিক্ত লবণগুলির নিষ্কাশনের জন্য আরো বেশী জল পান করার প্রয়োজন হোত। সমুদ্রে তবে মাছ ও অন্য প্রাণী বাস করে কেমন করে? নির্মল জল তারা পায় কোথা থেকে?

আসল ঘটনা হোল সত্যিই তারা পেয়ে যায় লবণমুক্ত জল। মাছ এবং অন্যান্য মেরুদন্ডী প্রাণীর রক্তে এবং দেহস্থিত তরল পদার্থে লবণের ভাগ বেশ কম। তাই সামুদ্রিক মাংসাশী প্রাণীরা তাদের খাদ্যের সঙ্গেই পেয়ে যায় প্রয়োজনীয় খাঁটি পাণীয় জলের অনেকটা। এই তরল পদার্থগুলি যে মানুষের পক্ষেও উপকারী সেটা সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেন ফরাসী চিকিৎসক এ. বমেয়ার।

প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ জাহাজ দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হয়ে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় মারা যায়। বমেয়ার অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে একটা পরীক্ষা করেছিলেন। তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে মহাসমুদ্রে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সকল বস্তুই আছে; এবং যে সব লাক নৌ-দুর্ঘটনায় পড়ে তারা মৃত্যু এড়াতে পারে যদি তারা মহাসমুদ্রের দান ঠিকঠিক গ্রহণ করতে পারে। এই উদ্দেশ্যে বমেয়ার আটলাণ্টিক মহাসমুদ্র পাড়ি দেন রাবারের একটা ছোট নৌকায়, খাদ্য — শুধু তাঁর নৌকা থেকে ধরা মাছ আর ছোট ছোট মেরুদন্ডী প্রাণী আর জলের বদলে মাছের শরীর টিপে নির্গত তরল পদার্থ পানীয়। ইউরোপ থেকে আমেরিকা পৌঁছতে বমেয়ারের পয়ষট্টি দিন লেগেছিল আর এই খাদ্য গ্রহণ করে তাঁর স্বাস্থ্যের যদিও যথেষ্ট অবনতি ঘটেছিল তবুও তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে মহাসমুদ্রে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে।

আবার সেই প্রশ্নটা তুলতে ইচ্ছে হচ্ছে যে মাছেরা পানীয় জল পায় কোথা থেকে? জানা গেছে যে মাছেদের আছে চমৎকার একটা পাতনযন্ত্র, বৃক্ক থেকে স্বতন্ত্র। মাছের বৃক্ক আকারে এতই ছোট এবং অপুষ্ট যে শরীর থেকে লবণ নিষ্কাশনে তাদের কার্যকারিতা নগন্য। পাতনযন্ত্রটির অবস্থান গিলস্ বা ফুলকোয়। বিশেষ ধরনের কোষের সাহায্যে লবণ আলাদা করে নিয়ে খুবই ঘন অবস্থায় শ্লেষ্মার সঙ্গে মিশিয়ে শরীর থেকে বর্জন করা হয়।
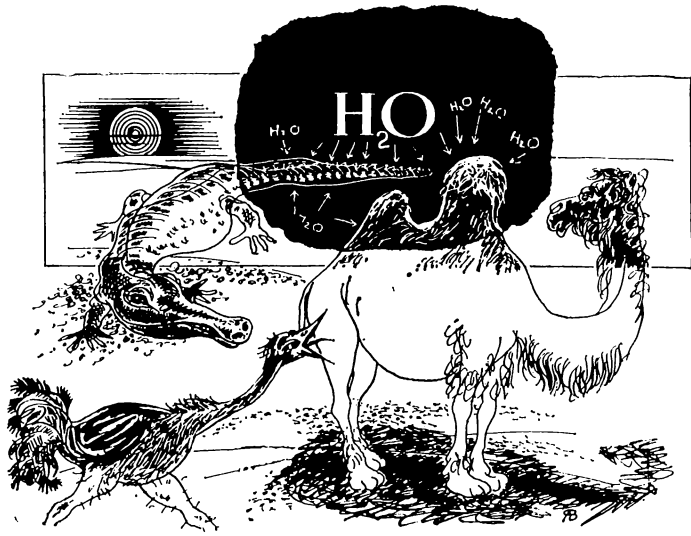
সামুদ্রিক পাখিদেরও নির্মল জল সংগ্রহ করতে অসুবিধা হয়। স্টর্মি পেতরেল আর আলবেট্রস থাকে খোলা সমুদ্রে ডাঙা থেকে বহুদূরে। বছরে একবার তারা আসে তীরে বাচ্চা জন্মানের সময়ে। করমর‍্যাণ্ট, গিলমট আর নানা জাতের সামুদ্রিক গাল কখনো মিঠে জল খায় না যদিও তারা তীরের কাছাকাছি থাকে। আগে আগে ধারণা করা হোত যে তাদের শিকারদের দেহস্থিত তরল পদার্থ দিয়েই কাজ চলিয়ে নেয়, কিন্তু প্রমাণিত হয়েছে যে তারা স্বেচ্ছায় সমুদ্রের জল খায়, এবং তাদের মধ্যে কোন কোন জাতের পাখির সমুদ্রজল না হলে চলে না। অনেকগুলি পশুশালাতে বহুদিন পূর্বেই লক্ষ করা গেছে যে এইসব পাখিরা বন্দীদশায় বাঁচে না। জীববিজ্ঞানীরা ধাঁধায় পড়লেন। দুর্বল ছোট টুনটুনি বন্দীদশায় বাঁচে, তোতারা, উটপাখিরা, ঈগলেরা, পেঁচারা খাঁচার মধ্যে যহজেই বেঁচে থাকে কিন্তু গাল-এরা মরে যায় কয়েকদিনের মধ্যেই। অবশেষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হোল যে এই সুন্দর সামুদ্রিক পাখিগুলি বন্ধ খাঁচায় বাঁচতে পারে না কারণ উন্মুক্ত মহাসাগরের পরিবেশের অভাবটা এরা বোধ করে। কিন্তু বন্ধ খাঁচা বা সমুদ্রের জন্য আকাঙ্খা এর কোনটাই এদের মৃত্যু ঘটাচ্ছিল না। আসল কারণটা হোল ওরা যথেষ্ট পরিমাণে লবণ পাচ্ছিল না। ওদের খাদ্যে লবণ মিশিয়ে দেখা গেল যে মহানন্দে এরা বেঁচে থাকছে।

সামুদ্রিক পাখি এবং সরীসৃপদের আছে চমৎকার পাতনযন্ত্র। এই যন্ত্রটি বৃক্ক নয়, পরন্তু নাসিকাস্থ একটা গ্রন্থি বা আধুনিক নাম অনুসারে লবণ-গ্রন্থি। পাখিদের ক্ষেত্রে এটির অবস্থান অক্ষিগোলকের ওপর দিকে, এর নির্গম-নালীটা নাকের গর্তে এসে মিশেছে। এই গ্রন্থি-নিঃসৃত রসে সোডিয়ামের ঘনত্ব রক্তের তুলনায় পাঁচগুণ এবং সমুদ্রজলের তুলনায় দুই থেকে তিনগুণ। নাকের ফুটো থেকে বেরিয়ে আসা তরল পদার্থ ঠোঁট থেকে ঝুলতে দেখা যায়, স্বচ্ছ ফোঁটার আকৃতিতে যেগুলি পাখিরা মধ্যে মধ্যে ঝেড়ে ফেলে দিচ্ছে। বেশি লবণ মেশানো খাদ্যগ্রহণেরদশ বারো মিনিট পরে দেখা যায় যে এই পাখিদের নাক থেকে ফোঁটা ঝড়ে পড়ছে, মনে হবে তাদের খুব সর্দি হয়েছে।

কাছিম, সাপ, গোসাপ প্রভৃতি সরীসৃপদের ক্ষেত্রে এই নিষ্কাশনী-নালীর মুখটি থাকে চোখের কোণে, তরল পদার্থ ঝরে চোখ থেকে। বহুকাল আগে মানুষের নজরে পড়েছে যে কুমির সময় সময় বড় বড় ফোঁটায় স্বচ্ছ অশ্রু ফেলে থাকে। শিকারকে পেটে পুরে, তার মৃত্যুর জন্যে কুমির নাকি কাঁদে। অতি সাম্প্রতিক কালে এই রহস্যের সমাধান হয়েছে এই যে, কুমির এই প্রক্রিয়ায় খাদ্য এবং জল থেকে গৃহীত অতিরিক্ত লবন বর্জন করে।

সবুজ কাছিম উষ্ণ সমুদ্রে ঘুরে বেড়ায় সারা বছর। বছরের একটা বিশেষ সময়ে একবার মাত্র রাত্রির অন্ধকারের আড়ালে স্ত্রী-কাছিম আসে বালুতটে ডিম পেড়ে লুকিয়ে রাখতে। সমুদ্রে ফিরে যাওয়ার কালে সেই কাছিম হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে যায়। ওরা কি সেই জায়গা ছেড়ে যেতে দুঃখবোধ করে যেখানে একদা সে নিজে ডিম থেকে ফুটে বেরিয়ে এসেছিল? অথবা ভাগ্যের হাতে নিজের সন্তানদের ফেলে রেখে যাচ্ছে বলে কি কাঁদে? আসল ব্যাপার এসব কিছুই নয়। লবণ-গ্রন্থি আসলে শরীর থেকে লবণ বর্জনের কাজ করে চলেছে, স্বাভাবিক নিয়মে। অসাধারণ কিছুই ঘটেনি। সবুজ কাছিমের অশ্রুসিক্ততা স্বাভাবিক ব্যাপার, কেবল জলের মধ্যে তাদের চোখের জল আলাদা করে বোঝা যায় না। সে জন্যই এই লবণ-গ্রন্থির ব্যাপারটা মানুষের জানতে কতদিন কেটে গেল।

মাছেরা কি জল খায়

মাছেরা কি জল খায়?তোমাদের কি মনে হয়? আমি দেখতে পাচ্ছি তোমাদের মুখে বিদ্রূপের হাসি। মুখ খুললেই তো মাছের মুখ জলে ভর্তি হয়ে যায়। মাছেদের ভাল লাগুক বা না লাগুক খাদ্যের সঙ্গে কিছু জল মাছের পাকস্থলীতে যায়। এই জলটুকুই কি যথেষ্ট? মাছেদের কখনো তেষ্টা পায় কি? এসব প্রশ্নের জবাব বিজ্ঞানীরা অনেকদিন আগেই পেয়েছেন।

সারা পৃথিবীর যেখানে জল আছে সেখানেই মাছেরা তো বাস করে, কিন্তু প্রত্যেক জাতের মাছ বেঁচে থাকতে পারে কেবল তার নিজের স্বাভাবিক পরিবেশে। কেবল মাত্র কয়েক জাতের মাছ আছে যারা নোনা জল থেকে মিঠে জলে গিয়ে আবার লোনা জলে ফিরে আসতে পারে নিজেদের শারীরিক ক্ষতি না ঘটিয়ে। কুঁচে জাতীয় মাছেদের জুড়ি নেই এই ব্যাপারে। তারা জীবনের অর্ধেকটা কাটায় লোনা জলে বাকি অর্ধেক মিঠে জলে। একরকমের জল থেকে অন্য রকমের জলে যেতে মাছেদের বাধা কিসে? ত্বকের নীচের আবরণী, মুখের গহবর, গিলস্, মাছের শরীরের অন্যান্য অংশ, সকল দেহযন্ত্রের বা কলার প্রত্যেক কোষের বহিচ্ছদ জলের বেলায় প্রবেশ্য। জল দ্বারা এরা সহজেই নিষিক্ত হয়ে যায়। কিন্তু লবণ এবং অন্যান্য পদার্থের বেলায় এই অংশগুলি প্রবেশ্য নয়।

জল কোথায় যায়? সঞ্চয় ভাণ্ডারে যায় না সংচয় ভাণ্ডার থেকে বাইরে কোথাও যায়? কোথায় যাবে সেটা নির্ভর করে না সেখানকার প্রাচুর্য বা ঘাটতির ওপর। ব্যপনক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয় দ্রবনের অসমটিক বা অভিশ্রবণ চাপের ওপর, যেটা নির্ভর করে মিশ্রিত দ্রব পদার্থের ওপর। এই দ্রব পদার্থের পরিমাণ যত বেশী হবে, অসমটিক চাপও হবে তত বেশি এবং দ্রবনটি তত বেশী জল টেনে নেবে। নির্মল জলে এই চাপ শূন্যের কাছাকাছি, অন্যদিকে মাছের রক্তে বা কোষস্থিত তরল পদার্থে যথেষ্ট পরিমাণে লবণ এবং প্রোটিন পদার্থ থাকার ফলে ছয় থেকে দশ আবহচাপের তুল্য। এই বলের সাহায্যে মিঠে জলের প্রাণী তাদের শরীরের মধ্যে বাইরে থেকে প্রচুর পরিমাণে জল টেনে নেয়। তাদের শরীরে বাড়তি জল বর্জন করবার জন্যে কোন যান্ত্রিক ব্যবস্থা যদি না থাকত তাহলে তারা ফুলে মরে যেত। সেজন্য

স্বাদুজলের মাছদের আলাদা করে জল পান করার প্রয়োজন হয় না। এমনিতেই সব দিক থেকে যে জল তাদের শরীরে প্রবেশ করতে চাইছে তাকে তাড়াতেই তাদের অনেক কষ্ট করতে হচ্ছে।

সমুদ্রের বাসিন্দা হাড়ওয়ালা মাছেদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যরকম। সমুদ্রজলে লবণের পরিমাণ মাছেদের দেহের কোষগুলির মধ্যস্থিত তরল পদার্থের তুলনায় অনেক বেশী। সমুদ্রজলের অসমটিক চাপ 32 আবহ, এদিকে শরীরস্থ তরলের চাপ 10-15 আবহ মাত্র যে-জন্যে তৃষ্ণার্ত সমুদ্র তাদের শরীর থেকে হ্যাংলার মতো জল শুষেই চলেছে। অসম্ভব মনে হতে পারে প্রথম চিন্তায় যে সমুদ্রজলে নির্ভয়ে সাঁতার দিচ্ছে যে-সব মাছ তাদের শুষে শুকনো করে দিতে পারে সেই জল। তাই বুঝি এইসব মাছেরা সর্বদা তৃষ্ণার্ত।

সব সামুদ্রিক মাছ কিন্তু জল খায় না। প্রাচীনতম মাছ, হাঙর আর সংকর মাছ মহাসমুদ্রে এসেছে হাড়ওয়ালা মাছদের আগে (হাড়ওয়ালা মাছেদের বলা হয় টেলিওসট্)। এরা এই লোনা জলে বাস করার জন্যে নিজেদের জীবনযাত্রা এক ভিন্ন ধারায় পরিবর্তন করে নিয়েছে। এরা এদের রক্তে ইউরিয়া রেখে দিতে শিখেছে। ইউরিয়া একটা ক্ষতিকর পদার্থ এবং অন্য প্রাণীরা একে যত তাড়াতাড়ি পারে বর্জন করে থাকে। এই হাঙর আর সংকর মাছেদের গিলস্‌গুলি ঢাকবার জন্যে আছে একটা বিশেষ পর্দা যার ভিতর দিয়ে ইউরিয়া গলে যেতে পারে না। হাঙর আর রে-ফিশদের রক্তের অসমটিক চাপ সমুদ্রজলের তুলনায় অনেক বেশী, তাই তাদের শরীর মিঠে জলের মাছেদের মতোই সমুদ্র থেকে জল নিয়ে থাকে। ওদের সমস্যাও তাই জল বর্জনের, গ্রহণের নয়।

হাঙরদের থেকে আবার এই প্রক্রিয়াটা ধার নিয়েছে কাঁকড়াভোজী ব্যাঙেরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে যাদের কথা সম্প্রতি জানা গেছে। উভচর প্রাণীদের মধ্যে কেবল এরাই লবণ-জলে বাঁচতে পারে। এই বাঙেরা কিন্তু ডিম পাড়ে মিঠে জলে, আর তাদের বাচ্চারা একটু বড় হোলেই মিঠে জল থেকে লোনা জলে চলে যায় যেখানে তারা কাঁকড়া ধরে খায়। হাঙরদের মতোই এই বাঙেরা তাদের রক্তের মধ্যে ইউরিয়া রেখে দেয়, আর মজা হোল এই যে এটা তারা ইচ্ছেমতো করতে পারে। সমুদ্রে যাবার আগে শরীরে ইউরিয়া সঞ্চয় করে নেয় এবং বাড়তিটুকু মিঠে জলে ফেরার সময় ত্যাগ করে আসে। তাই বাসস্থান যেখানেই হোক না কেন এই ব্যাঙেরা জল খায় না।

বাতাস নিংড়ে শুকিয়ে ফেলা যায় কি?

অনেককাল আগে থেকেই জীববিজ্ঞানীরা লক্ষ করেছেন যে কতকগুলি মরুভূমির প্রাণী যারা সারা জীবনে এক চামচ পরিমাণ জলও দেখেনি, বন্দীদশাতে খুশি মনে প্রচুর পরিমাণে জল খেয়ে থাকে। তাহলে স্বাধীনভাবে যখন তারা ছাড়া থাকে তখন জল না খেয়ে থাকে কি করে — এটা ছিল একটা রহস্য। তবে কি মরুভূমি যতটা শুকনো মনে করা হয় আসলে ততটা নয়? অথবা সেখানেও বোধহয় খোঁজ করলে জল পাওয়া যায়?

এই প্রশ্নের মীমাংসার আগে দেখা যাক শুষ্ক অঞ্চলে যে-সব মানুষ থাকে তারা জল পায় কোথা থেকে?

ক্রীমিয়ার দক্ষিনতীরের একটি সংকীর্ণ ভূখন্ডে, পাহাড় আর সমুদ্রের অন্তর্বর্তী অঞ্চলে আছে অনেকগুলি হলিডে-হোম, স্যানাটোরিয়া আর পাইওনিয়রদের শিবির। গ্রীষ্মকালে হাজার হাজার লোক ছোটে ক্রীমিয়ার দিকে। কারুর কিন্তু খেয়াল হয় না সেখানকার সেবা বিভাগের কর্মীদের কী কষ্ট ও পরিশ্রম করতে হয় নিয়মিত জল সরবরাহ বজায় রাখতে যাতে, এই ছুটির আমোদভোগীরা নিয়মিত চান করতে, বাসন ধুতে, রান্না করতে পারে। তোমরা জানো যে ক্রীমিয়ার দক্ষিণ উপকূলে কোন বড় নদী নেই, আর স্থানীয় ঝরণাগুলি গ্রীষ্মে শুকিয়ে যায়।

ক্রীমিয়াতে শরতের শুরু থেকেই (যে সময়ে সেখানে বৃষ্টি হয়) জল জমা করে রাখা হয়। জল ধরে রাখা থাকে মাটির ওপরে বা নীচে অবস্থিত বড় বড় দীঘি, পুকুর বা জলাধারে, গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত। তা সত্ত্বেও জলকষ্ট মাঝে মাঝে দেখা দিত, যেটা ঘুচল পাহাড়ের তলা দিয়ে সুড়ঙ্গ কেটে প্রমাণ সাইজের একটা নদীকে সমুদ্রে প্রবাহিত করে দেওয়ার পরে।

কয়েক দশক আগে এসব পরিকল্পনার কথা ভাবাই যেত না। কিন্তু প্রাচীন কালেও ক্রীমিয়াবাসীরা তাদের জলের প্রয়োজন মিটিয়ে নিয়েছে। তারা জল পেত সরাসরি বাতাস থেকে। ক্রীমিয়া অঞ্চল যতই শুষ্ক হোক তার বাতাস থেকে কেমন করে জল বার করা হোত।

পূর্বক্রীমিয়াতে ফিওডসিয়া শহরের অদূরে মধ্যযুগীয় কোন প্রতাপশালী ব্যক্তির জমিদারীতে একটা চমকপ্রদ স্থাপত্যের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে: পাথরের টালি দিয়ে মোড়া বিস্তীর্ণ একটি প্রাঙ্গন, যার ওপর আছে কতকগুলি পিরামিড। এই পিরামিডগুলির গায়ে রয়েছে অসংখ্য ফুটো আর সুড়ঙ্গ।

গরম বাতাস এই পিরামিডের মধ্যে ঢুকে ভিতরের শীতল দেয়ালে রেখে যায় কয়েকবিন্দু ঘনীভূত শিশির। শীতের দিনে জানালার কাঁচে জমে থাকা জলবিন্দুর মতো পিরামিডের ভিতরের দেয়ালগুলি হয়ে যায় কুয়াসায় লেপা। জমা হতে হতে ছোট ছোট শিশির বিন্দুগুলি বড় বড় জলের ফোঁটায় দেয়াল বেয়ে চুঁইয়ে পড়তে থাকে, বিশেষ একটা নালী বেয়ে পোঁছে যায় মাটির নিচে একটি জলাধারে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে জল সর্বত্র পাওয়া যায়, এমনকি শুষ্ক মরু অঞ্চলেও, যদিও শুকনো বাতাস থেকে বেশী জল পাওয়া সম্ভব নয়। এতদসত্ত্বেও সম্পূর্ণ শুষ্ক মরুভূমিতেও রাতের বেলায় পাথরের স্তুপের নীচে শিশির জমা হয়। গভীর বালুর স্তর ভেদ করে বাতাস সেখানে রেখে আসে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জলকণা। সময় সময় এর পরিমাণ নেহাৎ নগন্যও নয়।

কারাকুম মরুভূমিতে বালুর ওপর তরমুজ ফলে, তার জন্যে জল সেচের প্রয়োজন হয় না। সে অঞ্চলে মিঠে জলের ঝরনাও বিরল। তার বদলে, কারাবোগজগল উপসাগর থেকে বহে আসা বাতাস মরুভূমিতে নিয়ে আসে জলকণা। রাত্রে যখন ঠাণ্ডা পড়ে তখন সেই বাতাস যে পরিমাণ জলকণা ত্যাগ করে তা কোন কোন সময় এত বেশি হয় যে বালু তার সবটা শুষে নেবার সময় পায় না, এবং সেই জল সংগ্রহ করা যায় গভীর গর্তে জলপাত্র রেখে দিলে।

মরুভূমির বাসিন্দারা খোঁজ রাখে পাথরের ফাঁকে, গভীর গহ্বরে কোথায় শিশির জমা হয়ে লুকানো জলধারের সৃষ্টি করেছে।

অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমিতে বেতং নামের যে ক্যাঙারু ইঁদুর বাস করে তারা মাটি থেকেও জল বার করতে জানে। ছোট এই অদ্ভুত প্রাণীটা নানা জাতের উদ্ভিদের বীজ খেয়ে প্রাণধারণ করে — এই বীজগুলি এত শুকনো যে তার মধ্যে জল নেই বললেই চলে। ইঁদুরেরা বীজগুলি মুখে নিয়েই সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে ফেলে না, প্রথমে গালের ভেতরের বিশেষ থলিতে জমা করে পরে সেগুলি গর্তে নিয়ে যায়।

এই ইঁদুরদের গোঁফ গজায় কেবল মুখের বাইরেতেই নয়, ভেতরেও, যার ফলে মুখের লালা গালের ভেতরের এই থলিতে পেঁছায় না। এর ফলে শরীরস্থ জলের কিছুটা সাশ্রয় হয়। মাটি থেকে সম্পূর্ণ শুকনো বীজগুলি তুলে এনে বেতং রেখে দেয় গভীর গর্তের মধ্যে। মাটিতে সামান্যতম জলকণা থাকলেও বীজগুলি সেটা শুষে নেবে। শুকনো বীজের অসমটিক বা

অভিশ্রবণ চাপ 400 থেকে 500 আবহ, তাই সেই শক্তি দিয়েই তারা জল শুষে নিতে পারে। ইঁদুরেরা সেই বীজ জলে নিষিক্ত না হওয়া পর্যন্ত খায় না।

আশ্চর্য প্রাণী মলখ (Moloch) বা আগামঢ়ভ গোসাপ। এরা বাস করে উষ্ণ, শুষ্ক অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমিতে। এদের উদ্ভাবনী ক্ষমতা আরো বিচিত্র। এদের সারা গা থেকে বেরিয়ে আছে তীক্ষ্নধার কাঁটা আর খোঁচা। বিজ্ঞানীরা এই প্রাণীটির বিষয়ে অবগত আছেন অনেককাল, কিন্তু দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাঁদের ধারণা ছিল যে এই কাঁটাগুলি এরা আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্যেই ব্যবহার করে। এখন অবশ্য জানা গেছে এই কাঁটাগুলি সমান গুরুত্বের আর একটি উদ্দেশ্যেও ব্যবহৃত হয়। মলখ-এর ত্বকের ওপর আঁশ-এর মতোযে স্তর আছে তাতে মিশে আছে অসংখ্য ছিদ্র যার মুখগুলি আছে বাইরের দিকে, কাঁটাগুলির ফাঁকে ফাঁকে। গোসাপের চামড়ার ওপর এক ফোঁটা জল যদি পড়ে তখনি সেটা ত্বকের ছিদ্রে শুষে যাবে, শরীরের মধ্যে প্রবেশ করবে না, কেননা ছিদ্রগুলি ত্বকের গভীর স্তরে পাওয়া যায় না। এই ছিদ্রগুলির স্থাপত্য এমন যে ত্বক বেয়ে মাথার দিকে ছাড়া জল যাওয়ার আর কোন রাস্তা নেই। এই নালীপথগুলির জট মলখের মুখের ভিতরে অবস্থিত ছিদ্রযুক্ত দুটি ছোট থলিতে এসে শেষ হয়েছে, যেখানে জল জমা হয়। থলিতে সামান্য জল থাকলেও মলখকে কেবল চোয়াল নেড়ে সেই জলের এক এক ফোঁটা পাম্প করে মুখে আনতে হয় এক একটা থলি থেকে।

জল পান না করেও মলখ সুখে আছে। মরুভূমিতে যদি কোন ঝরণা দেখতে পেল, মলখ তখনি তাতে একটা ডুব দিয়ে নিল, ত্বক দিয়ে যত জল ঢুকল মুখ দিয়ে পান করে সে কখনোই ততটা জল খেতে পারত না, চামড়ার নিচে জমা রইল জলের একটি ভাণ্ডার।

এছাড়া মলখ-এর কাঁটাগুলি তার ত্বকের থেকে কিছুটা ঠাণ্ডা। রাত্রে সেখানে সামান্য শিশিরও জমা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ত্বকের মধ্যে শোষিত হয়ে যায়। সুতরাং মলখ সরাসরি বাতাস থেকে জল শুষে নিতে পারে।

জলের কারখানা

দুপুরের প্রখর সূর্য বিশাল মরুর বিভিন্ন প্রান্তে নির্দয়ভাবে ঢেলে দিচ্ছে উত্তাপ। তাই দিনের বেলায় বালু এত গরম হয় যে খালি পায়ে হাঁটলে পা পুড়ে যায়। কোথাও একটা জীবিত প্রাণী দেখা যায় না। দেখা যাবেই বা

কেন? দশমাইলের ভিতর, কখনো বা একশ মাইলের ভিতর কোথাও নেই এক ফোঁটা জল।

তা সত্ত্বেও কিন্তু মরুভূমিতে জীবনের অস্তিত্ব রয়েছে। তাকে দেখতে পাবে অতি প্রত্যূষে, সকালের বাতাসে বালুর চলাচল শুরু হবার আগে। যে দিকে তাকাও দেখবে অসংখ্য প্রাণীর হেঁটে চলে যাওয়া পদচিহ্নের রকমারি প্যাটার্ন। এখান দিয়ে চলে গেছে ধীর-স্থির কচ্ছপ, পিঠে তার শক্ত খোলাটি বয়ে নিয়ে। তারই একটু দূরে দিয়ে গেছে দুসারি ফুটকি, মাঝে লেজের একটা গভীর লাঙল-চষা দাগ: এখান দিয়ে চলে গেছে একটা ছোট গিরগিটি। ওধারের ওই খানিকদূর অন্তর অন্তর কতকগুলি করে যে দাগ দিতে দিতে চলে গেছে সে ছিল বোধহয় দ্রুত লাফ দিতে পারে এমনি একটা জারবোয়া। ওই বড় বড় পায়ের ছাপগুলি নিশ্চয় গলা-ফোলানো গ্যাজেল হরিণের। দেখা যাচ্ছে মরুভূমিতে রাত্রিটা কেটেছে প্রাণের পূর্ণ চঞ্চলতার মধ্য দিয়ে আর সকাল হতেই জীবিতপ্রাণীরা সব অন্তর্ধাণ করেছে নিরাপদ আশ্রয়ে।

এমনি নিষ্ফলা স্থানে প্রাণীরা বাঁচে কী করে? কী করে তারা এত জলকষ্টের মধ্যে টিকে থাকে?

মরুজীবী অনেক প্রাণী যেমন হরিণ, সুসলিক, গেরবিল, জারবোয়া, কচ্ছপ এরা জল একেবারেই পান করে না বা জল না খেয়ে অনেকদিন থাকতে পারে। তার বদলে এরা সবুজ পাতা। বসন্তে, বৃষ্টি হোলে অল্পকালের জন্য মরুভূমিতে জাগে প্রাণের সাড়া। চারদিক সবুজ, ফুল ফোটে। তারপরে ঘাসগুলি আবার প্রখর সূর্যের তাপে হলদে হয়ে শুকিয়ে যায়, প্রাণীরা তখন মাটি খোঁড়ে — খুঁজে বেড়ায় কোথায় আছে টিউলিপ গাছের কন্দ বা অন্য উদ্ভিদের মূল। এই কন্দগুলি তাদের পুরু ত্বকের ভিতরে সঞ্চয় করে রাখে যথেষ্ট পরিমাণে জলকণা। প্রাণীভোজীরাও কষ্ট পায় না, তারা তৃণভোজীদের খেয়ে জলের চাহিদা মেটায়। তবুও জলের অভাব ঘোচানো দুষ্কর। তাই এটা কম আশচর্যের নয় যে মরুজীবীরা কেমন করে নিজেদের জন্য জলদাত্রী উদ্ভিদের বা তাদের মূল বা কন্দে সঞ্চিত জলভাণ্ডারের সন্ধান পায় যেখানে উদ্ভিদ জল প্রস্তুতের মূল সরঞ্জামগুলি এনে রাখে। বলে রাখা ভাল, আমাদের এই পৃথিবীর সকল প্রাণী, এমনকি মানুষও জল প্রস্তুত করার ক্ষমতা রাখে। আমরা যখন কাজ করি, তখন শরীরস্থ কোষগুলি শর্করা আর মেদ জ্বালায় শক্তি জোগানোর জন্যে। দহন কাজটি সম্পূর্ণ হোলে দুটি পদার্থ পাওয়া যায় — কার্বন

ডাই-অকসাইড আর জল। কার্বন ডাই-অকসাইড অত্যন্ত ক্ষতিকর। শরীর তাই তৎক্ষণাৎ তাকে অপসারণ করে এবং জলটা রেখে দেয় শরীরের প্রয়োজন মেটাতে। এক গ্রাম শর্করা থেকে পাওয়া যায় 0·56 গ্রাম জল, এক গ্রাম চর্বি থেকে পাওয়া যায় 1·07 গ্রাম জল। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির শরীরে প্রত্যহ 300 গ্রাম জল তৈরী হয়।

মানুষের জন্য জল উৎপাদনের এই ব্যবস্থা যদিও নগণ্য, কোন কোন প্রাণীর ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা জল পাওয়ার একমাত্র পথ। তিতির, ভরত, গেরবিল প্রভৃতি পাখি, কয়েক জাতের ইঁদুর জল না খেয়ে অনেক কাল স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকে। এদের অনেকেই আদৌ জল খায় না, শুকনো ঘাসের ডাঁটা বা উদ্ভিদের বীজই এদের খাদ্য যার মধ্যে জল আছে অতি সামান্য মাত্রায়। প্রয়োজনীয় জল তারা পায় তাদের খাদ্যের চর্বি আর শর্করার জারনের থেকে। চর্বি আর শর্করা শরীরে জমা করে রাখা যায় অতি সহজে। জল উৎপাদনের কাঁচামাল হিসেবে শ্বেতসার আর চর্বি সবচেয়ে সুবিধাজনক কেননা এদের দাহণের ফলে জল আর কার্বন ডাই-অকসাইড ছাড়া আর কোন ক্ষতিকর উপাদানের সৃষ্টি হয় না। শুষ্ক স্তেপ অঞ্চলে বা মেরু অঞ্চলে যে সব প্রাণী বাস করে যেমন সাপ, হরিণ, জিরাফ, জেব্রা, সিংহ, আর উটপাখি, এরা সবাই প্রচুর পরিমাণে চর্বি সঞ্চিত রাখতে পারে শরীরে।

প্রাণীদের শরীরে চর্বি জমিয়ে রাখবার জন্য বিশেষ বিশেষ স্থান আছে। চামড়ার নিচে চর্বি জমিয়ে রাখা যায় না কারণ তাহলে অতিরিক্ত উত্তাপে জীবটা মারা যাবে। দৃষ্টান্ত হিসেবে: উট চর্বি জমা করে রাখে তার কুঁজে, যে কুঁজ তাদের শরীরে শোভা বৃদ্ধি বা পিঠে চড়বার আরামের জন্য গজায় নি। কুঁজটা পিঠের উপর আলগাভাবে লেগে আছে আর যেহেতু তার শরীরের অন্যত্র কোথায়ও চামড়ার নিচে চর্বি নেই তাই উটের শরীর কখনোই বেশী উত্তপ্ত হয় না।

অনেক ক্ষেত্রে লেজ সঞ্চয়ের ভান্ডার হিসেবে কাজ করে। এখানেও, এটা শরীর থেকে আলাদা একটা প্রত্যঙ্গ। জারবোয়া বা গেরবিল-এর ক্ষেত্রে চর্বি জমা হয় লেজের মূলে। বড় বড় গোসাপ — এদের নাম মনিটর — চর্বি সঞ্চয় করে রাখে লেজে, লেজগুলিও হয় বিরাট। লেজমোটা দুম্বাভেড়ারও চর্বির সঞ্চয় থাকে লেজে, এদের লেজ আরও বড়। এই ভেড়াদের লেজের দুপাশে থাকে দুটি প্রবৃদ্ধ অঞ্চল। চর্বি সঞ্চয়ের পরিমাণ কম বেশী হয়ে

থাকে। উটের ক্ষেত্রে কখনো কখনো 110 থেকে 120 কিলোগ্রাম, দুম্বা ভেড়ার ক্ষেত্রে 10 থেকে 11 কিলোগ্রাম। কোন জন্তু জলকষ্টে পড়লে, নিজের শরীর থেকে সঙ্গে সঙ্গে জলসৃষ্টি করতে শুরু করে, ভাণ্ডারে সঞ্চিত চর্বি কাজে লাগিয়ে। উট জল ছাড়া পয়তাল্লিশ দিন বেঁচে থাকতে পারে; এর মধ্যে প্রথম পনের দিন নিত্য যা খায় সেই শুকনো খড় খেয়ে স্বাভাবিকভাবে পরিশ্রম করতেও পারে।

এইভাবে জলসৃষ্টি বেশ সুবিধাজনক। চর্বিতে অকসিজেনের সংযোগ ঘটলে প্রচুর পরিমাণে শক্তি পাওয়া যায় তাই শরীর সেই শক্তি কাজে লাগায়, খাওয়ার প্রয়োজন হয় না। অনেক মরুজীবী প্রাণী বন্দীদশাতে তাদের স্বাভাবিক পরিবেশের থেকে বেশি তৃষ্ণায় কষ্ট পায়, কেননা এই বন্দীত্বের কালে শরীরের মধ্যে জল অনেক কম তৈরী হয়। ছাড়া থাকলে তাদের রোজই খাদ্য সংগ্রহে বেরোতে হয় তাই দৌড়-ঝাঁপে অনেক শক্তি খরচ হয়ে থাকে পেট পুরে খেতে হোলে। পেশীর কাজকর্মের জন্যে প্রয়োজনীয় চর্বি এবং শ্বেতসারের যৌগিক বিক্রিয়ায় শেষমেষ জল উৎপন্ন হয়ে যায়।

কেবল যে মরুজীবী প্রাণী রাসায়নিক বিক্রিয়া থেকে উপলব্ধ জলের সাহায্যে বাঁচে তা নয়। যে কোন প্রাণীর ক্ষেত্রেই যখন শরীরে প্রয়োজনীয় জলের পরিপূরণের জন্যে আর কোন উপায় থাকে না, চর্বি জ্বালানো ছাড়া আর গত্যন্তর তখন থাকে না। তাই পাখির ডিমের ভিতর এত চর্বি দেখে আমরা অবাক হই না। চর্বি শক্তির উৎস, একযোগে খানিকটা জলও যোগায়। মরুভূমিতে প্রাণধারণ সম্ভব হয়েছে কেবল যে মরুবাসীরা রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে জল তৈরী করতে শিখেছিল বা সরাসরি বাতাস থেকে জল শুষে নিতে শিখেছিল বা বালু আর পাথরের মধ্যেও জল খুঁজে পেয়েছিল বলে তাই নয়। এ ছাড়াও দিনমানে তারা সূর্যতাপ থেকে আত্মগোপণ করে নিজেদের বাঁচাতে শিখেছিল, উদ্ভাবন করেছিল শরীর থেকে বাষ্পীভবনে জল যাতে না বেরিয়ে যায় আর সবার আগে শিখেছিল কঠোর মিতব্যয়িতার সঙ্গে জলকে ব্যবহার করতে। এই সব উদ্যোগগুলি যদি একত্রিত না হোত, মরুভূমিতে প্রানধারণ সম্ভব হোত না।

লুকুলাস-এর বাহাদুরি
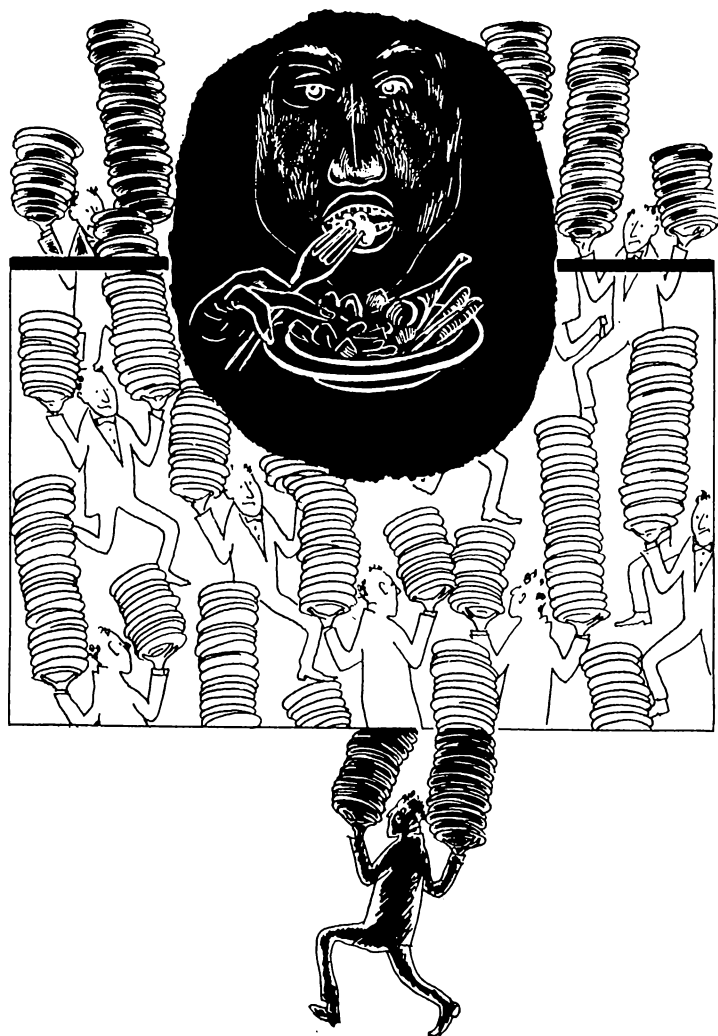
74-64 খৃষ্ট পূর্বাব্দে রোমান সৈন্যেরা লুসিয়াস লাইসিনিয়াস লুকুলাস-এর নেতৃত্বে পনটাস-এর রাজা মিথরিডাতিস (ষষ্ঠ)-এর সৈন্যদের সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করে, তারপর তাঁর আত্মীয় আর্মেনীয় রাজা ট্রিগানিস (দ্বিতীয়) কে হারিয়ে দেয়। মিথরিডাতিস-এর বিশাল সাম্রাজ্য টুকরো হয়ে যায়। লুকুলাস কিন্তু সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন তাঁর অস্ত্র চালনার নৈপুণ্য বা যুদ্ধনায়ক হিসেবে নয় — পরন্তু তাঁর বিলাসপরায়ণতা আর ভোজনপটুতার জন্যে।

রোমানরা খাওয়াদাওয়াতে আনন্দ পেত আর অপচয় পছন্দ করত। তাদের প্রাণোচ্ছল ভোজগুলি চলত ঘণ্টার পর ঘণ্টা, এমনকি দিনের পর দিন। এই সময়ের মধ্যে তারা প্রচুর পরিমাণে সুখাদ্য জঠরস্থ করত। ভোজনরসিকেরা কুশনে গা এলিয়ে বসে গীত-বাদ্য শুনতে শুনতে নানা প্রকারের খাদ্যসামগ্রীর স্বাদ গ্রহণ করত, তারপরে পান করত প্রচুর মদ। তাদের অভ্যস্ত পাকস্থলীও কিন্তু এত অধিক পরিমাণে খাদ্য পরিপাক করতে পারত না। এত খাবার কিন্তু তাদের উপর কেউ চাপিয়ে দিত না। প্রাণভরে খেয়ে ভোজনবিদ মুখে দুটি আঙুল ঢুকিয়ে দিত বমি করার জন্যে, তারপর আবার ভোজনের আসনে এসে বসত। লুকুলাসের মতো লোক একালেও দেখা যায় কিন্তু। সারাজীবনে যত খাদ্য আর পানীয় পেটে পড়ে তারা সবটা জড়ো করলে যে কেউ নিজেকে লুকুলাস ভাবতে পারে, কারণ এই বিপুল পরিমাণ বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী এত বেশি হবে যে সেটা বয়ে নিয়ে যেতে কয়েকটা রেলের ওয়াগন লাগবে।

খাদ্যের আবশ্যকতার তারতম্য আছে। আকারে ছোট প্রাণীদের বেশি খাদ্যের প্রয়োজন হয়, তুলনামূলকভাবে। দৃষ্টান্ত, একটা ছুঁচোর প্রতিদিন দরকার হয় অন্তত তার দেহের ওজনের সমপরিমাণ খাদ্য, অনেক সময় তার তিনগুণ পর্যন্ত।

যত বেশি খাওয়া যায় ততই ভালো তা ভেব না কিন্তু, বরং এর উলটো। খারকভ শহরে প্রফেসর নিকিতিন-এর জৈব রাসায়নিক ল্যাবরেটারিতে বিজ্ঞান-কর্মীরা একটা পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। একদল ইঁদুরকে খেতে

দেওয়া হয়েছিল নানা ধরনের ভালো ভালো খাবার। তবে সেই খাদ্য তাদের দেওয়া হোত এত কম পরিমাণে যে তারা না বেড়েছিল দৈর্ঘ্যে, তাদের না বেড়েছিল এক গ্রাম ওজন। অন্য একটা দলকে দেওয়া হয়েছিল কেবল এক প্রকারের খাদ্য তবে পর্যাপ্ত পরিমাণে। আশ্চর্যের কথা এই যে, সেই ইঁদুরগুলি, যাদের প্রায় উপোসী রেখে খাওয়ানো হোত তারাই অন্যদলের থেকে, যারা পেট ভরে খেতে পেত, বাঁচল বেশিদিন। অনেক প্রাণীরই দরকার হয় ঘন ঘন খাওয়ার। একটা ছুঁচো 14 থেকে 17 ঘণ্টা উপবাসী থাকলে মরে যাবে, অন্যদিকে জানোয়ারদের গায়ের কীট কয়েক বছর না খেয়ে বেঁচে থাকে। কিছু প্রাণী আছ যারা জীবনে একবারই খায়। আবার কোন কোন প্রাণী খাওয়া ছেড়ে দেয় পূর্ণবয়স্ক হয়েই। এই দলে পড়ে গরমকালের মাছি। মানুষও কিছু সুফল পেতে পারে মাঝে মাঝে উপবাস করলে। এমনকি চিকিৎসাশাস্ত্রে কোন কোন রোগ সারান হয় রোগীকে উপবাস করিয়ে। কয়েক ক্ষেত্রে উপবাস নিশ্চিত-রূপে হিতকারী। আধুনিক চিকিৎসকদের মধ্যে অবশ্য এই বিষয়ে মতবিরোধ আছে; তবে তাঁরা এটা মানতে একমত হয়েছেন যে উপবাস অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ ছাড়া রোগীর ক্ষতি করতে পারে।

সাধারণভাবে অবশ্য পরিষ্কার বোঝা যায় কি কারণে সারাজীবনে এত পরিমাণ খাদ্য গলাধঃকরণ করা আমাদের দরকার। প্রধানত এই খাদ্যের প্রয়োজন গঠনের মালমসলা হিসেবে। যতই অদ্ভুত মনে হোক না কেন সারা জীবন ধরে আমরা আমাদের এই শরীরটাকে গড়েই চলেছি, আর গড়ছি প্রায় বার্ধক্যের মাঝামাঝি পর্যন্ত। সারাজীবন ধরে মানুষের চুল আর নখ গজাচ্ছে। এরিথ্রোসাইটস্ বা রক্তের লোহিত কণা বাঁচে দুই বা তিন মাস, তারপরে তারা মারা যায় আর তাদের স্থানে আসে নতুনেরা। স্কোয়ামাস বা আঁশের মতো পাতলা পর্দার কোষগুলি জীবিত থাকে আরো কম সময়, সাত দিনের বেশি নয়।

শরীরের প্রতিটি কোষের অণুগুলি সব সময়ে নতুন করে পরিপূরিত হয়ে যাচ্ছে। কিছু অণু আছে যারা পুরোপুরি ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে আর নতুনেরা সেই জায়গায় সংশ্লেষিত হচ্ছে আবার কতকগুলিকে আংশিকভাবে মেরামত করে নেওয়া হচ্ছে। গঠনের মালমসলার কতটা বর্জ্যবস্তুতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে যাদের আর ব্যবহার করা যাবে না। সেইজন্য সকল জীবেরই অবিরাম নতুন মালমসলার যোগান দরকার হচ্ছে। ঘাটতি দেখা দিলেই

গোলমাল শুরু হয়ে যায়। তামা বা লৌহের ঘাটতি হোলে রক্তাল্পতা দেখা দেবে। এমনকি হাড়গুলিও যাদের মনে হয় কত মজবুত সব সময়ে নতুন করে গড়া হচ্ছে। দীর্ঘকাল যদি খাদ্যে ক্যালসিয়াম না থাকে হাড়গুলির মধ্যে সঞ্চিত ক্যালসিয়াম ব্যবহৃত হবে শরীরের অন্যান্য প্রয়োজনে এবং সেগুলি নরম ও নমনীয় হয়ে যাবে।

খাদ্যগ্রহণের আর একটি উদ্দেশ্য হোল এই যে শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় শক্তি পাওয়া যায় খাদ্য থেকে। নতুন অণু গড়ে তোলার কাজেই দরকার হয় খানিকটা শক্তি। তারপরে আছে পেশী ও অন্যান্য দেহযন্ত্র যারা সবসময় কাজ করে চলেছে এক মুহূর্ত না থেমে। ঘুমন্ত অবস্থাতেও হৃৎপিণ্ড কাজ করে চলেছে এবং তার সাথে শ্বাসযন্ত্রের পেশীগুলি, যকৃৎ, বৃক্ক, পৌষ্টিকনালী, আর অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিগুলি। এমনকি মস্তিষ্কও কম শক্তি খরচ করে না যদিও এই ব্যাপারটা আমাদের মনে রাখতে ভুল হয়ে যায়।

শক্তির ক্ষয় সহজেই পূরণ করে দেওয়া যায়। জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয় চর্বি, শ্বেতসার আর কিছুটা প্রোটিন যারা নিজেরা পুড়ে যায় শরীরের মধ্যে আর তৈরি করে কারবণ ডাই-অকসাইড আর জল। বস্তুত শরীর গ্রহণ করে কেবল গ্লুকোজ। চর্বি আর প্রোটিন প্রথমে গ্লুকোজে পরিণত হয়, শক্তি যোগাবার বস্তু হিসেবে ব্যবহৃত হবার আগে।

শরীরকে জ্বালানি সরবরাহ করা বরং সহজ, তার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল মালমসলা যোগাবার তুলনায়। মানুষের শরীরের প্রধান উপাদানগুলি হোল কারবন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, আর অকসিজেন। এর সঙ্গে সামান্য বা কোন কোন ক্ষেত্রে নগণ্য পরিমাণে অন্যান্য মৌল।

একজন ফরাসী জৈব রসায়নবিদ গ্যাব্রিয়েল বারট্রান্ড, হিসেবে করেছিলেন যে দেহের ওজন একশ কিলোগ্রাম এমন একজন মানুষের শরীরে আছে:

অকসিজেন	63	কেজি.	কারবন	19	কেজি.
হাইড্রোজেন	9	কেজি.	নাইট্রোজেন	5	কেজি.
ক্যালসিয়াম	1	কেজি.	ফসফরাস	700	গ্রাম.
গন্ধক	640	গ্রাম	সোডিয়াম	240	গ্রাম
পটাসিয়াম	220	গ্রাম	ক্লোরিন	180	গ্রাম
ম্যাগনেসিয়াম	40	গ্রাম	লৌহ	3	গ্রাম
আয়োডিন	0.03	গ্রাম			

ফ্লুওরিন, ব্রোমিন, ম্যাঙ্গানিজ আর তামা আরো কম পরিমাণে। খুবই সম্ভব যে আর সব মৌল এমনকি যেগুলি রাসায়নিকভাবে বিশেষ ক্রিয়াশীল নয় যেমন স্বর্ণও শরীরে পাওয়া যেতে পারে কিন্তু আমরা এখনো জানিনা তারা কি কাজ করে।

স্বাভাবিকভাবে, সুষম খাদ্যের মধ্যে শরীর পর্যাপ্ত পরিমাণে পেয়ে যায় দরকারী মৌলগুলি গৃহীত খাদ্য ও পানীয় থেকে। কিন্তু কোন একটি মৌলের যদি অভাব ঘটে, নানাবিধ অসুখ, সময় সময় সাংঘাতিক অসুখ হতে পারে। মাটিতে আয়োডিন যদি না থাকে তাহলে সাধারণ লবনে আয়োডিন মিশিয়ে দেবার দরকার হয়ে পড়ে। নেভা নদীর জল পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ পানীয়জল কিন্তু এর বিশুদ্ধতাই এর প্রধান দোষ। লেনিনগ্রাদ-এর একটি জলসরবরাহ কেন্দ্র থেকে পানীয় জলে ফ্লুওরিন মেশানো হচ্ছে কারণ ফ্লুওরিনের অভাবে আনেক সময় দাঁতের গোলমাল দেখা দেয়। অধিকন্তু সুইডিস বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে যে-সব লোকেরা 'নরম' জল নিয়মিত পান করে তাদের হৃৎপিণ্ডের ধমনীসংক্রান্ত অসুখ হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

শরীরকে রাসায়নিক মৌল পদার্থ যুগিয়ে যাওয়া বেশ জটিল ব্যাপার কারণ শরীরের কলা বা দেহযন্ত্র যে সব পদার্থ দিয়ে তৈরি সেগুলি সরাসরি মৌল থেকে সংশ্লেষণ করা যায় না। যেমন ধরো প্রোটিনেরা তৈরি হয় বাইশটি এমাইনো অ্যাসিডের ভিন্ন ভিন্ন জোট-এর দ্বারা, যার দশটি শরীর নিজেই সংশ্লেষণ করে বানাতে পারে আর বাকি বারোটা তৈরি অবস্থায় পাওয়া চাই। এছাড়া যে সব ক্ষেত্রে আমরা এমাইনো অ্যাসিড নিজেরাই তৈরি করে নিই সেখানেও প্রায়াজনীয় নাইট্রোজেনকে পেতে হবে জৈব রাসায়নিক যৌগ থেক। একই কথা প্রযোজ্য গ্লুকোজের বেলায় কারণ প্রাণীশরীর কারবন আর হাইড্রোজেন থেকে সরাসরি গ্লুকোজ সংশ্লেষণ করতে পারে না, তাই তৈরি হাইড্রোকারবন যৌগ ব্যবহার করতে হয় গ্লুকোজ তৈরির কাজে।

যে-সব পদার্থ প্রাণীদেহে খুব সামান্য মাত্রায় হলেও অবশ্যই প্রয়োজনীয় তাদের মধ্যে ভাইটামিনদের নাম উল্লেখ করতেই হবে। ভাইটামিনের অভাবে প্রাণ রক্ষা করা সম্ভব নয়।

ঠিকঠিক খাদ্য বাছাই করাও দরকার। মৌমাছিদের দৃষ্টান্তটা কেমন মজার দেখ না। রানী মৌমাছি তার জীবনের প্রথম দিন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত
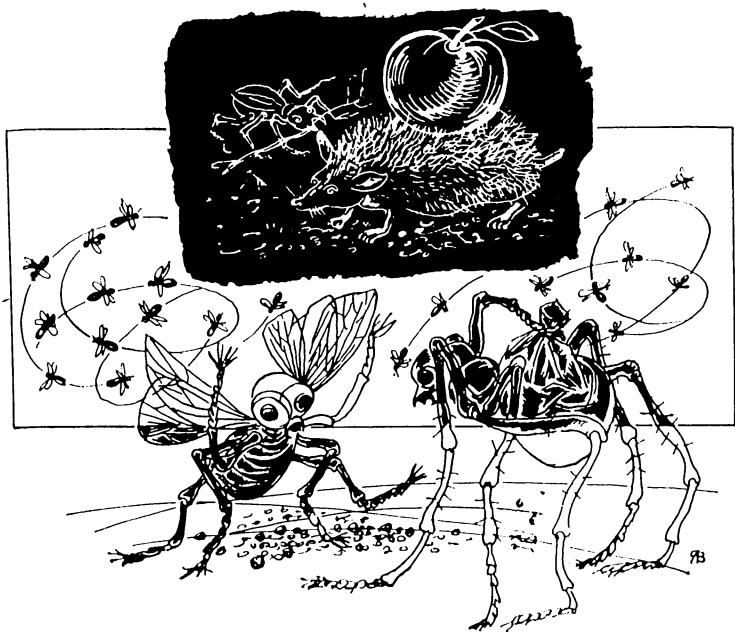
তথাকথিত রাজভোগ-জেলি খেয়ে বাঁচে দুই থেকে তিন বছর। কর্মী মৌমাছির ভাগ্যে এই আশ্চর্য খাদ্যটি জোটে তার জীবনের প্রথম দুদিন মাত্র, তারপরে তাকে খেতে দেওয়া হয় নিকৃষ্ট খাদ্য। এর ফলে এরা সন্তান ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন স্ত্রী-মৌমাছি রূপে বেড়ে উঠতে পারে না, আর বাঁচেও দুই থেকে তিন সপ্তাহ।

খাদ্যের গুণগত তারতম্য শুধু শারীরিক নয়, মানসিক বিকাশকেও প্রভাবিত করে। ইতালিতে লোকে বিশ্বাস করে, যে-সব জেলায় সাদা আলুবোখরা জন্মায় সেই জেলাগুলি বিশ্বকে এতজন প্রতিভাধর মনীষী উপহার দিয়েছে যে তাঁদের সংখ্যা বিশ্বের বাকি অংশের সব মনীষীদের সমষ্টির থেকে বেশি। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এ কথা জোর গলায় বলা যায় না। মনোভেষজ বিজ্ঞানীরা এমন সম্ভাবনা আজগুবি বলে উড়িয়ে দিতে পারেন না যদি কেউ খোঁজে এমনই একটা পদার্থ যা মস্তিষ্ককে উদ্দীপিত করবে, প্রতিভার স্ফুরণ ঘটাবে, বিদ্যাশিক্ষা এবং অন্যান্য মানসিক শ্রমের সহায়ক হবে। ভবিষ্যতে কোনদিন হয়ত এই ধরনের অনুসন্ধান ফলপ্রসূ হবে।

মানুষ সর্বভুক্ প্রাণী। নিছক অভ্যাসের দিকটা বাদ দিলে ইচ্ছামতো যেকোন খাদ্যাভাস তৈরি করতে তাকে কেউ বাধা দেবে না। জীবজগতে সর্বভূক্ প্রাণী কিন্তু বেশি নেই, বরং অধিকাংশেরা খেয়ে থাকে বিশেষ ধরনের খাদ্য। অনেকে খায় আজব সব পদার্থ যেমন: কাঠ, পশম, পালক, মাছের আঁশ, মোম — যেগুলি সুস্বাদু খাদ্যবস্তু বলে মনে তো হয় না।

একই প্রজাতির প্রাণীদের মধ্যে খাদ্যরুচির বিভিন্নতা কখনো কখনো দেখা যায়। একই পরিবারের মশাদের কথাই ধরো না, স্ত্রী-মশা রক্ত শুষে খায় কারণ তাকে সন্তানের জন্ম দিতে হবে, পুরুষ-মশা পাতার রস খেয়েই তৃপ্ত থাকে।

রুচি আবার বয়সের সঙ্গে বদলায়। খাদ্যাভ্যাসের বিবর্তন আফ্রিকার মৌ-সন্ধানী পাখীদের মধ্যে লক্ষণীয়। এই জাতের ছোট আমুদে পাখিরা নিজেদের বাসা তৈরি করে না, কোকিলের মতো অন্য পরিবারের বাসাতে ডিমপেড়ে রেখে আসে। ধাত্রী বাবা-মা ভবিষ্যৎ মৌ-সন্ধানীকে পোকা খাওয়ায় যেমন তারা নিজেদের বাচ্চাদের খাইয়ে থাকে। সেই শাবক যেই বড় হয়ে স্ব-নির্ভর হয় তখনি সে ভাঙা মৌচাক খুঁজে চাক-ভাঙা মোম বেশ তারিয়ে তারিয়ে খায়।

কেমন করে এই মোমের প্রতি লুব্ধতা এদের জন্মায় সেটা বলা কঠিন, কেননা ধাত্রী বাবা-মা তো আর তাকে শেখায় নি, কিন্তু মৌ-সন্ধানী খুঁজে বেড়ায় আর খায় ভাঙা মৌচাকের মোম, আস্ত হলেও আপত্তি নেই। তবে একা একা মৌমাছির ঝাঁকের সঙ্গে পেরে ওঠে না। তাই বলিষ্ঠতর ডাকাতদের সাহায্য তাকে নিতে হয়। ওর তীক্ষ্ম চিৎকারে কাছাকাছির মানুষ ও জন্তু জানোয়ারেরা জানতে পারে যে মৌ-সন্ধানী মৌচাক দেখতে পেয়েছে।

এই পৃথিবীতে অস্বাভাবিক খাদ্যাভ্যাস যত প্রকারর আছে তার মধ্যে ক্যানিবালিজম্ (cannibalism) বা স্বজনভোজন বোধ করি সবচেয়ে ঘৃণ্য। এই শব্দটি এসেছে স্প্যানিশ থেকে, এর অর্থ 'মানুষের মাংস খাওয়া'। নিজ গোষ্ঠীর জীবকে যে-সব প্রাণী খায় তাদের উল্লেখেও এই শব্দ ব্যবহার করা হয়। পাখিদের গায়ের এঁটুলি পোকাদের মধ্যে এক ধরনের স্বজনভোজন প্রথা বেশ অদ্ভুত। এই পোকারা পাখিদের সাংঘাতিক রোগ স্পাইরোকিটোসিস-এর বাহক। পাখিদের গায়ে যখন এরা বসে তখন এদের শূককীট, পূর্ণাঙ্গ শাবক এবং বয়স্ক পোকারা সকলেই কিন্তু পাখির ত্বক ভেদ করে ঢোকে না। সংখ্যায় এরা অনেক হয়ে গেলে, কিছু সংখ্যক পোকা স্বজনভোজন শুরু

করে এই ভাবে। ওরা একটা স্ত্রী-পোকা বা পূর্ণাঙ্গ শাবক খুঁজে নেয় যে রক্ত চোষা শুরু করেছে এবং তার শরীরে নিজেরা লেগে যায়। আর একজন স্বজনভোজী আবার তার গায়ে লেগে যায় ক্রমে ক্রমে এইভাবে আরো অনেকে লাইন করে পরস্পরের গায়ে লেগে গিয়ে আক্রান্ত পাখির শরীরের রক্তরস একের থেকে অন্যের মাধ্যমে শুষতে থাকে। আক্রান্ত পাখির কিন্তু কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। এই যে মালার আকৃতিতে পরভোজীগুলি একজনের শরীর থেকে অন্যজন শুষছে এই মালাটা ছেঁড়ে না যতক্ষণ না সবার পেট বেশ ভরে যায়। যে-সব পোকারা তাদের সঙ্গীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল তারা বেঁচে বর্তে থাকে, তাদের বাড় বৃদ্ধিও হয়।

বিদঘুটে খাদ্যরুচির প্রসঙ্গ চলা কালে বিষ্ঠাভোজী প্রানীদের কথা ভুললে চলবে না, কেননা এরা অনেক উপকার করে চলেছে। কিছু প্রানী আছে যারা বিষ্ঠা খায় কখনো কখনো। কুকুরদের পরিবারে দেখা যায় বাবা-মা বাচ্চাদের বিষ্ঠা খেয়ে নিচ্ছে — এটা নিশ্চয় বাচ্চাদের স্বাস্থের খাতিরে, বাসাটা মলমুক্ত রখার আগ্রহে।

মৌচাক মথ-এর শূককীটদের বিষ্ঠাভোজনের অভ্যাসটা ভারি মজার। এই মথ সাধারণত মৌচাকের মোম খেয়ে থাকে। কিন্তু অন্য কোন প্রাণী এসে যদি মৌচাক ভেঙে সম্পূর্ণটা খেয়ে গিয়ে থাকে তখন এই শূকেরা নিজেদের বিষ্ঠাই খায় যা ততদিনে অনেকটা জমেছে। আশ্চর্যের কথা এই যে এই খাদ্য খেয়ে এরা আবার যে-বিষ্ঠা ত্যাগ করে সেটাও এদের কাছে সুখাদ্য। এর ফলে সম্পূর্ণ এক পুরুষ বা ততোধিক মৌচাক মথ জন্মাবার পরে বড় হয়ে যেতে পারে নিজেদের বিষ্ঠা খেয়ে, মলত্যাগ করে এবং সেই মল আবার খেয়ে। এই অদ্ভুত চক্রটা চলতে পারে সাত আট বছর পর্যন্ত।

শক্তির এই যে অফুরন্ত পরিপূরণ, চিরায়ত যন্ত্রের সঙ্গে যার সাদৃশ্য রয়েছে, এর ব্যাখ্যা কিন্তু সহজ। মৌচাকের মোম হজম করা খুবই দুরুহ। মৌচাক মথ সাধারণত মোম খেয়ে থাকে ঠিকই, কিন্তু তাদের অন্ত্রেও সেই মোম সবটা হজম হয় না। এরই ফলে বিষ্ঠার পুনঃ পুনঃ শরীর যন্ত্রের মধ্যে পাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

এই পৃথিবীতে অনেক প্রাণী আছে যারা কেবল বিষ্ঠাই খায়। কতকগুলি গুবরে পোকা বা সেই জাতের ছোট ছোট পোকার খাদ্য শুধুই বিষ্ঠা। তবে এদের মধ্যে গুবরে পোকার আচরণ মজাদার। গোবরের স্তুপের নীচে এরা গর্ত করে এবং সেই গর্তে গোবর ভর্তি করে রাখে — যে-সব শূককীট

জন্মাবে তাদের আহারের সংস্থান। পবিত্র স্কারাব-বীটলদের রীতি প্রকৃতিতে বিস্ময় জাগে। এরা নিজেদের শরীরের থেকে অনেকগুণ বড় বড় গোবরের গোলা পাকাতে পারে। এটা ভিত্তিহীন নয় যে মিশরীয়রা প্রাচীনকালে এদের পবিত্র মনে করে পাথরের মূর্তিতে খোদাই করে পুজো করত। মেমফিস-এর মন্দিরে যে সব এপিস বা পবিত্র ষাঁড় বাস করত তাদের প্রত্যেকের শরীরে এই প্রাকৃতিক জনস্বাস্থ্যকর্মীর ছবি আঁকা থাকত।

লাল কাঠ-পিঁপড়ের একমাত্র স্বাভাবিক খাদ্য ফড়িংজাতীয় পোকার বিষ্ঠা যার মধ্যে চিনি আর অন্যান্য পুষ্টিকর পদার্থ থাকে। পিঁপড়েরা কেবল যে বিষ্ঠাগুলিই কুড়িয়ে বেড়ায় তা নয়, এরা ফড়িংদের শত্রুর হাত থেকে বাঁচায়, তাদের প্রজনন এবং পালন করে। বসন্তকালে গরম পড়লে এই পরিশ্রমী পিঁপড়েরা ফড়িং শিশুদের টেনে বাইরে নিয়ে এসে তাদের চরায়। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় আবার তাদের টেনে টেনে বাড়িতে নিয়ে যায় — গরম বেশি পড়লে বাইরে থাকতে দেয়। একজাতের পিঁপড়ে এমন ফড়িংদের প্রতি-পালন করে যারা শিকড় খায় তাদের জন্যে পিঁপড়েরা মাটি দিয়ে আশ্রয়স্থল বানিয়ে দেয়। এক বছরে একটা পিপড়ের ঢিবি থেকে একশ কেজি পর্যন্ত ফড়িং-এর বিষ্ঠা পাওয়া যায়।

কোন কোন প্রাণী কেবল শিশুকালেই বিষ্ঠা ভোজন করে। অস্ট্রেলিয়ার ইউক্যালিপটাস-এর জঙ্গলে বাস করে ভারি সুন্দর ছোট এক জাতের প্রাণী, দেখতে অনেকটা লোমওয়ালা ভাল্লুকের মতো। এদের নাম কোয়ালা। মায়ের পেটের থলিতে বড় হয় — এই থলি কিন্তু ক্যাঙারুদের পেটের থলির বিপরীত — এর মুখ খোলে পিছন দিকে। থলির মুখ পিছনে হওয়াতে কোয়ালা শিশুর ভারি সুবিধে — মা যাচ্ছেন গাছ থেকে গাছে বিষ্ঠা ত্যাগ করতে করতে, বাচ্চা আর সেগুলি পড়তে দিচ্ছে না মুখটি বড়িয়ে খেয়ে নিচ্ছে। জন্মানোর পরে শুরুতে কোয়ালা শিশু মায়ের দুধই খায় তারপরে মুখ বদলায় এই পেপটোন-সমৃদ্ধ হজম হয়ে যাওয়া ইউক্যালিপটাসের পাতার বিষ্ঠাভূত মণ্ড দিয়ে। গাছের ডালে ডালে বিচরণশীল কোয়ালা মায়ের মুখ্য খাদ্য বস্তু এই পাতা (কোয়ালারা থাকে দীর্ঘ গাছের উঁচু ডালে — মাটিতে কখনো নামে না)। আমরা যে মানুষ, এই আমাদের কথাই ধরো না। তোমরা হয়ত ভাববে যে আমাদের স্বভাবজ শুচিতার অনুভূতি আমাদের রক্ষন করে থাকে এই সব বিচ্ছিরি খাদ্য গ্রহণ করা থেকে। মোটেই নয়। মধু-র কথা ভুলে যাওয়া উচিত্‌ নয়। এই সুস্বাদু বহুব্যবহৃত খাদ্যটির উৎপত্তিটা

কিন্তু ততটা শুচিসম্মত নয়। কাঁচা মালটা তো ছিল ফুলের ভেতরের মিষ্ট রস, সন্ধানী মৌমাছির গলনালীর ভেতরে সেটা পরিপাকের পরে ইক্ষুচিনির পরিবর্তন হয়েছে দু'প্রকারের গ্লুকোজে আর তারপরে সেটাকে উগরে দেওয়া হয়েছে মৌচাকের কোষের ভেতরে। ফুল থেকে মধু এইভাবে আহরিত হয়।

আরো কম শুচিসম্মতভাবে উৎপন্ন হয় মধুহিমানি যা পশ্চিম জার্মানীতে প্রচুর পাওয়া যায়। এই বস্তুটা আর কিছুই নয় কেবল সেই ফড়িংজাতীয় পোকার শূককীটের বিষ্ঠা যা কাঠ-পিপ্‌পড়েরা খায় আর যা পশ্চিম জার্মানীর লোকেরা অতি উপাদেয় মনে করে।

বিষ্ঠাভোজী প্রাণীদের খাদ্যরুচির এই বিচিত্রতাটা বাদ দিলে স্বীকার করতেই হবে যে তারা আমাদের পক্ষে অতি দরকারী। এরা যে কেবল আমাদের এই গ্রহটাকে পরিচ্ছন্ন রাখে তাই নয়, পরন্তু মূল্যবান জৈবসার-এর একটা স্বাভাবিক চক্র বজায় রাখে যার গুরুত্ব আরো বেশি।

মনে হয় অতীতে বিষ্ঠাভোজী প্রাণীর সংখ্যা এখনকার থেকে অনেক কম ছিল। অথবা, তারা তাদের কাজ (বিষ্ঠাভোজন) পুরোপুরি সামলে উঠতে পারত না। সত্তর থেকে আশি লক্ষ বছর আগে ইউরোপে বাস করত ইকথিওসরাস — দৈত্যাকার মাংসাশী সরীসৃপ। আকৃতিতে এরা বিরাটকায় ছিল, সংখ্যায়ও এত বেশি আর এদের রাজত্ব চলেছিল এত বেশিকাল ধরে যে এই পৃথিবীর বুকে এদের উপস্থিতির লক্ষণীয় চিহ্ন এরা রেখে গেছে পর্বতাকার বিষ্ঠার স্তুপে।

কথায় বলে কালের প্রভাবে সকল বস্তুতেই কিছুটা সদগুণ বর্তায়। কথাটা খানিকটা সত্য। সাধারণ পাইন গাছের রস বা রজন (Resin) লক্ষ লক্ষ বছর মাটিতে চাপা পড়ে থেকে যে পাথরে পরিণত হয় সেটা মূল্যবান গোমেদ মানিক। হাজার হাজার বছর ধরে ইকথিওসরাস এর মল পড়ে থাকার ফলে পাথর হয়ে গেছে — তার দুর্গন্ধটা চলে গেছে। বিশ্বের সর্বাধিক কপরোলাইট-এর (প্রস্তরীভূত বিষ্ঠার) সঞ্চয় ইংলন্ডে পাওয়া যায় ইয়র্ক-এর কাছে, আর পাওয়া যায় পশ্চিম জার্মানীতে যেখানে খনি থেকে তুলে এগুলি কাজে লাগানো হয়েছে। মিহি করে গুঁড়ো করলে কপরোলাইট উৎকৃষ্ট সার হিসেবে প্রয়োগ করা যায়।

মজার কথা হোল এই যে কপরোলাইট শুধু এই কাজেই যে লাগে তা নয়। যেহেতু এই কপরোলাইটের ভেতরে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে জমে যাওয়া সিপিয়া (শামুকদের শরীরস্থ কালির থলি) আর মাছের আঁশ আর হজম

না হওয়া হাড়, সেজন্য পালিশ করলে কপরোলাইটের উপরিতলে দেখা যায় বিচিত্র প্যাটার্ন। এই পাথর হয়ে যাওয়া ইকথিওসরাসের মল থেকে মেয়েদের প্রসাধনের সামগ্রীরূপে ব্যবহারের জন্য ছোট ছোট সুদৃশ্য অনেক জিনিষ তৈরি করা হয় যেমন পুঁতি, ব্রুচ ইত্যাদি।

তাহলে দেখ ইতিহাস একদিকে কেমন কাজ করে চলেছে আর অন্যদিকে দেখ ফ্যাশনের জন্যে মেয়েদের খেয়াল খুশির সীমা কোথায় যেতে পারে।

বুকে-হাঁটা দাঁত

প্রধান দেহযন্ত্রগুলির নাম জিগগেস করলে অনেকেই দাঁতের কথা বলতে ভুলে যাবে, কিন্তু তাহলেও, দাঁত খুবই দরকারী কাজ করে থাকে। দাঁতের সাহায্যে শিকারকে আগে হত্যা করে, তারপরে কামড়ে ধরে, তারপরে ভেঙে ছিঁড়ে খাদ্যে পরিণত করা হয়। এই কারণে জঙ্গলের যে-সব প্রাণীর দাঁত পড়ে গেছে তাদের মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। এমনকি মানুষও, বাঁধানো দাঁত আবিষ্কারের ফলে যদিও ইচ্ছে মতো খাদ্যগ্রহণে তার কোন অসুবিধে হয় না, বিধিদত্ত দাঁত পড়ে যাওয়ার ব্যাপারে উদাসীন থাকতে পারে না।

মাংসাশী বা উদ্ভিদভোজী সকল প্রাণীর পক্ষেই দাঁত সমান প্রয়োজনীয়। বিখ্যাত ভারতীয় শিকারী জিম করবেট একাধিক দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছেন যে একটি মাত্র স্বদন্ত হারানোর ফলে বাঘ গৃহপালিত গরু, ছাগল, এমনকি মানুষকেও আক্রমণ করতে বাধ্য হয়েছে, কেননা জঙ্গলের বড় বড় ক্ষুরওয়ালা যে-সব প্রাণী তার খাদ্য, তাদের সঙ্গে সে আর পেরে উঠছিল না।

ইঁদুরেরা তাদের দাঁতকে সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম করায়। কঠিনতম ধাতু দিয়ে তৈরি তীক্ষ্নতম দাঁতও সেই পরিমাণ কাজ করতে হলে ক্ষয়ে যাবে। তাহলে সমস্যাটার সমাধান খুঁজতে গিয়ে দেখা যায় দাঁতকে কাজের সঙ্গে সঙ্গে গজিয়ে যেতে হবে। সত্যি বলতে ইঁদুরের সামনের দাঁতগুলি এত তাড়াতাড়ি বেড়ে যায় যে প্রাণীটাকে কঠিন খাদ্য যদি না দেওয়া হয় তাহলে এই দাঁতগুলি অস্বাভাবিক বড় হয়ে যাবে এবং এর মালিক অকর্মণ্য হয়ে যাবে। প্রতিমাসে ইঁদুরের কামড়ে ধরার দাঁতগুলি তিন সেন্টিমিটার করে বাড়ে। ইঁদুরেরা যদি এই দাঁতগুলিকে শক্ত জিনিসে কামড় দিয়ে ক্ষয়িয়ে না রাখত তাহলে বৃদ্ধকালে একটা ইঁদুরের দাঁত হয়ে যেত 70 থেকে 100 সেন্টিমিটার লম্বা। হাতি কতদিন বাঁচবে নির্ভর করে তার

দাঁতের অবস্থার উপর। স্বাধীনভাবে থাকা কালে হাতি গাছের ডালপালা ভেঙে খায় যার কিছু কিছু বেশ কঠিন এবং সেগুলি পিষে খেতে শক্তিশালী কষের দাঁত ব্যবহার করতে হয়। হাতির আছে কেবল দু'জোড়া কার্যকর দাঁত, এক জোড়া উপরের চোয়ালে অন্যজোড়া নীচে। এছাড়া, প্রত্যেক চোয়ালে পাঁচ জোড়া করে দাঁতের অঙ্কুর আছে। একটি করে দাঁত ক্ষয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যায় আর সে জায়গায় নতুন দাঁত গজায়, শেষ অর্থাৎ ষষ্ঠ জোড়া পর্যন্ত, শেষে সেটাও পড়ে যায়। ক্রমশ হাতির পুষ্টি ব্যাহত হয় এবং এর ফলে অবশেষে তার মৃত্যু হয়।

মাংসাশী মাছের বেলাতেও দাঁত ভারি দরকারী। হাঙরদের চোয়ালের ভিতরের তলাটিতে দাঁত গিজ গিজ করছে। এই দাতগুলি নিয়মিত সারিতে সাজানো, অগ্রভাগ মুখের ভিতরদিকে বাঁকানো, যাতে হাঙর তার শিকারকে বেশ শক্ত করে পাকড়াতে পারে। বলাবাহুল্য সামনের দাঁতগুলিকে খুব কঠিন পরিশ্রম করতে হয় এবং তারা খুব তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে যায়। হাঙরদেরও বেকায়দায় পড়তে হোত যদি না তাদের ক্ষয়ে যাওয়া সামনের দাঁতের জায়-গায় নতুন দাঁত গজাতো। প্রকৃতপক্ষে জীবনভোর হাঙরের সামনের দাঁতগুলি চলে বেড়াচ্ছে। লড়াকু সৈন্যর মতো ঝুঁকে থাকা সারির পর সারি দাঁত ধীর গতিতে কিন্তু নিশ্চিতভাবে এগিয়ে আসছে চোয়ালের কানায়। প্রথম সারির পুরানো ক্ষয়ে যাওয়া দাঁতগুলি বুকে হেঁটে বাইরে চলে আসে, বাইরের পৃথিবীটাকে ভাল করে দেখে নিয়ে পড়ে যায়, পরের সারির নতুন দাঁতেরা তাদের জায়গা নেয়। তাদের সাধ্যমতো কাজকর্ম করে তারা ক্ষয়ে যায়, সময় এলে তারা পড়ে যায় এবং পিছনের যারা তারা এগিয়ে আসে। হাঙরের মৃত্যু পর্যন্ত এটা চলতে থাকে। এই যে দাঁত নতুন করে বদলাবার ক্ষমতা এর ফলে হাঙর তার বার্ধক্য পর্যন্ত লড়াই করতে পারে।

দাঁত যদি কেবল খাদ্যপেষাই-এর জন্যেই ব্যবহৃত হয় তাহলে তাদের মুখেই যে থাকতে হবে এমন নয়। অন্যত্রও থাকতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে প্রাথমিক কারখানা থেকে সরিয়ে দাঁতগুলিকে কাছাকাছি অন্য কোন কার্য-শালাতে রাখা যেতে পারে। রুই জাতীয় মাছের মুখ দন্তহীন, কিন্তু ওই মাছের গলার মধ্যে আঙুল গলিয়ে দিও না যেন, কারণ ওর দাঁতগুলি সেখানে থেকেই খাদ্য বিচূর্ণ করে।

কোন কোন মাংসাশী মাছ আর সামুদ্রিক কাছিমের দাঁত থাকে তাদের খাদ্যনালীতে। এগুলি ঠিক দাঁত নয় বরং বড় বড় ধারালো কাঁটা। এর

সাহায্যে চোয়ালের মাঝে ধরা পড়া তখনো জ্যান্ত শিকারকে পালিয়ে যেতে বাধা দেওয়া হয়। কাঁটাযুক্ত অন্ননালী দেখতে অনেকটা শজারু বা পিঁপড়ে-ভোজীদের গায়ের মতো। কাঁটাগুলির মুখ পাকস্থলীর দিকে থাকে যে কারণে খাদ্য কেবল সেই দিকেই বাহিত হতে পারে। পাকস্থলী থেকে অন্ন-নালীর দিকে চলতে পারে না।

যে-সব প্রানীর দাঁত নেই তাদের নকল দাঁতের সাহায্য নিতে হয়। পাখিরা যে-সব খাদ্য খায় সেগুলি পাকস্থলীর মধ্যেই পেষাই হয় ছোট ছোট পাথরের সাহায্যে। শক্ত, পুরু চামড়াযুক্ত পাকস্থলীর মধ্যে শস্যগুলি পৌঁছালে, এই পাথরের সাহায্যে সেগুলি পেষাই হয় জাঁতায় গম পেষাই-এর মতো।

পাখিদের পেটের মধ্যে ছোট ছোট পাথর হামেশাই পাওয়া যায়। বাড়িতে মুরগী কেটে রান্নার জন্যে বানাবার সময় এটা তোমরা দেখতে পারো। কিন্তু এই ব্যাপারটা নানা দিক দিয়ে বিচার করে দেখলে আজ পর্যন্ত একটা ধাঁধা। পাখিরা পাথর গিলে খায় কেন? ক্ষুধার্ত হয়ে তো তারা পাথর খায় না? পাখিরা কেমন করে জানতে পারে যে তাদের পেটের ভিতরের পাথরগুলি ক্ষয়ে গেছে এবং আবার নতুন পাথর সেখানে রাখতে হবে? কিভাবে তারা ঠিক যেমন দরকার তেমনি কঠিন পাথর খুঁজে পায়? আজ পর্যন্ত এসব প্রশ্নের জবাব আমাদের জানা নেই।

কেবল পাখিরাই যে পাথর গিলতে ভালবাসে তা নয়। তিমি, ওয়ালরাস, সীল প্রভৃতি প্রাণীর পেটের ভিতর সাড়ে তিনশ থেকে পাঁচশ গ্রাম ওজনের পাথর হামেশা পাওয়া যায়। কখনো কখনো ঢেকুর তুলে এই পাথর তীরের উপর ফেলে রেখে যায় এই সব প্রাণীরা — ডাঙার উপর অনেকখানি সময় যখন তারা কাটায়। তাই সেইসব জায়গায় সমুদ্রতল থেকে তুলে আনা অনেক পাথর পাওয়া যায়। দেখলে মনে হবে তারা যেন ঠিক করেছে যে ভূবিদ্যা-চর্চার জন্যে বিভিন্ন নমুনার একটা মিউজিয়াম তারা বানাবে সমুদ্রতীরে।

বিজ্ঞানীরা আজও জানেন না যে সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী জানোয়ারেরা কেন তাদের অন্ত্রের মধ্যে এইসব অস্বাভাবিক বস্তুর বোঝা রাখে। হতে পারে এই পাথরগুলি পাখিদের মতোই খাদ্য চূর্ণ করার কাজে লাগে। সেইসব শক্তখাদ্য যেমন শামুকের বা চিংড়ির খোলা। আর একটা কারণ হয়ত এই, যে এই পাথরগুলি অন্ত্রের মধ্যেকার পরজীবী প্রাণীদের সঙ্গে লড়াই-এর কাজে

লাগে, কেননা এই পরজীবীর ঝামেলা এইসব প্রাণীদের আকছার পোহাতে হয়।

দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকতে হলে প্রাণীরা পাথর গিলে খায়। তাই বলা হয় যে পাথর খেলে পাকস্থলীটি শুকিয়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচে। পাথর খেলে পাকস্থলী সেটা নিয়েই কর্মব্যস্ত থাকে, কাজের অভাবে চুপ করে বসে থাকতে হয় না। আবার এটাও সম্ভব যে কোন কোন সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণী পরিপাকতন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য অন্য কারণেও পাথর খায়। বেশি খেয়ে মোটা হয়ে গেলে এদের আপেক্ষিক গুরুত্ব কমে যায়। তখন তাদের জলের মধ্যে ডুবে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে তাই এইসব প্রাণীদের পেটের মধ্যে পাথর রাখা বোধহয় অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সমুদ্রগামী প্রাণীরা পাথর খেয়ে কিছু 'ভার' শরীরের মধ্যে রেখে দেহের ওজন হয়ত বাড়িয়ে নেয়। হিসেব করে দেখা গেছে য এই 'ভার'-এর পরিমাণ বেশ বেশি: কোন কোন সীলের পেটের মধ্যে এগার কিলোগ্রাম 'পাষাণ' পাওয়া গেছে।

সকলের পক্ষেই যে দাঁত একটা উপযুক্ত যন্ত্র তা কিন্তু বলা যায় না। প্রকৃতিও সে কারণে তাদের দাঁতের বদলে আরো কার্যকর যান্ত্রিক উপায় করে দিয়েছেন। অনেক জাতের গেঁড়ি আছে যাদের খাদ্য হোল তাদের চেয়ে ঢের বড় এবং শক্ত খোলাওয়ালা শামুক। এই শামুকদের খোলা তাদের মুখের ছেনি দিয়ে ফুটো করতে সপ্তাহের পর সপ্তাহ বা মাসের পর মাস লেগে যাবে। তাই, এই গেঁড়িরা এক প্রকার লালা ব্যবহার করে দাঁতের বদলে যেটা হোল চার শতাংশ সালফিউরিক অ্যাসিড। এতে অবাক হবার কিছু নেই কেননা মানুষের পাকস্থলীর গ্রন্থিজ কোষ যদি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তৈরি করতে পারে, তবে গেঁড়িরা সালফিউরিক অ্যাসিড কেনই বা তৈরি করবে না?

গেঁড়িদের শরীরে নিঃসৃত অ্যাসিড এতই উগ্র যে মার্বেলের উপর পড়লে শোঁ শোঁ শব্দ হয় এবং ফুটতে থাকে। শামুকের খোলা এই অ্যাসিড সহজেই গলিয়ে দেয়। শিকারকে আক্রমণ করার সময় গেঁড়ি শামুকের খোলার উপর খানিকটা লালা ছিটিয়ে দেয় যার ফলে সেখানকার খোলাটা একটু নরম হয়ে যায়। শিকারী গেঁড়িটা তখন তার মুখের করাত দিয়ে একটু ছিদ্র করলো, শুঁড়টা সেই ফুটোর মধ্যে ঢুকিয়ে দিল আর পরমানন্দে অরক্ষিত শিকারকে খেতে থাকল।

খাদ্যকে কেবল পিষে ফেললেই যে খাদ্যনালীর ভিতর দিয়ে গলে যাবে তা কিন্তু সবসময় সত্যি নয়। সেই কারণে এই প্রাথমিক কারখানাতে থাকে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ লালাগ্রন্থি — খাদ্যের যান্ত্রিক ও রাসায়নিক ভাঙা-গড়ার জন্যে। লালার অনেকগুলি কাজ আছে যার মধ্যে মুখ্য হোল প্রত্যেক গ্রাস খাদ্যকে ভিজিয়ে নেওয়া, কারণ অন্যথায় খাদ্য খাদ্যনালী দিয়ে যাবে না। লালা কত দরকারী। পুকুরের কচ্ছপের লালাগ্রন্থি নেই। তাদের শিকারকে তারা জলের মধ্যেই খায়, প্রত্যেক গ্রাস ভাল করে জলে ভিজিয়ে নিয়ে। কিন্তু ডাঙাতে তারা অসহায়, কেননা শুকনো খাবার গলায় আটকে যাবে। বেশিরভাগ প্রাণীর লালাতে আছে কতকগুলি পদার্থ (এনজাইম বা জারক রস) যেগুলি সর্বপ্রথম রাসায়নিক বিক্রিয়া শুরু করে খাদ্যবস্তু মুখে ঢোকার সাথে সাথেই। প্রকৃতি তারপরে এই ক্ষমতটার কিছুটা বিবর্তন করে নিয়ে লালাকে সামান্য বিষাক্ত করেছেন। এর প্রয়োজন আছে কারণ অসংখ্য জীবাণু, যারা জীবদেহের পক্ষে ক্ষতিকর মুখের ভিজে পর্দায় এবং দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাদ্যে আশ্রয় নিতে পারে।

সাধারণত প্রকৃতি যখন বিষ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন তখন তিনি মাঝপথে থেমে যান না, বরং এমন কিছু সৃষ্টি করেন যা প্রকৃত ত্রাসের সঞ্চার করতে পারে — যেমন ধরো বিষাক্ত সাপেদের বেলায় — যাদের কামড় মানুষের পক্ষে প্রাণঘাতী হতে পারে।

আচ্ছা, সাপের বিষ আসে কোথা থেকে? বিষটা আর কিছুই নয় কেবল সাপের লালা, কিছুটা পরিবর্তিত লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসরিত হয়ে পেঁছায় দাঁতের মধ্যে অবস্থিত ছিদ্রতে। কামড়ের কালে সাপ সব বিষটা আঘাতের স্থানে ঢেলে দেয়।

কতকগুলি সাপ তাদের এই মারনাস্ত্রটির বিকাশে নৈপুন্য দেখিয়েছে। গোখুরা (পদ্ম আর খড়ি জাতের) এবং কয়েক জাতের আফ্রিকার ফণাধর সাপেরা তাদের কামড়াবার পদ্ধতিতে অনেকটা উন্নতি করেছে — বিষটা তারা থুথুর মত ছিটিয়ে দিতেও পারে। অন্য সাপের তুলনায় এদের বিষদাঁতগুলি কিছুটা স্বতন্ত্র। যে-নল দিয়ে বিষটা ঢেলে দেওয়া হয় তার ছিদ্রটি শেষ হয়েছে বিষদাঁতের আগাতে নয় কিন্তু। বরং কিছুটা পিছনে (বিষটা ঠেলে বার করে দিতে সুবিধে হয় এতে) এবং অন্য প্রান্তে নলটা চওড়া হয়ে গেলাসের আকৃতি নিয়েছে। এই কারণে কামড়টা গভীর না হলে বিষটা ক্ষতস্থানে পৌঁছবে না, কিন্তু তার চারপাশে কিছুটা জায়গাজুড়ে

ছড়িয়ে যাবে সূক্ষ্ম কণাতে। ছররা-মারা বন্দুকের মতো লক্ষ্যস্থলের ক্ষেত্রফল বাড়বে সাপ এবং লক্ষ্যস্থলের মধ্যবর্তী দূরত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে।

থুথুর মতো বিষ ছুঁড়ে দিতে সাপেরা পটু আর প্রায় চার মিটার দূরত্ব পর্যন্ত তারা এই থুথু ছিটাতে পারে। এই দূরত্ব এরা হাসিল করতে পারে বিষের থলির উপর চাপ দিয়ে আর যুগপৎ মাথা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে। বিষ যদি কোন ছোট প্রাণীর চোখে লাগে বা নাক-মুখের শৈষ্মিক ঝিল্লিতে, তাহলে সেই প্রাণী মারা যাবে। এই দূরপাল্লার অস্ত্র সেই কারণে অন্যান্য বিষধর সাপের থেকে বেশি কার্যকর। শুধু সাপেরই যে বিষাক্ত লালা আছে তা নয়। ফিজি দ্বীপপুঞ্জের কাছে, প্রশান্ত মহাসাগরে, নিউ গিনিতে, সামোয়া দ্বীপপুঞ্জে, এক-খোলার এক জাতের শামুক আছে — সুন্দর, মোটাকৃতি গা, পনের সে. মি. আন্দাজ লম্বা। তাই বলে এদের গায়ে হাত দিও না কিন্তু। কেননা, ধারালো দাঁত দিয়ে তোমাকে কামড়াবেই। এদের বিষ, বিশেষ করে, এদের মধ্যে বড় জাতের শামুকের পক্ষে প্রাণঘাতী।

হাজার বছরের পুরানো রহস্যের সমাধান

এমনকি আদিম যুগেও মানুষেরা জানত যে মানুষ বা অন্য প্রাণী যে-খাদ্য খায় সেটা পাকস্থলীতে পরিপাক হয়। শিকারের ছাল ছাড়ানোর কালে পাকস্থলীতে কি আছে সেটা তারা দেখে নিত। একালেও অনেক গৃহিনী ঔত্তসুক্য দমন করতে পারেন না মাছ কোটার সময়ে ভেট্‌কি মাছটা কি খেয়েছিল অথবা মুরগীটার পাকস্থলীতে ছোট ছোট পাথর ছাড়া আর কি কি আছে তা জেনে নিতে। শিকারীরা শিকারের মাংস কাটার সময়ে দেখতে পেত যে পাকস্থলীতে ঘাস বা বীজ বা মাংস, এসব কিছুই নেই। আছে কেবল চট্‌চটে খানিকটা পদার্থ যেন খাদ্যটা সেখানে আবার রান্না করা হয়েছে।

আসল ব্যাপারটা জানতে মানুষের লেগেছিল অনেকদিন। খাদ্যটা পরিবর্তিত হয়ে যায় কেবল তাপের প্রভাবেই নয় কিন্তু।

সর্বাধিক উষ্ণরক্তের প্রাণীরও পাকস্থলীর ভিতরের উত্তাপ 38°-43° সে.-এর বেশি নয়। এই উত্তাপে খাদ্য রান্না করা যায় না। বিপাক ঘটে থাকে

পৌষ্টিক রসের সাহায্যে যাতে আছে বিভিন্ন বিশেষ এনজাইম।

মানুষ ও অন্য প্রাণীর পৌষ্টিক নালীটি বেশ জটিল রাসায়নিক যন্ত্রাগার। গৃহীত খাদ্য সেখানে পেষা হয়, তারপর বিভিন্ন জারক রস মেশান হয় এবং একস্থান থেকে অন্যস্থানে ক্রমশ এগিয়ে যায়। প্রত্যেকটি স্থানে খাদ্য ততক্ষণ আটক থাকে যতক্ষণ না সেখানে সেটা বিশেষ পদার্থের সঙ্গে মিশে কিছুটা করে পরিপাক হয়ে যায়। পদার্থগুলি শরীরের মধ্যে শুষে নেওয়া হয় পরিপাকপ্রক্রিয়া চলার কালে, অর্থাৎ জটিল রাসায়নিক পদার্থগুলি তুলনামূলকভাবে সরলতর পদার্থে ভেঙে যাওয়ার কালে (প্রোটিনগুলি ভেঙে হয় এমাইনো অ্যাসিড, চর্বি ভেঙে হয় গ্লিসারল ও চর্বি জাতীয় অ্যাসিড, শ্বেতসারগুলি ভেঙে হয় চিনি)। শরীর যেটা হজম করতে পারে না সেটা বর্জন করে।

পরিপাক প্রক্রিয়াটির অধ্যয়ন খুব সহজ ব্যাপার নয়। কেবলমাত্র বিগত শতাব্দী শেষ হওয়ার পরে রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক ইভান পেট্রভিচ পাভলভ প্রধান পাচন গ্রন্থিগুলির সম্বন্ধে বিস্তারিত পরীক্ষা শেষ করেন। দেখা গেল এরা সংখ্যায় অনেকগুলি, আর প্রত্যেক ধরনের খাদ্যবস্তুর জন্য তারা প্রস্তুত করে বিশেষ পাচক রস। আকাদেমীর সদস্য পাভলভ তাঁর এই গবেষণার জন্য নোবেল প্রাইজ সম্মানে ভূষিত হন। পরিপাক প্রক্রিয়ার মূল রহস্য উদ্ঘাটিত হয়ে গেল একথা মনে হতে পারে। কিন্তু আবিষ্কারগুলি সম্পূর্ণ হয়নি তখনো। বিজ্ঞানাগারে কিন্তু কেউই পরিপাক প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয় নি, যেমন ধরো টেসট্-টিউবে প্রয়োজনীয় পাচকরস পর্যায়ক্রমে ঢেলে দিয়ে — স্বাভাবিক প্রক্রিয়াটি জীবিত প্রাণীর শরীরের মধ্যে যেমন যেমন দেখা যায় ঠিক তেমনি অবস্থায়।

এইভাবে টেষ্ট-টিউবে পরিপাক সম্ভব কিন্তু প্রক্রিয়াটি নিষ্পন্ন হয় শ্লথ গতিতে, পৌষ্টিক নালীর মধ্যে যত সময় লাগে তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি সময় নিল।

সম্প্রতি রাশিয়ান বিজ্ঞানীরা রহস্যটি উদ্ঘাটন করেছেন। একটা আশ্চর্যের ব্যাপার হোল এই যে, খাদ্যের যে-অংশ অন্ত্রের দেয়ালের সংস্পর্শে আসে সেটা তাড়াতাড়ি হজম হয়ে যায় খাদ্যের প্রধান পিণ্ডের তুলনায়। অনেকটা কড়াইতে যখন কোন খাদ্যবস্তু ভাজা হয় সেইরকম: অর্থাৎ কড়াইয়ের গায়ে যে-খাদ্য লেগে থাকে সেটার তাড়াতাড়ি ভাজা হয়ে যাওয়ার মতো। এটা সহজেই বোঝা যায়, কেননা কড়াইটা খাদ্যের থেকে অনেক বেশি উত্তপ্ত।

কিন্তু অন্ত্রের দেয়াল তো মোটেই উত্তপ্ত নয়, তাহলে কেমন করে সেটা পরিপাক ত্বরান্বিত করে?

প্রথমে দেখার দবকার হোল এই যে অন্ত্রের দেয়াল প্রকৃতই পরিপাক ত্বরান্বিত করে কিনা। এই উদ্দেশ্যে একটা পরীক্ষা করা হোল। সদ্যমৃত প্রাণীর অন্ত্রের খানিকটা নিয়ে একটা পরীক্ষানলের মধ্যে রাখা হোল যার ভিতরে আছে স্টার্চ আর এমাইলেজ (স্টার্চকে ভেঙে দেবার জন্যে প্রয়োজনীয় এনজাইম) অপর একটি পরীক্ষানলে আছে শুধু স্টার্চ আর এমাইলেজ। স্টার্চের ভেঙে যাওয়ার প্রক্রিয়াটা অন্ত্রের দেয়ালের চারপাশে খুব দ্রুত নিষ্পন্ন হতে দেখা গেল' যার ফলে প্রমাণিত হোল যে অন্ত্রের নল সত্যিই পরিপাক ত্বরান্বিত করে। কিন্তু এটা ঘটে কেমন করে?

অন্য একটা পরীক্ষা করা হোল। এক টুকরো অন্ত্র পরীক্ষানলে খানিকটা স্টার্চ দ্রবনের সঙ্গে রাখা হোল। কল্পনা করা হোল যে অন্ত্রে যদি পরিপাক দ্রুততর করার জন্যে প্রয়োজনীয় পদার্থ থাকে তাহলে সেটা পরীক্ষানলে নিঃসরিত হবে। এর পরে অন্ত্রের টুকরোটা সরিয়ে নেওয়া হোল এবং পরীক্ষানলে স্টার্চের সঙ্গে কিছুটা এমাইলেজ মেশানো হোল। পরিপাক মন্থর গতিতেই চলতে থাকল, প্রথম পরীক্ষারই অনুরূপ।

হয়ত অন্ত্রের টুকরোটা যথেষ্ট সময় পায়নি তার মধ্যস্থিত পদার্থগুলিকে নিঃসরণ করতে। তাই আরো একটা পরীক্ষা করা হোল। সদ্য হত্যা-করা প্রাণীর অন্ত্র থেকে নির্যাস তৈরি করা হোল। পরিপাকের জন্য প্রয়োজনীয় পদার্থ যদি অন্ত্রে থাকে তবে তা সেই নির্যাসেও থাকবে। কিন্তু এই নির্যাস সেই পরীক্ষানলে — যার মধ্যে স্টার্চ আর এমাইলেজ আছে — মিশিয়ে দেখা গেল পরিপাক প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হল না। তার মানে অন্ত্রের দেয়ালে পরিপাকের গতিবেগ বাড়িয়ে দেবার জন্যে কোন পদার্থই তাহলে নেই। তবে প্রক্রিয়াটা ঘটায় কে?

রহস্যের সমাধান কিন্তু হয়ে গেল আচমকা। অন্ত্রের দেযালের গঠনই পরিপাকক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করে। এই দেয়ালের উপরিতলের আবরণীকোষগুলির আছে অতি সূক্ষ্ম রোঁয়া। প্রত্যেক কোষের আছে প্রায় তিনশ পর্যন্ত রোঁয়া, যার ফলে এই উপরিতলের ক্ষেত্রফল অনেকগুণ বেড়ে যায়, তাই শুষে নেওয়া অবস্থায় সেখানে থাকতে পারে অনেকগুলি এনজাইম। এই এনজাইমগুলি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ক্যাটালিসট বা অনুঘটকের কাজ করে। এনজাইমগুলি বিক্রিয়ায় অংশ নেয় কিন্তু বিক্রিয়ার্টি

সম্পূর্ণ হয়ে গেলেই তাদের স্বাভাবিক রাসায়নিক গঠন ফিরে পায়। এর থেকে বোঝা যায় যে কেন সামান্য পরিমাণে ক্যাটালিসট বিক্রিয়ার বেগ লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি করে দেয়। তাহলে এটাই স্বাভাবিক যে বিপাক তেজের সঙ্গে ঘটবে অন্ত্রের দেয়ালের উপরিতলে, যেখানে এনজাইমের ঘনত্ব অনেক বেশি, যখন তুলনা করি অন্ত্রের ভিতরে অবস্থিত খাদ্যপিণ্ডের বিপাকের বেগের সঙ্গে। এনজাইমের সর্বমোট পরিমাণ বেশি না হলেও চলে কেননা তারা বারবার ব্যবহৃত হয়। আসল কথা তাদের ঘনত্বের প্রখরতা, যে কারণে অল্প পরিমাণে এনজাইম বিপাকক্রিয়ার তীব্রবেগ নিশ্চিত করে। খাদ্যের বিপাক সাধিত হয় দুই ধাপে। প্রথমধাপে বোলাস বা পিন্ডগুলি অংশগ্রহণ করে অন্ত্রপথে (যেখানে এনজাইম-এর ঘনত্ব কম) চলতে চলতে। এই পর্যায়ে পিন্ডগুলি ছোট হতে থাকে, ছোট হতে হতে আলাদা হয় অণুর আকৃতিতে। বিপাকের প্রধান কাজটি (অণুগুলিকে ভেঙে দেওয়া) দ্বিতীয় পর্যায়ে ঘটে অন্ত্রের দেয়ালের কাছে। এই বিপাক যাকে বলা হয় পেরিয়েটাল (Parietal) বিপাক, শরীরের পক্ষে খুবই হিতকর। এর প্রথম সুফলের কথা আগেই বলা হয়েছে যে বিপাকের তীব্রতা আনা যায় অতি সামান্য পরিমাণ এনজাইম-এর সাহায্যে। দ্বিতীয় সুবিধা এই যে বিপাকক্রিয়াতে অতি সামান্য পরিমাণে এনজাইম ব্যবহৃত হয়। যে এনজাইমগুলি অন্ত্রের দেয়াল শুষে নেয়, তারা সেখানেই থাকে এবং দীর্ঘ সময় শরীরের সেবায় ব্যবহৃত হয়, অন্যপক্ষে যে এনজাইম খাদ্যপিণ্ডের মধ্যে থাকে সেগুলি শরীর থেকে বর্জ্য খাদ্যবস্তুর সঙ্গে বেরিয়ে যায় এবং শরীর সেগুলিকে হারায়। তৃতীয় এবং শেষ সুবিধা হোল এই যে সম্পূর্ণরূপে পরিপাক সম্পন্ন হয়েছে যে খাদ্যবস্তু অর্থাৎ রক্তের সঙ্গে মিশে যাওয়ার উপযোগী অবস্থায় পৌঁছেছে যে খাদ্যবস্তু সেটা রয়েছে সেইস্থানেরই সংলগ্ন, যেখান দিয়েই সেটা রক্তে মিশবে অর্থাৎ অন্ত্রের দেয়ালের খুব কাছে। এর ফলে শরীরে মেশার কাজটা উন্নত ও ত্বরান্বিত হয়।

এই আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে আর একটা রহস্যের সমাধানও হয়ে গেল। চিকিৎসকেরা বহুকাল ধরে দেখে আসছেন যে সময় সময় অসুস্থ অবস্থায় কতকগুলি রোগীর ক্ষেত্রে পৌষ্টিক নালীর গ্রন্থিগুলি প্রায় সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। অসুস্থ ব্যক্তি এটা লক্ষ করে না কারণ এর ফলে তার খাদ্যের পরিপাক ব্যাহত হয় না। কিভাবে এই পরিপাক ক্রিয়াটা চলছিল এটাই ছিল ধাঁধা। পরে জানা গেছে যে অতি সামান্য পরিমাণে যেটুকু

এনজাইম অসুস্থ গ্রন্থি থেকে নিঃসরিত হয়েছে সেটা অন্ত্রের দেয়ালে শুষে নিয়েছে, সেখানে জমা হয়ে থেকে গেছে এবং গৃহীত খাদ্যের স্বাভাবিক বিপাক ঘটিয়েছে।

গরুরা কি খায়?

চমকে দেওয়ার মতো প্রশ্নই বটে! যারা চাষবাসের কোন খবরই রাখে না শুধু তারাই নয় এমনকি ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও জানে যে গরু ঘাস খায়। যাই হোক, চট্ করে জবাব না দেওয়াই ভাল, কারণ জাবর কাটে যে সব প্রাণী, অর্থাৎ গরুও, সত্যি সত্যি তৃণভোজী প্রাণী, বলা চলে না।

আমরা জানি যে উদ্ভিদশরীরে আছে প্রচুর সেলুলোজ — দেহকোষের দেয়ালের গঠনের মালমসলা হিসেবে এই সেলুলোজের প্রয়োজন। এই সেলুলোজ থেকে উদ্ভিদ দেহকোষের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর উপাদান সংগ্রহ করার জন্য চাই একটি এনজাইম — এই সেলুলোজকে ভাঙবার জন্যে। বিস্ময়ের কথা এই যে গরুর অন্ত্রস্থ গ্রন্থিগুলি এই এনজাইম তৈরি করে না। সাধারণভাবে, কোন প্রাণীই, তা সে গাছের ছালের মধ্যে বসবাসকারী গুবরে পোকা বা কাঠের ঘুণপোকাই হোক না কেন, অর্থাৎ যারা কাঠ বা সেলুলোজ ছাড়া আর কিছুই খায় না, এদের কারুরই শরীরে এই এনজাইমটা নেই। যে-সব প্রাণী কঠিন উদ্ভিজ্জ পদার্থ নিজেদের খাদ্য হিসেবে বেছে নিয়েছে তারা সবাই এই খাদ্য হজম করতে পারে তাদের পৌষ্টিক নালীর মধ্যে বসবাসকারী লক্ষ লক্ষ জীবকণার সাহায্যে। এই যে অসংখ্য জীবকণার বসতি রয়েছে জন্তু-জানায়ারদের পেটের মধ্যে এদের কার্যকলাপ খুব ভাল করে চর্চা করা হয়েছে গরুদের ক্ষেত্রে। এই জীবাণুগুলি বাস করে পাকস্থলীর একটা বিশেষ অংশে যার নাম রুমেন (Rumen) বা প্রথম পাকস্থলী। এখানে প্রতি ঘন সেন্টিমিটার অঞ্চলে দেড়শ থেকে দুশ কোটি জীবাণু থাকে। গরুর পাকস্থলীতে ঘাস এসে পৌঁছালেই এরা সেগুলিকে খেতে আরম্ভ করে। এই নিখরচায় ভোজ তারা বেশ চেটে পুটে খেয়ে মোটা হয়ে বংশবৃদ্ধি করে হয়ে যায় অনেকগুণ। ঘাসের সেলুলোজ পরিণত হয় স্টার্চে এবং গ্লাইকোজেন-সদৃশ পদার্থে জীবাণুদের শরীর যা দিয়ে গড়ে ওঠে — তাই, উদ্ভিজ্জ প্রোটিন পরিণত হয় জীবানুদেহজ প্রোটিনে।
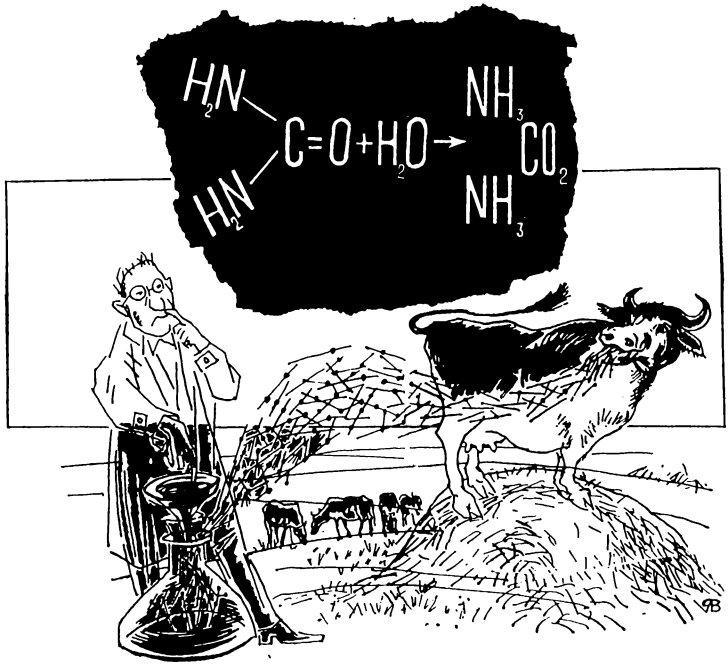
দ্রুত বংশবৃদ্ধি করতে ব্যস্ত এই জীবাণুদের ঘাঁটির পরিণতি বেশ সহজেই আন্দাজ করা যায়। তারা পাকস্থলীর পরবর্তী অংশগুলিতে এবং অন্ত্রের মধ্যে অতি দ্রুত হজম হয়ে যায় আর তাদের দ্বারা উৎপন্ন গ্লুকোজ, এমাইনো অ্যাসিড এবং আরো কয়েকটি পদার্থ রক্তে মিশে যায় বিনা পরিবর্তনে। এই জীবাণুগুলিই তাহলে পুষ্টির প্রধান উৎস। এই কারণে গরুকে তৃণভোজী প্রাণী বলা ঠিক হবে না, আসলে এরা জীবাণুভোজী।

তাহলে একটা প্রশ্ন স্বভাবতই এসে যায়, যেহেতু আমরা গরুকে তো খাওয়াই না আমরা খাওয়াই তার রুমেন বা প্রথম পাকস্থলীতে বসবাসকারী জীবাণুদের, তবে কি প্রাকৃতিক পশুখাদ্যের বদলে কৃত্রিম পশুখাদ্য ব্যবহার করা যায়? প্রশ্নটা মোটেই অলস চিন্তা নয়।

এই যে মাংস, দুধ, পশম, প্রভৃতি সরবরাহে অব্যবস্থা, এর প্রধান কারণ হোল খামারগুলিতে প্রোটিনভরা পশুখাদ্যের অভাব। প্রাণীশরীর অজৈব পদার্থ থেকে প্রোটিন তৈরি করতে পারে না, আর পালিত পশুরা তাদের

যতটা প্রোটিন দরকার সেটা পাবার জন্যে তারা সেইসব উদ্ভিদ খায় যারা বিভিন্ন নাইট্রোজেনঘটিত অজৈব পদার্থ থেকে প্রোটিন সংশ্লেষন করতে পারে। উদ্ভিজ্জ খাদ্য কিন্তু, শুঁটি জাতীয় উদ্ভিদকে বাদ দিলে, প্রোটিনে রিক্ত। এটা দুর্ভাগ্যের ব্যাপার কেননা পশুখাদ্য প্রোটিনসমৃদ্ধ না হোলে অনেক বেশি পরিমাণে প্রয়োজন হবে একটন মাংসে পরিবর্তিত হতে। এছাড়া পশুখাদ্যে প্রোটিনের ভাগ কম থাকলে প্রাণীশরীর তার সবটাই শুষে নেবে ঠিকই কিন্তু সেই খাদ্যের মধ্যেকার বাকি পুষ্টিকর উপাদানগুলির কেবলমাত্র আংশিক অদন সম্পন্ন হবে। তাই ওজন যথেষ্ট বাড়াতে হলে প্রচুর পরিমাণে পশুখাদ্যের প্রয়োজন হবে যার খানিকটা নষ্ট হচ্ছে। এই কারণে বিজ্ঞানীরা প্রোটিনের পরিপূরক খাদ্যের অনুসন্ধান দীর্ঘকাল ধরে করে চলেছেন। এরকম খাদ্য আজকাল পাওয়া গেছে যার একটা হোল ইউরিয়া বা কারবামাইড। প্রাণীশরীরের কাছে ইউরিয়া সম্পূর্ণ অচেনা বস্তু নয়। স্বাভাবিকভাবে প্রেটিন যখন ভাঙা হয় তখন অ্যামোনিয়া নামের একটা বিষাক্ত পদার্থের উদ্ভব হয় যাকে যকৃৎ নিষ্ক্রিয় করে ফেলে এবং শরীর থেকে রেচন প্রক্রিয়ায় নির্গত করে দেয় ইউরিয়া আকারে। সোভিয়েত ইউনিয়নে খামারের কর্মীরা 1959 থেকে গরুকে ইউরিয়া খাইয়ে আসছে। গরুর রুমেন-এর ভিতর কারবামাইড জলের সঙ্গে বিক্রিয়ার ফলে অ্যামোনিয়ার সৃষ্টি করে যার থেকে আবার জীবাণুদেহজ প্রোটিন সংশ্লেষিত হয়। রুমেন-এর আয়তন বিরাট, কখনো কখনো একশ লিটার পর্যন্ত এবং এখানে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন সংশ্লেষিত হয়। একটন কারবামাইড থেকে বাড়তি 8 থেকে 10 হাজার লিটার দুধ, 1·8 থেকে 2·1 টন মাংস বা 120 কিলোগ্রাম পশম পাওয়া যেতে পারে।

গরুর খাদ্যে কারবামাইড মেশাতে কিন্তু খুব বেশি সাবধান হওয়া জরুরী। পরিমাণে বেশি হয়ে গেলে জীবাণুগুলি উৎপন্ন অ্যামোনিয়ার সবটা উপযোগ করে উঠার সময় নাও পেতে পারে যার ফলে বিষক্রিয়া দেখা দেবে। কারবামাইড অন্যান্য পশুখাদ্য থেকে আলাদাভাবে দেওয়া যাবে না কারণ প্রোটিন সংশ্লেষণ-এর জন্য জীবাণুদের প্রয়োজন হয়ে পড়ে খানিকটা শক্তির। সেলুলোজ, স্টার্চ আর শর্করা থেকে এই শক্তি পাওয়া যায়। এছাড়া প্রোটিন সংশ্লেষণের জন্য ভাইটামিন A এবং D, সালফার, ফসফরাস এবং অন্যান্য খনিজ-এর ও প্রয়োজন হয়।

পশুখাদ্যের সংযোজক হিসেবে ইউরিয়া প্রয়োগের চিন্তা কিন্তু হঠাৎ

আসেনি। প্রকৃতি আন্দাজে কাজ করার ব্যাপারে মানুষের উপরে চলে যান অনেক সময়। মরুভূমির প্রাণীরা প্রচণ্ড কঠোর এবং নিষ্ফলা অঞ্চলে বাস করার কালে প্রতিনিয়ত জল আর খাদ্যের অভাবের সঙ্গে লড়ছে। তাই তারা প্রোটিন-বিপাকজ বর্জ্য পদার্থগুলি কাজে লাগাতে শিখেছে। উপবাসী উটের বৃক্ক থেকে ইউরিয়া নিঃসৃত হয় না বললেই চলে। ইউরিয়া শরীরেই থেকে যায়, পাকস্থলীতে আসে যেখানে আছে জীবাণু উৎপাদনের কারখানা, যার থেকে প্রোটিন সংশ্লেষিত হয়।

পশুপালনের ক্ষেত্রে ইউরিয়ার ব্যাপক প্রয়োগ সম্ভব নয় কারণ ইউরিয়ার বিষক্রিয়া বড় তীব্র। কঠোর নিয়ন্ত্রণের তত্ত্বাবধানে এই পদার্থ ব্যবহার করা যেতে পারে, নতুবা ব্যাপক পশুমড়ক দেখা দিতে পারে। তাই প্রোটিনের বিকল্প খুঁজতে হবে আরো নিরাপদ পদার্থের মধ্য থেকে। যে-সব কারণে ইউরিয়া খাওয়ালে পশুশরীরে বিষক্রিয়া দেখা দেয় সেগুলি ইতিমধ্যে আবিষ্কৃত হয়েছে। জানা গেছে রুমেন-এর মধ্যে একটা এনজাইম আছে যার নাম ইউরিয়েজ যা ইউরিয়াতে দ্রুত জল-বিভাজন বিক্রিয়া ঘটায়। উৎপন্ন অ্যামোনিয়া জীবাণুদের আচ্ছন্ন করে ফেলে, তাই তারা খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেয় যার ফলে প্রচুর পরিমাণে জমা হওয়া অ্যামোনিয়া রক্তে প্রবেশ করে এবং প্রাণীটিকে বিষের কবলে ফেলে। তাই গরুদের বিষক্রিয়া থেকে বাঁচাতে হলে দরকার জীবাণুদের কার্যকলাপ বৃদ্ধি করা অথবা ইউরিয়েজ-এর জল-বিভাজন বিক্রিয়া বন্ধ করা।

সম্প্রতি সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা দুটি বিকল্প প্রোটিন নিয়ে পরীক্ষা করেছেন, যার একটি ইউরিয়া-ফসফরিক অ্যাসিড এবং অন্যটি ইউরিয়া গ্লুকোসিল। তাঁদের বিশ্বাস যে ইউরিয়ার অণুতে ফসফরাস প্রবিষ্ট করালে ইউরিয়েজ-এর ক্রিয়া ব্যাহত হবে এবং উৎপন্ন অ্যামোনিয়া ক্ষতিকর থাকবে না। ইউরিয়া-অণুতে শর্করার অনুপ্রবেশের ফলে গরুর পেটের জীবকণাদের পুষ্টি যোগানো হবে অর্থাৎ ইউরিয়া থেকে প্রকৃত প্রোটিন সংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি যোগানা হবে। এই দুটি পদার্থ ইউরিয়া থেকে অনেক নিরাপদ প্রমাণিত হয়েছে এবং এদের প্রয়োগ করাতে যথেষ্ট সুফল পাওয়া গেছে।

প্রোটিন-বিকল্প প্রয়োগের আরো পদ্ধতি আছে। জীবকণাদের চাষ করা যায় খামারে এবং তারপরে গবাদিপশুদের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এই পদ্ধতি ব্যয়সাধ্য, জটিল এবং কম কার্যকর, কিন্তু সম্পূর্ণ নিরাপদ।

এর প্রয়োগে জাবর-কাটা জন্তুদের এবং খামারের অন্যান্য পালিত পশুদের পুষ্টিসাধনে অনেক সুরাহা হবে। প্রফেসর ল. ড. পেট্রভ একটি মাধ্যমের প্রোটিনের পরিমাণ আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে তিনগুণ বাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন, কারবামাইড মিশ্রিত আলুতে জীবাণুর বংশবৃদ্ধি ঘটিয়ে। প্রোটিনসমৃদ্ধ এই খাদ্য শুয়োরদের আহার্য হিসেবে প্রয়োগ করা যাবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে রোমন্থক প্রাণীদের পরিপাকক্রিয়ার একটি আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার ফলেই বিজ্ঞানীরা চিন্তা করলেন জীবাণুকণার সাহায্যে সংশ্লেষণ ঘটানোর সম্ভাবনার কথা, প্রাণীদের স্বাভাবিক খাদ্যকে প্রোটিনসমৃদ্ধ করে তোলার প্রয়োজনের খাতিরেই। তার মানে, আমরা আশা করতে পারি যে অদূর ভবিষ্যতে পশুখাদ্যের একটা মোট অংশ তৈরি হবে, না, মাঠে নয়, বরং কারখানাতে।

ডেক্‌চি আছে অনেক প্রকারের

এককোষী প্রাণীদের নিজেদের খাদ্য পাক করে নেবার জন্যে কোন বিশেষ বাসন বা পাত্র নেই। আত্মকৃত খাদ্য একটা খোঁদলের মধ্যে ঢোকে, খাদ্যটা হজম হয়ে গেল খোঁদলটাও বুজে গেল।

এদের থেকে জটিলতর প্রাণীদের বেলায় প্রক্রিয়াটা ভিন্নতর। এই পৃথিবীতে প্রথম যে-সব বহুকোষী প্রাণীর আবির্ভাব হয়, যেমন পলিপ আর জেলি-ফিশ, এদের কিন্তু জীবন্ত ডেকচি ছাড়া অন্য কোন অভিধা দিয়ে বর্ণনা করা চলে না। সাদৃশ্যটা যতটা বাইরের আকৃতিতে তার চেয়ে অনেক বেশি ভিতরের প্রকৃতিতে। আকৃতিতে এরা ধূমপায়ীদের তামাক রাখার বটুয়ার মতো, দু'সারির কোষ দিয়ে তৈরি ছোট একটা থলি যার মধ্যে খাবার ঢোকে আবার যা হজম হোল না সেটা বেরিয়েও যায়। ডেকচিতে খাদ্য থাকলে বিশেষ ধরনের কোষ থেকে বিশেষ পদার্থের নিঃসরণ হয় যার সাহায্যে খাদ্যের পাচন শুরু হয় এবং খাদ্যবস্তু ছোট ছোট টুকরোয় ভেঙে যায়। তারপর তাদের পাকড়ে ধরে ভেতরের দেয়ালের কোষগুলি এবং সেখানেই সারা হয়। প্রত্যেক কোষই যদিও সুস্বাদু একমুঠো খাবার ধরতে পারে না, কিন্তু ভাগ্যবান যারা তাদের পড়শী ক্ষুধার্ত সঙ্গীদের সঙ্গে ভাগ করে খাওয়ার ব্যাপারে উদারতা দেখায়। আবার, এই কোষগুলি সব সময় ভেসে বেড়াচ্ছে আর নিজেদের জায়গা বদল করছে, স্থায়ীভাবে

শরীরের কোন জায়গায় আটকে থাকে না। যথেষ্ট খাওয়ার পরে যারা খানিকটা শক্তি সঞ্চয় করেছে, তারা সরে গিয়ে ক্ষুধার্তদের জন্যে জায়গা ছেড়ে দেয়।

এরপরে ব্যাপার স্যাপার আরো জটিল হতে থাকে যখন আরো সুবিন্যস্ত শরীরধারী জীবের দেখা পাওয়া গেল। খাদ্য হজম করবার নিয়মটা আগেই শেখা হয়ে গেছে তাই এই ব্যাপারটাতে কোন গোলযোগ দেখা দিল না। আসল অসুবিধা দেখা দিল শরীরের প্রতিটি কোষের কাছে পুষ্টিকর খাদ্য পৌঁছে দেবার ব্যাপারে। প্রথম প্রথম এই কাজটার ভার পরিপাকতন্ত্রই নিয়েছিল। অর্থাৎ অন্ত্র শরীরের সব কোষের কাছে নিজে পৌঁছাতে চেয়েছিল।

এইভাবে এলো টারবেলারিয়া নামের প্রাণী। প্রকান্ড এদের অন্ত্র, দেখতে অনেকটা ডালপালা মেলে দেওয়া গাছের মতো, যার ওপর দেহ বেড়ে ওঠে সেই ভিত্তির কাজ করে এবং শরীরের সকল কোষকে খাদ্য যোগায়। স্বভাবতই, এই যে সরবরাহব্যবস্থা শরীরের পাঁচভাগের চার ভাগ জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে এটা কিছুটা জবড়জং — তাই প্রকৃতি এই পদ্ধতিটা পরে বাতিল করে দেন, আর পরিপাক আর পুষ্টির সরবরাহ দুটি স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হয়ে যায়।

প্রকৃতির মধ্যে বৈষম্যের ছড়াছড়ি। একদিকে বিরাট পরিপাকযন্ত্র তৈরী হচ্ছে আবার অন্যদিকে চেষ্টা চলছে এটা সম্পূর্ণ বাদ দিলে চলে কিনা তাই নিয়ে পরীক্ষা করার। সত্যিই তো, পরিপাকযন্ত্রের কোন প্রায়াজন আছে কি? এর চেয়ে সহজ হোত না কি খাদ্যটা এনজাইম দিয়ে ভিজিয়ে নিয়ে পরিপাক হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করা আর তারপরে পুষ্টিকর অংশগুলি শরীরে শুষে নেওয়া যদি সম্ভব হোত।

এই টারবেলারিয়া, যাদের কথা আগেই বলা হয়েছে, এদের মধ্যে আছে অনেকগুলি খুব ছোট ছোট প্রাণী যাদের অন্ত্র নেই। এদের আছে কেবল একটা মুখগহ্বর যেখান থেকে পাচক রস ঢেলে দেওয়া হয় শিকারের উপর এবং অর্ধপক্ক খাদ্য শুষে নেওয়া হয়। এই মুখগহ্বরটা বসানো আছে পাচনের উপযোগী প্যারেণকাইমেটাস কোষশ্রেণীর ওপর যাদের দেয়াল নেই এবং যাদের একটি থেকে অন্যটিকে আলাদা করা যায় না। খাদ্যের টুকরোগুলি এক্ষেত্রে, যেমন হয় বড়সড়ো অ্যামিবার বেলায়, শেষপর্যন্ত পরিপাক হয়ে যায়। এদের আকৃতি খুব ছোট হওয়ার কারণে বাকি কোষগুলিও বেঁচে থাকে।

রান্নাঘরটা তবে সমুদায় নোংরা বাসন আর আবর্জনা সমেত বাইরে সরিয়ে দেওয়ার মৎলবটা ভাল মনে হওয়াতে অনেক প্রাণী এই বিচিত্র পদ্ধতিটাই বেছে নিয়েছে। খুব ছোট ছোট পোকার শূককীটেরা বাস করে প্রাণী বা উদ্ভিদ শরীরের কলাসমষ্টির মধ্যে, এরা অনেক সময় এই প্রণালীটা ব্যবহার করেছে। এদের চোয়াল জীবন্ত দেহকলার কোথাও কামড়ে ধরে তার মধ্যে ঢুকতে পারে না। এরা তাই পাচক রসের সাহায্যে বাইরের আবরণের কোষগুলিকে কোমল করে ফেলে। শূককীট তৈরী খাবার খেতে খেতে ভিতরে ঢুকতে থাকে। বয়স্ক পোকারাও এই উপায় ব্যবহার করে থাকে, ধারালো একটা ছোরা পাতা বা উদ্ভিদশরীরের আর কোন অংশে আগে গিঁথে দিল, তারপরে সেই অঞ্চলে জারক-রস ছিটিয়ে তার কোষস্থাপত্যকে দিল ভেঙে। স্টার্চের জল-বিভাজন শুরু হোল, বহু-অণুর শর্করা ভেঙে হোল এক অণুর শর্করা। এই সুমিষ্ট আচারটি তারপরে চেটে চেটে খাওয়া গেল। পোকাদের পছন্দ যদি হয় মাংস, তাহলে তারা তাদের ছোরা ঢুকিয়ে দিল নিজেদের ভায়েদের শরীরে বা অন্য প্রাণীর শরীরে, এক ফোঁটা এনজাইম দিল ঠেলে ঢুকিয়ে চামড়ার ভিতরে।

এই যে রান্নার ব্যবস্থাটা বাইরে রাখা, বড়সড়ো প্রাণীদের মধ্যেও কেউ কেউ এটা সুবিধাজনক মনে করেছে। পৃথিবীর সকল সমুদ্রেই বাস করে তারা-মাছ। এই সুন্দর কিন্তু অলস প্রাণীরা প্রকৃতই শিকারী জন্তু, এদের পছন্দসই খাদ্য হোল শুক্তি। এই তারা-মাছেরা পালিত শুক্তির ভাণ্ডারগুলি লুঠ করে থাকে। বহুকাল ধরে রহস্যটা অজানা ছিল যে এমনি একটা জড়ভরত তারা-মাছ কেমন করে শুক্তির শক্ত-করে বন্ধ-করা খোলা খুলে ফেলতে পারে। তারা-মাছের রীতি-প্রকৃতি অল্পদিন হোল গবেষণা করা হয়েছে। দেখা গেছে যে এরা কখনোই ঝিনুকের খোলা জোর করে খুলতে চেষ্টা করে না। এদের কার্যধারাটা আরো অনেক সরল। তারা-মাছ তার পাকস্থলীটি মুখ দিয়ে উলটে বাইরে এনে চুপটি করে অপেক্ষা করে কখন ঝিনুক তার খোলটি একটু খুলবে। একটি ছোট ফাঁক, এক মিলিমিটার হলেই চলবে, দেখা দিক, সেটুকুই যথেষ্ট তার পাকস্থলীটি ঝিণুকের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবার জন্যে। এখন আর তারা-মাছকে বাধা দেবার কেউ নেই, তার শিকারকে নিজের ঘরের মধ্যেই রান্না করে ফেলবে তারা-মাছ। ঝিণুকটা মরে গেলে খোলাটা আপনিই আলগা হয়ে খুলে যাবে, তখন সেই খোলার গা পর্যন্ত চেটে সাফ করে দেবে তারা-মাছে।

কোন কোন আধুনিক প্রাণীর আবার নিজেরা রান্নাবান্না করতে ভাল লাগে না। তাদের পছন্দ কাছাকাছির কোন ক্যান্‌টিন বা সস্তার রেস্তোঁরা। খাওয়াদাওয়া এরা সেখানেই সারে। এরা হোল ক্রীমি বা অন্ত্রের মধ্যে বসবাসকারী পরভোজী প্রাণী। এই ক্ষতিকর, ঘৃণ্য প্রাণীগুলি কোন চেষ্টাই করেনি নিজেদের শরীরে পরিপাকের জন্য কোন যন্ত্রাদি রাখবার। আরো খোলাখুলিভাবে বলতে গেলে বলা উচিত যে এরা সেইসব যন্ত্রাদি খুইয়ে বসে আছে কেননা এদের পিতৃপুরুষদের নিশ্চয়ই কোন না কোন ধরনের ব্যবস্থাদি ছিল।

অন্ত্রের পরভোজীরা চায় সব কিছু তাদের সামনে পরিবেশন করা হোক, আর সবকিছু তাদের জুটেও বেশ যায়। মানুষের বা অন্য প্রাণীর অন্ত্রের ভিতর থেকে তারা সারা শরীর দিয়ে শুষতে থাকে সেই পরিপাক হয়ে যাওয়া, খাদ্য, অন্ত্রের মালিক যেটা নিজের জন্যই প্রস্তুত করেছিল।

তবে এই রকম একটা জীবন যাপনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা মোটেই সহজ হয় নি। অন্ত্রের মধ্যে বেঁচে থাকতে হলে তাদের অভ্যস্ত হতে হয়েছে অকসিজেন ছাড়া বাঁচতে শেখায়, আর নিজেদের শরীরের বাইরে বেশ মজবুত একটা ত্বক রাখতে হয়েছে (বাইরের একটা খোলস) যেটা তাদের গৃহকর্ত্রীর পাচকরসগুলি থেকে রক্ষা করে অথচ গৃহকর্ত্রী যে-সব খাদ্য পরিপাক করেছে তাদের শুষে নেওয়ায় বাধার সৃষ্টি করে না।

অন্ত্রের পরজীবীদের সম্পূর্ণ কুঁড়ে বলা যায় না কেননা খাদ্যটা তাদের শুষে নিতে তো হয়। এদের চেয়ে কুঁড়ে, মানে কুঁড়ের বাদশারাও আছে। এদেরই একজনের কথা বোধহয় ইউক্রেনের মজার উপকথায় বলা হয়েছে। কুঁড়ের বাদশাকে কাজ করতে ডাকা হয়েছিল।

— কি ধরনের কাজ আমাকে করতে হবে? সে শুধায়।

-- কঠিন কোন কাজ নয়, তাকে বলা হোল, চষিগুলো ক্ষীরে ডোবাতে হবে আর খেয়ে ফেলতে হবে। চষিগুলো ক্ষীরে ডোবাও আর খেয়ে ফেল। কুঁড়ের বাদশা বলল অনেক ভেবে চিন্তে, না বাপু, প্রথমে ডোবাও তারপরে আবার খাও, অত পারবো না।

তা, এরকম কুঁড়েও কিন্তু আছে গভীর সমুদ্রে: একজনের নাম, পুরুষ ছিপ-ফেলা মাছ। অনেককাল পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকেরা এই জাতের মাছের স্ত্রী ও পুরুষদের আলাদা জাত বলে জানতেন কেননা স্ত্রী ও পুরুষেরা দেখতে একেবারেই আলাদা। পুরুষেরা আকৃতিতে আনক ছোট আর তাদের সেই

বিখ্যাত ছিপ — মানে মাথা থেকে বেরিয়েছে যে লম্বা সুতো — থাকে না। এই পুরুষেরা বড় হলে মেয়ে বন্ধুর স্বপ্ন দেখে এবং তাকে খুঁজতে বেরোয়। স্ত্রীর জন্যে প্রেমে পাগল হয়ে তাদের খিদে চলে যায়, অন্ততঃ আর কোন কারণ জানা নেই যে কেন তারা খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে দেয়। কিছুই তারা খায় না এবং নিজেদের ত্বকের নীচের চর্বি ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই যদি তারা সঙ্গিনী খুঁজে না পায় তাহলে তারা উপোস করে মারা যায়।

মেয়েবন্ধু খুঁজে পাওয়া সহজ নয় কারণ এই ছিপ-ফেলা মাছ সংখ্যায় তো আর বেশি নেই, জালে ধরা-পড়া স্ত্রী-জাতের মাছদের মধ্যে কেবল কয়েকটির সঙ্গেই পুরুষ মাছ পাওয়া গেছে। তাই বোঝা যায় যে পুরুষমাছ সঙ্গিনীর দেখা পেলে কেন আর সঙ্গ ছাড়ে না। সময় নষ্ট না করে তার দাঁতগুলি বসিয়ে দেয় স্ত্রী-শরীরের কোন নরমস্থানে, আর তাকে ছাড়ে না, স্ত্রীর শরীর থেকে ঝুলতে থাকে। আস্তে আস্তে তারা এক হয়ে যায়, ভিন্ন দেহের কোষকলার যে ভিন্নতা সেটা এই প্রক্রিয়ায়কোন বাধাহয় না। ইতিমধ্যে পুরুষমাছের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি শুকিয়ে নষ্ট হয়ে গেছে, কেবল তার প্রজননযন্ত্র তেজের সঙ্গে সক্রিয় হয়েছে। প্রয়োজনীয় যা কিছু, যেমন অকসিজেন এবং পুষ্টি, পরভোজী পুরুষ পেয়ে যায় স্ত্রীর রক্ত থেকে। খাদ্য তাকে শুষেও নিতে হয় না, গল্পের কুঁড়ের বাদশার মতো 'ডোবাও আর গিলে ফেল' এইটুকু পরিশ্রমও করতে হচ্ছে না। যেটুকু কাজ তাকে করতে হচ্ছে সেটা হোল কেবল শুষে যাওয়া খাদ্য সারা শরীরে সমানভাবে ছড়িয়ে দেওয়া।

খাদ্য পরিপাকের ব্যবস্থা যদি শরীরের বাইরে থাকে তাহলে নানান মজার ব্যাপার ঘটে থাকে। যেসব প্রাণীর পরিপাকতন্ত্রের যন্ত্রাদি বেশ সুগঠিত, তারা যদি এই পদ্ধতি পছন্দ করতে শুরু করে, তখন প্রশ্ন আসে তাদের শরীরস্থ রান্নার বাসনপত্র অকেজো হয়ে যাওয়ার পরে কি ঘটে। প্রকৃতি কখনো ফালতু জিনিষ রাখেন না। অপ্রয়োজনীয় দেহযন্ত্র ধ্বংস হয়ে বাতিল হয়ে যায় অথবা তারা নতুন কোন কাজ করে। যেমনটি ঘটেছে মারমিথিডি-এর পৌষ্টিক নালীর বেলায় — এরা হোল ছোট পরজীবী সুতোর মতো ক্রীমি জাতীয় পোকা।

প্রথম যে ব্যক্তি মারমিথিডি-এর পাচনতন্ত্রের নিম্নোক্ত বিচিত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছিলেন, তিনি জার্মান বৈজ্ঞানিক হানস্ মেইসনার। তিনি দেখলেন যে এই পোকার শূককীটদের মুখের গহ্বর অত্যন্ত সংকীর্ন আর তার

দেয়ালে পেশী নেই। এই অতি ক্ষুদ্রাকৃতি সুতোক্রীমি তরল খাদ্য খায়, কিন্তু এত দুর্বল মুখগহ্বর দিয়ে খাদ্য শুষে নেওয়া সম্ভব নয়। মেইসনার-এর একজন সহকারী বললেন যে তরল খাদ্য কৈশিক বলের সাহায্যে মুখের ভিতরে প্রবিষ্ট হবে, তাই ক্রীমিটাকে কেবল মুখটা খুলে রাখতে হবে।

কিন্তু মেইসনার-এর ভৌতবিদ্যার উপর আস্থা ছিল না তাই তিনি কৈশিক বলের ব্যাপারটা বিশ্বাস করলেন না। তিনি অনুবীক্ষণ যন্ত্রে চোখ লাগিয়ে বসেই রইলেন এবং দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে দেখতে পেলেন যে মুখের গহ্বরটা কিছুদূর গিয়েই সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে — অন্ত্রের সঙ্গে এর কোন যোগই নেই। অন্ত্রের না আছে কোন ঢোকবার ছিদ্র, না বেরোবার। সুতোক্রীমির কোন পাকস্থলী নেই, মুখগহ্বরের পরেই অন্ত্রের অবস্থান। বহু চেষ্টা করেও তিনি জানতে পারলেন না যে তাহলে এই ক্রীমিরা খায় কেমন করে?

অল্প কিছু কাল হোল বিজ্ঞানীরা রহস্যটা উদ্ঘাটন করেছেন। সুতো-ক্রীমির পরিপাকক্রিয়া শরীরের বাইরে ঘটে। মুখ দিয়ে কোন খাদ্যই তারা দেহের ভিতরে নেয় না। বরং এই অঞ্চলের কোষকলা থেকে পাচকরস নিঃসৃত হয়ে মুখ দিয়ে বাইরে চলে আসে — এর সঙ্গে যুক্ত হয় ক্রীমির বহিরাবরণের মধ্যস্থিত নালী থেকে নিঃসৃত এনজাইম। এই পাচকরসগুলি আশ্রয়দাতার শরীরের যে অঞ্চলে তাদের বসতি সেখানকার কোষকলা পরিপাক করতে থাকে এবং এই প্রস্তুতান্ন ত্বকের সর্বত্র দিয়ে তারা শুষতে থাকে এবং রক্তের সাহায্যে নিজেদের সারা শরীরে ছড়িয়ে দেয়।

তাই যদি হয়, তবে এদের এই অন্ত্রটা থাকার কি প্রয়োজন? রক্তে যে খাদ্য মেশে সেটা শরীরের বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্যে আংশিকভাবে ব্যবহৃত হয়। বাড়তিটুকু অন্যান্য প্রাণীদের মতো অন্ত্র থেকে রক্তে যায় না, বরং তার উলটো — রক্ত থেকে অন্ত্রে পৌঁছায়। সুতো ক্রীমির অন্ত্র খালি থাকে না। এর নলটি বিশেষ কোষ দিয়ে ঠাসা যেখানে খাদ্য জমা করা থাকে প্রোটিন ও চর্বির দানার আকারে। তার মানে এই শুককীটগুলির অন্ত্র ব্যবহৃত হয় খাদ্য ভান্ডার হিসেবে। পূর্ণবয়সে পৌঁছালে পোকাগুলি খাওয়া বন্ধ করে আর তখন এই জমা করা ভান্ডারের খাদ্য ব্যবহার করে প্রজননের জন্য প্রয়োজনীয় পদার্থ এবং শক্তির উৎস হিসেবে। সুতোক্রীমি বংশবৃদ্ধি করতে পারত না যদি না যথেষ্ট খাদ্য সঞ্চিত থাকত তাদের অন্ত্রে।

মাঝে মাঝে দেখা যায় যে উচ্চতর প্রানীদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের রান্নার বাসন পাত্রগুলিকে ব্যবহার করেছে রান্না ছাড়া অন্য কাজে। সকল

স্তন্যপায়ীর পরিপাকতন্ত্র শুরু হয় মুখগহ্বর থেকে, তারপর খাদ্যনালী ধরে পৌঁছান যায় পাকস্থলীতে। এরপর রয়েছে একরাশ বাসনপত্র: ডিউওডিনাম, জেজুনাম, ইলিয়াম, সিকাম, কোলন, এস্‌-আকৃতির অন্ত্র এবং মলভাণ্ড বা রেকটাম। মানুষের দেহে এদের সবাইকে নিয়ে পাচনতন্ত্রের দৈর্ঘ্য 8·5 মিটার, তৃণভোজী প্রাণীদের ক্ষেত্রে আরো অনেক বেশি। এই দীর্ঘ নলের যে কোন জায়গা থেকে 50 থেকে 70 সেণ্টিমিটার কেটে বাদ দিলে খাদ্য পরিপাকের কোন ব্যাঘাত ঘটে না, কেবল একটি জায়গা ছাড়া — এই ব্যতিক্রমের জায়গাটা হোল ডিউওডিনাম পাকস্থলী থেকে বেরিয়ে প্রথম 25 থেকে 30 সেণ্টিমিটার অঞ্চল, কোন অবস্থাতেই একে স্পর্শ করা যাবে না। যে-সব প্রাণীর ডিউওডিনাম কেটে বাদ দেওয়া হয় তারা অপারেশনের কিছু পরে মারা যায় — যারা প্রথম কয়েকটা দুরূহ দিন কাটিয়ে দিতে সক্ষম হয় তারা মারা যায় তিন মাসের ভিতর। শরীরের উত্তাপ তাদের অনেক কমে যায়, কখনো চার ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড পর্যন্ত। তাদের ক্ষুধা চলে যায়, তারা ক্রমশ রোগা হয়ে যায়, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মাসে দেহের ওজন শতকরা ষাটভাগ কমে যায় এবং তারপরে তারা মারা যায়।

বিজ্ঞানীরা আজও এর কারণ নির্ধারণ করে উঠতে পারেন নি। এই ঘটনাটি ব্যাখ্যা করতে দুটি তত্ত্বের প্রস্তাব করা হয়েছে, প্রথমটা হোল ডিউওডিনাম বাদ দিলে হজম হয় না, দ্বিতীয় — ডিউওডিনাম বিপাক ছাড়াও শরীরযাত্রার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় আর কোন কাজ করে। পর্যবেক্ষণ থেকে দ্বিতীয় মতটার সমর্থন পাওয়া যায়। ডিউওডিনামের যদি সবটাই কেটে বাদ দেওয়া না হয়, অন্তত তিন-চার সেণ্টিমিটার যদি রাখা যায় তাহলে প্রাণীটা মরবে না। এর থেকে বোঝা গেল যে অপারেশনের দরুণ যে কষ্ট সেই কারণে মৃত্যু ঘটছিল না, বরং ডিউওডিনামের অভাবের কারণেই। ডিউওডিনামকে যথাস্থানে রেখে পাচনতন্ত্র থেকে তাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাখা সম্ভব; খাদ্যবস্তুকে ভিন্ন পথে চালিত করে। সে-সব ক্ষেত্রে প্রাণীরা বেশ ভালোভাবেই বেঁচে থাকে। এ থেকে প্রমাণ হয় যে ডিউওডিনাম আর কোন কাজ করে চলেছে। ডিউওডিনাম অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি, এমন ধারণাও উল্লখিত হয়েছে। সম্ভবত অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কোন পদার্থ রক্তপ্রবাহে পৌঁছে দেয় এই দেহযন্ত্র কিন্তু কি সে পদার্থ; কিই বা তার কাজ সেসব তথ্য আজও অজ্ঞাত।

একজাতের শামুক আছে (Nudibrandiale mollusk) যাদের যকৃতের
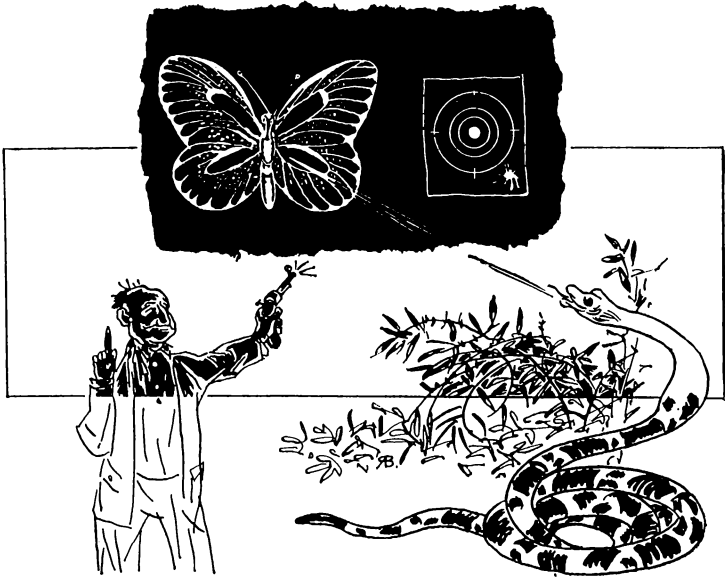
আছে আত্মরক্ষামূলক একটা ভূমিকা যেটা কম আগ্রহের বিষয় নয়। এই দেহযন্ত্রটি এদের বেশ বড় — অনেকগুলি তার খন্ড যাদের মধ্যে পরস্পর সংযোগকারী অসংখ্য নল পাকস্থলীতে এসে পেঁছেছে। যকৃতের এই গ্রন্হিজ নলগুলি শামুকের সারা শরীর জুড়ে ছড়িয়ে আছে, তাদের পিঠের শুঁড়ের আকৃতির উঁচু ঢিবিগুলির মধ্যে এসে বাইরের দিকে এক একটা মুখে এসে শেষ হয়েছে। এইখানেই পাওয়া যায় অনেকগুলি বিঁধিয়ে দেবার হুল, শামুকের অস্ত্র, এই নলগুলির বহিরাবরণে। সবচেয়ে মজার কথা হোল এই যে এই ব্রণগুলি শামুকের নিজের শরীরের অংশ নয়, এদের ধার করে আনা হয়ছে জলজ হাইড্রা জাতীয় প্রাণী থেকে যারা শামুকের খাদ্য। হুল বেঁধাবার ক্যাপসুলগুলি শামুকের পরিপাকতন্ত্রে প্রবেশ করে হজম না হয়ে যকৃতে প্রবেশ করেছে। এই ক্যাপসুলগুলি বিষাক্ত তীর ছুঁড়তে পারে যখনই কেউ তাদের আশ্রয়দাতাকে স্পর্শ করে থাকে। বধ্য প্রাণীর অস্ত্র কেমন বিজেতার সম্পত্তি হয়ে গেল দেখ।

সেফালোপোডা বা অকটোপাস (বাংলায় শিরঃপাদ) গোষ্ঠীর প্রাণীদের অস্ত্র কেমন আত্মরক্ষার কাজ করে শোন। স্কুইড, স্কাটল-ফিশ প্রভৃতির পায়ুদ্বারের কাছে আছে একটা কালির থলির মুখ। এই কালির থলি

আসলে নাসপতির আকারের একটা বড় গ্রন্থি যার নিঃসৃত রস কালির মতো কালো, জলকে ঘোলা করে দিতে কয়েকটা ফোঁটাই যথেষ্ট। প্রাণীটা তাই শত্রুকে বিভ্রান্ত করতে পারে ধোঁয়ার আড়াল সৃষ্টি করে, নিজে সমুদ্রের গভীরে পালিয়ে যাবার কালে।

অনেক শামুক আছে যাদের ছড়ানো কালি জলে গুলে যায় না, কিন্তু একটা বড় ফোঁটার আকারে জলের মধ্যে ভাসতে থাকে, আকৃতিতে সেই ফোঁটা অনেকটা ওই শামুকেরই মতো। ধূর্ত শামুক শত্রুর জন্য নিজের ছায়াটি রেখে কেটে পড়ে।

এই পরিচ্ছেদটি এখানেই শেষ করতাম যদি না বিজ্ঞানীরা গভীর সমুদ্রের আর একটি বিচিত্র প্রাণীর খবর পেতেন। প্রাণীটির নাম পগনোফোরা। সম্প্রতি পগনোফোরা নিয়ে গবেষণা বেশ আগ্রহের সৃষ্টি করেছে।

পগনোফোরা আবিষ্কৃত হয়েছে সম্প্রতি এবং এই আবিষ্কার ও তাদের নিয়ে গবেষণার সমস্ত কৃতিত্ব বিশিষ্ট সোভিয়েট জীববিজ্ঞানী আ. ভ. ইভানভ-এর। এই জীবগুলি আকৃতিতে দীর্ঘ, সরু সরু পোকার মতো, তারওপর মাথায় পাগড়ির মতো কতকগুলি শুঁড় আছে, সংখ্যায় এক থেকে দু'শ কুড়ি পর্যন্ত। কখনো কখনো এই শুঁড় বিড়ের মতো বাঁধা অবস্থায় থাকে। পগনোফোরা বাস করে দীর্ঘ সুড়ঙ্গে, যেগুলি তারা নিজেরাই বানায় এবং সুখেই তারা সেই সুড়ঙ্গে বা ছোট ছোট গর্তেও বসবাস করে। তারা মোটামুটি উন্নত প্রাণী, স্নায়ুতন্ত্র আছে, সম্পূর্ণ রক্তসংবহন প্রণালী রয়েছে কিন্তু তাদের পরিপাকতন্ত্র নেই। কেউ জানে না যে পরিপাকতন্ত্র ছাড়া এদের চলে কি করে। তবে আ. ভ. ইভানভ একটা মত পোষণ করেন। তিনি বলেন যে পগনোফোরার খাদ্য পরিপাক শরীরের বাইরে ঘটে। তাঁর যা ধারণা সেটা এই রকম: পছন্দসই খাদ্যবস্তু পেলে প্রাণীটা সেটা নিয়ে তার সুড়ঙ্গে লুকিয়ে থাকে আর তারপরে তার শুঁড়ের ঘন জাল দিয়ে তাকে জড়িয়ে এই ক্ষুদে শিকারী বানায় একটা তাৎক্ষণিক পাকস্থলী, শুঁড়গুলির গোড়া থেকে পরিপাকের জন্য প্রয়োজনীয় এনজাইম নিঃসরণ করে আর শুঁড়গুলিই শুষে নেয় হজম হয়ে যাওয়া খাদ্য। বলা শক্ত প্রকৃত ব্যাপারের কত কাছাকাছি এই মত। তবে এটা ঠিক যে পগনোফোরা প্রকৃতিতে অত্যাশ্চর্য উদ্ভাবনগুলির আরো একটা বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত।

খাদ্য শিল্প

আগষ্ট মাসের মাঝামঝি। এখনো গরম, তবে শরৎকাল যে আসছে সেটা বোঝা যায়, কারণ দিনগুলি ছোট হয়ে আসছে আর ভোরের কুয়াসা আরো ঘন হচ্ছে। দিকে দিকে শরতের আগমনের লক্ষণ দেখা যায়: মাঠে খড়ের গাদা সাজানো হয়ে গেছে, বার্চ গাছের পাতায় ধরেছে সোনার রং। এটা ফসল তোলার ঋতু। দোকানগুলি ফলে, সবজীতে উপচে পড়ছে, আঙুর উঠেছে সবেমাত্র।

বছরের এই সময়টাতে বনের শোভা ভারি মনোরম। শতায়ু দেওদার-এর ছায়া দিয়ে ঘেরা রৌদ্রোজ্জ্বল প্রান্তরগুলিতে কত না বনফল পেকে সুগন্ধ ছড়াচ্ছে, নালার ধারে পাওয়া যায় ছত্রাকের ঘ্রাণ। প্রত্যেক শুক্রবার আর শনিবার হাজারে হাজারে শহরের মানুষ ঝুড়ি, বালতি নিয়ে মফঃস্বলে যাবার ট্রেন ধরবার জন্য ধাবমান, সোমবারে গৃহিনীরা আচার, মোরব্বা বানায়, শুকোতে দেয় পাতালকোঁড়, বাতাস ভরপুর তারই সু-আঘ্রাণে।

বছরের এই সময়টাতে দেখা যায় বন্য প্রাণীরাও ব্যস্ত ফসল তোলার কাজে। এদের অনেকেই দীর্ঘ শীতকালটাতে প্রাণরক্ষা করতে পারত না সঞ্চিত খাদ্য ছাড়া। তাইতো তারা এমন দক্ষ হয়ে উঠেছে সঞ্চয়ের কাজে। সন্ধ্যে হোল, ট্রাকটরের ইনজিনের শব্দ যেই মিলিয়ে গেল ওমনি ইঁদুরেরা বেরিয়ে আসে গর্ত থেকে: নেংটি ইঁদুর, মেঠো ইঁদুর, কেঁদো ধেড়ে ইঁদুর। এরা সবাই মাটির নিচে নিজের নিজের শস্য গোলা ভর্তি করে সব চেয়ে ভালো ভালো দানা শস্য দিয়ে। শীত এলে দেখবে এক একটা ধেড়ে ইঁদুরের গর্তে তিন থেকে চার কিলোগ্রাম দানা শস্য গুছিয়ে রাখা আছে। শীত যখন খুব বেশি, মাঠ বরফে ঢাকা পড়ে গেছে এই দুষ্টুগুলোর তখন আর খোলা জায়গায় আসতে হবে না। তারা গর্তের মধ্যে গরমে পেট পুরে খেয়ে নিরাপদে থাকবে।

জঙ্গলের বাসিন্দারাও মাঠের প্রাণীদের থেকে পিছিয়ে পড়ে থাকে না। বন্য প্রান্তরের এক কোণে দেখা যাবে মরা দেওদারের ডাল থেকে ঝুলছে সারি সারি শুকোতে দেওয়া পাতালকোঁড়। এ কোন ছত্রাক-সন্ধানী আর কেনই বা সে পাতালকোঁড়গুলি গাছের ডালে শুকিয়ে নেয়? আরে! এযে দেখছি দুষ্টু লাল কাঠবিড়ালী। বনে জঙ্গলে ছুটতে ছুটতে এখান থেকে পাকা বাদাম, সেখান থেকে ওক-এর ফল লুকিয়ে রাখে গাছের ফাঁপা

কাণ্ডের ভিতর, গাছের ডালে শুকোতে দেয় পাতালকোঁড়, শীতের সময় কাজে লাগবে।

ছোট চিপমুংক পাইনের ফলের ভক্ত, কিন্তু বেচারীর ভাগ্যে তার সঞ্চিত ভাণ্ডার থেকে খাওয়া ঘটে কদাচিৎ। এই ছোট ছোট বাদামগুলি খেতে সবাই ভালোবাসে কিন্তু পাইনের কোন্ (cone) বা মোটাকৃতি ফলগুচ্ছ থেকে আলাদা করে বের করা ভারী শক্ত কাজ। কিন্তু বৃহৎবপু ভাল্লুক, জঙ্গলের প্রভু, তিনি পছন্দ করেন চিপমুংক-এর ভাঁড়ারের মধ্যে হাত গলিয়ে সকালের জলখাবারটা সারতে। চেঁচামেচি তাঁর বরদাস্ত হয় না, ভাঁড়ারের মালিক যদি কাছে আসে তাহলে তাকেও সাবাড় করে ফেলবেন। আলতাই পর্বতমালার উপত্যকায় জন্মায় কয়েক জাতের সেরা ঘাস। শরৎকালের সমাগমে দেখতে পাবে মাঠের মাঝখানে এখানে সেখানে ছোট ছোট ঘাসের স্তুপ। মন দিয়ে দেখ, কত যত্নে স্তুপগুলি সাজানো হয়েছে। মাঠে জন্মায় কত জাতের ঘাস, এই স্তুপগুলিতে তাদের সবগুলিকে পাবে না কিন্তু। এখানে পাবে সবচেয়ে সরস, সবচেয়ে পুষ্টিকর ঘাসের গুচ্ছ। এদের মালিক হোল পাইকা নামের ছোট একজাতের ইঁদুর। শরৎ আসার সঙ্গে সঙ্গে এরা খড় সংগ্রহ শুরু করে। ঘাসের শ্রেষ্ঠ কাণ্ডগুলি কেটে মাঠে এরা সেগুলি শুকিয়ে নেয়, তারপরে তাই দিয়ে বানায় খড়ের গাদা। এইভাবে শীতের সঙ্গে যুঝতে তারা সব চেয়ে ভালো খড় মজুত করে।

মৌমাছিরা সঞ্চয় আরম্ভ করে বসন্তের শুরু থেকে। সূর্যের আলোতে মাটি উত্তপ্ত হতে থাকলেই প্রথম ফুলের রাশি উজ্জল মখমল দেয় বিছিয়ে, আর মৌমাছিরা বেরিয়ে পড়ে পুষ্পরস সংগ্রহ করতে। কাজটা সোজা নয়, অনেক কাঁচামালের প্রয়োজন, রাঁধুনিদের কুশলতার কথা বাদই দিলাম, যা না থাকলে মধু আদৌ তৈরিই হোত না।

মিষ্ট পুষ্পরসে থাকে শতকরা 40 থেকে 60 ভাগ জল। মৌমাছিদের কাজ হোল ফুটিয়ে জলটা কমিয়ে ফেলা যতক্ষণ না জলের অংশ নেমে আসছে শতকরা 20 ভাগে। একটা সবল নিরোগ মৌমাছি পরিবার এক বছরে 150 থেকে 250 কিলোগ্রাম মধু সংগ্রহ করতে পারে, যার অর্থ হোল 180 থেকে 350 লিটার জলকে বাষ্পীভূত করতে হবে। এ কাজটা কঠিন নয় আবহাওয়া যদি গরম থাকে। কিন্তু মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা পড়ে যায়, কাজে কাজেই মৌমাছিরা ঘন হয়ে বসে নিজেদের শরীরের উত্তাপ দিয়ে ফুলের মিষ্ট রস জ্বাল দেয়।
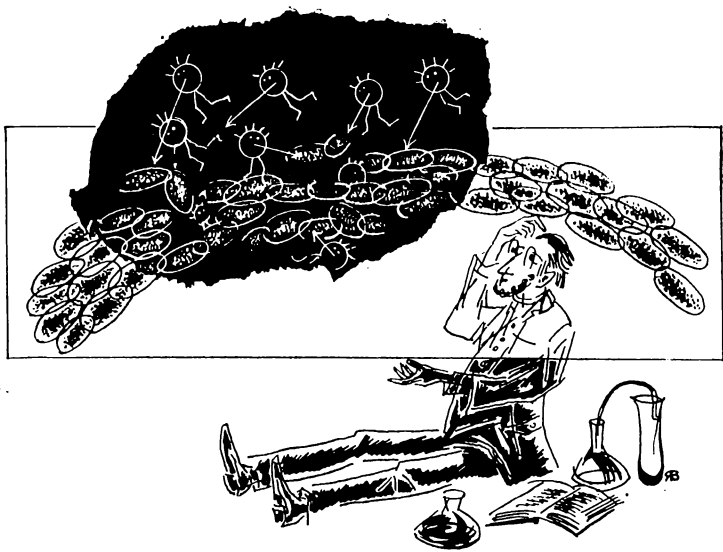
মধু সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে গেলে বিশেষ প্রকোষ্ঠে নিয়ে যাওয়া হয় এবং মোম দিয়ে সেই প্রকোষ্ঠগুলি বন্ধ কর দেওয়া হয়। এইখানেই সেটা থাকবে যতদিন না মৌমাছির দরকার পড়ছে। ঠিকভাবে তৈরি হলে মধুতে গাঁজলা হবে না বা জমে চিনিও হবে না।

আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা জানেন না মধু কেন বছরের পর বছর অবিকৃত থাকে। সাধারণত, যে কোন খাদ্যবস্তু, এমন কি আচার বা টিনের খাবারও নষ্ট হয়ে যায় জীবাণুসংযোগ ঘটলে, যাদের তাড়ানো যায় দীর্ঘকাল ধরে ফুটিয়ে নিলে। শুধু তাই নয়, খাদ্য সংরক্ষণের জন্য টিনের পাত্রগুলির মুখ এমনভাবে বন্ধ করা হয় যাতে জীবাণুর অনুপ্রবেশ না ঘটতে পারে। মৌমাছিরা তাদের মধু সংরক্ষণের জন্য সত্যি সত্যিই তো আর আগুনে ফোঁটায় না। মধুর মধ্যেই আছে কোন পদার্থ যা জীবাণু ধ্বংস করে। প্রাচীনকালে মানুষ এই গুণটির প্রয়োগ করেছিল টোটকা ওষুধে। কারণ তারা জানত যে মধু ব্যবহার করে ঘা সারিয়ে তোলা যায়।

আর একটা কঠিন কাজ হোল চোরের হাত থেকে মধুকে রক্ষা করা, তাই খুবই সঙ্গত যে মৌমাছিরা তাদের এই সম্পদের উপর খুব কড়া নজর রাখে। মৌচাকের প্রবেশ পথের রক্ষীরা একমুহূর্তের জন্যেও ঝিমোয় না। আর

সামান্যতম বিপদের সংকেত পেলেই একঝাঁক প্রতিরক্ষার ফৌজ উড়ে যাবে শত্রুর মোকাবিলা করতে, নিজেদের প্রাণের জন্য বিন্দুমাত্র মায়া না রেখে। ছিড়ে যাওয়া একটা হুল থেকে নির্গত গন্ধ হল যুদ্ধের ইঙ্গিত। এই গন্ধে মৌমাছিরা উন্মাদ হয়ে যায় এবং চাকের ধারে যে কোন প্রাণীই থাকুক তাকে আক্রমণ করবে বিপদের এই ইঙ্গিতে। জঙ্গলের প্রভু বৃহৎবপু ভাল্লুকও পালিয়ে যাবে এই সম্মিলিত আক্রমণে।

মনে হয় যেন এমন কোন শক্তি নেই যা মৌমাছির সামনে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু মধুর লোভ এমনই প্রবল যে কোন কোন বেপরোয়া প্রাণী কপাল ঠুকে চেষ্টা চালিয়ে যায়। চোরেরা দিনরাত্রি সুযোগ খুঁজতে থাকে, তপ্ত বা ঠাণ্ডা সব আবহাওয়াতেই ছল বা বল দরকারমতো ব্যবহার করে। সবচেয়ে ছোট ছোট কীটেরাই হোল সবচেয়ে বদ: তারা সকল বাধাই তুচ্ছ করে।

মানুষ কীট পতঙ্গের সঙ্গে লড়াই করে রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করে। ন্যাপথলিনের গন্ধে পালায় পোশাক কেটে দেয় যে-সব পোকা, তারা, অন্যান্য কীট পতঙ্গ মরে যায় ক্লোরোফস বা অপর কোন কীট নাশক বিষের প্রয়োগে। কিন্তু মৌমাছিরা মানুষের কয়েক হাজার বছর আগে আবিষ্কার করেছিল একটি রাসায়নিক কীটঘ্ন বিষ। প্রকৃতির রাজ্যে আছে কত রকমের বিষাক্ত গাছ, মৌমাছিরা তাদের সন্ধান রাখে, এদের কতকগুলি থেকে তারা মিষ্ট পুষ্পরস সংগ্রহ করে থাকে। বিষাক্ত পুষ্পরস মৌমাছিদের মেরে ফেলতেও পারে (যদিও তারা খুব একটা স্পর্শকাতর নয় বিষে), তবে মধুতে এই বিষের পরিমাণ থাকে খুবই অল্পমাত্রায় সেজন্য তাদের কোন বিপদ ঘটে না। কিন্তু চোরেরা এই মধু খেলে মরবেই মরবে। অর্থাৎ, সময়মতো কীটনাশক প্রয়োগের ফলে মধুটা মৌমাছি পরিবারের জন্যই সুরক্ষিত থাকে।

শিকারী জানোয়ারদের অনেক বেশি কষ্ট নিজেদের জন্যে খাবার সঞ্চয় করে রাখার ব্যাপারে। পিঠ-লাল শ্রাইক (shrike),-এরা চড়াই পাখির থেকে সামান্য বড় — গুবরে পোকা, ছোট গিরগিট বা ব্যাঙ ধরে কাঁটাঝোপের গায়ে গেঁথে রেখে দেয়, রোদে শুকিয়ে নিতে। কেউ সঠিক বলতে পারে না কেন এরা এমন করে থাকে, খাদ্য বাড়তি হয় বলে না কি দুঃসময়ের সঞ্চয়ের জন্য। যদিও ঘরে তৈরি মাংসের শুঁটকি খেতে তত ভাল নয়, তবুও খুব কম প্রাণীই দেখা যায় যারা মাংস সংরক্ষণ করতে পারে।

ইকনিউমন মাছিরা নিজস্ব প্রণালীতে খাদ্য সঞ্চিত করে থাকে। আসলে নিজেদের জন্যে নয়, এদের উদ্বেগ বাচ্চাদের জন্যে। ছোট শূককীটেরা জ্যান্ত খাদ্য খেতে চায় কিন্তু এদের মায়েরা আবার বাচ্চাকে নিজেরা খাওয়াতে চায় না। এরা মনে করে বাচ্চার আহার আর আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে রেখে ব্যক্তিগত ছোঁয়াচ এড়ানোই ভাল।

ছেলেমেয়েদের জন্যে একটা বাড়ি বানানো কঠিন নয়। প্রথমে একটা গভীর সুড়ঙ্গ করে দেওয়া হোল, পরে আবার মা তার মুখটাও দিল বন্ধ করে। খাবারটা টাটকা রাখা যায় কি করে, সুড়ঙ্গে তো আর রেফ্রিজারেটর নেই, তাই সমস্যাটা একটু কঠিন। চিন্তাকুল মা খুঁজে বেড়ায় একটা পছন্দমতো শুঁয়োপোকা বা মাকড়সা বা গুবরে পোকা বা তার শূককীট, দেখা পেলেই সেটাকে কামড়ায়। বাধা দিয়ে কোন লাভ নেই, কেননা শিকারকে একবার বাগে পেলে মাছিটা তার হুল ফুটিয়ে দেয় তার দেহে। ইকনিউমন তখন তার নির্জীব শিকারকে টেনে নিয়ে যায় তার গর্তে, শিকারেরই দেহের উপর একটি বা একাধিক ডিম পাড়ে, গর্তের মুখটা বুজিয়ে দেয় আর বাচ্চাদের বলে, 'আসি, ভাল থেকো' তাদের রেখে যায় নিজের চেষ্টায় বেঁচে বড় হয়ে ওঠার ব্যবস্থাদি সম্পূর্ণ করে রেখে।

শিকার তো রইল গর্তে, যতদিন না ডিম ফুটে শূক হয়ে বেরোয়। সেতো পচে যাবে না, কারণ সে যে সংরক্ষিত জ্যান্ত খাবার। শিকারকে আক্রমণ করার কালে ইকনিউমন তো তাকে কোথায়ও মারে না, কেবল একটা নির্দিষ্ট জায়গা বেছে নেয়। হুলটা শরীর ভেদ করে একটা স্নায়ুগ্রন্থিতে এসে পৌঁছায়। সেখানে কেবল এক ফোঁটা বিষ ঢেলে দেওয়া হয়, হাত পা অবশ করে দিতে। কোন কোন ইকনিউমন মাকড়সা শিকার করে, এরা কিন্তু টারানটুলাদেরও শিকার করে থাকে। এমন ভয়ঙ্কর শত্রুকে আক্রমণ করার কালে নিজেদের বা বাচ্চাদের বাঁচাবার জন্য মাছিটা (কেবল স্ত্রী-মাছিরই আছে এত সাহস) প্রথমে মাকড়সাটাকে চিৎ করে ফেলে, তারপরে তার হুলটা বেঁধায় সেই জায়গায় যেখানকার স্নায়ুগ্রন্থি নির্ধারণ করে মাকড়সাটার বিষাক্ত শুঁড়গুলির নড়াচড়া। এরপরে বিজেতা সময়মতো তার শত্রুর বুকের ওপর হুল বিঁধিয়ে সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত ঘটিয়ে দেয়।

অনেক ইকনিউমন আছে যারা নিজেরা ট্যারানটুলাকে আক্রমণ করতে ভরসা পায় না, কেবল অপেক্ষা করে বন্ধুদের মধ্যে কে কখন এই দুঃসাহসিক কাজটা করছে, তারপরে বীরাঙ্গনা যখন ধীরে সুস্থে একটা সুড়ঙ্গ খুজতে

থাকে তখন চুরি করে এই প্রস্তুতান্ন, অথবা নিজের ডিম দু'একটা তার উপর পেড়ে রাখে।

খাদ্যের পরিমাণ পর্যাপ্ত, কারণ মা ডিম পাড়ে এমন জায়গায় যাতে শূককীট জন্মে খেতে শুরু করে সেই সব দেহাংশ যেগুলি বাদ দিয়েও পোকাটা বেঁচে থাকতে পারে। শিকার বেঁচে থাকে তার দেহের অর্ধেক বা এমনকি চার ভাগের তিনভাগ খাওয়া হয়ে গেলেও।

খাদ্যটা ভারি চমৎকার পদ্ধতিতে সংরক্ষিত থাকে। আমাদের টিনের খাবারের চেয়ে অনকে ভাল আর পুষ্টিকর এই খাদ্য।

গলমিজ (একজাতের উইচিংড়ি) দের শূককীটেরা যে খাদ্য খায় সেটাও কম বিচিত্র নয়। বাবা-মা আর সন্তানদের মধ্যে যে সম্পর্ক তা থেকে বাবা-মার নিঃস্বার্থ ত্যাগের একটা জীবন্ত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মা তার নিজের দেহটাকে দিয়ে দেয় সন্তানদের খাদ্যরূপে।

এই পতঙ্গগুলির জীবনধারা এই রকম। বসন্তকালে ডিম ফুটে শূককীট বেরোয়। এরা পূর্ণবয়স পর্যন্ত বাঁচে না, কিন্তু তথাপি একবার বাচ্চা দিয়ে যায়। শূককীটেরা ডিম পাড়ে না কিন্তু মায়ের শরীরের মধ্যে থেকে বেড়ে ওঠে। এইভাবে আট থেকে তেরটা শিশুকণ্যা জন্মায় এবং তারা মায়ের শরীরের মধ্যে বাস করে তাকে খেতে থাকে। খেয়ে মাকে একেবারে শেষ করে তার ফাঁপা খোলসটা ছেড়ে বাইরে আসে। এরা নিষ্ঠুর বা অকৃতজ্ঞ নয় কেননা এদের শরীরও আবার আশ্রয় দেবে এক ডজন কণ্যাদের এবং সেই মায়েরা কন্যাদের জন্যে নিজেদের বলি দেবে। কেবল শরৎকালে যারা জন্মাবে সেই মা শূককীটেরা নিজেদের কন্যাদের দ্বারা ভক্ষিত হওয়া এড়াতে পারবে। এই প্রজন্মের শূকেরা নিরাপদে মূককীটে পরিণত হবে যার থেকে পূর্ণাঙ্গ গলমিজ (gall-midge) উইচিংড়ি বেরিয়ে আসবে। পূর্ণবয়স্ক উইচিংড়িরা বসন্তকালে ডিম পাড়বে এবং এই প্রথায় চলতে থাকবে তাদের জীবনধারা।

প্রাকৃতিক স্বাস্থ্যভাণ্ডার

বড় শহরের রাস্তা ধরে বেড়াতে বেড়াতে তোমাদের চোখে পড়বে কতকগুলি মনিহারী দোকান যারা রাখে শিশুখাদ্য বা বিশেষ পদ্ধতিতে প্রস্তুত খাদ্য, কারণ শিশু বা রোগীদের পাকস্থলী এত দুর্বল যে বয়স্ক

লোকে যে খাদ্য সচরাচর খেয়ে থাকে সেটা তারা পরিপাক করতে পারে না। এই কারণেই নানা প্রকারের দুধের পুডিং, কুরিয়ে নেওয়া সবজী বা বিশেষভাবে সিদ্ধ করা মাংস রাধতে হয়। প্রাণীরাও ঠিক তাই করে থাকে।

ধরো আমাদের চড়াই পাখিদের কথা — এরা তো শস্য খেয়ে থাকে, কিন্তু বাচ্চাদের খাওয়াবার কালে এরা বিরক্তিতে নাকমুখ কোঁচকাবে তথাপি খুঁজে নিয়ে আসবে ছোট ছোট পোকা, উইচিংড়ি বা অন্য কীট — বাচ্চাদের জন্য।

কেবল এমন যদি হোত যে শিশুদের পাকস্থলী যে কোন ধরনের খাদ্য হজম করতে পারে না প্রকৃতি তাহলে রাস্তা একটা বের করতই। নেকড়ের ছানাদের পাকস্থলীতে যেমন মাংস হজম করবার এণজাইম নেই বলে তাদের বাবা-মা চিন্তিত হয় না। ধাড়ি নেকড়েরা শিকারকে গিলে ফেলবার পরে যখন সেটা যথেষ্ট পরিপাক হয়ে যায়, তখন তা উগরে বের করে। এই অর্ধভুক্ত মাংস আর তার সঙ্গে মিশে থাকা জারক-রস তারা খেতে দেয় বাচ্চাদের। এর মানে বাচ্চারা যে শুধু খাদ্যই পেল তা নয় তারা সেই সঙ্গে পরিপাকের জন্য প্রয়োজনীয় জারক-রসও পেয়ে গেল। এই পদ্ধতি হয়ত অন্য প্রাণীরাও ব্যবহার করতে পারত কিন্তু সমস্যার সমাধান তাতে হোত না। বয়স্করা যে খাদ্য খায় তাতে হয়ত বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় কোন কোন উপাদানের ঘাটতি থাকতে পারে এবং ঠিক এই কারণে প্রত্যেক প্রাণী নিজের নিজের বাচ্চার জন্যে আলাদা আলাদা বেবী-ফুড ব্যবহার করে।

শিশুখাদ্যকে অনেকগুলি চাহিদা মেটাতে হবে। এতে থাকবে স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্যে প্রয়োজনীয় সবগুলি উপাদান, আবার ছোট পাকস্থলীতে সেইখাদ্য হজমও হওয়া চাই। তাছাড়া পর্যাপ্ত পরিমাণে সেই খাদ্য পাওয়া চাই, সরবরাহ হওয়া চাই নিয়মিত। প্রকৃতি, যাঁর উদ্ভাবনের শেষ নেই, তাঁর পক্ষেও কাজটা মোটেই সহজসাধ্য নয়।

শেষপর্যন্ত সমস্যাটার সমাধান হয়েছে, কিন্তু এই উদ্দেশ্যে বাবা-মার শরীরে খাদ্যের ভাণ্ডার রাখতে হয়েছে, অর্থাৎ সোজাসুজি বলতে গেলে দুগ্ধ-গ্রন্থি রাখা হয়েছে। এইভাবে পৃথিবীতে স্তন্যপায়ীদের আবির্ভাব ঘটল। ঘটনাটা একটা সুদূরপ্রসারী বিপ্লব। বাচ্চাকে দুধ খাওয়াবার ক্ষমতা, যেটা স্তন্যপায়ীদের বহুদূরের পূর্বপুরুষদের থেকে শুরু হয়েছিল, আর তারই ফলশ্রুতি জরায়ুজ প্রজনন, প্রাণীদের পরবর্তী বিবর্তনের ধারা বদলে দিয়েছে এই পৃথিবীতে। এর ফলে জীবিত সন্তানের সংখ্যার হার

অনেক বেড়ে গেল, সুতরাং প্রাণীদের সন্তান জন্মাবার সংখ্যা অনেক কমানো সম্ভব হোল। বাচ্চারা সকল প্রকারের আবহাওয়ার পরিবর্তনের থেকে রক্ষা পেতে থাকল। ঠাণ্ডা বা খরা, মুষলধারায় বর্ষা বা পশুখাদ্যের অভাব স্তন্যপায়ীর বাচ্চার কাছে এখন আর ভয়ের ব্যাপার নয়। যতক্ষণ মায়ের শরীরে একফোঁটা চর্বি থাকবে দুধের কারখানার কাজ চলবে পুরোদমে। কোন কোন স্তন্যপায়ী প্রাণীর স্ত্রী-পশুরা বাচ্চাকে বড় করে তোলার কালে আদৌ খায় না। ইওরাপীয় বাদামী ভাল্লুকেরা যেমন শীতকালে বাচ্চার জন্ম দেয় যে সময় স্ত্রী-ভাল্লুক বহুকাল পর্যন্ত বাসা ছেড়ে বাইরে বেরোতেই পারে না।

মাছ বা উভচর প্রাণীদের বেলায় আবার ভিন্ন ব্যবস্থা। বাবা-মা হয়ত শক্তি ও সহনশীলতায় ওলিম্পীক চ্যামপিয়ন আর ধী-শক্তিতে হতে পারে প্রফেসর তবুও তাদের বাচ্চারা হয়ত ডিম থেকে ফুটতে না ফুটতে মরে গেল। এর থেকেই বুঝতে পারবে যে নিম্নস্তরের প্রাণীদের মধ্যে বিবর্তন কেন চলতে থাকে এত মন্থর গতিতে। পরিবারভুক্তভাবে বাস করতে অভ্যস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্তন্যপায়ীদের বিবর্তন ভিন্ন দিকে মোড় নিল।

সকল প্রাণীর মধ্যে বিশেষত তারাই টিঁকে যায় যাদের দাঁতগুলি বড় আর যারা জোরে ছুটতে পারে। কিন্তু স্তন্যপায়ীদের বেলায় বুদ্ধি, অর্থাৎ মস্তিষ্কের ভূমিকাটাই বড়। বাবা-মা কেবল যে সন্তানদের পালন-পোষণ করে তাই নয়, তারা তাদের খাদ্য সন্ধান করতে বা শত্রুর হাত থেকে বাঁচতে শেখায়। তারা সন্তানদের কাছে পেঁৗছে দেয় যা তাদের নিজেদের বাবা-মার কাছে শিখেছে এবং তারপরে নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে যা জেনেছে। এর ফলে স্তন্যপায়ীদের মধ্যে সম্ভব হয়ছে অভিজ্ঞতার সঞ্চয় এবং তা এক পুরুষ থেকে উত্তর পুরুষে অর্পণ অতএব এটা স্বাভাবিক যে দক্ষ এবং চতুর শিক্ষার্থীরা দীর্ঘকাল টিঁকে থাকবে। এই কারণে মস্তিষ্কের বিকাশের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি।

অন্য প্রাণীর ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের বিকাশ তত দ্রুত হয়নি যেমন হয়েছে স্তন্যপায়ীদের বেলায়। এটাই তাদের দিয়েছে একটা চূড়ান্ত সুবিধা আর সব প্রাণীকে ছাড়িয়ে। যা থেকে সম্ভব হয়েছে পর্যায়ক্রমে উন্নতি এবং পরিণামে এই পৃথিবীতে আবির্ভাব ঘটেছে প্রাণীদের মধ্যে সর্বোচ্চ জীবের — মানুষের। এ কথা অত্যুক্তি নয় যে মানবজাতির পৃথিবীতে অবির্ভাবের মূলে আছে দুগ্ধ।

শরীরে দুগ্ধ সঞ্চয়ের বিবর্তনের ইতিহাস সঠিক বলা কঠিন। কেউও বলতে পারে না জরায়ুজ প্রজনন থেকেই দুগ্ধ ক্ষরণের প্রয়োজনীয়তাটা এসেছিল (কেননা ছোট ছোট বাচ্চাদের উপযোগী খাদ্য দিতেই হবে) নাকি বিপরীত দিক থেকে, অর্থাৎ দুগ্ধ সঞ্চয় থেকেই প্রেরণা পেয়ে জরায়ুজ প্রজনন সম্ভব হয়েছে। মনে হয়, দুগ্ধ সঞ্চয় এসেছে আগে। এমনকি বর্তমান যুগেও কিছু কিছু স্তন্যপায়ী আছে যারা ডিম পাড়ে যেমন ডাক্‌বিল আর গায়ে কাঁটাওয়ালা পিপিলীকাভুক। এরা ডিম পাড়ে কিন্তু বাচ্চাদের দুধ পান করায় অন্য যে কোন আত্মসম্মানযুক্ত স্তন্যপায়ীর মতোই।

দুগ্ধগ্রন্থির উদ্ভবের ব্যাপারে কিন্তু অনেক বেশি খবর জানা গেছে। খুব সম্ভব ঘর্মগ্রন্থি পরিবর্তিত হয়েই এদের সৃষ্টি করেছে। আজকের যুগের স্তন্যপায়ীদের পূর্বপুরুষদের অনেক বেশি সংখ্যায় দুগ্ধগ্রন্থি ছিল যেগুলির মুখ খুলত বাইরের দিকে কিন্তু কোন বৃন্ত ছিল না। ডাক্‌বিল-এর আছে অন্তত দু'শটি ছোট ছোট গ্রন্থি, যাদের দুগ্ধবাহী নলগুলির মুখ খোলা তলপেটের ত্বকের এক বিশেষ অংশে যার নাম দুগ্ধগ্রন্থি অঞ্চল। ডাক্‌বিল বিজ্ঞানীদের কাছে প্রমাণিত দৃষ্টান্ত যে দুগ্ধগ্রন্থি আসলে বিবর্তিত ঘর্মগ্রন্থি। এই প্রাণীটার সারা শরীরে ছড়িয়ে আছে স্বেদ আর মেদগ্রন্থি যাদের নলগুলির মুখ খোলে লোমের আবরণের খুব কাছে। কেবল দুগ্ধগ্রন্থি অঞ্চলে এই স্বেদগ্রন্থি চর্বিগ্রন্থি আর লোমের আবরণের জট-এর মধ্যে থেকে প্রথমটি পরিবর্তিত হয়েছে দুগ্ধগ্রন্থিতে। গ্রন্থি থেকে দুধ গড়িয়ে আসে বিশেষ 'দুগ্ধলোম' দিয়ে আর বাচ্চারা সেটা চেটে নেয়।

উচ্চতর প্রাণীদের ক্ষেত্রে আলাদা গ্রন্থিগুলি এক সঙ্গে গ্রথিত হয়ে থাকে এবং অনেকগুলি দুগ্ধবহানল একত্রিত হয়ে এক বা একাধিক দুগ্ধবহানলে বিবর্তিত হয়েছে।

দুগ্ধগ্রন্থি আকারে বেশ বড় হতে পারে। মনে করে দেখ ডেয়ারির গরুদের পালান কত বড়। তবুও, মানুষের দ্বারা হাজার হাজার বছর ধরে বিশেষ যত্নে ও পালনে-পোষনে সৃষ্ট ডেয়ারির প্রাণীও কিন্তু এই ব্যাপারে রেকর্ডের অধিকারী নয়। সাধারণ ছোট ইঁদুরের শরীরের ওজনের শতকরা সাতভাগ এই দুগ্ধগ্রন্থির ওজন; আর দুধে পূর্ণ থাকলে সেটা ইঁদুরের শরীরের ওজনের শতকরা বিশভাগ হতে পারে। এর থেকে মনে হতে পারে দুধের জন্য গরু পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া ভুল হয়েছিল। বিজ্ঞানীরা প্রকৃতই সাদা ইঁদুরের দুধ দোহার জন্যে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি তৈরি করেছেন এবং

বড় বড় ইঁদুর পালন কেন্দ্রে যদি যাও তো সেখানে ইচ্ছে হলে সাদা ইঁদুরের দুধ চেখে আসতে পারবে।

কোন কোন উচ্চতর প্রাণীর পূর্ণগঠিত দুগ্ধগ্রন্থির সঙ্গে আছে বিশেষ পেশীযন্ত্র, পেশীত্বক জাতীয় কোষ দিয়ে তৈরি। ক্যাঙারু আর সমগোষ্ঠীর অঙ্কগর্ভ প্রাণীরা জন্মায় তাদের গঠন সম্পূর্ণ হবার অনেক আগে। কোনরকমে তারা দুগ্ধগ্রন্থির সন্নিহিত থলিতে ঢুকে একটি বৃন্তে মুখ দিয়ে জীবনের প্রথম দু'এক মাস সেখানে বাস করে। দুধ তাদের মুখের মধ্যে জোর করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় ত্বকের নীচের পেশীর কুঞ্চনের সাহায্যে।

একই উপায়ে তিমি আর অন্য জলজীবী স্তন্যপায়ীরা তাদের বাচ্চার মুখের মধ্যে দুধ ঢেলে দেয়। এদের বাচ্চারা যদিও আকারে বড় আর তাদের গায়ে জোরও আছে তথাপি জলের নীচে টেনে টেনে দুধ খাওয়া সহজ নয় তাই মায়েদের সাহায্য করতেই হয়।

দুগ্ধগ্রন্থির যান্ত্রিক পদ্ধতিটা অন্য সব রেচনযন্ত্রের সঙ্গে তুল্য। বৃক্ক, লালা, স্বেদ বা দুগ্ধগ্রন্থির নলগুলির ভিতরের গাত্রে প্রথমে সামান্য তরল পদার্থ দেখা দেয় — এই তরল যে কোন কোষের অন্তঃপাতী স্থানের তরলপদার্থের অনুরূপ, সামান্য সোডিয়াম মেশানো জল। সোডিয়ামটা আবার শুষে নেওয়া যেতে পারে যেমন হয় বৃক্কের ক্ষেত্রে, অথবা অভিশ্রবন প্রক্রিয়ায় স্থানান্তর ঘটতে পারে অন্য পদার্থের সঙ্গে যেমন প্রোটিন, শর্করা বা অন্য কোন মৌলের সঙ্গে যেমন পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম বা ম্যাঙ্গানিজ যেটা হয় দুগ্ধগ্রন্থির ক্ষেত্রে।

সকল প্রাণীর দুগ্ধে থাকে প্রোটিন, চর্বি, ল্যাকটোজ (বিশেষ একটি শর্করা যা কেবল দুধেই থাকে), ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, ক্লোরিন, পটাশিয়াম, আরো অনেক খনিজ, ভাইটামিন আর হরমোন। অন্য কথায় এতে থাকে বর্ধমান একটি প্রাণীদেহের যা যা প্রয়োজন তার সবই। এই পদার্থগুলি সবই পাওয়া যায় যে কোন দুধে, কেবল অনুপাতের তারতম্য থাকে। যে-সব প্রাণীর শাবকেরা খুব তাড়া তাড়ি বেড়ে উঠে তাদের দুধ প্রোটিন ও চর্বিতে বিশেষ সমৃদ্ধ। সব চেয়ে বেশি (53%) চর্বি আছে সীল আর ধূসর তিমিদের দুধে। এই কারণে তিমিশিশুর ওজন বাড়ে একশ কিলোগ্রাম করে। খরগোসের দুধে আছে 25% চর্বি। খরগোসের মা এর সুযোগটা নেয়, বাচ্চাদের সপ্তাহে দু'তিন বারের বেশি খাওয়ায় না। এই সব প্রাণীর দুধের তুলনায় মানুষ-মায়ের বা গাভীর দুধ চর্বিমুক্ত বলা যেতে পারে, চর্বির

পরিমাণ শতকরা ছয়ভাগের বেশি নয়। তবে মানুষ-মায়ের দুধ সব চেয়ে মিষ্টি। এতে আছে শতকরা সাতভাগ ল্যাকটোজ। এই দিক দিয়ে বিচার করলে কেবল ঘোড়া-মায়ের দুধই তুলনীয়।

কতদিন দুধ থাকবে সেটার স্থিরতা নেই, তবে সাধারণত গর্ভের কাল যত দীর্ঘ হবে দুধও থাকবে তত দীর্ঘদিন। তবে এই নিয়মটার ব্যতিক্রম আছে অনেক। স্ত্রী-ডাক্‌বিল ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা আনে 13 থেকে 14 দিনে কিন্তু বাচ্চাদের দুধ খাওয়ায় তিন চার মাস পর্যন্ত। অংকগর্ভ প্রাণীদের বেলায়ও সময়টা ওই রকম। গর্ভ মাত্র কয়েকদিনের, কিন্তু দুগ্ধপান চলে কয়েক মাস। গিনিপিগদের ক্ষেত্রে নিয়মটা উল্‌টো, গর্ভবাস দু'মাসের, স্তন্যপান মাত্র 10 থেকে 12 দিন। সীলদের ক্ষেত্রে এই প্রভেদটা আরো অনেক বেশি — গর্ভবাস 275 দিনের কিন্তু স্তন্যপান মাত্র 14 থেকে 17 দিনের।

অনেক প্রাণীর ক্ষেত্রে দুগ্ধক্ষরণের কালটাকে বাড়ানো যায়, এবং এই তথ্যটা ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো হয় পশুপালনের ক্ষেত্রে। সকলেই জানে যে জংলী গরুদের দুগ্ধক্ষরণ হয় অনেক কম দিনের জন্যে, তাদের গৃহপালিত ভগিনীদের সঙ্গে তুলনা করলে।

দীর্ঘস্থায়ী দুগ্ধক্ষরণের বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় মানুষের ক্ষেত্রে। পলিনেশিয়ার কোন কোন অঞ্চলে বাচ্চার ছয় বছর বয়স পর্যন্ত মায়েরা দুধপান করায়। এসকিমো স্ত্রীলোকেরা আরো দীর্ঘকাল, কোন কোন ক্ষেত্রে শিশুরা পনের বছর বয়স হওয়া পর্যন্ত। দীর্ঘকাল দুগ্ধক্ষরণ যে বিশেষ কয়েকটি জাতির বৈশিষ্ট্য তা নয়। মুসলমান দেশে ক্রীতদাস স্ত্রীলোকদের রাখা হোত হারেমে, যারা বছরের পর বছর প্রভু পত্নীদের অসংখ্য বাচ্চাদের দুধ-মায়ের ভূমিকায় নিযুক্ত হোত — এরা তো ছিল নানা জাতের মানুষ।

উচ্চতর স্তন্যপায়ীদের প্রত্যেক জাতির আছে নির্দিষ্ট সংখ্যায় দুগ্ধগ্রন্থি। প্রকৃতি মানুষকে দিয়েছেন দুটি, তবে সময় সময় দু একটা বাড়তিও থাকতে পারে যেগুলির সাধারণত পূর্ণ বিকাশ হয় না। কোন কোন জাতির ক্ষেত্রে এই বাড়তি দুগ্ধগ্রন্থি বেশি দেখা যায়। জাপানী স্ত্রী লোকদের প্রত্যেক চারজন থেকে পাঁচজনের মধ্যে এই বাড়তি গ্রন্থি আছে বলে জানা গেছে।

প্রাচীন কালের মানুষও জানত যে বাড়তি দুগ্ধগ্রন্থি থাকা সম্ভব। সেই কারণে ফ্রীজিয়ান-এরা উপাসনা করত দেবতা এবং পৃথিবীর সকল জীবিত প্রাণীর মা, মহতী মাতৃদেবী রীয়া সিবেলির যিনি ছিলেন উর্বরতার মূর্ত প্রতীক, সাতটি স্তন বিশিষ্ট্য যুবতী মাতৃরূপ।
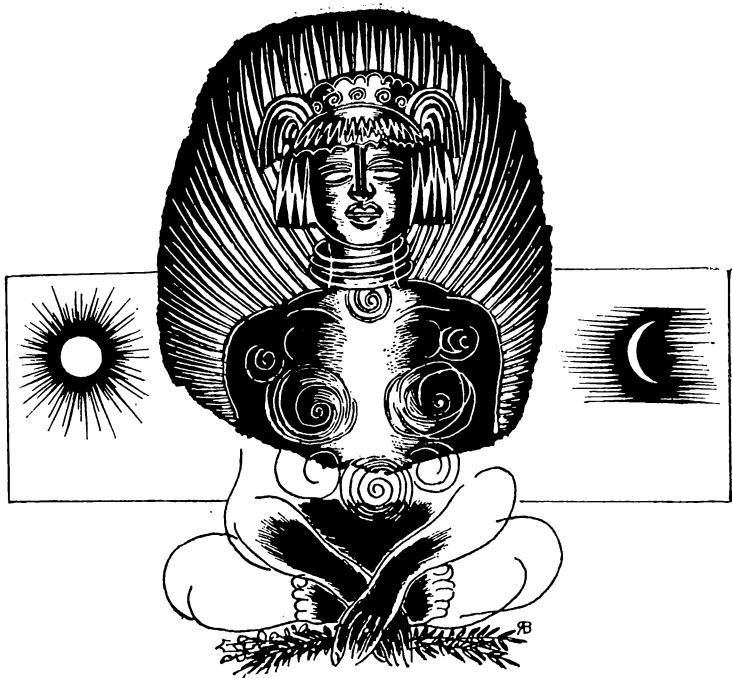
প্রসঙ্গত, এই আজকের যুগেও প্রত্যেক স্ত্রীলোকই অংশত এক একটি সিবেলি। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন স্ত্রীলোকদের গলার ভিতরে কতকগুলি বড় বড় গ্রন্থি আছে যেগুলি গর্ভবতীদের ক্ষেত্রে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং প্রচুর পরিমাণে রসস্থ হয়। বগলের নিচেও অনুরূপ গ্রন্থি আছে। এই গ্রন্থিগুলিতে যে রস জমা হয় গর্ভাবস্থায়, প্রসবের পরেও, সেটা দেখতে দুধেরই মত এবং এতে আছে অণু পরিমাপের কণিকা যা এই সময়ে প্রধান দুগ্ধগ্রন্থি দুটিতে যে কোলোস্ট্রাম কণা জমা হয় তার থেকে অভিন্ন।

দুগ্ধগ্রন্থির কাজ শুরু হওয়া বা গঠনের পূর্ণ বিকাশ গর্ভ ও প্রসবের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে মেয়েদের স্তনের আকৃতি প্রথম গর্ভের বহুপূর্বেই লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন প্রাকৃতিক নির্বাচনের দ্বারাই এটা সম্ভব হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে আমাদের দূরসম্পর্কের প্রাচীন পূর্বপুরুষ লেজহীন বানরেরাও ছিল নান্দনিক। স্ত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সুঠাম দেহসৌষ্ঠব

ধারিণীরাই ছিল তাদের পছন্দ। বস্তুত সেই প্রাচীন কাল থেকেই চ্যাপ্টাবুক মেয়েদের বিয়ে হওয়া কঠিন ছিল পীন-পয়োধরা সুন্দরীদের সঙ্গে তুলনায়। এই বৈশিষ্ট্যটা যুগ যুগ ধরে মানুষের ধারনায় স্ত্রী-সৌন্দর্যের একটা নিয়ামক হয়ে মানুষের পছন্দকে গড়ে তুলেছে।

স্ত্রীলোকের দুগ্ধগ্রন্থি গর্ভসঞ্চারের অনেক আগে থেকেই কাজ শুরু করতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় যে সদ্যপ্রসূত শিশুর দুগ্ধগ্রন্থি সামান্য ফুলে উঠেছে এবং তাতে জমা হয়েছে 'ডাইনির দুধ'। এটার কারণ ব্যাখ্যা করতে বলা হয়ে থাকে যে ভূমিষ্ঠ হবার আগে যেসব হরমোন মায়ের দুগ্ধসঞ্চার উজ্জীবিত করবার জন্য নিঃসৃত হোত, মায়ের রক্ত শিশুর শরীরে প্রবেশ করার দরুণ তারা শিশুর ক্ষেত্রেও এটা ঘটায়।

কেবল যে স্ত্রীলোকেরই দুগ্ধগ্রন্থি আছে তা নয়। সকল পুরুষই এই গ্রন্থির অধিকারী তবে কেন যে তাদের এই গ্রন্থি থাকে সেটা বোঝা যায় না, কেননা এমন অকেজো দেহযন্ত্র আর নেই। প্রবাদ আছে যে যত চেষ্টাই তুমি করো ষাঁড়ের দুধ বের করতে তুমি পারবে না। প্রবাদটা তো আর মিথ্যে নয়। প্রকৃতপক্ষে, পুরুষের দুগ্ধগ্রন্থি, যতই অকেজো হোক লক্ষ লক্ষ বছর ধরে রয়েছে।

কিন্তু খুব জোর দিয়ে যদি কেউ বলে যে পুরুষের দুগ্ধগ্রন্থি কোন কাজই করতে পারে না, তবে সেটা ভুল বলা হবে। যদিও অনেক পুরুষ স্তন্যপায়ীর দুগ্ধগ্রন্থির সম্পূর্ণ বিকাশ হয় না, দেখা যায় জীবনের কোন কোন সময়ে তাদের বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যায়, এমনকি দুগ্ধসঞ্চারের ক্ষমতার লক্ষণও। শুধু তাই নয়, প্রজননের ঋতুতে কয়েকটি প্রাণীর স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই দুগ্ধগ্রন্থির সমান বৃদ্ধি দেখা যায় এবং উভয়েরই ক্ষেত্রে দুগ্ধসঞ্চারও ঘটে।

দুগ্ধগ্রন্থির কার্যকর পরিবর্তন পুরুষ ডাক্‌বিল এবং তাদের সমগোষ্ঠীর প্রাণীদের ক্ষেত্রে দেখা যায়। লক্ষণীয় এই যে পুরুষ ডাক্‌বিল-এর দুধটা নষ্টই হয় কারণ পুরুষেরা বাচ্চাদের দুধ পান করায় না।

অপুষ্ট অবস্থায় দুগ্ধগ্রন্থির বিকাশ স্ত্রী বা পুরুষের ক্ষেত্রে সমানভাবেই হয় কতকগুলি স্তন্যপায়ী প্রাণীর ক্ষেত্রে। সুতরাং পুরুষের দুগ্ধগ্রন্থিকে সুষ্ঠুভাবে সক্রিয় করে তোলা সম্ভব অন্তঃস্রাবী-গ্রন্থিজ চিকিৎসার সাহায্যে। চিকিৎসা বিষয়ক পত্র-পত্রিকায় উল্লেখ পাওয়া যায় সেই সব দৃষ্টান্তের যেখানে অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিতন্ত্রের কোন রোগগ্রস্ত যন্ত্রের কারণে পুরুষের দুগ্ধগ্রন্থিকে সক্রিয় করে তুলেছে। আরো আছে, সম্পূর্ণ সুস্থ পুরুষদের

দুগ্ধক্ষরণ ঘটানো সম্ভব হয়েছে স্তনবৃন্ত চোষার ফলে। তাহলে দেখা যাচ্ছে ষাঁড়ের থেকে দুধ পাওয়া একেবারেই অসম্ভব নয়। সকলেই জানে যে মাছ, ব্যাঙ বা সাপেরা, পাখিদের কথা নাই বা তুললাম, দুধ তৈরি করতে পারে না। 'পাখির দুধ' কথাটাতে আমরা বুঝি কোন কিছু যা সম্পূর্ণ অসম্ভব, অবাস্তব, যার সঙ্গে তুলনায় অন্য সবকিছুই সম্ভব। এই যে ধারণা, এটাতো আর বিনা কারণে গড়ে উঠে নি? এই কারণে তুমি যদি কোন বন্ধুর জন্যে কিছু করতে চাও, জোর দিয়ে সেটা বোঝাতে গিয়ে তুমি হয়ত বলবে যে সে তোমার কাছে যে কোন জিনিষ চাইলে তুমি তা এনে দিবে কেবল পাখির দুধ ছাড়া।

সত্যিই, পৃথিবীতে স্তন্যপায়ীদের আবির্ভাবের আগে থেকেই প্রকৃতি চেষ্টা করেছেন অন্যান্য প্রাণীর বাচ্চার জন্য মায়ের দুধের ব্যবস্থা করতে। এই চেষ্টাগুলি ছিল অসংখ্য। কোন কোন রক্ত-চোষা মাছির শূককীটেরা যেমন ডিম ফুটে বেরোয় মায়ের শরীরের মধ্যেই, গর্ভকোঠরের মতো একটা জায়গায়, তাদের খাওয়ানো হয় বিশেষ গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রস যাতে আছে প্রোটিন, চর্বি এবং অন্যান্য সব পৌষ্টিক পদার্থ: এমনি ভাবেই চলে যতদিন না শূকগুলি মূককীটে রূপান্তরিত হচ্ছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে অতি সাধারণ একজাতের মৌমাছি আছে যাদের চোয়ালের নীচে আছে বিশেষ 'দুগ্ধ গ্রন্থি'। এই গ্রন্থিগুলি কেবলমাত্র কর্মী মৌমাছিদের ক্ষেত্রেই পুষ্ট হয়। এদের জন্মের চতুর্থ থেকে অষ্টম দিন পর্যন্ত এই গ্রন্থি নিবিড়ভাবে ক্রিয়াশীল হয় যে সময় সেই মৌমাছি তার বিরাট পরিবারের দুধ-মা হয়ে কাজ করে।

মৌমাছির দুধ এতই পুষ্টিকর যে এটা খেয়ে রাণীমৌমাছি প্রতিদিন প্রায় দুহাজার ডিম পাড়তে পারে। একদিনের শাবকদের দেহের ওজন তাদের সৃষ্টিকর্ত্রীর ওজনের থেকে বেশি হতে পারে কিন্তু তাই বলে মা সে জন্য একটুও রোগা হয়ে যায় না। একটা মুরগী যদি মৌমাছির সঙ্গে ডিম পাড়ার প্রতিযোগিতায় নামে তাহলে তাকে রোজ পঞ্চাশটা ডিম পাড়তে হবে। তাহলে দেখছ মৌমাছির দুধ ভারি চমৎকার খাদ্য।

উইপোকা আর পিঁপড়েরা তাদের শূককীটদের, এমনকি তাদের ডি-মদেরও খাওয়ায় নিজেদের লালা। একথা ভেবে ঘাবড়ে যেওনা যে ডিমদের মুখ বা পেট কিছুই নেই যেমন আছে প্রাণীদের। দুধ-মা শুধু ডিমগুলির চারিধারে চাটে। লালার মধ্যে পুষ্টিকর পদার্থ থাকে যেটা ডিমের উপরের

আবরণ ভেদ করে ভিতরে ঢোকে। তোমার চোখের সামনে ডিমগুলিকে বড় হতে দেখবে, আসল সাইজের তিন-চার গুণ পর্যন্ত।

মাছেদেরও আছে যন্ত্রচালিত ক্যানটিন। আমাদের নদীর চাকতি আকারের মাছ, দেখতে ঠিক প্যানকেক-এর মতো গোল, এরা বাচ্চাদের খাওয়ায় নিজেদের শরীরস্থ হলদেটে শ্লেষ্মা। ডিম থেকে ফুটে বেরিয়ে বাচ্চারা থাকে জলজ গাছের একটা পাতার উপর, কিন্তু খিদে পেলেই তারা তাদের মাকে যে তাদের কাছাকাছি থেকে তাদের উপর নজর রাখে, আক্রমণ করে মায়ের গায়ে যেটুকু শ্লেষ্মা লেগে থাকে তার সবটাই বাচ্চারা চেটেপুটে খেয়ে নেয়। খিদে মিটলে তারা আর পাতার উপর ফিরে যায় না, মায়ের পিঠে, পাঁজরে ঝাঁকে ঝাঁকে লেগে থাকে বাকি শ্লেষ্মাটুকুর সঙ্গে নিজেদের সেঁটে রাখে, এইভাবেই মায়ের পিঠে চড়ে তারা বেড়ায়। বাচ্চাদের যখন এর পরে খাওয়াতে হবে স্ত্রী তখন ডাকে পুরুষ মাছকে এবং ক্ষুধার্ত বাচ্চাদের ঝাঁকুনি দিয়ে ফেলে দেয় বাবার পিঠে। এইভাবে বিচক্ষণ বাবা-মা তাদের অসংখ্য ছানা পোনাদের পালাক্রমে খাওয়ায়। বাচ্চারা নিজেরা খাবার খুঁজে খেতে অনেকদিন লেগে যায়।

প্রায় সবজাতের পাখিই অত্যন্ত যত্নশীল বাবা-মা, তাই এটা দুঃখের কথা যে এদের দুধ নেই। তবে, শুনতে আশ্চর্য লাগলেও, পাখির দুধ সত্যি সত্যিই আছে। এই দুধ তৈরি করতে পারে কেবল পায়রারা। তাদের দুধ এক প্রকার সাদাটে তরল পদার্থ, গলার ভিতরে তৈরি হয়, সেখানকার দেয়ালের কোষগুলির পুনর্বিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে।

এই দুধ, সাধারণত ভিজে শস্যের সঙ্গে মেশানো অবস্থায় বাচ্চাদের খাওয়ানো হয়। পায়রার বাবা-মা দুজনেই দুধ তৈরি করতে পারে তাই দুজনেই বাচ্চাদের খাওয়াতে পারে। পায়রার দুধের আর একটা বৈশিষ্ট্য হোল এই যে দেখতে এটা ঠিক স্তন্যপায়ীদের দুধেরই মতো। উভয়ের ক্ষেত্রেই এই দুধের উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত হয় পিটুইটারি গ্রন্থির সামনের অংশ থেকে নিঃসৃত একটি হরমোনের দ্বারা যার নাম প্রোলাকটিন।

O_2
O_2
O_2
O_2
O_2
O_2
O_2
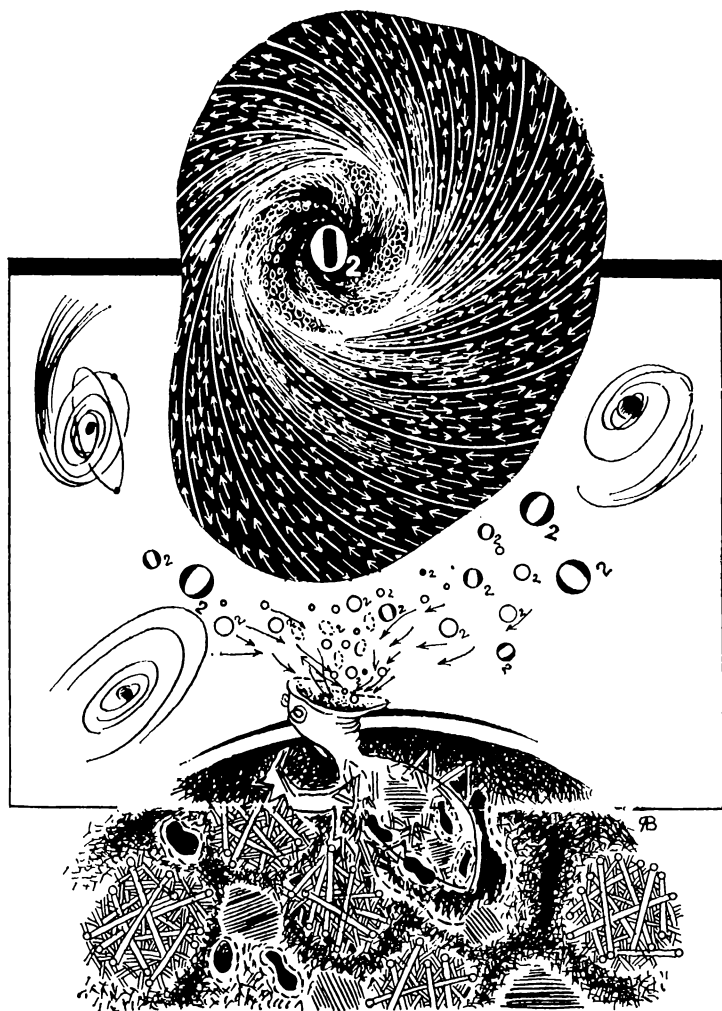
শক্তির প্রয়োজন হয় নতুন অণু তৈরি করতে হলে এবং ভবিষ্যতে নতুন কোষের সৃষ্টি করতে হলে। দেহযন্ত্র বা কলাসমষ্টির নিজের নিজের কাজ করতেও শক্তির দরকার। প্রাণীরা যে শক্তি ব্যয় করে তার সবটা আসে প্রোটিন বা চর্বি বা শ্বেতসারের সঙ্গে অকসিজেনের জারণের ফলে অর্থাৎ এই পদার্থগুলির দহনের ফলে।

অকসিজেন ছাড়া জারণ ঘটতে পারে না। শ্বাসযন্ত্রের কাজ হোল অকসিজেন জোগানো। মানুষের ক্ষেত্রে এই কাজ করে থাকে ফুস্‌ফুস্‌। তবে শ্বাস-প্রশ্বাস কথাটাকে বুকের তালে তালে উঠা-নামার দরুণ ফুস্‌ফুসে বাতাসের প্রবেশ বা নিষ্ক্রমণের ব্যাপারটার মধ্যে সীমিত রাখা ঠিক হবে না। আসল শ্বাস-প্রশ্বাস কার্য এটা নয়, এটা কেবল শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য প্রয়োজনীয় অকসিজেনের পরিবহনকেই বোঝায়।

শ্বাস-প্রশ্বাস মূলত জারণের ব্যাপার, দহনের সঙ্গে যার সম্পর্ক সামান্যই, অন্তত তাই দিয়ে প্রক্রিয়াটাকে নির্দেশ করা যায় না। সাধারণ দহনের ক্ষেত্রে অকসিজেন সরাসরি যুক্ত হয় সেই পদার্থে যেটির জারণ ঘটছে। কিন্তু জীবদেহের জারণের কালে প্রোটিন, চর্বি বা শ্বেতসার থেকে প্রথমে হাইড্রোজেন বেরিয়ে আসে। এই হাইড্রোজেন তার পরে অকসিজেনকে বিজারিত করে জলে পরিণত হয়। দেহকলার শ্বাস-প্রশ্বাসের এই প্রক্রিয়াটির কথা মনে রেখো, কারণ এর পরে আমরা এই প্রসঙ্গে আবার আসব।

শক্তি উৎপাদনের একটা প্রধান উপায় হোল জারণ। এই কারণে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সৌরজগতের গ্রহগুলির পর্যবেক্ষণের কালে উদ্বেগের সঙ্গে সন্ধান করেন সেখানে অকসিজেন আর জল আছে কিনা, কারণ এই দুটি পদার্থ যেখানে থাকে প্রাণ সেখানে থাকা সম্ভব। তাই সোভিয়েট অন্তর্গ্রহ স্টেশন 'ভিনাস-4' যখন ভিনাস-পৃষ্ঠে আলতোভাবে নামতে সক্ষম হোল তখনকার হর্ষকে দমিয়ে দিল যে খবর সেটা এই যে, ভিনাসের আবহপরিমন্ডলে মুক্ত অকসিজেনের পরিমাণ নগন্য আর ভিনাসের উপরিতলের উত্তাপ 300°C।

তাই বলে খুব বেশি হতাশ হবার কোন কারণ নেই। ভিনাসে প্রাণের

চিহ্ন না থাকলেও, এই গ্রহটি সম্বন্ধে আশা ছেড়ে দেবার প্রয়োজন নেই। এর আবহমণ্ডলের উপরিভাগের উত্তাপ খুব বেশি না হওয়ায় সেখানে আদিম এককোষী উদ্ভিদের বসতি ঘটাতে পারলে সেই প্রাণীগুলি সেখানে ভাসমান থাকবে, ভিনাস-গাত্রে গিয়ে পড়বে না। এই প্রাণীগুলি শেষপর্যন্ত ভিনাসের আবহাওয়ায় গ্যাসীয় উপাদানের পরিবর্তন সাধন করবে।

সবুজ উদ্ভিদ হলে তো এই ব্যাপারটা ঘটানো সম্ভব বলেই মনে হয়। আমাদের এই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সৃষ্টি জীবিত প্রাণী দিয়েই হয়েছিল। প্রত্যেক বছর এই পৃথিবীর উদ্ভিদেরা সাড়েছয় লক্ষ কোটি টন কারবণ ডাই অকসাইড গ্রহণ করে আর সাড়েতিন লক্ষ কোটি টন অকসিজেন দান করে। এমন একটা সময় ছিল যখন পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে অকসিজেন ছিল অনেক কম, কারবন ডাই অকসাইড ছিল অনেক বেশি, এখনকার চেয়ে। প্রশ্নটা শুধু সময়ের। ভিনাসের আবহাওয়া বদলাতে হয়ত দু'একশ কোটি বছর লাগবে। এই ধারণার অনেক যুক্তি আছে যে ততদিনে ভিনাসের উত্তাপ অনেক কমে যাবে (পৃথিবী ও এক কালে কত বেশি গরম ছিল)। এমনটি যখন ঘটবে তখন এই পৃথিবীর মানুষ সেখানে সুখেই থাকবে।

সরবরাহ দপ্তর

অকসিজেন প্রাণরক্ষার জন্যে অপরিহার্য, তাই কোন না কোন উৎস থেকে একে সংগ্রহ করতেই হবে জীবদেহের প্রত্যেক কোষে পেঁছে দেবার জন্যে। আমাদের গ্রহের প্রায় সকল প্রাণীই চারিপার্শ্বের আবহমণ্ডল থেকে বা জলে দ্রবীভূত অকসিজেন শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে নেয়। শ্বাসকার্যের জন্য ফুসফুস অথবা গিল্স ব্যবহৃত হয়, সেখান থেকে অকসিজেন শরীরের সকল অঞ্চলে বণ্টন করে দেওয়া হয়।

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হবে যে বাতাস থেকে বা জল থেকে অকসিজেন গ্রহণ করা খুব কঠিন। কিন্তু আদপেই কাজটা তেমন দুরূহ নয়। প্রাণীদের বিষেশ কোন যন্ত্র উদ্ভাবন করতে হয় নি। অকসিজেন রক্তে মেশে ফুসফুস বা গিলস-এর মাধ্যমে ব্যপন প্রক্রিয়ার সাহায্যে কারণ রক্তে অকসিজেনের পরিমাণ বাতাসের থেকে কম, এবং গ্যাস ও তরল পদার্থের ধর্ম হোল যে কোন ঘেরা জায়গার ভিতরে তারা সমভাবে ছড়িয়ে থাকে।

ফুসফুস বা গিলস্-এর ধারণাটা প্রকৃতির মাথায় চট করে আসেনি। অতি প্রাচীন বহুকোষী প্রাণীদের ক্ষেত্রে এই ভাবে শ্বাসকার্য প্রায় অজ্ঞাত ছিল, তাই তারা শ্বাস চালাত তাদের সারা শরীর দিয়ে। পরবর্তী সকল উন্নত প্রাণীরা, মানুষও বাদ যায় না, শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য যেমন বিশেষ যন্ত্রের উদ্ভাবন করেছে তেমনি ত্বক দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রক্রিয়াটাও বজায় রেখেছে। কেবল বর্ম-আঁটা প্রাণীরা, যেমন কাছিম, আমাডিলো, কাঁকড়া বা এইসব জাতের অন্য প্রাণীরা ত্বক দিয়ে শ্বাসকার্য নিষ্পন্ন পারে না।

মানুষের শ্বাসকর্মের সঙ্গে জড়িত তার সারা শরীরের উপরিতল, এমনকি গোড়ালি আর কেশ দিয়ে ঢাকা মাথার চামড়াও। বুকের, পিঠের আর পেটের চামড়া দিয়ে শ্বাসকার্য খুব নিবিড়ভাবে নিষ্পন্ন হয়। মনে রাখা দরকার যে ফুসফুসের থেকে বেশি তীব্র এই শ্বাসকার্য। যদি ত্বক ও ফুসফুসের দুটি সমান মাপের অংশ নেওয়া হয়, তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে ফুসফুসের চেয়ে ত্বক শতকরা 28 ভাগ বেশি অকসিজেন নিতে পারে আবার শতকরা 54 ভাগ বেশি কারবনডাই অকসাইড ছেড়ে দিতে পারে।

ত্বকের এই যে শ্রেষ্ঠত্ব এটা ব্যাখ্যা করা শক্ত। একটা কারণ হতে পারে যে ত্বকের শ্বাসকার্য পরিচ্ছন্ন বাতাস নিয়ে, অপরদিকে ফুসফুসে তো বদ্ধ বাতাস। খুব গভীরভাবে যদি নিঃশ্বাস ছেড়ে দেওয়া যায় তবুও ফুসফুসে খানিকটা বাতাস থেকে যায়, এই বাতাসের উপাদানগুলির আনুপাতিক পরিমাণ কিন্তু আদর্শের থেকে অনেক হীন। এই বাতাসে অকসিজেন আছে বাইরের বাতাসের চেয়ে অনেক কম অনুপাতে, কারবন ডাই অকসাইড আছে অনেক বেশি। প্রশ্বাসের সঙ্গে টেনে নেওয়া বাতাস ফুসফুসের তলানি বাতাসের সঙ্গে মেশে এবং এর গুণগত অনুপাত আরো খারাপ হয়। বিস্মিত হবার কিছু নেই যদি এই ঘটনাটাই দায়ী হয় ত্বক দিয়ে সাধিত শ্বাসকার্যের উৎকর্ষতার জন্যে।

তাহলেও মানুষের শ্বাসকার্যের পুরোব্যাপারটা ধরলে ফুসফুসের তুলনায় ত্বক দিয়ে শ্বাসকার্যের স্থান নগণ্য। এটা বোঝা কঠিন নয় যদি আমরা মনে রাখি যে মানুষের ত্বকের মাপ হোল টায় টোয় দুই বর্গমিটার, এদিকে ফুসফুসের উপরিতল, তার সত্তরকোটি আলভিওলাইকে বিছিয়ে সমান করে দিলে অন্তত 90 থেকে 100 বর্গমিটার হবে, তার মানে ত্বকের থেকে 45—50 গুণ বেশি। (আলভিওলাই (alvioli) হচ্ছে পাতলা দেয়ালবিশিষ্ট

ছোট ছোট থলি যাদের উপরিতল দিয়ে শ্বাসকার্যের কালে রক্তের সঙ্গে বাতাসের গ্যাস বিনিময় ঘটে)।

ত্বক দিয়ে শ্বাসকার্য খুব ছোট ছোট প্রাণীর ক্ষেত্রেই কেবল যথেষ্ট পরিমাণে অকসিজেনের যোগান দিতে পারে। অতএব, একেবারে গোড়া থেকেই প্রকৃতি ক্রমান্বয়ে চেষ্টা করে গেছেন, ভুল শোধরাতে শোধরাতে এমন একটা প্রক্রিয়ার উদ্ভব হোক যাতে এই শ্বাসকার্যটা সুচারুরূপে সাধ্য হয়। প্রথম পরীক্ষা হোল পরিপাকতন্ত্র নিয়ে।

সিলেনটেরেটাদের আছে দুইস্তরে কোষশ্রেণী। বাইরের স্তরের কোষগুলি অকসিজেন নেয় বাতাস থেকে আর ভিতরের স্তরটি নেয় জল থেকে, যে জল অবাধে ঢোকে অন্ত্রের গহ্বরে। এমনকি চ্যাপ্টা ক্রিমি, যার পাচন যন্ত্রগুলি আরো জটিল তারাও পাচণতন্ত্রকে এভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজে লাগাতে পারে নি। তাই তাদের চ্যাপটা থাকতে হয়েছে, কেননা ব্যপন প্রক্রিয়াতে যথেষ্ট পরিমাণ অকসিজেন ভিতরের স্তরের কোষগুলিতে পেঁাছে দেওয়া সম্ভব হয় না।

চ্যাপটা ক্রিমির পরে এই পৃথিবীতে নানাজাতের যত কেঁচোরা এসেছে তারাও ত্বকের সাহায্যে শ্বাস-প্রশ্বাস চালিয়ে গেছে কিন্তু সেটা সম্ভব হয়েছে এই কারণে যে ইতিমধ্যে তারা রক্তসংবহন যন্ত্রাদি বানিয়ে ফেলেছে যার ফলে সারা শরীরে অকসিজেন পৌঁছে দেওয়া সহজ হয়েছে। প্রসঙ্গত, কোন কোন জাতের কেঁচো গোষ্ঠীর প্রাণীর গিলস্ আছে, সর্বপ্রথম সরাসরি বাতাস থেকে অকসিজেন নেবার জন্য উদ্ভূত যন্ত্র।

এর পরে যে-সব প্রাণী এসেছে তাদের শ্বাসযন্ত্র গড়ে উঠেছে দুটি ভিন্ন ছাঁদ অবলম্বন করে। অকসিজেন যে সব ক্ষেত্রে জল থেকে পাওয়া যায় সেসব ক্ষেত্রে গড়ে উঠল শরীরের বাইরে বেরিয়ে থাকা কোন অর্বুদ বা ঢিবি যেটা জলের সংস্পর্শে আসে, অন্যদিকে কোন সাদামাটা গর্ত বা থলি (যেমন ভক্ষ্য গুগলির শ্বাসযন্ত্র কিংবা সালামান্ডার বা লেজযুক্ত ব্যাঙের ফুসফুস) থেকে গড়ে উঠল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোসকা দিয়ে থাকে থাকে গড়ে উঠা জটিল আঙুরের থোলোর আকৃতি — যেমন স্তন্যপায়ীর ফুসফুস — অকসিজেন সরাসরি বাতাস থেকে নেবার জন্য।

জলে আর ডাঙায় শ্বাসকার্যের পদ্ধতিতে অনেক প্রভেদ আছে। এক লিটার জলে খুব সুবিধাজনক অবস্থাতেও দশ মিলিলিটারের বেশি অকসিজেন থাকতে পারে না, পরন্তু এক লিটার বাতাসে থাকে 210 মিলি

লিটার অর্থাৎ 20 গুণ বেশি অকসিজেন। তাহলে তো বিস্ময়ের কথা এই যে এমন অকসিজেনসমৃদ্ধ বাতাস থেকে জলের জীবেরা কেন পর্যাপ্ত অকসিজেন গ্রহণ করতে পারে না। গিলস্-এর গঠন এমন যে এই কাজ তারা বাতাস থেকেই সহজে সম্পন্ন করতে পারত, কিন্তু গিলস্-এর পাতলা পাতলা প্লেট অর্থাৎ বিভক্ত অংশগুলি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শুকিয়ে যেত যদি তারা জলের সহায়তা বা আশ্রয় না পেত। রক্ত তাহলে সঞ্চালিত হোত না, শ্বাসকার্য বন্ধ হয়ে যেত।

শ্বাসযন্ত্রের উদ্ভবের ইতিহাস আগ্রহকর বিষয়। এই যন্ত্র সৃষ্টি করতে গিয়ে প্রকৃতি প্রথমে সেই সব প্রণালীর প্রয়োগ করেছেন যেগুলি আদিম প্রাণীরা ব্যবহার করেছে। প্রথমে ত্বক এবং তার পরে পরিপাক যন্ত্রগুলি ব্যবহার করা হোল এই কাজে। জাহাজ পোকার গিলস্ আর কিছুই নয় কেবল তার বহিরাবরণ থেকে উৎপন্ন বাড়তি, জটিল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অংশ। মেরুদন্ডী সকল প্রাণীর গিলস্ বা ফুসফুস তাদের খাদ্যনালীর প্রথম অংশের রূপান্তরিত যন্ত্র।

পতঙ্গেরা শ্বাসকার্য সুসম্পন্ন করার অসুবিধা দূর করেছে অন্যভাবে। সমস্যাটার (অকসিজেনকে সকল দেহযন্ত্রে পৌঁছে দেবার) তারা সমাধান করেছে সকল দেহযন্ত্রে তা তারা যেখানেই থাকুক, বাতাসকে সরাসরি পেঁাছে দিয়ে। এটা সহজেই নিষ্পন্ন হয় সকল দিকে শাখাবিস্তার করা বাতাসের নল সমষ্টির সাহায্যে, যেগুলি ছড়িয়ে আছে পতঙ্গের সারা গায়ে। এমনকি তাদের মস্তিষ্ক পর্যন্ত সরু সরু বাতাসপরিবাহী নল দিয়ে গিজগিজ করছে যেজন্য আক্ষরিক অর্থে বলা যায় তাদের মাথার ভিতরে কিছু নাই।

এই বায়ুনালীগুলি শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে যায় ছোট হতে হতে যার ফলে তাদের শেষ প্রান্তগুলিতে তারা এত সূক্ষ্মনলে পরিণত হয় যে দেহের এক একটি কোষের সংস্পর্শে আসতে পারে। এখানে এসে তারা এত সূক্ষ্ম বায়ুনালীকণাতে ছড়িয়ে যায় যে তাদের ব্যাস এক মাইক্রনের বেশি থাকে না এবং দেহকোষের প্রোটোপ্লাজম পর্যন্ত ভেদ করে যায়। এইভাবে পতঙ্গদের ক্ষেত্রে অকসিজেন সরাসরি গন্তব্যে পৌঁছে যায়। বায়ুনালীক-নাগুলি বেশি ঘন সেইসব দেহকোষে যারা অকসিজেন ব্যবহার করে বেশি মাত্রায়। ওড়ার কাজে ব্যবহৃত পেশীর বড় বড় কোষগুলিতে, এই বায়ুনালীগুলি ঘন জালের সৃষ্টি করে।

পতঙ্গের বাতাসপরিবাহী পথগুলি স্বাধীনভাবে নির্ণয় করতে পারে শরীরের কোন অঞ্চলে অকসিজেনের ঘাটতি রয়েছে। এই ক্ষমতাটা আছে ত্বকের বাইরের আবরণীর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বায়ুনালীকণাদের যারা হোল প্রান্তিক বন্ধ নল, এক মাইক্রনের চেয়ে সরু আর এক মিলিমিটারের তিনভাগের একভাগের থেকেও কম দীর্ঘ। যখন সংলগ্ন দেহকলা বেশি পরিমাণে অকসিজেন খরচ করছে তখন এই বায়ুনালীকণারা লম্বা হতে থাকে, প্রায়ই এক মিলিমিটার পর্যন্ত।

প্রথম নজরে মনে হতে পারে যে পতঙ্গেরা অকসিজেন সরবরাহের সমস্যাটার সমাধান করে ফেলেছে। বায়ুনালীগুলি যদি সব সময় খোলা থাকে তাহলে তাদের শরীরের উপর দিয়ে বহে যাওয়া তীব্র বাতাস অবিলম্বে তাদের শুকিয়ে ফেলবে। এটা বন্ধ করতে বায়ুনালীর বাইরের দিকের মুখগুলিকে খুলতে হয় অলপকালের জন্য এবং অনেক জলজ পতঙ্গের ক্ষেত্রে তারা সব সময় বন্ধ থাকে। এই সব ক্ষেত্রে ত্বক বা গিলস্-এর ভিতর ব্যপনের সাহায্যে অকসিজেন এই বায়ুনালীতে প্রবেশ করে এবং তাদের মধ্যে ছড়িয়েও যায় ব্যপনের সাহায্যেই। ভূ-পৃষ্ঠের বড়

বড় পতঙ্গরা শ্বাসকার্য বেশ সক্রিয়ভাবে চালায়। তাদের পেটের পেশীগুলি মিনিটে 70 থেকে 80 বার সংকুচিত হয়, পেটটা চ্যাপটা হয়ে বাতাসকে নিংড়ে বাইরে পাঠিয়ে দেয়। পেশীগুলি আলগা হলে পেটটা আগের আকৃতি ফিরে পায়, বাতাস ভিতরে শুষে নেওয়া হয়। মজার ব্যাপার হোল এই যে এই সব পতঙ্গরা বাতাস টেনে নেয় বা ছেড়ে দেয় নানা রাস্তা দিয়ে, যেমন গলার ছিদ্রগুলি দিয়ে বাতাস টেনে নিয়ে পেটের ছিদ্র দিয়ে বের করে দেওয়া হয়।

প্রায়শই মুখ্য শ্বাস-প্রশ্বাসের যন্ত্রগুলি তাদের কাজগুলি পুরোপুরি সামলে উঠতে পারে না। এটা ঘটে সেই সব প্রাণীদের ক্ষেত্রে যারা হয়ত এমন পরিবেশে গিয়ে পড়েছে যেখানে অকসিজেনের বেশ ঘাটতি আছে বা যে পরিবেশ তাদের কাছে সম্পূর্ণ অজানা। এই সব ক্ষেত্রে প্রধান শ্বাসযন্ত্রগুলিকে সাহায্য করার উপায় খুঁজে নেবার ব্যাপারে প্রকৃতির উদ্ভাবনশীলতার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

সর্বপ্রথমে, পরীক্ষিত উপায়গুলি ব্যবহৃত হয়েছে বা তাদের আধুনিক করে তোলা হয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের দক্ষিন অঞ্চলে পাওয়া যায় ছোট এক জাতের মাছ। জলের তলায় থাকে, তাই গ্রাউন্ডলিং এদের নাম। এরা বাস করে সেইসব ছোট ছোট নালা বা ঝরনায় অথবা বদ্ধ জলাশয়ে, যেগুলি গ্রীষ্মকালে শুকিয়ে যায়। এই জলাধারগুলির তলদেশে থাকে পাঁক। প্রচুর পরিমাণে জলজ উদ্ভিদ সেই শুকিয়ে আসা জলে পচতে থাকে তাই সেখানে অকসিজেন অত্যন্ত কমে আসে গ্রীষ্মকালে। শ্বাসরোধ যাতে না ঘটে তাই এই গ্রাউন্ডলিঙদের হাওয়া খেতে হয় আক্ষরিক অর্থে। অর্থাৎ খাদ্যের মতোই হাওয়া গিলে ফেলে তার পরে অন্ত্র দিয়ে নির্গত করে দিতে হয়। খাদ্যনালীর প্রথম অংশ ব্যবহৃত হয় খাদ্য পরিপাকের কাজে এবং শেষাংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজে।

পরিপাক প্রক্রিয়া যাতে শ্বাসকার্যের বিঘ্ন না করতে পারে সেজন্য অন্ত্রের মধ্যভাগে আছে নিঃস্রাবী বিশেষ কোষকলা যার থেকে ক্ষরিত শ্লেষ্মা বর্জ্য অংশগুলির চারধারে লেপটে থাকে। তাই এই বর্জ্য পদার্থগুলি অন্ত্রের সেই অঞ্চল দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায় শ্বাসকার্য যেখানে চলে। আরো দু'জাতের মাছ আছে 'চার' আর 'লোচ', যারা শ্বাসকার্য চালায় অনেকটা একই উপায়ে। একই দেহযন্ত্র দুটি কাজ অনায়াসে করতে পারবে এমন আশা করা যায় না। মুখ্যত এই কারণে ক্রান্তীয় এশিয়ার অনেক অঞ্চলে কয়েক জাতের মাছের শরীরে উদ্ভব হয়েছে বাড়তি একটি শ্বাসযন্ত্র, যে যন্ত্র

গিলস-এর পূর্বভাগের চওড়া প্রথমঅংশে অবস্থিত গোলকধাঁধার মতো জটিল নল ও ছিদ্রাদি দিয়ে গড়া।

বিজ্ঞানীদের অনেক সময় কেটেছে এই গোলকধাঁধার উপযোগিতা কি সেটা নির্ধারণ করতে। সুপ্রসিদ্ধ জি. কুভিয়ে (G. Cuvier) একটি কইমাছকে ব্যবচ্ছেদ করতে গিয়ে সর্বপ্রথম এই যন্ত্রটি লক্ষ করেন। এই যন্ত্রটির নামকরণ তিনিই করেছিলেন এবং তাঁর ধারণার কথা ব্যক্ত করেছিলেন যে জল ছেড়ে উঠে আসার সময় কইমাছ এই গোলকধাঁধা বা ল্যাবিরিনথ-এ জল সঞ্চয় করে নেয়। কইমাছ বেড়াতে ভালবাসে, খুব সহজেই এক পুকুর থেকে অন্য পুকুরে বেড়াতে যায়।

মাছেদের নিজস্ব পরিবেশে তাদের পর্যবেক্ষণ করেও এই যন্ত্রের প্রকৃত উপযোগিতা সম্বন্ধে কোন তথ্যই পাওয়া যায় নি। বৃটিশ জীববিজ্ঞানী কমারসন ইউরোপীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম যিনি গোরামি নামের একটি অপেক্ষাকৃত বড় মাছের খবর পান যাদের ক্রান্তীয় অঞ্চলে পুকুরে বহুকাল ধরে ‘পালন’ করা হয়ে আসছে। এদের নাম তিনি রাখেন, অসফ্রোনেমাস গোরামি। ল্যাটিন ভাষায় যার অর্থ ‘যে গন্ধ শোঁকে’। এই মাছগুলির উপর নজর রাখার কালে তিনি দেখলেন যে ঘন ঘন তারা উপরে ভেসে ওঠে আর নাক বাড়িয়ে বাতাস টেনে নিঃশ্বাস নিয় থাকে। সে সময়ে কারো মাথায় আসেনি যে মাছেরা বাতাস টেনে নিঃশ্বাস নিয়ে থাকে। কমারসন তাই এই অদ্ভুত ধারণাটি ব্যক্ত করলেন যে গোরামিরা মাঝে মাঝে ভেসে উঠে বাতাসের গন্ধ শুঁকতে।

এই ল্যাবিরিনথ মাছদের অ্যাকোয়ারিয়ামে পোষা শুরু হয় এর অনেকদিন পরে এবং কেবল তখনই প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা জানতে পারলেন যে এই মাছেরা ল্যাবিরিনথ বা গোলকধাঁধা ব্যবহার করে নিঃশ্বাস নিতে। তাদের গিলস্ অসম্পূর্ণ, তাই তারা এই ল্যাবিরিনথ-এর উপরই নির্ভর করে অকসিজেনের জন্য। ল্যাবিরিনথ মাছেরা শুকনো বাতাসের উপর এতই নির্ভরশীল যে এই বাতাসের অভাবে তারা বাঁচতে পারে না এবং জলের তলায় যদি থাকতে বাধ্য করা হয় তাহলে তারা দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে — এমনকি অ্যাকোয়ারিয়ামেও যেখানে নির্ভেজাল অকসিজেনসমৃদ্ধ খাঁটি জলই আছে।

শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজটা ব্যাঙদের ক্ষেত্রেও সহজ ব্যাপার নয়। এদের ফুসফুসটা তেমন জোরালো নয়, তাই সময় সময় তাদের উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগাতে হয়েছে।

1900 সালে আফ্রিকার গাবন থেকে একটা রোমশ ব্যাঙ ধরা পড়ে। সারা বিশ্বজুড়ে প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের মধ্যে এই সংবাদ আলোড়নের সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানীরা ধরেই নিয়েছিলেন যে স্তন্যপায়ী প্রাণী ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর দেহে কেশ গজায় না। ব্যাঙদের শরীরে কস্মিনকালেও লোম ছিল না। কোন কারণই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না গাবনের ব্যাঙের পায়ে বা শরীরে লোম কেন থাকবে। আফ্রিকার ব্যাঙদের শীতবোধ কেন বেশি হবে, যখন ইউরোপ বা সুমেরুর কাছাকাছি অঞ্চলের ব্যাঙদের শীতবোধ হয় না?

অল্পদিনেই জানা গেল কেন ব্যাঙের গায়ে ফার-এর কোট চাপানো আছে? এই অদ্ভুত পশমের কোট যখন অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে ধরা হোল তখনই জানা গেল যে এগুলি ত্বকের বাড়তি অংশ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাছাড়া গাবন তো ঠান্ডা জায়গা নয় যে শীতের জন্য সেখানে ব্যাঙের গায়ে লোম গজাবে? পরবর্তী পরীক্ষার ফলে জানা গেল যে ব্যাঙের এই লোম ডাঙায় বা জলে শ্বাসকার্য চালাবার জন্যে গিলস্-এরই অনুরূপ কাজ করে থাকে। কেবল পুরুষ ব্যাঙদেরই এই কেশ আছে। যদি এই কেশের সহায়তা তারা না পেত তাহলে বর্ষাকালে তাদের যে প্রচুর দৈহিক শক্তি ব্যয় করতে হয় সেটা তারা করতে পারত না আর অকসিজেনের অভাবে হাঁফিয়ে পড়ত।

ক্রান্তীয় ভারতের বাসিন্দা চ্যাং মাছের শ্বাসকার্যের ব্যাপারটা ভারি মজার। এই মাছেরা কাদাতেই বেশি সময় কাটায়, জলের থেকে কাদাই এদের পছন্দ। ডাঙায় এরা বেশ দূর পাল্লার পাড়ি দিতে পারে, গাছেও চড়তে পারে। শুকনো ডাঙায় এরা শ্বাসকার্য চালায় লেজ দিয়ে, এদের লেজের ত্বকে প্রচুর পরিমাণে শাখা-প্রশাখা সম্বলিত রক্তবহা নাড়ী আছে।

চ্যাং মাছের শ্বাসকার্য অনুধাবন করতে গিয়ে প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা দেখেছিলেন যে চ্যাং মাছেরা সারাদিন যদিও শুকনো ডাঙায় থাকে পোকা-মাকড় ধরে খাওয়ার জন্যে, জল ছেড়ে যেতে এরা চায় না, আর কাদার ডোবার কিনারায় লেজটি ডুবিয়ে থাকতে ভালোবাসে। একটা প্রজাপতি ধরতে একটা লাফ দিয়েই আবার পিছিয়ে এসে লেজটি ডুবিয়ে দেয় জলে। এই অভ্যাসটা লক্ষ্য করে বিজ্ঞানীরা বললেন তবে বোধরহয় চ্যাং মাছেরা লেজ দিয়ে জল থেকে অকসিজেন নিয়ে থাকে। এই ধারণা মাথায় আসতে তাঁরা সেই জলের অকসিজেনের ভাগ মেপে দেখলেন যে এতই কম সেই অকসিজেনের পরিমাণ যে লেজ ডুবিয়ে বসে থাকলে আছের কোন লাভই

হবে না। পরে আবিষ্কার করা গেছে যে চ্যাং মাছ লেজ দিয়ে জল টেনে নেয় শরীরের বিভিন্ন অংশ ভালো করে ভিজিয়ে নেবার জন্য এবং সারা শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে শ্লেষ্মা নিঃসরণ করে নেবার জন্য। জলে ডোবানো অবস্থায় যেটুকু অকসিজেন পাওয়া যায় লেজ থেকে সেটা নগণ্য। কিন্তু নিজের শরীরে ভাল করে জল সঞ্চয় করে নেওয়া হয়ে গেলে ডোবা ছেড়ে বাইরে যখন আসে তখন লেজই তার প্রধান শ্বাসযন্ত্র।

কাদার মাছ মিনো-এরা অকসিজেন নেয় তাদের পটকা থেকে। এই জাতের মাছ পাওয়া যায় মলডাভিয়াতে এবং নিসটার নদীর নিম্নভাগে আর ডানিয়ুব নদীতে। এদের ভেসে থাকার জন্য সহায়ক ব্লাডার বা পটকার সঙ্গে যোগ রয়েছে গলার, বেশ চওড়া একটা নলের সাহায্যে। পটকাতে এরা বাতাস ভরে নেয় জল থেকে মাথাটা বাইরে নিয়ে এসে। পটকার বাইরের আবরণে রক্তবহানাড়ীর জাল বোনা রয়েছে এবং অকসিজেন অনায়াসে রক্তস্রোতে প্রবেশ করতে পারে। মধ্যে মধ্যে কাদার মাছ মিনো (minnow) ব্যবহৃত বাতাস ছেড়ে দেয় যাতে কারবন ডাই অকসাইডের মাত্রা অনেক বেশি। পটকা থেকে শ্বাসকার্য চালানোটা এদের কাছে একটা মজার ব্যাপার নয়। তাজা বাতাস যদি শ্বাসের সঙ্গে না নিতে পারে তাহলে এরা 24 ঘন্টার বেশি সময় বাঁচে না।

আরো অনেক জাতের মাছের কাছে মুক্ত বাতাস অপরিহার্য, তবে সেটা ভিন্ন কারণে। প্রায় সব জাতের মাছেরাই জন্মাবার পরে অন্তত একবার ভাল করে নিঃশ্বাস নেবেই এই কারণে মাছেরা অগভীর জায়গায় ডিম পাড়তে পছন্দ করে। অন্যথায় বাচ্চা মাছেরা ভেসে উঠতেই পারত না। বাচ্চা মাছেদের বাতাসের দরকার তাদের নিজেদের পটকা ফুলিয়ে নেবার জন্যে। বাচ্চাদের বয়স যখন কয়েকদিন মাত্র পটকা আর গলার মধ্যে সংযোগকারী নলটি বন্ধ হয়ে যাবে তার মধ্যে, আর বাচ্চারা মরেই যাবে যদি না তারা ইতিমধ্যে তাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব ইচ্ছে মতো কমিয়ে নিতে শিখে নেয়।

পটকার নলটি কিন্তু সব জাতের মাছের ক্ষেত্রেই বন্ধ হয়ে যায় না। কোন কোন জাতের মাছ বৃদ্ধকাল পর্যন্ত তাজা বাতাস নিয়ে থাকে শ্বাসের সঙ্গে, জলের উপরিতলে ভেসে বেড়াবার কালে, আবার গভীর জলে নেমে যাওয়ার সময় খানিকটা বাতাস ছেড়েও দেয়। কিন্তু উপরে এসে ভেসে ওঠা সর্বদা নিরাপদ তো নয় তাই মাছেরা একটা ভিন্ন পদ্ধতিতে পটকার মধ্যে

প্রয়োজনীয় গ্যাসের মাত্রা বজায় রাখে। তাদের শরীরে আছে একটা গ্যাস গ্রন্থি যেটা সক্রিয়ভাবে পটকার মধ্য গ্যাস নিঃসরণ করে।

শ্বাসকার্য চর্চার প্রথম দিকে ধারণা করা হয়েছিল যে অকসিজেন ফুসফুসে প্রবেশ করার পরে আলভিওলাই-এর দেয়ালে বাধা পড়ে সেখান থেকে রক্তে মেশে। কিন্তু এই মত পরে বর্জন করা হয়েছে। যে-সব মাছের পটকা সম্পূর্ণ বন্ধ তাদের অবশ্য এই পদ্ধতি নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নাই। গ্যাস-গ্রন্থির কার্যকর অংশে আছে তিন স্তরে পর পর সংযুক্ত অপূর্ব রক্তবহানাড়ীর জালিকাপুঞ্জ। হিসেব করে দেখা গেছে যে এই জালিকাপুঞ্জের শিরাধমনীগুলি পূর্ণ করে দেবার জন্যে বেশি রক্ত দরকার হয় না, মাত্র এক ফোঁটাই যথেষ্ট। কিন্তু যতটা জায়গা জুড়ে এই জালপুঞ্জের বিস্তার সেটা বিরাট, কারণ 88 হাজার শিরা আর 116 হাজার ধমনীকণা দিয়ে এই জাল তৈরি হয়েছে, সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য হবে এক কিলোমিটার। তার উপর, গ্যাস-গ্রন্থির অনেকগুলি ছোট ছোট নালী আছে। নিঃসৃত তরল পদার্থ পটকার ভিতরের গায়ে জমা হোলে সেখানে সেটা বিভাজিত হয়ে যায়, নির্গত হতে থাকে অকসিজেন আর নাইট্রোজেন।

পটকার ভিতরের গ্যাস যেহেতু গ্যাস-গ্রন্থি থেকে তৈরি হয়, বাইরের আবহাওয়া থেকে নয়, সেই কারণে এই গঠনের অনুপাত বাইরের আবহওয়ার বাতাসের থেকে একেবারেই আলাদা। এই গ্যাসের মধ্যে অকসিজেনের ভাগ অনেক বেশি, সময় সময় শতকরা নব্বুই ভাগ পর্যন্ত।

ডুবুরীর পোশাক ও কৃত্রিম ফুস্‌ফুস্‌

আমাদের এই গ্রহের তিন ভাগের দু'ভাগ বা তার চেয়ে বেশি অঞ্চল তো সমুদ্রের জলে ঢাকা। জলের বাইরে রয়েছে কেবল তিন ভাগের এক ভাগ। এই যে সীমাহীন জলের বিস্তার, বহুকাল আগে থেকেই মানুষের প্রাণে আগ্রহের ও কৌতুহলের সঞ্চার করেছে এই জল। তাই প্রাচীন কালের মানুষ যে জলের তলদেশে অভিযান চালাবার চেষ্টা করে থাকবে তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে। তবে উনবিংশ শতাব্দী শেষ হওয়া নাগাত মানুষ সফলভাবে ডুবুরীর পোশাক তৈরি করতে পেরেছে যার ফলে সম্ভব হয়েছে জলের নীচে অনেকটা সময় কাটানো, বিশেষ নলের সাহায্যে পাঠানো বাতাস শ্বাসকার্যের জন্যে ব্যবহার করেই। আরো পরে আবিষ্কৃত হয় কেসন

(caisson) বা একটি বড়ো ধাতব ঘন্টা যার খোলা মুখটি থাকে নীচের দিকে। ঘণ্টাটি সমুদ্রের তলদেশে নামিয়ে দেওয়া হয়, পাম্প্ করে বাতাস ঠেলে দেওয়া হয় এর ভিতরে, যার ফলে এর মধ্যে বাস করে জলের তলায় অনেক কাজ করা যায়।

ডুবুরীরা বা ঘণ্টার ভিতরের কর্মীরা জলের তলায় কতটা গভীরতায় কাজ করতে পারবে সেটা সীমিত হয়ে যায় বাতাস সরবরাহের নলটার দৈর্ঘ্যের দ্বারা। অতএব, স্বাভাবিক ভাবেই বিজ্ঞানীরা খুঁজতে থাকলেন অন্য কোন উপায়। কেবল সম্প্রতিকালেই তাঁরা সক্ষম হয়েছেন একটি অ্যাকোয়া-লাঙ (Aqualang) বা 'জলের ফুসফুস' উদ্ভাবন করতে, যেটা হোল স্বয়ং-সম্পূর্ণ একটা ডুবুরীর যন্ত্র। বোতলের মধ্যে উচ্চচাপে বাতাস বা অক্সিজেন ভরা থাকে যার সাহায্যে জলের তলায় বিস্তৃত অঞ্চলে স্বচ্ছন্দে ঘুরে ফিরে কাজ করা যায়।

প্রাণীদের ক্ষেত্রেও, কোন তরল মাধ্যমের মধ্যে চলে বেড়াবার সময় তাদের এই ধরনের সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়েছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ

প্রয়োজনীয় গ্যাসের মাত্রা বজায় রাখে। তাদের শরীরে আছে একটা গ্যাস গ্রন্থি যেটা সক্রিয়ভাবে পটকার মধ্য গ্যাস নিঃসরণ করে।

শ্বাসকার্য চর্চার প্রথম দিকে ধারণা করা হয়েছিল যে অকসিজেন ফুসফুসে প্রবেশ করার পরে আলভিওলাই-এর দেয়ালে বাধা পড়ে সেখান থেকে রক্তে মেশে। কিন্তু এই মত পরে বর্জন করা হয়েছে। যে-সব মাছের পটকা সম্পূর্ণ বন্ধ তাদের অবশ্য এই পদ্ধতি নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নাই। গ্যাস-গ্রন্থির কার্যকর অংশে আছে তিন স্তরে পর পর সংযুক্ত অপূর্ব রক্তবহানাড়ীর জালিকাপুঞ্জ। হিসেব করে দেখা গেছে যে এই জালিকাপুঞ্জের শিরাধমনীগুলি পূর্ণ করে দেবার জন্যে বেশি রক্ত দরকার হয় না, মাত্র এক ফোঁটাই যথেষ্ট। কিন্তু যতটা জায়গা জুড়ে এই জালপুঞ্জের বিস্তার সেটা বিরাট, কারণ 88 হাজার শিরা আর 116 হাজার ধমনীকণা দিয়ে এই জাল তৈরি হয়েছে, সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য হবে এক কিলোমিটার। তার উপর, গ্যাস-গ্রন্থির অনেকগুলি ছোট ছোট নালী আছে। নিঃসৃত তরল পদার্থ পটকার ভিতরের গায়ে জমা হোলে সেখানে সেটা বিভাজিত হয়ে যায়, নির্গত হতে থাকে অকসিজেন আর নাইট্রোজেন।

পটকার ভিতরের গ্যাস যেহেতু গ্যাস-গ্রন্থি থেকে তৈরি হয়, বাইরের আবহাওয়া থেকে নয়, সেই কারণে এই গঠনের অনুপাত বাইরের আবহওয়ার বাতাসের থেকে একেবারেই আলাদা। এই গ্যাসের মধ্যে অকসিজেনের ভাগ অনেক বেশি, সময় সময় শতকরা নব্বুই ভাগ পর্যন্ত।

ডুবুরীর পোশাক ও কৃত্রিম ফুস্‌ফুস্‌

আমাদের এই গ্রহের তিন ভাগের দু'ভাগ বা তার চেয়ে বেশি অঞ্চল তো সমুদ্রের জলে ঢাকা। জলের বাইরে রয়েছে কেবল তিন ভাগের এক ভাগ। এই যে সীমাহীন জলের বিস্তার, বহুকাল আগে থেকেই মানুষের প্রাণে আগ্রহের ও কৌতুহলের সঞ্চার করেছে এই জল। তাই প্রাচীন কালের মানুষ যে জলের তলদেশে অভিযান চালাবার চেষ্টা করে থাকবে তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে। তবে উনবিংশ শতাব্দী শেষ হওয়া নাগাত মানুষ সফলভাবে ডুবুবীর পোশাক তৈরি করতে পেরেছে যার ফলে সম্ভব হয়েছে জলের নীচে অনেকটা সময় কাটানো, বিশেষ নলের সাহায্যে পাঠানো বাতাস শ্বাসকার্যের জন্যে ব্যবহার করেই। আরো পরে আবিষ্কৃত হয় কেসন

(caisson) বা একটি বড়ো ধাতব ঘন্টা যার খোলা মুখটি থাকে নীচের দিকে। ঘণ্টাটি সমুদ্রের তলদেশে নামিয়ে দেওয়া হয়, পামপ্ করে বাতাস ঠেলে দেওয়া হয় এর ভিতরে, যার ফলে এর মধ্যে বাস করে জলের তলায় অনেক কাজ করা যায়।

ডুবুরীরা বা ঘণ্টার ভিতরের কর্মীরা জলের তলায় কতটা গভীরতায় কাজ করতে পারবে সেটা সীমিত হয়ে যায় বাতাস সরবরাহের নলটার দৈর্ঘ্যের দ্বারা। অতএব, স্বাভাবিক ভাবেই বিজ্ঞানীরা খুঁজতে থাকলেন অন্য কোন উপায়। কেবল সম্প্রতিকালেই তাঁরা সক্ষম হয়েছেন একটি অ্যাকোয়া-লাঙ (Aqualang) বা 'জলের ফুসফুস' উদ্ভাবন করতে, যেটা হোল স্বয়ং-সম্পূর্ণ একটা ডুবুরীর যন্ত্র। বোতলের মধ্যে উচ্চচাপে বাতাস বা অকসিজেন ভরা থাকে যার সাহায্যে জলের তলায় বিস্তৃত অঞ্চলে স্বচ্ছন্দে ঘুরে ফিরে কাজ করা যায়।

প্রাণীদের ক্ষেত্রেও, কোন তরল মাধ্যমের মধ্যে চলে বেড়াবার সময় তাদের এই ধরনের সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়েছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ

মানুষের ব্যবহৃত পদ্ধতির তুল্য উপায়ের প্রয়োগ করেছে, অর্থাৎ ডুবুরীদের মতো কায়দা আন্দাজ করতে পেরেছে লক্ষ লক্ষ বছর আগেই।

মানুষের ডুবতে হয়েছে শুধু জলেই, কিন্তু অন্য প্রাণীদের বেলায় জল ছাড়াও নানা ধরনের তরল মাধ্যমের মুখোমুখি হতে হয়েছে যার মধ্যে অক্সিজেন একেবারেই নেই। তাই তাদের বাইরে থেকে আগেভাগেই পর্যাপ্ত পরিমাণে বাতাস সঞ্চয় করে নেওয়া ছাড়া আর কোন গতি ছিল না। জীবের বা উদ্ভিদের শরীরের মধ্যে যে-সব পরজীবী থাকে তাদেরও বাস করতে হয় এমনি অবস্থার মধ্যে।

একজাতের পরজীবী পতঙ্গের শূক, যারা বাস করে আফ্রিকার বড় বড় পঙ্গপালের শরীরের মধ্যে, তারা শিকারের দেহে প্রবেশ করে শ্বাসনালীর একটা নল ভেদ করে। প্রথম পর্যায়ে, এই শূকেরা তাদের বাসস্থানের দেয়ালগুলি খেতে থাকে এবং এবং দ্রুত স্বাস্থ্যলাভও করতে থাকে। পরজীবী প্রাণীটির শীঘ্রই স্থানের অসংকুলান হয়ে পড়ে। তাই সে তখন শ্বাসনালীর মধ্যে একটা ফুটো করে আশ্রয়দাতার শরীরের কোষকলার মধ্যে ঢুকে পড়ে। কিন্তু সেখানে তো নিঃশ্বাস নেবার বাতাস নেই অথচ শূকের দরকার বাতাসের, তাই তারা কি করে, ডুবুরীরা ডুব দেবার সময় যা করে ঠিক তাই। নিজের জন্যে বাতাস পরিবাহী একটা নলের ব্যবস্থা করে ফেলে। শিকারের দেহের শক্ত খোলসের স্তর ভেদ করে একটি ছিদ্র করে ফেলে এবং নিজের তলপেটের পিছনের অংশ সেখানে লাগিয়ে বসে থাকে। শীঘ্রই সেখান থেকে, মানে শূকের শরীরের সেই অংশ থেকে, একটা নল গজায়। এইভাবে সেই শূক সেই পঙ্গপালের শরীরের মধ্যে থেকে যায়, নলের সাহায্যে বাইরের বাতাস পেয়ে যায়, ঠিক যেমন ডুবুরীকে বাতাসের নল দিয়ে বাতাস সরবরাহ করা হয়ে থাকে সেই উপায়ে। শ্বাস নেবার নলটি বড় হতে থাকে, আর শূককীটও ক্রমশ দেহকোষের আরো গভীরে প্রবেশ করতে থাকে। নলটা হয়ত শূকের শরীরের দৈর্ঘ্যের দু'গুণ লম্বা হয়ে যায়।

এরিসটালিসদের (আমাদের অতি পরিচিত ভ্রমরদের স্বগোত্র) শূককীটের আছে একটা সহজে লম্বা করা যায় এমনি দীর্ঘ সাইফন, ঠিক যেন ডুবুরীর বাতাস-নল। এরা বাস করে জলাধারের তলায় পাঁকের মধ্যে শরীর ডুবিয়ে রেখে। জল যদি অগভীর হয় তাহলে এই শূকেরা তাদের নলটা জলের বাইরে এনে ভারি সুখে পাঁকের মধ্যে বসে বসেই শ্বাসকার্য চালিয়ে যেতে পারে।

জলে বাস করে যে-সব পতঙ্গ তাদের পূর্বপুরুষেরা ছিল ডাঙার প্রাণী। তারা ডাঙা ছেড়ে জলে চলে গেছে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস প্রণালীর বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি। নিঃশ্বাসে এরা বাতাসই নিয়ে থাকে। জলীয় পরিবেশে বাস করার জন্য যেটুকু পরিবর্তন এরা করে নিয়েছে সেটা হোল খানিকটা বাতাস সঞ্চয় করে নেবার ক্ষমতা, ডুবুরীরা দীর্ঘকাল জলের নীচে কাজ করবার জন্য যেমন কৃত্রিম ফুসফুস সঙ্গে নিয়ে যায় ঠিক তেমনি। ডুবুরী গুবরে পোকারা ডানার খাঁজের নীচে বাতাসের সঞ্চয় রেখে দেয়, পিছনে সাঁতার-কাটা পতঙ্গের বাতাসের সঞ্চয় থাকে তলপেটে। বাতাসের বুদ্বুদগুলি কতকগুলি জলে ভেজেনা এমনি লোম দিয়ে আটকানো থাকে। শ্বাসযন্ত্রের নালীর মুখগুলি থাকে বুদ্বুদগুলির পাশেই। এই উপায়ে এই পতঙ্গেরা প্রয়োজনীয় অকসিজেন পেয়ে যায়। মাকড়সাদের বেলায়ও একই ব্যাপার। এদের প্রায় সবাই ডাঙার প্রাণী, শ্বাস-প্রশ্বাস নেয় বিশেষ ফুসফুস-থলির সাহায্যে। এই কারণে জলের বাসিন্দা রুপোলি মাকড়সারা ভারি অদ্ভুত, কেননা এই জাতের জীবদের মধ্যে কেবল এরাই কুলপ্রথা ত্যাগ করে জলের তলায় বাস করতে চলে গেছে। এদের সারা শরীর অতি সূক্ষ্ম রোঁয়া দিয়ে ঢাকা। এই রোয়াঁগুলি জলে ভেজে না। জলে যখন এরা ঝাঁপ দেয়, ছোট ছোট বাতাসের বুদ্বুদ সারা গায়ে রোয়াঁর সঙ্গে লেগে থাকে যার ফলে সমস্ত শরীরটাকে বাতাসের একটা মোড়কে ঢেকে দেওয়া হয়েছে মনে হয়। জলের মধ্যে এই মোড়কটি ঝক্ ঝক্ করে, মাকড়সাকে দেখায় যেন পারদের একটি জীবন্ত দানা। মাকড়সাটা আবার তলপেটের শেষপ্রান্তটি বাড়িয়ে দিয়ে ধরে ফেলে আরো বড় একটা বুদ্বুদ। বুদ্বুদটিকে পিছনের পাগুলি দিয়ে আঁকড়ে ধরে বরুণদেবের সাম্রাজ্যে নেমে যায়।

জলজ উদ্ভিদের মধ্যে এসে জলের মাকড়সা তার ডাঙার জ্ঞাতিদের মতোই জাল বোনা শুরু করে। শুরুতে এই জালটা চ্যাপটা কিন্তু ক্রমশ এর আকৃতিটা দাঁড়ায় একটা অঙ্গুষ্ঠীর মতো, মাকড়সাটা যতই বাতাসের বুদ্বুদ তার মধ্যে রেখে দিতে থাকে, এইভাবে একটা কেসন বা ডুবুরীর ঘন্টা তৈরি হয়ে যায় যেটা মাকড়সার জীবনের বেশির ভাগ সময় কাটাবার আশ্রয়স্থল। স্ত্রী মাকড়সা এই কেসনেই ডিম পাড়ে, বাচ্চারাও বেড়ে উঠে এখানে।

জলের মাকড়সার বাসা আর ডুবুরীর কেশন বা ঘন্টার মধ্যে সাদৃশ্য কেবল আকৃতিগত। আর অন্তর্নিহিত পদ্ধতিগুলি বেশ জটিল। বাতাসের যে বুদ্বুদ মাকড়সা বয়ে নিয়ে আসে সেগুলি দিয়ে তৈরি করে একটা সঞ্চয়

ভান্ডার। কিন্তু তারই সঙ্গে সেই বুদ্বুদ তার চারপাশের থেকে অকসিজেনও নিংড়ে নিতে পারে। এই প্রক্রিয়ার নাম দেওয়া হয়েছে ‘যান্ত্রিক ফুসফুস।’

সকলেই জানে যে জলের মধ্যে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে বাতাসের মধ্যে যে সব গ্যাস আছে তার সবগুলিই, আর এদের পরিমাণ বাতাসে যেটি যে মাত্রায় থাকে তারই সমতুল্য। পতঙ্গ নিঃশ্বাস নিলে বুদ্বুদের মধ্যেকার অকসিজেনের ঘনত্ব কমে যায় এবং এর মাত্রা যখন শতকরা 16 ভাগের থেকে কমে যায় তখন জলের মধ্যে দ্রবীভূত অকসিজেন ব্যাপ্ত হতে থাকে এই বুদ্বুদের মধ্যে। তাই এই বুদ্বুদের মধ্যে অকসিজেনের মাত্রা নিয়তই পরিপূরিত হয়ে যাচ্ছে।

যদি অকসিজেনের উপযোগ মাঝমাঝি গতিতে হয়, যেমন পতঙ্গটি বিশ্রাম নেবার কালে, এই যান্ত্রিক ফুসফুসটি পর্যাপ্ত অকসিজেন জুগিয়ে যাবে অনির্দিষ্ট কাল ধরে। কিন্তু অকসিজেনের খরচ যদি বেশি হয় তখন আর এই ফুসফুস জল থেকে ব্যপনের সাহায্যে কমে যাওয়া অকসিজেন দ্রুত পরিপূরণ করে নিতে পারবে না। তারমানে বাতাসের বুদ্বুদে অকসিজেনের ভাগ হঠাৎ কমে যাবে, অন্য গ্যাসের (প্রধানত নাইট্রেজেনের) ভাগ বাড়বে, যতক্ষণ না বাতাসের স্বাভাবিক অনুপাত থেকে অনেক বেশি হয়ে যায়। তখন নাইট্রোজেন জলে মিশতে থাকবে। বুদ্বুদ আয়তনে ছোট হতে থাকবে কারণ একদিকে ব্যবহার করার ফলে অকসিজেন গেছে কমে, অন্যদিকে নাইট্রোজেন বেশি হওয়ায় মিশছে জলের সঙ্গে। অতএব পতঙ্গটাকে উপরে আসতে হয় বাতাসের সঞ্চয় পরিপূরণ করে নিতে।

যেটুকু বাতাস একটা পতঙ্গ সঙ্গে নিয়ে যায় সেটা বেশি নয়, তা দিয়ে বেশিক্ষণ কাজও চলত না, যদি না জল থেকে ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা থাকত। এটা সহজেই লক্ষ্য করা যায় সেই সব ক্ষেত্রে যেখানে ব্যপন সম্ভব হয় না। যেমন ধরো, যদি জলের গুবরে পোকা বা উলটো সাতারু পোকাদের ফোটানো জলে ছেড়ে দেওয়া হয় — দেখবে কিছুক্ষণের মধ্যে তারা মরে যাবে কেননা এই জলে দ্রবীভূত বাতাস একেবারেই নেই, যার ফলে অকসিজেনের পুরিপূরণ হতে পারে না।

ঠিক একই ব্যাপার ঘটবে যদি পোকাদের সেই জলে ছেড়ে দেওয়া হয় যে জলে দ্রবীভূত আছে কেবল অকসিজেন এবং সে অকসিজেন ও একেবারে খাঁটি অবস্থায় যদি সঞ্চিত ভান্ডার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ভান্ডার খালি হয়ে যাবে আধঘণ্টার মধ্যে এবং এই পরিস্থিতিতে ব্যপন ঘটবে না।

উলটো-সাঁতার জলের মধ্যে ছ'ঘন্টার বেশি বাঁচে না তার বাতাসের ঘাটতি পূরিয়ে না নিয়ে। তার অর্থ হোল এই যে বাতাসের বুদ্বুদের মধ্যে জল থেকে অকসিজেনের ব্যপন হওয়ার দরুণ পতঙ্গটা বাতাসের ঘাটতি পূরণ না করে আরো অনেক বেশি সময় জলের মধ্যে থাকতে পারে।

ছোট ছোট পতঙ্গ-রা যারা খুব সামান্য অকসিজেন ব্যবহার করে, দীর্ঘসময় বাতাসের সরবরাহ পূরিয়ে না নিয়ে থাকতে পারে। আবার এটাও দেখা গেছে যে অকসিজেনের ভান্ডারে ঘাটতির জন্য ততটা কাতর তারা হয়না যতটা হয় বুদ্বুদের বাতাসে নাইট্রোজেন কমে গেলে। বাতাসের বুদ্বুদগুলি যদি সূক্ষ্ম একটা বুরুশ দিয়ে সরিয়ে নিয়ে তার জায়গায় নাইট্রোজেনের বুদ্বুদ রেখে দেওয়া হয় তখন দেখা যাবে খাঁটি অকসিজেনসম্পৃক্ত জলের মধ্যে জলের পোকা দীর্ঘকাল স্বচ্ছন্দে থাকবে কারণ নাইট্রোজেনের বুদ্বুদ শীঘ্রই জলে মেশা অকসিজেন থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে অকসিজেন ব্যপনের সাহায্য সংগ্রহ করবে।

কতকগুলি পতঙ্গ আছে যারা নিজে নিজে জল থেকে উঠে এসে অকসিজেনের ঘাটতি পূরণ করে নিতে পারে না। সীলের গায়ে থাকে কয়েকজাতের সমগোষ্ঠীর উকুন। এই পরজীবীরা আশ্রয়দাতার শরীর থেকে কখনোই অন্যত্র যায় না, তাই সীলেরা জল থেকে উপরে উঠলেই কেবল তারা বাতাসের ঘাটতি পূরণ করে নিতে পারে। তাই তাদের অভ্যাস হয়ে গেছে সুদীর্ঘ সময় জলের নীচে থাকা। যে পোকাগুলি সীলের দেহে থাকে তাদের বুকে ও তলপেটে আছে চওড়া আঁশ যার মধ্যে বেশ খানিকটা বাতাস সঞ্চিত থাকে। বাতাসের খুব বড় ভান্ডার এদের দরকার হয় না কেননা সীল নিজেই তো বারবার নিঃশ্বাস নিতে জলের উপরে ভেসে উঠে।

ল্যাবিরিনথ-মাছের ডিম-ফোটা বাচ্চারা এমনি যান্ত্রিক ফুসফুস ব্যবহার করে। যেজন্য এদের বাবা-মা তৈরি করে দেয় বাতাসের বুদ্বুদ দিয়ে ঠাসা লালার মতো আবরণের মধ্যে একটা বাসা। ডিম-ফোটা বাচ্চা থাকে এই রকমেরই এক ফোঁটা তরলের মধ্যে এবং ভেসে বেড়ায় বুদ্বুদের মধ্যে যার ভিতরে রয়েছে অকসিজেনের পর্যাপ্ত সরবরাহ। অকসিজেনের ঘাটতির পূরণ হয়ে যায় বাতাস থেকে।

পলিএকানথাস্-এরা, বাঁচে একটু বেশি সমৃদ্ধ অকসিজেনের পরিমন্ডলে — তারা কিন্তু বাসা বানায় পাতার উপরের তলে নয়, বরং কোন জলজ গাছের চওড়া পাতার জলের ভিতরের তলে বা একটা পাথরের নীচে

বা ফাটলের মধ্যে। জলে অকসিজেন আছে তাই এই যান্ত্রিক ফুসফুস জলের গভীরেও কাজ করে। এর ফলে এরা জলের নীচে ঘন গাছপালার মধ্যে কিংবা ফাটলের ভিতরে জঞ্জালের মধ্যে থাকতে পারে। পলিএকানথাস অকসিজেনসমৃদ্ধ বাতাস নেয় তার সঞ্চয় ভান্ডার থেকে আর কারবন ডাই অকসাইড মিশ্রিত নাইট্রোজেনের বুদ্বুদ ফিরিয়ে দেয় সেই ভান্ডারে আবার কারবন ডাই অকসাইড থেকে পরিশ্রুত এবং পুনর্বার অকসিজেনে সমৃদ্ধ হয়ে যাবার জন্য। তাই পলিএকানথাস-এরা উপরে উঠে আসে কেবল তখনই, যখন নাইট্রোজেনের ঘাটতি দেখা দেয়।

অকসিজেনের সন্ধানে

আমাদের এই গ্রহে অকসিজেন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, যে কারণে প্রাণীরা বেশি পরিমাণে অকসিজেন সঞ্চয় করে রাখতে শেখে নি। জমির উপর যে-সব প্রাণী বাস করে তাদের মধ্যে কেবলমাত্র কয়েকটি প্রচুর পরিমাণে অকসিজেন জমা করে রাখতে পারে। অবশ্য অল্প পরিমাণে জমা করে রাখতে পারে বহু প্রাণী।

যদি আলভিওলাই-এর সূক্ষ্ম রক্তবহানাড়ীর মধ্যে দিয়ে যেতে রক্তের সময় লাগে মাত্র দু'সেকেন্ড, এই সময়টুকুই যথেষ্ট আলভিওলাই-এর বাতাস এবং রক্তের অকসিজেনের মধ্যে একটা সমতার সৃষ্টি করতে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে রক্তে যেটুকু অকসিজেন দ্রবীভূত হতে পারে সেটা হোল অণু পরিমাণ (প্রতি ঘন সেন্টিমিটার রক্তের প্লাজমাতে 0·003 ঘনসেন্টিমিটার)। কোন প্রাণীর পক্ষে এই উপায়ের সাহায্যে যথেষ্ট পরিমাণে অকসিজেন পেতে হোলে ফুসফুসের আয়তন আর তার মধ্য দিয়ে বহে যাওয়া রক্তের পরিমাণ প্রায় একশ গুণ বাড়ানো দরকার। স্বভাবতই সেটা করা বেশ শক্ত।

প্রকৃতি আর একটা উপায় বেছে নিয়েছেন। রক্তের মধ্যে দিয়েছেন একটি পদার্থ যেটা সহজেই অকসিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়াতে মিলিত হয় এবং সাধারণ দ্রবণের তুলনায় ধরেও রাখতে পারে অনেক বেশি অকসিজেন*।

---

* শরীরের কোষকলার পক্ষে সঞ্চিত অকসিজেন যাতে সহজে প্রয়োজনের সময় ব্যবহৃত হতে পারে, সেজন্য এই পদার্থকে আবার আত্মস্থ অকসিজেনকে দ্রুত ছেড়েও দিতে হবে।

এই পদার্থটি হিমোগ্লোবিন। এই পদার্থের দুটি গুণ আছে যে জন্য শ্বাসকার্যে এই পদার্থটি অপরিহার্য। রক্ত যখন ফুসফুসে থাকে যেখানে প্রচুর পরিমাণে অকসিজেন আছে, হিমোগ্লোবিন তখনই অকসিজেনের সংস্পর্শে আসে। এই কারণে প্রতি ঘন সেন্টিমিটার রক্ত বয়ে নিয়ে যায় 0·2 ঘন সেন্টিমিটার অকসিজেন, তার মানে রক্তের আয়তনের প্রায় 20 শতাংশ এবং তারপর সেই অকসিজেনকে সঁপে দেয় দেহস্থ কোষকলাতে।

কতকগুলি দেহযন্দের দরকার পড়ে আরো বেশি পরিমাণে অকসিজেন, প্রধানত পেশীতে, যার অনেকগুলিকে ঘন্টার পর ঘন্টা ছন্দ, তাল রেখে কাজ করতে হয়। এরা হোল পায়ের বা ডানার পেশী, এবং চিবোবার পেশী — এছাড়া আছে শ্বাসযন্ত্রের পেশী বা হৃৎপিন্ডের পেশী যারা তো কখনোই কাজ বন্ধ করে না। এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, পেশীরা যে সময়ে কাজ করে তখন তাদের অকসিজেন সরবরাহ করা সম্ভব নয়। যখন একটা পেশী সংকুচিত হয় তখন তার ভিতরের রক্তবহানাড়ীগুলি কুঁচকে যায়, রক্ত তাদের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না।

পেশীরা তাদের জন্য একটি বিশেষ পেশী-হিমোগ্লোবিন-এ সঞ্চিত অকসিজেন ব্যবহার করে। রক্তের হিমোগ্লোবিন আর এই পদার্থটি প্রায় অভিন্ন — প্রধান তফাৎ হোল এই যে পেশীর হিমোগ্লোবিন অকসিজেনকে পাকড়াতে আর ধরে রাখতে আরো বেশী পটু, পরিপার্শ্বের অকসিজেনের মাত্রা খুব বেশি কমে গেলেই কেবল অকসিজেন ছেড়ে দেয়। উষ্ণ রক্তের প্রাণীরা হৃৎপিন্ডের পেশীর শতকরা 0·5 ভাগ এই পেশী-হিমোগ্লোবিন, যার ফলে প্রতিগ্রাম পেশীতে 2 ঘন সেন্টিমিটার অকসিজেন থাকতে পারে। এই মাত্রাটি পেশীকে স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে সাহায্য করে সেই সময়েও যখন রক্তের সরবরাহ বন্ধ থাকে (পেশী-সঙ্কোচের ফলে)।

জলজীবী স্তন্যপায়ী আর জলের পাখিদেরকে দীর্ঘ সময় জলের নীচে থাকতে হয়, তাই এরা এদের পেশীগুলিকে বিশেষত প্রধান পেশীগুলিকে অকসিজেনের সরবরাহ-ভান্ডারে পরিণত করেছে তাদের খুব বেশী পরিমাণে পেশী-হিমোগ্লোবিনে সম্পৃক্ত করে রেখে। এইভাবেই স্পার্ম-তিমি 30 থেকে 50 মিনিটকাল পর্যন্ত জলের মধ্যে ডুবে থাকতে পারে, সাঁতার কেটে অনেকটা দূরত্ব পার করতেও পারে। একটা কুমির ডুবে থাকতে পারে আরো বেশি সময় —দেড় থেকে দু'ঘন্টা পর্যন্ত।
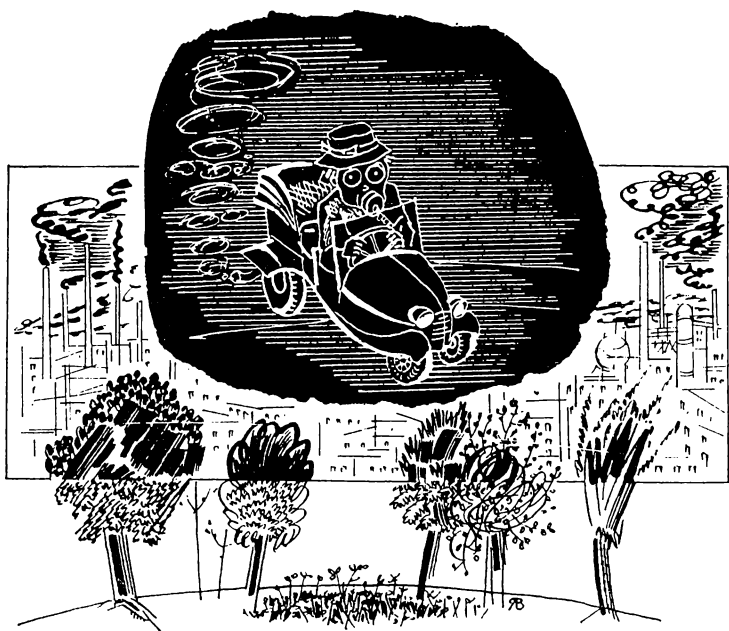
আমাদের বায়ুমন্ডলে প্রচুর অকসিজেন আছে, ঘাটতি যা হচ্ছে অনবরত সবুজ গাছপালা তার পূরণ করে চলেছে। মনে করা হোত যে মানুষকে অকসিজেনের অভাব কখনোই বোধ করতে হবে না। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে গভীর বেদনার সঙ্গে যে, সে আশা ক্রমে ক্রমে মিলিয়ে যাচ্ছে।

কয়েক বছর পূর্বে জাপানীরা অকসিজেন সঞ্চয় করে রাখতে বাধ্য হয়েছিল দৈনন্দিন পরিস্থিতিতে। জাপানের টোকিও এবং অন্যান্য বড় বড় শহরের রাস্তাগুলি সর্বদাই গাড়িতে ঠাসা থাকে, তাদের ধোঁয়া বাতাসকে বিষাক্ত করে কারবন ডাই অকসাইড আর কারবন মনকসাইড দিয়ে। এই বাতাস শ্বাসকার্যের পক্ষে অনুপযোগী যদিও তার মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে অকসিজেন থাকে।

যানবাহনের নিয়ন্ত্রণ করতে যাদের অনেকঘন্টা রাস্তায় থাকতে হয় তাদের পক্ষে কাজের পুরো সময়টা বহালতবিয়তে টিকে থাকা সম্ভব হয় না। খুব বেশি বিষ যাতে শরীরে ঢুকে না যায় সেজন্য তাদের আলাদা করে অকসিজেন

সরবরাহ করতেই হয়। আজকাল তাই এটা বেশ দীর্ঘকালের একটা প্রচলিত ব্যবস্থায় দাঁড়িয়েছে পুলিশস্টেশনে উচ্চচাপে সংরক্ষিত বাতাসের আধার রাখা, যেখান থেকে পুলিশের কর্মীরা মধ্যে মধ্যে উচ্চমানের বাতাস শ্বাসের সঙ্গে নিতে পারে। আজকাল তারা অকসিজেন-যন্ত্র বসাতে শুরু করেছে টোকিও শহরের রাস্তায় পথচারীদেরও জন্য, ঠিক যেমন দেখা যায় বিভিন্ন শহরে বাতাস-মেশানো পানীয়ের মেশিন। এর অর্থ হোল এই যে, যে কোন ব্যক্তি যন্ত্রে একটা মুদ্রা ফেলে দিলেই ফুসফুসটা অকসিজেন দিয়ে একবার পরিষ্কার করে তাজা করে নিতে পারবে।

এই পৃথিবীতে এমন অনেক স্থান আছে যেখানে অকসিজেন খুব সামান্যই আছে বা একেবারেই নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জীবিত প্রাণীরাই এজন্য দায়ী, ব্যাকটিরিয়ারা বিশেষত, খুব বেশি মাত্রায় অকসিজেন খরচ করে থাকে।

এক মিলিগ্রাম ব্যাকটিরিয়া প্রতি ঘন্টায় 200 মিলিলিটার অকসিজেন খরচ করতে পারে। মনে রাখা ভাল যে সমান ওজনের একটি কর্মব্যস্ত পেশী কেবল 20 মিলিলিটার অকসিজেন ব্যবহার করে আর সেই পেশীটা বিশ্রামের কালে কেবল আড়াই মিলিলিটার অকসিজেন নেয়। ব্যাকটিরিয়া এবং আর একটু বড় আকৃতির জীবাণুদের তৎপরতার ফলে এই গ্রহের অনেকগুলি কোণ ক্রমশ প্রাণকার্য নির্বাহের পক্ষে অনুপযোগী হয়ে উঠেছে, তাই প্রাণীদের সেইসব দুরূহ পরিবেশে বসবাস করতে হোলে আরো উদ্ভাবনশীল হতে হবে।

এমনি একটা কোণে সাফল্যের সঙ্গে ঘরবসত করে থাকে ইলেকট্রিক কুঁচে মাছ বা ঈল। এই বড় বড় মাছগুলি দক্ষিণ আমেরিকাতে বাস করে ছোট ছোট নদীতে আর জলার মধ্যে। বর্ষাকালে নদীগুলি হয়ে যায় খরস্রোতা, জলাগুলি বন্যায় ভেসে যায়, ঘোলা জলের ধারায় সেগুলি ভরে যায়। এই জলের ধারাগুলি অকসিজেন-পুষ্ট তাই জলের তলদেশের বাসিন্দারা শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারে স্বচ্ছন্দে। কিন্তু বর্ষার পরে যে খরা আসে তাতে নদীর জল কমে যায়, তাই জায়গায় জায়গায় সেগুলি হ্রদের সৃষ্টি করে যার মাঝে মাঝে শীর্ণ জলের ধারা কোন ক্রমে থেকে যায়, জলাগুলি শুকোতে থাকে। অগভীর জলাধারগুলি ক্রান্তীয় সূর্যের প্রখর তাপে উত্তপ্ত হয়ে উঠে, জলজ গাছপালা পচতে শুরু করে, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণুর হয় দ্রুত বংশবৃদ্ধি, দ্রবীভূত অকসিজেনের খরচ হতে থাকে যে হারে বাতাস থেকে ব্যপনের

সাহায্যে পাওয়া অকসিজেনের তুলনায় সেটা অনেক বেশি। এর ফলে সকল জলজীবী প্রাণীর পক্ষেই শ্বাসকার্য চালানো ভারি কঠিন হয়ে উঠে, শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। কিন্তু ইলেকট্রিক ঈল মাছদের তো অকসিজেনের অভাবে কোন কষ্ট হচ্ছে বলে মনে হয় না। তারা এই অবস্থায় দিব্যি থাকে। তার ওপর খাদ্যও পাওয়া যাচ্ছে প্রচুর। শুকিয়ে আসা জলাধারের সকল প্রাণীই কিসের আকর্ষণে যেন চলে আসে সেই জায়গাটায় যেখানে ইলেকট্রিক ঈল আস্তানা করেছে। প্রাণীদেহজ তড়িৎ-উৎপাদন কেন্দ্র সম্বন্ধে পরে আমরা আলোচনা করব, এখন শুধু এটুকুই স্মরণ রাখতে বলছি যে ইলেকট্রিক ঈলদের খাদ্যের জন্য শিকারকে কষ্ট করে ধরতে হয় না। তরল কাদা, কফির তলানির মত ঘোলা। তার মধ্যে তুমি তোমার নিজের নাকের ডগাটাও দেখতে পাবে না। সহজেই বোঝা যায় যে এই ঘোলা জলে দেখে শুনে কাউকে ধরা যায় না, দৈবাৎ কেউ ধরা পড়ে যায়। ঈল-এরা তাদের শিকারকে ধরে শক্তিশালী তড়িৎশক্-এর সাহায্যে — যাকে ধরেছে সেটা কেমন জানোয়ার তাও দেখবার চেষ্টা করে না।

ঈল-এর বাসস্থানের প্রতি এই আকর্ষণের হেতুটা কি? তারা কি জলাধারের সবচেয়ে ভাল জায়গাটাতে থাকে? মোটেই না, এর কারণ হোল, এই সাংঘাতিক মাছ তার শরীরের চারপাশের জলটাকে অকসিজেনে পুষ্ট করে তোলে। 600 ভোলট-এর তড়িৎসংঘাত জলকে বিভাজন করে ফেলে তার মৌল উপাদান দুটিতে যথা অকসিজেন এবং হাইড্রোজেন-এ এবং এই প্রাণদাত্রী জলের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নানা দিক থেকে ছুটে আসে অকসিজেন-ভিক্ষু মাছেরা।

এই তড়িৎসংঘাতের ফলে ইলেকট্রিক ঈল-এর শরীরস্থ জলও বিভাজিত হয়ে যায়। এর ফলে যে অকসিজেন পাওয়া যায় সেটা তৎক্ষণাৎ রক্তের সাহায্যে ছড়িয়ে যায় সারা শরীরে, কিন্তু হাইড্রোজেনকে তাড়াতে হবে। গিলস্ থেকে এই হাইড্রোজেন বিতাড়িত হয় এবং ছোট ছোট বুদ্বুদের ফিন্‌কি হয়ে সেই গ্যাস জলের উপর চলে আসে, এই বুদ্বুদগুলি থেকে রেডইনডিয়ান মাছ-শিকারীরা জানতে পারে কোথায় আছে এই বিপদজনক মাছ এবং দেরি না করে তারা মাছটাকে মেরে ফেলে, নিজেদের খাওয়ার টেবিলে মাছের ব্যবস্থা হয়ে যায়।

ঈল ছাড়াও আছে আর এক জাতের অদ্ভুত মাছ — লেপিডোসাইরেণ, এরাও থাকে দক্ষিণ আমেরিকার জলাভূমিতে। সম্পূর্ণ, শুকিয়ে যাওয়া

জলার মধ্যেও এরা বেঁচে থাকতে পারে সেই সব অঞ্চলে যেখানে জলের মধ্যে অকসিজেন থাকে খুব অল্প মাত্রায়, এমন কি বর্ষাকালেও। পূর্ণবয়স্ক মাছেরা খুব সামান্য অকসিজেনেই কাজ চালাতে পারে কারণ এদের ভেসে থাকার বাতাস-থলি একজোড়া শ্বাসযন্ত্রে পরিণত হয়ে গেছে। এরা শ্বাসের সঙ্গে বাতাস নিয়ে থাকে কিন্তু মুস্কিল হোল এই যে শুকিয়ে আসা অকসিজেনশূন্য সাদাজলে ডিম ফুটিয়ে বাচ্চাদের পালন পোষণ কেমন করে করা যায়। সন্তান পরিচর্যার এক অভিনব উপায় বের করেছে এই লেপিডোসাইরেন মাছেরা। কৃতিত্ব অবশ্য পুরুষ মাছের, বর্ষকাল এলে এই মাছ জলের তলায় একটি ছোট কিন্তু গভীর গর্ত বা খানা খুঁজে নেয় এবং স্ত্রী-মাছকে সেখানে নিয়ে যায়। ডিম পাড়া এবং নিষিক্ত হয়ে গেলে স্ত্রী-মাছটা সাঁতার কেটে চলে যায় জায়গাটা ছেড়ে। ছানাপোনা রইল সব বাবার কাছে।

সন্তান জন্মানোর ঋতুতে লেপিডোসাইরেন পুরুষ সাজে তার বিয়ের পোশাকে। খুব লম্বা লম্বা সুতোর মতো ডাঁটি বেরুতে থাকে তার তলপেটের পাখনা থেকে। এই আজব পোশাকে পুরুষ-মাছকে দেখায় বেশ অদ্ভুত। স্ত্রী-মাছকে আদর করছে বা বাসা পাহারা দিচ্ছে, তার পাখনাগুলি সব নামানো রয়েছে বাচ্চাদের ঘিরে। এই বিয়ের পোশাক কিন্তু কেবল স্ত্রী-মাছকে আকর্ষণ করার জন্যেই নয়, পাখনাগুলি বাচ্চাদের জন্য অকসিজেন সরবরাহের নল হিসেবে কাজ করে। লেপিডোসাইরেন পুরুষের এই অস্থায়ী ডাঁটিগুলি ছোট ছোট রক্তবহানাড়ীতে ভরা যার ফলে তাদের রক্ত থেকে অকসিজেন পরিপার্শ্বের জলে চলে যেতে পারে।

যুৎসই একটা জায়গা পেলে — যেমন অগভীর জায়গায় একটা গর্ত বা খানা আসল জলাশয় থেকে সম্পূর্ণ বিছিন্ন — সেখানে বাচ্চাদের জন্য অকসিজেন যোগানো কত সহজ। পুরুষ-মাছ এই অবস্থায় জলের উপর নাকটি বাড়িয়ে বাতাস থেকে অকসিজেন নেয়, বাচ্চাদের নিজের শরীরের নীচে আগলে রেখে, এইভাবে রক্তটা অকসিজেন-পুষ্ট করে নিয়ে তারপরে জলে সেই অকসিজেন ছেড়ে দেয় একটু বর্ধিত মাত্রায়। বদ্ধজলে এই কাজ চলে বেশ ভালই তবে গর্ত বা খানা যাতে বাসা করা হয়েছে সেটা বেশ ছোট হওয়া চাই।

বদ্ধ জলাশয় অকসিজেনের আর একটি উৎস আছে — সবুজ উদ্ভিদ। যদি গাছ থাকে মাত্র কয়েকটা, যেটুকু অকসিজেন তারা ছাড়ে তা যদি জলকে

সম্পৃক্ত করতে না পারে তাহলে আর কি করা, ওই গাছের গায়ে বসে থাকা যাক, যেটা করে থাকে নানা জাতের পতঙ্গ। কারণ হোল এই অঞ্চলটা তো আরেকটু বেশি অকসিজেন-পুষ্ট।

জলজ উদ্ভিদের গায়ে অকসিজেনের ছোট ছোট বুদ্বুদ অনেক সময় দেখা যায়। ম্যাকরোপ্লিয়া পতঙ্গরা তাদের ছোট ছোট পা দিয়ে এই বুদ্বুদগুলিকে টেনে নিয়ে আসে তাদের শুঁড়ে। কিছুকাল পরে এই বুদ্বুদগুলি মিলিয়ে যায়, যার থেকে আমাদের মনে হয় অকসিজেন গ্যাসের বুদ্বুদ আর আসছে না, পোকাটা গাছটাকে কেটে দিল, বসে রইল কখন কাটা গাছ থেকে বাতাসের নল দিয়ে বেরিয়ে আসবে বাতাস। জলের ঘুণ পোকাদেরও এই পদ্ধতির প্রয়োগ করতে দেখা যায়।

ম্যাকরোপ্লিয়া আর ডনিসিয়া জাতের গুবরে পোকার শূককীটেরা গাছে ফুটো করে সেই ফুটোতে নাক ডুবিয়ে বসে থাকে। অন্য পোকারা গাছের গায়ে শুঁড় ঢুকিয়ে দিয়ে কোষের অন্তর্বর্তী জায়গা থেকে অকসিজেন শুষে নিয়ে আসে। কোষের অন্তর্বর্তী জায়গাগুলি শূককীট থেকে মূককীটে রূপান্তরের পক্ষে খুব সহায়ক। তবে ব্রাজিলের প্যারাপনিকস্ জাতের পতঙ্গের শুঁয়োপোকাদের উদ্ভাবনী শক্তি আরো বিচিত্র। সবুজ পাতার টুকরো দিয়ে এরা বাসা বানায়, শুকিয়ে গেলে আবার তাজা পাতা নিয়ে আসে। এর ফলে দিনের আলোর সময়ে এদের বাসাতে অকসিজেন থাকে অনেক, কিন্তু রাত্রে যাতে পাতা থেকে নির্গত কারবন ডাই অকসাইডে দম বন্ধ হয়ে না যায়, সেজন্য শুঁয়োপোকাদের খানিকটা সময় বাসার বাইরে ঘুরে বেড়াতে হয়।

মেরুদন্ডী প্রাণীর পাকস্থলীতে বা অন্ত্রে যে পরিমাণ অকসিজেন পাওয়া যায় সেটা নগণ্য। কিন্তু কতকগুলি জীবিত প্রাণী যারা সৌরালোকপ্লাবিত ভূপৃষ্ঠের কোথাও স্থান পায়নি, তারা কিন্তু শিখেছিল কি করে অকসিজেন সংগ্রহ করতে হয়। এদের মধ্যে বট্-দের স্থান তুচ্ছ নয়। এরা (বট্ মাছির শূককীটেরা) ঘোড়ার অন্ত্রে বাস করে। আর সব পতঙ্গের মতোই বট্-দের শ্বাসকার্যের জন্য আছে ক্লোমনালীর কাঠামো যেটা খুবই মজবুত আর শাখায়িত, যে-সব শূককীট মুক্তস্থানে বাস করে তাদের চেয়ে ন্যূন মোটেই নয়। এদের আবার লাল দেহযন্ত্র আছে যেগুলির যুগ্মগঠন — অনেকগুলি লাল কোষ দিয়ে তৈরি। একটি করে ক্লোমশাখা এক একটা কোষে প্রবেশ করে এবং তার প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে অসংখ্য ক্লোমনালীকণায় বিস্তৃত হয়ে যায়।

এখনো পর্যন্ত আমরা জানিনা এই লাল দেহাংশের কি কাজ, কিন্তু এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে বট্-মাছির শূককীটদের অকসিজেন যোগানোর কাজে এই লাল দেহাংশের কার্যকর ভূমিকা রয়েছে। এর প্রমাণ হোল এই যে, এই কোষগুলির লাল রং ইঙ্গিত করে প্রচুর পরিমাণে হিমোগ্লোবিনের উপস্থিতি, যার অকসিজেনের প্রতি অনুরাগ অর্থাৎ খুব সামান্য অকসিজেন থাকলেও তার সঙ্গে মিলিত হবার ক্ষমতা স্তন্যপায়ীদের থেকে শত গুণ বেশি।

অ্যাসকারাইডস্-রা থাকে অন্ত্রে, প্রায়শই স্তন্যপায়ীদের শরীরে এদের পাওয়া যায়। অতিসম্প্রতিকাল পর্যন্ত মনে করা হোত যে এরা অকসিজেন ছাড়া বাঁচতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা শুয়োরের ক্রিমির শরীরে দুই প্রকারের হিমোগ্লোবিন পেয়ে বিস্মিত হলেন। এই দুই প্রকারের হিমোগ্লোবিন শরীরের দুটি অঞ্চলে জমা হতে দেখা গেল — শরীরের দেয়ালে আর আন্ত্রিক তরল পদার্থে — যা দিয়ে দেহগহ্বরটা ভরা থাকে। বাইরের হিমোগ্লোবিন 2500 গুণ আর ভিতরের হিমোগ্লোবিন 10,000 গুণ বেশি সময় অকসিজেন-কে ধরে রাখতে পারে — শুয়োরের শরীরস্থ হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে তুলনা করলে।

এখন কথা হোল এই যে, ক্রিমির শরীরে হিমোগ্লোবিনের কি-কাজ, যদি অকসিজেন ছাড়াই সে বাঁচতে পারবে? খাতা-কলমে হিসেবে করে দেখানো যায় যে বর্ধমান অকসিজেনের তৃষ্ণা এবং সেই সঙ্গে নিদারুন অকসিজেনর ঘাটতি — এই পরিস্থিতিতে দুই প্রকারের হিমোগ্লোবিনের ব্যবস্থা অকসিজেনের পরিবহনের ব্যাপারে আদর্শভাবে কার্যকর হতে পারে। আরো আদিম জীবদের, বিশেষত ব্যাকটিরিয়াদের হিমোগ্লোবিন নেই তাই তারা পরিপার্শ্ব থেকে সরাসরি অকসিজেন ছেঁকে নিতে পারে না। আবার, দুর্ভাগ্যক্রমে তাদের প্রায়শই যে পরিবেশে থাকতে হয় সেখানে অকসিজেন নেই বললেই চলে। তা সত্ত্বেও অকসিজেনের অভাবের সঙ্গে তারা সুখেই মানিয়ে নিয়ে চলেছে। এই কারণেই এদের নাম দেওয়া হয়েছে অ্যানারোবিস (anaerobes) বা যারা বায়ু ছাড়াই বাঁচে।

অবায়ুজীবী বা অ্যানারোবিস প্রাণীরা বায়ু ছাড়া বাঁচে কেমন করে? অল্প কিছুকাল আগে পর্যন্ত সমস্যাটার কোন সমাধান জানা ছিল না। আজ আমরা জেনেছি যে অকসিজেন তাদেরও দরকার। বাতাস থেকে অকসিজেন আলাদা করে না নিয়ে এরা নেয় জৈব পদার্থ থেকে। কোন কোন

ব্যাকটিরিয়া আছে যারা আবার অজৈব পদার্থ থেকেও অকসিজেন নিষ্কাশন করতে পারে। নাইট্রাইট এবং সালফাইট-এর সাহায্যে অ্যানারোবিস-এর শ্বাসকার্য চলে বিপাকীয় পদার্থের জারণের দ্বারা, বাইরে থেকে বাড়তি অকসিজেনের সাহায্য ছাড়াই। যে পদার্থের বিপাক ঘটছে তার মধ্যস্থিত অকসিজেনটুকুই ওরা পর্যাপ্ত মনে করে। কারণ, কোন পদার্থের জারণ যখন ঘটছে তখন অকসিজেন যোগ বা হাইড্রোজেন বিতাড়ন এই দুটি প্রক্রিয়ার যে কোন একটাই সমার্থক।

হাইড্রোজেন বিতাড়নের দ্বারা যে জারণ তার নাম সন্ধিতকরণ বা fermentation। এর ফলে জৈব পদার্থ ভেঙে যায় জারিত এবং বিজারিত পদার্থে, সেই সঙ্গে প্রাণীর জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি মুক্ত হয়।

এককোষী প্রাণীদের ক্ষেত্রে সন্ধিতকরণের সবচেয়ে ভাল উদাহরণ হচ্ছে গ্লুকোজের বিভাজন — দুটি ইথাইল অ্যালকোহল-এর অণুতে (বিজারিত পদার্থ) এবং দুটি কারবণ ডাই অকসাইড অণুতে (জারিত পদার্থ)।

বহুকোষী প্রাণীদের ক্ষেত্রে সন্ধিতকরণ-এর খুবই সাধারণ দৃষ্টান্ত হোল ল্যাকটিক সন্ধিতকরণ, যে বিক্রিয়ার ফলে কারবোহাইড্রেট-এর বিয়োজন ঘটে, যেমন একটি চিনির অণু ভেঙে হয় দুটি ল্যাকটিক অ্যাসিডের অণু যার মধ্যে আছে প্রাথমিক পদার্থটি থেকে কম শক্তি। কারবোহাইড্রেট-এর ভেঙে যাওয়াটা ঘটে কয়েকটি ধাপে, ভিন্ন ভিন্ন বিক্রিয়ার সাহায্যে। এর ফলে চিনির অণুর মধ্যস্থিত যে অকসিজেন পরমাণু ভিতরের কারবন পরমাণুর সংলগ্ন ছিল সেটার স্থানান্তর ঘটে, সেটা চলে আসে বাইরের দিকের একটা কারবন-পরমাণুর গায়ে। এই স্থানান্তরের ফলে শক্তির উদ্ভব ঘটে।

জারণের আর একটা পদ্ধতি আছে, ইলেকট্রন বিচ্যুতির দ্বারা, তবে জীবিত প্রাণীরা এই পদ্ধতি ব্যবহার করে কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট চর্চা হয় নি।

একটা প্রশ্ন ওঠে, যদি জীবিত প্রাণীরা সন্ধিতকরণ প্রক্রিয়ার দ্বারাই অকসিজেন পেতে পারে, তাহলে বাতাস থেকে অকসিজেন কেন নিয়ে থাকে? এর অনেকগুলি প্রধান কারণ আছে। সন্ধিতকরণ প্রক্রিয়ার জারন কখনোই সম্পূর্ণ হয় না তাই শক্তি যা উদ্ভূত হয় সেটা সামান্যই। যদি এক গ্রাম-মলিকিউল গ্লুকোজ সম্পূর্ণভাবে জারিত হয়ে কারবণ ডাই অকসাইড আর জলে বিশ্লিষ্ট হয় তাহলে *673* কিলো-ক্যালরি পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায়।

কিন্তু সন্ধিতকরণ প্রক্রিয়ায়, ইথাইল অ্যালকোহল আর কারবন ডাই অকসাইডের সাথে নির্গত হয় 25 কিলো-ক্যালোরি অর্থাৎ 27 ভাগের একভাগ শক্তি। এর অর্থ হোল এই যে বায়ুশ্বাসী প্রাণীদের থেকে সাতাশ গুণ বেশি গ্লুকোজ ব্যবহার করতে হবে অবায়ুশ্বাসীদেরকে সম-পরিমাণ শক্তি পেতে হলে। তফাৎটা এত বেশি যে প্রকৃতি এই অপচয় বরদাস্ত করেন না।

আর একটা প্রধান কারণ হোল এই যে সন্ধিতকরণ প্রক্রিয়ায় কতকগুলি পদার্থ উৎপন্ন হয়, যেমন ইথাইল আর বিউটাইল অ্যালকোহল, ল্যাকটিক আর বিউটিরিক অ্যাসিড, অ্যাসিটোন প্রভৃতি যেগুলি প্রাণীশরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। এইসব ক্ষতিকর পদার্থ শরীর থেকে অপসারন করা সহজ নয়।

শ্বাসকার্য থেকে অনেক সময় দাহ্য গ্যাস উৎপন্ন হয়। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণীরা প্রায়শই হাইড্রোজেন নিঃসরন করে থাকে। এই উপায়েই জীবাণুরা উইপোকার অন্ত্রে শ্বাসকার্য চালায়। বহুকোষী প্রাণীদের মধ্যে কোন কোন মাছির শুকেরা প্রচুর পরিমাণে হাইড্রোজেন ত্যাগ করে, আরো কতকগুলি প্রাণী আছে যারা কেবল হাইড্রোজেন নয়, মিথেন ও আরো অনেকগুলি গ্যাস ত্যাগ করে যাদের কয়েকটি এখনো অজ্ঞাত। এর মধ্যে আছে বিনা ইন্ধনে জ্বলে-ওঠা গ্যাস। ভারি সুন্দর দেখায় যখন এই গ্যাসগুলি জলার কাদার নীচে জমা হয়ে উপরে উঠে আসে এবং রহস্যময় নীলচে আভায় জ্বলতে থাকে।

তাহলে কেমন করে প্রাণীরা তাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের পদ্ধতি বদলে ফেলল, আর নিজেদের অকসিজেন-বিহীন বাতাবরণের উপযোগী করে তুলল? কাজটা খুব কঠিন ছিল না। এই পৃথিবীতে প্রাণের সঞ্চার যে-যুগে সর্বপ্রথম হয় তখন মুক্ত অকসিজেন এত প্রচুর পরিমাণে উপলব্ধ ছিল না, তাই আদিমতম জীবিত প্রাণীরা ছিল অবায়ুশ্বাসী। যতদিন না বায়ুমন্ডল অকসিজেনে পুষ্ট হয়ে উঠেছিল, ততদিন সময় লেগে গেল প্রাণীদের শিখে নিতে কেমন করে শক্তি উদ্ভবকারী পদার্থকে সম্পূর্ণভাবে দাহন করা যায়। একই সঙ্গে অবায়ুশ্বসন পদ্ধতিটার বিলোপ ঘটলো না, বংশধারার সঙ্গে চলতে থাকল, পৌঁছাল এসে আমাদেন কাল পর্যন্ত। এই পরিচ্ছেদের শুরুতে বলা হয়েছে যে-সকল প্রাণীর ক্ষেত্রেই শক্তি নিষ্ক্রমণের প্রথম পর্যায়টা আরব্ধ হয় অকসিজেন ছাড়াই। যখন বায়ুজীবী প্রাণীরা বসবাস করতে গেল

সেই সব অঞ্চলে যেখানে অকসিজেন পাওয়া যায় না, তখন আবার তাদের সীমিত উপযোগ করতে হোল কেমন করে আংশিক জারিত পদার্থকে বিষশূন্য করে নিতে হয়।

প্রাণীদের রাজত্ব যখন শুরু হোল আমাদের এই গ্রহে, বায়ুমন্ডলে তখনো অকসিজেনের ভাগ বেশ কম। আশ্চর্য কি যে জীবিত প্রাণীরা তখন নিজেদের মানিয়ে নিল অকসিজেনের ঘাটতির পরিমন্ডলেই। কিন্তু আমরা অপর একটি আরো বিভ্রান্তিকর ঘটনা লক্ষ্য করতে প্রায়ই ভুলে যাই সেটা হোল যে-সব প্রাণী অকসিজেনের প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করে তারা কেমন করে তাদের শরীরের মধ্যে জারণের বেগ ধরে রাখতে সক্ষম হয়, একটা জ্বলে-উঠব-উঠব আগুনকে নিবিয়ে দেবার জন্যে তারা সদাপ্রস্তুত।

বাতাসের অকসিজেনের অনুপাতে পরিবর্তন হয় না, যদি বা হয় সেটা কিছুটা কমের দিকে। এর ফলে ব্যাখ্যা করা যায় কেন বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীর আছে বিভিন্ন উপায় অকসিজেনের ঘাটতির বিরুদ্ধে লড়বার জন্য, কিন্তু অকসিজেনের আতিশয্য থেকে বাঁচবার কোন উপায়ই তাদের জানা নেই।

প্রায় একশ বছর আগে পল বার্ট (Paul Bert) প্রথম লক্ষ করেন যে খাঁটি অকসিজেন শ্বাসের সঙ্গে নিলে বিষক্রিয়া ঘটতে পারে। এই আবিষ্কারটা এমনই অপ্রত্যাশিত ছিল যে বিজ্ঞানীরা তাঁর কথায় বিশ্বাস করেন নি এবং সন্দেহ করা হয়েছিল যে পল বার্ট-এর ব্যবহৃত অকসিজেনে ছিল কোন বিষাক্ত গ্যাসের ভেজাল। পরীক্ষাগুলি বার বার করে পুনরনুষ্ঠিত হোল, কিন্তু যতরকমেই অকসিজেনকে নির্মল করা হোক না কেন যে-সব প্রাণীরা দীর্ঘ সময় ধরে শ্বাসের সঙ্গে নির্মল খাঁটি অকসিজেন নিয়েছিল তারা সবাই অবশ্যই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেল।

অকসিজেনের বিষক্রিয়ার ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের আগ্রহের সঙ্গত কারণ ছিল। সমস্যাটা ছিল ডুবুরীদের কাজের সুবিধা কি করে করা যায়। খাঁটি অকসিজেনের পরিমন্ডলে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে 24 ঘন্টার বেশি নয়। এর থেকে বেশি সময় থাকলে তার নিউমোনিয়া হবে এবং মৃত্যু ঘটবে দম বন্ধ হয়ে, অর্থাৎ শুনতে অবাক লাগলেও শরীরের প্রধান দেহযন্ত্রাদি ও কলাসমষ্টিতে অকসিজেনের ঘাটতির জন্য। যে কোন লোক (খাঁটি অকসিজেনের বাতাবরণে) দুই বা তিন আবহের চাপ সহ্য করতে পারে দেড় থেকে দু'ঘন্টা। এর পরে অকসিজেনের নেশায় সে আচ্ছন্ন হয়ে যায়, চলাফেরায় নিয়ন্ত্রণ হারায়, মানসিক বিভ্রমে পড়ে তার স্মৃতিভ্রংশ এসে

যায়। অকসিজেনের চাপ তিন আবহের অধিক হোলে তার তড়কা বা খেঁচুনি শুরু হয়ে যাবে এবং মৃত্যু ঘটবে।

যে-সব প্রাণী অকসিজেনের আত্যন্তিক ঘাটতির মধ্যে বাস করে, তাদের ক্ষেত্রে অকসিজেনের বিষক্রিয়া হয় আরো ক্ষতিকর। এই পদ্ধতিতে জীবিত মানুষের অন্ত্র থেকে ক্রিমির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়ে থাকে। অন্ত্রের মধ্যে অকসিজেন প্রবিষ্ট করে দেওয়া হয়, এতে মানুষের কোন ক্ষতি হয় না কিন্তু নির্ভুলভাবে পরজীবীগুলি মরে যায়।

অকসিজেনের আতিশয্য কেবল যে প্রাণীদের পক্ষেই ক্ষতিকর তা নয়, উদ্ভিদের পক্ষেও সমান বা আরো ক্ষতিকর। লক্ষণীয় যে উদ্ভিদেরা যদিও আমাদের এই গ্রহে বাতাসকে সম্পৃক্ত করে দেয় অকসিজেন দিয়ে, এই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল তাদের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়। তাদের পক্ষে এই বায়ুমণ্ডলে কারবন ডাই অকসাইড এর বেশ ঘাটতি রয়েছে অকসিজেন যেন বড় বেশি রয়েছে। সাম্প্রতিক পরীক্ষা থেকে জানা গেছে যে বাতাসে অকসিজেনের স্বাভাবিক ঘনত্বই শুধু নয়, পরন্তু কেবল 2% বা স্বাভাবিকের একভাগ অকসিজেনও সালোক সংশ্লেষণ-এর যথেষ্ট হ্রাস ঘটিয়ে দেয়। তার মানে, উদ্ভিদেরা যে আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে সেটা তাদের নিজেদের পক্ষে অনুপযোগী। যদি বাতাসে আরা কম অকসিজেন থাকত তাহলে তারা জন্মাতো আর বেড়ে উঠত আরো তাড়াতাড়ি।

খাঁকরি আর পাষাণ

অপারেশনের ঘরে সব চুপচাপ। একজন কমবয়সী অসাড়তাবিদ (anaesthetist) ঝুঁকে আছে একটি রোগিনীর শরীরের উপর। অপারেশনের জন্য সব কিছু তৈরি। ‘আনেসথেটিক্ দেওয়া শুরু করো,’ আদেশ দিলেন দীর্ঘদেহী, পক্ককেশ এক ব্যক্তি যিনি দাঁড়িয়েছিলেন হাত ধোবার জায়গায়। ‘আমি হাতটা ধুয়ে নিই।’।

যে অপারেশনটা হবে সেটা বেশ সহজ। তথাপি অপারেশনের টেবিলে শোয়া বেশ ভয়ের ব্যাপার তাই আশ্চর্য কি যে রোগিনী বেশ ভয় পেয়ে গেল যেই ইথারের প্রথম ফোঁটা তার ফুসফুসে ঢুকল, সে চেষ্টা করে মুখোসটা খুলে ফেলতে। নার্সকে মুখোসটা জোর করে চেপে ধরতে হয়, যুবক আনেসথেটিসট নিজর অজ্ঞাতে একটু বেশি মাত্রায় আনেসথেটিক পদার্থটা

দিয়ে ফেলে, কাম্য অবস্থায় পৌঁছানো যায় অল্পক্ষণেই। দুই-এক মিনিটের মধ্যেই রোগিনীর পেশীগুলি আলগা হয়ে যায়, সে শান্ত হয়ে যায়। কিন্তু রোগিণী যে কাঠের মতো হয়ে গেল। তার নিশ্বাস তো পড়ছে না! পরমুহূর্তে আনেসথেটিসট দ্রুত খুলে ফেলে মুখোসটা — কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস প্রয়োগ শুরু করে দেয়।

কাঁপা কাঁপা গলায় নার্সকে বলে লোবেলিন নিয়ে আসতে।

অতীতে, আনেসথিসিয়া ব্যবহারের ফলে শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া—মানে একটা বিপজ্জনক জটিলতা—প্রায়ই ঘটত। এটা হতে পারে আনেসথেটিক পদার্থের মাত্রা দ্রুত বাড়িয়ে দেওয়া হলে। আজকাল আনেসথেসিয়া প্রায়াগের যে পদ্ধতি নেওয়া হয়ে থাকে তাতে এই ধরনের জটিলতা যাতে না ঘটতে পারে বা ঘটলেও তার থেকে সামলে ওঠার ব্যাপারে শল্যবিদের হাতে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য সাবধানতার ব্যবস্থা আছে। তা সত্ত্বেও শিক্ষার্থী আনেসথেটিসট-এর পক্ষে তার বৃত্তির শুরুতেই এই ধরনের জটিলতার মুখোমুখি হওয়াটা বেশ অস্বস্তিকর, বিশেষত যদি এটা ঘটে তার নিজেরই অসাবধানতাবশত। এই কারণেই আনেসথেটিসট্ তৎপর হয়েছিল কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস পদ্ধতির প্রয়োগে। দুই তিনটি উদ্বিগ্ন মিনিট কেটে যায়, তার পরে রোগিনী প্রথম নিঃশ্বাস নেয়, তারপর দ্বিতীয়, তারপর তৃতীয়...।

‘ব্যস ঠিক আছে’, শল্যবিদ আদেশ দেন, কিন্তু শ্বাসকার্য আবার থেমে যায়। কাগজের মতো সাদা আনেসথেটিসট-এর মুখ, সে আবার ঝুঁকে পড়ে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস প্রয়োগ শুরু করে। এবারে শল্যবিদ তাকে আশ্বস্ত করেন, বলেন যে সে রোগিণীকে একটু বেশিমাত্রায় বাতাস দিয়ে ফেলেছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষা আবার শুরু হয়। অবশেষে রোগিণী আবার একটি শ্বাস নেয়। তারপর আবার, তারপর আবার। ক্রমশ শ্বাসকার্য আরো ঘন ঘন এবং স্বাভাবিক হয়ে আসে।

রোগিণীর কেন দুবার শ্বাসরোধ হয়েছিল অপারেশনের সময়? প্রথমবারের কারণ তো স্পষ্ট। নিদ্রাকর ওষুধের অতিপ্রয়োগের ফলে মস্তিষ্কের মেডুলা অবল্যাংগাটাতে অবস্থিত শ্বাসকেন্দ্রের অবদমনের ফলে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় বারের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার কারণটা আরো জটিল। এটা বুঝতে হলে আগে আমাদের জানতে হবে শ্বাস-কার্য নিয়ন্ত্রিত হয় কেমন করে। শ্বাস-কার্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ধারক যন্ত্র সক্রিয় হয়ে থাকে। প্রথমটি ফুসফুস-স্থিত ধারক, যারা মস্তিষ্কের শ্বাসকেন্দ্রে পৌঁছে দেয়

ফুসফুস কতটা সংকুচিত বা প্রসারিত হয়েছে সেই বার্তা। তারা মস্তিষ্ককে তথ্য পাঠায় স্থির করতে যে রেচক বা পূরকের কাজটা কখন বন্ধ করতে হবে।

রাসায়নিক ধারকগুলির গুরুত্ব আরো বেশি। এদের কয়েকটি আছে ক্যারোটিড ধমনীতে, অন্য কতকগুলি আছে মহাধমনীতে। এরা নিয়ন্ত্রণ করে রক্তে অকসিজেনের মাত্রার ঘনত্বকে। যেইমাত্র শ্বাসকেন্দ্রে খবর পৌঁছায় যে রক্তে অকসিজেন কমে গেছে তখনি তারা একটি আদেশ পাঠায় যে শ্বাস-প্রশ্বাস আরো দ্রুত করতে হবে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই শ্বাসগ্রহণ হয় অগভীর। এর কারণ হোল এই যে অকসিজেনের অভাবে মস্তিষ্কের শ্বাসকেন্দ্রের তৎপরতা হ্রাস পায় তাই সামান্যতম ইঙ্গিতমাত্রই যে ফুসফুসের প্রসারণ ঘটেছে, থামিয়ে দিতে পারে প্রশ্বাসের বাতাস টেনে নেওয়া।

বাকি রাসায়নিক ধারকগুলি আছে শ্বাসকেন্দ্রের মধ্যেই। এদের কাজ হোল মুখ্যত রক্তে কারবণ ডাই অকসাইড-এর ঘনত্বের নিয়ন্ত্রণ। কারবন ডাই অকসাইড যদি বেশি থাকে তাহলে শ্বাসগ্রহণ হয় গভীর। আনোসথেটিসট যখন কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস দিচ্ছিল তখন ফুসফুসের বায়ুসঞ্চালন অনেক পরিমাণ বেড়েছিল রক্তে তাই অকসিজেনের সরবরাহ হয়েছিল প্রচুর। কারবণ ডাই অকসাইড-এর মাত্রা গিয়েছিল কমে। দুটি প্রধান উদ্দীপক, শ্বাস-প্রশ্বাস সঞ্চালনের জন্য যারা দায়ী, তারা গিয়েছিল অদৃশ্য হয়ে, ফুসফুস থেকে যে উত্তেজনার খবর আসছে প্রদমিত শ্বাসকেন্দ্রে তারা এত দুর্বল যে প্রশ্বাস টানা সম্ভব হচ্ছে না। এই জটিলতা বিপদজনক নয়। যদি কারবন ডাই অকসাইড-এর মাত্রা বাড়িয়ে স্বাভাবিক করে দেওয়া যায়(যেহেতু কোষ কলা-র শ্বাস-কার্য চলছে, কারবণ ডাই অকসাইড-এর মাত্রাও বাড়ছে) তবে নিশ্বাস-প্রশ্বাস চলতে থাকবে।

এইসব দেখে শুনে বোঝা যায় যে কারবন ডাই অকসাইড, যেটা প্রাণীদেহজ বিপাক থেকে উৎপন্ন একটা ক্ষতিকর পদার্থ, যা শরীর দ্রুত অপসারণ করে ফেলে, মানুষের প্রাণকার্যের জন্য সেটা ততটা অপ্রয়োজনীয় নয়।

বিজ্ঞানীরা যখন আবিষ্কার করলেন শ্বাসকার্যের অতিপ্রকৃতির আসল ভূমিটা কোথায়, তখন থেকে শ্বাসকেন্দ্রের কাজকে উজ্জীবিত করে তুলতে গ্যাসের মিশ্রণে কারবন ডাই অকসাইড যোগ করতে আরম্ভ করলেন। আনেসথেটিক্-এর সঙ্গেও কারবন ডাই অকসাইড যোগ করা হতে থাকল। এই গ্যাস

শ্বাসকেন্দ্রে উত্তেজনার সৃষ্টি ক'রে, সঞ্চালিত রক্তে অকসিজেনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

শ্বাসকেন্দ্র নিয়ন্ত্রণ করে প্রতিটি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ছন্দ এবং গভীরতা, স্বচালিতভাবে। তা হলেও আমরা ইচ্ছা করলে এর কাজে বাধার সৃষ্টি করতে পারি, জ্ঞানত ফুসফুসের বায়ু সঞ্চালনের আয়তন কম বেশি করতে পারি, এমনকি কিছু সময়ের জন্য শ্বাসকার্যের সঞ্চালন একেবারে বন্ধ করে থাকতে পারি। নিজেরা অভ্যাসের দ্বারা যতক্ষণ সম্ভব নিঃশ্বাস না নিয়ে থাকতে পারি। যে-সব জাপাণী মেয়েরা জলে ডুব দিয়ে শুক্তি তোলে তারা জলের নীচে থাকতে পারে চার থেকে ছ'মিনিট। এমনকি তাদের মজুরীও নির্ভর করে কতক্ষণ তারা জলের নীচে থাকতে পারে তার উপর।

এই ধরনের প্রশিক্ষণের একটা খারাপ দিকও আছে। জলের নীচে কাজ করা বিশেষ বিপজ্জনক এই কারণে যে, মানুষের স্নায়ুতন্ত্রে আছে একটা ধারকযন্ত্র যা মস্তিষ্ককে বলে দেয় অকসিজেনের মাত্রার ঘার্টতির কথা। কিন্তু কখন এই মাত্রা বিপদের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে সে খবর দিতে সে পারে না। সৌখিন ডুবুরীরা যাদের বিশেষ প্রশিক্ষণ নেওয়া হয়নি তাদের পক্ষে ভয়ের কিছু নেই কেননা রক্তে অকসিজেনের সরবরাহ ফুরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত তারা জলের নীচে থাকতেই পারবে না। কিন্তু পেশাদার ডুবুরীদের ক্ষেত্রে পরিস্থিতিটা একেবারেই ভিন্ন—কারণ প্রশিক্ষণের দ্বারা এরা পারে শ্বাসকেন্দ্রের কাজ প্রদমিত করে রাখতে, অকসিজেনের মাত্রা বেশ কমে যাওয়া পর্যন্ত তারা ততক্ষণ পর্যন্ত জলের নীচে থাকে যতক্ষণে তাদের শরীরস্থ অকসিজেনের সঞ্চয় শেষ করে ফেলে, তাই খুব সহজেই বিপদের সীমাটা ছাড়িয়ে যেতে পারে। এর ফলে অকসিজেনের বিশেষ অভাব দেখা দেয় যার কুফলের দরুণ প্রথমেই মস্তিষ্ক আক্রান্ত হয়। হঠাৎ চেতনা লোপ পায় এবং এই অবস্থা থেকে ডুবুরীর প্রাণ রক্ষা তখনই হতে পারে যখন তাদের কোন সাথীর লক্ষ্য পড়ে যায় এবং চিকিৎসা তৎক্ষণাৎ শুরু করা যদি হয়।

কারবন ডাই অকসাইড একটা বিপজ্জনক বর্জ্য পদার্থ। এই গ্যাস বর্ণহীন, এবং এর আপেক্ষিক গুরুত্ব অকসিজেন বা নাইট্রোজেনের থেকে অনেক বেশি। কারবন ডাই অকসাইড সেই সব জায়গায় জমে থাকে যেখানে বাতাস চলাফেরা করে না, যেমন চুনাপাথর আর জলমগ্ন গুহাতে। চতুর্দিকের পাথরগুলি সরবরাহ করে খানিকটা করে কারবণ ডাই অকসাইড যেটা মাটির নীচের রাস্তা বেয়ে নেমে যায় এবং গুহার নীচে জমা হয়ে গ্যাসের হ্রদের

সৃষ্টি করে। কেউ যদি এই অবস্থার জন্য প্রস্তুত না হয় নেমে যায় এই ধরনের গুহাতে, সম্ভবত তার মৃত্যু ঘটবে। জমির উপরের কয়েক স্থানে আছে তথাকথিত কুকুরের গুহা, যেখানে কারবন ডাই অকসাইড-এর হ্রদের গভীরতা বেশি নয়, তাই এই গুহা মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক নয়, এবং অনায়াসে তাকে ঠেলে হেঁটে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু কুকুর তাতে ডুবে যাবে।

বায়ুমণ্ডলের তৃতীয় উপাদান হোল নাইট্রোজেন। অকসিজেন ও কারবন ডাই অকসাইড-এর পরেই যার উপযোগিতা। শ্বাসকার্যে এই গ্যাস কোন অংশই নেয় না। সাধারণ চাপে শরীর এবং বাতাবরণের মধ্যে নাইট্রোজেন গ্যাসের বিনিময় ঘটে না, কেননা দেহের কোষকলায় যতটা আছে, রক্তেও আছে তুল্য মাত্রায়, তাই রক্তে নাইট্রোজেন সম্পৃক্ততার সীমা পর্যন্ত ঠাসা আছে।

যদি বাইরের বাতাসের চাপ খুব বেশি বাড়ানো হয়, তাহলে রক্তের মধ্যে বাতাসের গ্যাসগুলি তুলনামূলক ভাবে অসম্পৃক্ত হয়ে যাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে রক্ত এই গ্যাসগুলি বেগের সঙ্গে শুষে নিতে থাকবে, সেখান থেকে তারা ছড়িয়ে পড়বে কোষে, কলায় ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণে এই তিন মাধ্যমের মধ্যে একটা সমতা এসে পৌছায়।

এখন যদি চাপ কমিয়ে স্বাভাবিক করে দেওয়া হয়, বা চাপের যদি বেশ কিছুটা হ্রাস ঘটে, কোষে কলায় দ্রবীভূত গ্যাসগুলি ফিরে আসবে রক্তে। এই প্রক্রিয়াতে অকসিজেন-বিক্রিয়ার কোন ব্যাঘাত ঘটবে না, কেবল খুব দ্রুত খরচ হতে থাকবে, কিন্তু নাইট্রোজেন জমা হতে থাকবে রক্তবহানাড়ীতে এমন পরিমাণে যে সেটা রক্তে দ্রবীভূত হতে পারবে না এবং ফুসফুস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার মতো সময়ও পাওয়া যাবে না। নাইট্রোজেন-এর বুদ্বুদ ছোট ছোট রক্তবহানাড়ীগুলিকে বন্ধ করে দেবে। মস্তিষ্কর বা হৃৎপিন্ডের নাড়ী হলে তো এর ফলে মৃত্যুও ঘটতে পারে। রোগীকে বাঁচাবার একমাত্র উপায় হোল তাকে আবার উচ্চচাপের বাতাবরণের মধ্যে রাখা, এবং এইভাবে নাইট্রোজেনকে আবার রক্ত বা কোষকলার অন্তর্বর্তী তরলে দ্রবীভূত করা এবং ক্রমে ক্রমে চাপ স্বাভাবিক করা, যার ফলে শরীর থেকে নাইট্রোজেন-এর অপসারণের জন্য শরীরকে পর্যাপ্ত সময় দেওয়া হয়।

আবহের বাতাসে সাধারণত থাকে ধূলিকণা আর জলীয়বাষ্প। শহরের বাতাস নির্মল রাখা একটা প্রধান সমস্যা। ভেবে দেখ, বাতাসকে নির্মল বলে ধরা হয় যদি তাতে প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে ছ'হাজারের কম ধূলিকণা থাকে।

কারো যদি মনে হয় এই পরিমাণ অত্যন্ত বেশি, তাহলে তার জানা দরকার যে, বাড়িতে যে বাতাস আমরা শ্বাসের সঙ্গে নিই তার প্রতি ঘন সেণ্টিমিটারে আছে কুড়ি লক্ষ ধূলিকণা, যার ওজন দশ মিলিগ্রাম। তাই, আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে খারকভ আর লেনিনগ্রাদ, এই শহর দুটিতে রান্নার গ্যাস পৌঁছানোর আগে, প্রতি বর্গ কিলোমিটারে 300 থেকে 350 টন ধূলিকণা জমা হোত এক বছরে এবং ম্যাগনিটোগোরসক্ শহরে এই ধূলির পরিমাণ ছিল 700 টনের থেকেও বেশি। মানুষের শরীরে যদি ফুসফুসকে ধূলার হাত থেকে বাঁচাবার কোন ব্যবস্থা না থাকতে তাহলে শহরে যেসব শিশু বাস করে তাদের ফুসফুস ধূলায় পূর্ণ হয়ে বন্ধ হয়ে যেত তাদের জীবনের প্রথম বছরেই।

পক্ষান্তরে, জলবাষ্প কিন্তু দরকারী, কেননা এই পদার্থটি শরীরকে রক্ষা করে জলকণার অতিরিক্ত ক্ষয়ের থেকে। স্বাস্থ্যের সাধারণ নিয়ম অনুসারে, ধরা হয় বাড়ির ভিতরের বাতাসে থাকবে শতকরা 60 ভাগ জলবাষ্প। আর্দ্রতা এর থেকে কম হলে মানুষ কিছুটা অস্বচ্ছন্দ বোধ করে।

শেষ যে-উপাদানটি মানুষ বাতাস থেকে গ্রহণ করে সেটা হোল তড়িৎ। সচারচর আমরা ভুলে যাই যে আমাদের ফুসফুস প্রতিদিন যথেষ্ট পরিমাণে তড়িৎ খরচ করে থাকে, যদিও তড়িতের অনুপ্রবেশ বিশেষ জরুরী, শরীরের প্রাণকার্য নির্বাহের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াগুলির জন্য।

কোন ধরনের তড়িৎ আমাদের ফুসফুস শুষে নেয় এবং কেমন করেই বা তড়িৎ আবহাওয়ার মধ্যে থাকে? বিজ্ঞানীরা এই তড়িতের উপস্থিতি আবিষ্কার করেছেন মাত্র গত শতাব্দীর শেষ নাগাত। তারা জেনেছিলেন যে মাটিতে অতি সামান্য পরিমাণে যে ইউরেনিয়াম এবং অন্যান্য তেজষ্ক্রিয় মৌল থাকে তার দরুণ, কসমিক রশ্মি বা অতি বেগুনী রশ্মির সক্রিয়তার জন্য এবং তড়িৎ মোক্ষণের ফলে ইলেকট্রন আলাদা হয়ে থাকে গ্যাসের অণু বা পরমাণু থেকে। আলাদা হয়ে যাওয়া ইলেকট্রন বেশিক্ষণ একলা থাকতে পারে না। শীঘ্রই সেটা কোন উদাসীন অণু বা পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয়। ইলেকট্রনের আছে ঋণাত্মক আধান, যেটা সে দিয়ে থাকে গ্রহীতা অণুকে। অন্যপক্ষে, যে অণু একটা ইলেকট্রন হারাল সেটা ধনাত্মকভাবে আহিত হয়ে গেল, কেননা যে কোন পরমাণুর নিউক্লিয়াসে ধনাত্মক আধানের পরিমাণ তাতে যতগুলি ইলেকট্রন আছে তাদের সম্মিলিত ঋণাত্মক আধানের সমান।

বায়ুমন্ডলের আহিত অণুগুলিকে বলা হয় বায়ুমন্ডলীয় আয়ন। তাদের

মধ্যে অনেক ধূলিকণায় চেপে বসে থাকে, এরা ভারী আয়ন। অন্যেরা উদাসীন অণুতে যুক্ত হয়ে হালকা আয়নের সৃষ্টি করে।

বায়ুমন্ডলের আয়নের বেশির ভাগের উৎপত্তি হয় মাটির মধ্যে বা তার কাছে। মাটির কাছাকাছি বাতাসে প্রতি ঘন সেণ্টিমিটারে আট থেকে দশ জোড়া আয়নের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এরা ক্রমে ক্রমে জমা হয় না, কারণ কিছু ধ্বংস হয়ে যায় যখন দুটি বিপরীত আয়নে ধাক্কা লাগে, বাকিদের কঠিন বা তরল পদার্থ শুষে নেয় বা মহাকাশে ব্যাপ্ত হয়ে যায় যেখানে আয়নের সংখ্যা খুবই কম।

যদিও আয়নের সৃষ্টি সব সময়েই হয়ে থাকে জোড়ায় জোড়ায়, পরিবেশের বাতাসে সচারচর এক ধরনের আয়নই থাকে বেশি পরিমাণে। এর কারণ আমাদের পৃথিবীর মাটির কাছে ঋণাত্মক বায়ুমন্ডলীয় আয়নগুলিকে উপর দিকে ঠেলে দেয় আর ধনাত্মক বায়বীয় আয়নগুলি মাটির দিকে নেমে আসে, এবং জমা হয় বায়ুমন্ডলের সব চেয়ে নীচের স্তরে। কি পরিমাণ ভারী আয়ন থাকবে সেটা নির্ভর করে বায়ুমন্ডলে কতটা ধূলিকণা আছে তার উপর। সাধারণত ভারী আয়নের পরিমাণ হালকা আয়নের পঞ্চাশ গুণের থেকে বেশি হয় না।

প্রাণী-শরীরের পক্ষে এই আহিত গ্যাসের অণুগুলি কি দরকারী? প্রমাণিত হয়েছে যে তাদের না হলে চলে না। আ. ল. চিজেভস্কি একটা পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে বায়ুমন্ডলে আয়নের অভাব থাকলে সেই পরিবেশে রাখা জানোয়াররা কঠিন অসুখে পড়ে যায় এবং যদি তাদের শ্বাস নিতে দেওয়া হয় সেই বাতাস যাতে এক কণাও বৈদ্যুতিক আধান নেই তাহলে তারা দেড়দিন থেকে পাঁচদিনের মধ্যেই মরে যায়।

আবার, অন্যদিকে বায়ুমন্ডলে যদি আয়নের ঘনত্ব খুব বেশি হয়, বিশেষকরে ধনাত্মক আয়ন, সেটাও প্রাণীশরীরের পক্ষে হানিকর। টাইরল পর্বত (আলপস্) থেকে বহে আনা ফন (Foehn), জাপানের পূর্ব-দক্ষিণ দিক থেকে বহে যায় যে বাতাস, জাসামি, দক্ষিণ ইতালির বাতাস সিরক্কো, এরা বহন করে বহুসংখ্যায় ধনাত্মত্মক আয়ন, মানুষের উপর এদের প্রভাব বেশ দমিয়ে দেবার মতো। মাথাধরা, অসুস্থতা, রক্তচাপ বৃদ্ধি, যক্ষা ও আরো কয়েকটি রোগকে বাড়িয়ে দয়।

স্থিতিশীল আবহর স্বাভাবিক আধানের পরিবর্তন হোলে সেটা সহ্য করা কঠিন হয়ে ওঠে, কিন্তু সাধারণত ঋণাত্মক আয়ন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই
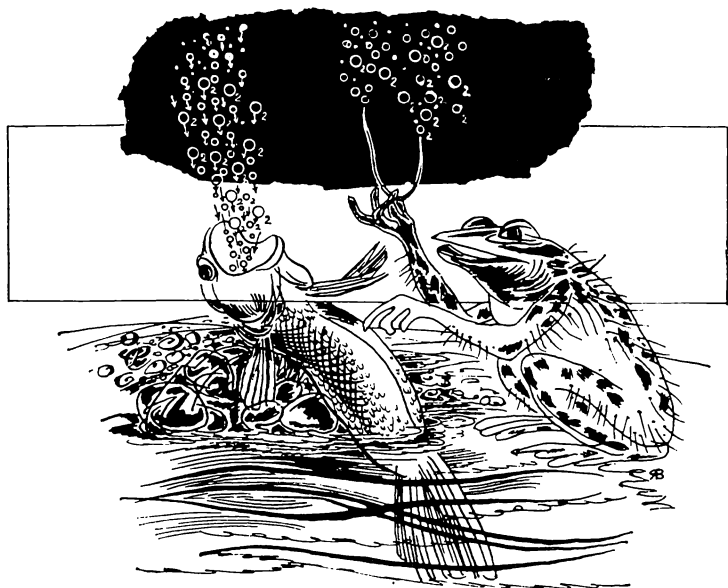
উপকারী। এই আবহাওয়া যক্ষা রোগীর পক্ষে হিতকর আর রক্তচাপও কমিয়ে দিতে পারে। আরো কয়েকটি অসুখ থেকে নিরাময়ে এই আবহাওয়া সাহায্য করে, এমনকি সংক্রামক ব্যাধিও।

বহুল পরিমাণে হালকা ওজনের ঋণাত্মক আয়নই অনেক স্বাস্থ্যকর অঞ্চলের রোগ নিরাময় ক্ষমতার কারণ। বাল্টিক সাগর উপকূলের কয়েকটি অঞ্চলে ঋণাত্মক আয়ন বাতাসে খুব বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় — জলপ্রপাতের ধারে, পাহাড়ী নদীর কোলে এবং শক্তিশালী ঝরনার পাশে। তড়িৎ আধানগুলি শরীরে এসে কিন্তু সেখানে জমা হয়ে থাকে না। দেহের কোষকলায় বিদ্যুৎ-পরিবহন বেশ ভালোই হয় এবং এই কারণে যে-সব আধান আমরা গ্রহণ করি সেগুলি আবার মাটিতে চলে যায় কালক্রমে।

বাতাসের আধান শরীরের উপর কি ধরনের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি কেমন ভাবে করে এই বিষয়ে অনেকগুলি মত আছে। একটি মত অনুসারে অণুগুলির বৈদ্যুতিক আধান ফুসফুসের কলার স্নায়ুপ্রান্তে সক্রিয় হয়, এবং এইভাবেই কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সার্বিক কাজকর্মকে প্রভাবিত করে। অন্যমতে, বাতাসের

আয়ন ফুসফুসে ঢুকে তার আধানগুলি ত্যাগ করে রক্তে এবং তার লোহিতকণাতে। ফুসফুস থেকে সংগ্রহ করা এই আধানগুলিকে রক্ত নিয়ে যায় প্রত্যেক দেহযন্ত্রে এবং কোষকলায় এবং এইভাবে নির্দিষ্টরূপে তাদেরকে প্রভাবিত করে।

এই দুটি মতের কোনটি ঠিক সেটা বলা শক্ত। মনে হয় দ্বিতীয় মতটি তথ্যাদি দ্বারা কিছুটা বেশি সমর্থিত, কিন্তু সুদীর্ঘ অনুসন্ধানের প্রয়োজন নিশ্চিত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার পূর্বে।

শত শত কোটি পরিবাহক

যা ক্লান্ত হয় না
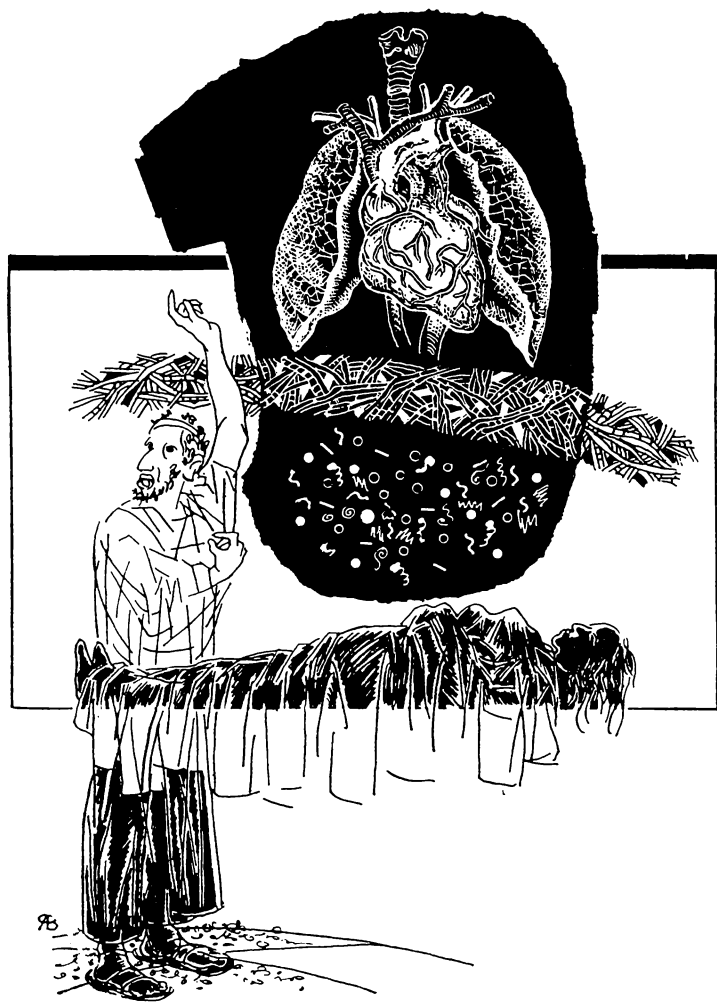
গর্ভধারনের পরে আঠার দিনের মাথায় একটি মানুষের ভ্রূণ মটরের দানার আকৃতির একটা কোষগুচ্ছ মাত্র। এই সময় থেকে হৃৎপিন্ড নিয়মিত চলতে শুরু করে, আর চলতেই থাকে না থেমে, মৃত্যু পর্যন্ত। হৃৎপিন্ডই সম্ভবত একমাত্র দেহযন্ত্র যে কাজে কামাই দেয় না এবং সুষম ছন্দে কাজ করে যায়, এমনকি যদি সেই হৃৎপিন্ডের মালিক কুঁড়ের বাদশাও হয়। তিন সপ্তাহ বয়স্ক একটি মানুষের ভ্রূণের মধ্যে, যার প্রকৃত রক্ত বলতে কিছু নেই হৃৎপিন্ড চলে প্রতি সেকেন্ডে একবার। এরপরে, শিশুর জন্মলাভের পরে নাড়ীর স্পন্দন দ্রুততর হয়, পেঁছায় প্রায় প্রতি মিনিটে 140 বার বেগে। ভাগ্যের কথা, যে এই গতিবেগই চূড়ান্ত এবং নাড়ীর স্পন্দন এর পরে কমতে থাকে। পূর্ণবয়স্ক মানুষের হৃৎপিন্ড চলে বিশ্রামের কালে প্রতি মিনিটে প্রায় 76 বার, কঠিন পরিশ্রমের সময় যেটা আড়াই গুণ বেড়ে যেতে পারে। তার মানে একশ বছর যদি কেউ বাঁচে তাহলে তার হৃৎপিন্ড চলবে পাঁচশ কোটি বার।

এই বিপুল সংখ্যার কথা চিন্তা করলে আশ্চর্য হতে হয় যে হৃৎপিন্ড কখনো ক্লান্ত হয় না, এবং যতদিন এই দেহযন্ত্র সুস্থ থাকে, এর কাজ সহজেই সামলায় এবং আক্ষরিক অর্থে এক সেকেন্ডের জন্যও না থেমে।

মানুষের শরীরের বিপাক মোটেই নিখুঁত নয় এবং অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট উষ্ণ রক্তের প্রাণীর থেকে অনেক নিকৃষ্ট। আসল কথাটা হোল এই যে আকৃতি যতই ছোট হতে থাকে, দেহের উপরিতলের ক্ষেত্রফলের হ্রাস ততই কম হতে থাকে। এই কারণে ছোট ছোট প্রাণীদের প্রতি গ্রাম দেহের ওজনের হিসেবে বেশি তাপ সৃষ্টি করতে হয়, বড় আকারের প্রাণীদের সঙ্গে তুলনায়। ছোট প্রাণীদের শরীরে বিপাক আরো তীব্র হয় তাই হৃৎপিণ্ডকে তেজের সঙ্গে কাজ করতে করতে হয়। সত্যিই, প্রাণীটা যত ছোট হবে তার হৃৎপিন্ড চলবে তত দ্রুত বেগে। দৃষ্টান্ত ধরা যাক: একটা তিমির শরীরের ওজন 150 টন, তার হৃৎপিন্ড চলে মিনিটে সাতবার, হাতির ওজন

তিন টন, তার হৃৎপিন্ড চলে মিনিটে 46 বার, বিড়ালের ওজন 1·3 কিলোগ্রাম, তার হৃৎপিন্ড চলে মিনিটে দু'শ চল্লিশ বার আর কয়লার মতো কালো টুনটুনির শরীরের ওজন আটগ্রাম, তার হৃৎপিন্ড চলে মিনিটে 1200 বার।

হৃৎপিন্ড এমন তীব্র বেগে কেমন করে কাজ করে? প্রথমত, একথা সম্পূর্ণ সত্য নয় যে হৃৎপিন্ড কাজ করে বিশ্রাম না নিয়ে। হৃৎপিন্ডের পেশা বেশ ঘন ঘনই বিশ্রাম নেয়, কিন্তু বিশ্রামের সময়গুলি খুবই হ্রস্ব। এক সেকেন্ডের মধ্যে হৃৎপিন্ড কাজ করে 0·49 সেকেন্ড, মানুষটি নিজে বিশ্রাম নিচ্ছে যে সময়, প্রত্যেকবার চলার পরে আছে 0·31 সেকেন্ডের বিশ্রাম। বিশ্রামের কালটা আসলে আরো কিছুটা বেশি সময়, কেননা হৃদযন্ত্রের সকল অংশ একই সঙ্গে কাজ করে না। হৃৎপিন্ডের চলার একটা চক্র শুরু হয় অলিন্দের সংকোচন দিয়ে, যে সময় নিলয়গুলি বিশ্রামরত রয়েছে। অলিন্দের সংকোচনের জন্য লাগে 0·11 থেকে 0·14 সেকেন্ড, এর পরে 0·66 সেকেন্ডের বিশ্রাম। তার মানে প্রতিদিন তাদের কাজ করতে হয় 3·5 থেকে 4 ঘন্টা আর বিশ্রামের সময় প্রায় 20 ঘন্টা। নিলয়গুলি সংকুচিত হতে সময় লাগে আরো কিছু বেশি, প্রায় 0·27 থেকে 0·35 সেকেন্ড এবং তাদের বিশ্রামের কাল 0·45 থেকে 0.53 সেকেন্ড। তারমানে, প্রতি 24 ঘন্টায় হৃৎপিন্ডের নিলয়গুলি কাজ করে 5·8 থেকে 10·5 ঘন্টা আর বিশ্রাম নেয় 13·5 থেকে 15·5 ঘন্টা।

ছোট ছোট পাখিদের হৃৎপিন্ডও বিশ্রাম নেয় তবে তাদের হৃৎপিন্ডের সংকোচন আর বিশ্রাম ঘটে আরো অনেক খরবেগে। উইলো গাছের টুনটুনির হৃৎপিন্ড প্রতি মিনিটে স্পন্দমান হয় 1000 বার, অলিন্দদের একবারের সংকোচনের জন্য লাগে 0·014 সেকেন্ড আর তার পরেই বিশ্রাম 0·046 সেকেন্ডের। নিলয়গুলি সংকুচিত হয় 0·024 সেকেন্ড, আবার বিশ্রাম 0·036 সেকেন্ডের। তার মানে অলিন্দের কাজের সময় দৈনিক 5 ঘন্টা 40 মিনিট আর বিশ্রামের সময় 18 ঘন্টা 20 মিনিট, এদিকে নিলয় কাজ করে 9 ঘন্টা 36 মিনিট আর বিশ্রাম নেয় 14 ঘন্টা 24 মিনিট। মানুষের হৃৎপিন্ডের সঙ্গে প্রভেদটা নগণ্য।

তা সত্ত্বেও, মানুষ তার হৃৎপিন্ডের কাজের ধারাকে আরো উন্নত করতে পারে, হৃৎপিন্ডের বিশ্রামের কালটার বৃদ্ধি ঘটিয়ে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণার ফলে দেখানো গেছে যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন ক্রীড়াবিদের

হৃৎপিন্ড, অন্য লোকের থেকে অনেক ধিমা গতিতে চলে, এই গতিবেগ নীচের দিকে 40 এমনকি 28 বারও হয়ে থাকে প্রতিমিনিটে।

হৃৎপিন্ডের এই যে প্রচন্ড কাজের ভার এটা সামলাতে কেবল বিশ্রামই যথেষ্ট নয়। হৃৎপিন্ডকে পর্যাপ্ত পুষ্টি যোগাতে হবে, যোগাতে হবে অকসিজেন। এর থেকেই ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে যে কেন উচ্চতর প্রাণীদের থাকে হৃৎপিন্ডের জন্য স্বতন্ত্র, শক্তিশালী রক্তসংবহন ব্যবস্থা।

ছোট খাট প্রাণীরা তাদের হৃৎপিন্ডকে রক্ত সরবরাহ করতে নিজ নিজ উপায় খুঁজে নিয়েছে। প্রকৃতি নেপোলিয়নের শত কোটি বছর আগে তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তির অর্থ জানতেন, যে সৈনিকের হৃদয়ে পৌঁছতে হয় তার উদরের রাস্তা ধরে। দুইখোলার শামুক লামেলিব্রাজ-কে সৃষ্টি করতে গিয়ে প্রকৃতি স্থির করলেন হৃদয়টাকে ছ্যাঁদা করে দেওয়া যাক। তবে এর জন্য তিনি মদনের ফুলশর ব্যবহার না করে কেবল বৃহদন্ত্রটিকে কাজে লাগিয়েছিলেন। কেউ জানে না একটা শামুকের অন্ত্র কেন তার একটা নিলয়কে ভেদ করে যাবে। নিঃসন্দেহে এর কারণ সহজতম উপায়ে রক্তে পুষ্টিকর পদার্থ মিশিয়ে দেবার জন্য এবং সম্ভবত হৃৎপিন্ডের পেশীতে পুষ্টি পৌঁছে দেবার সবচেয়ে উন্নত উপায়ও এইটেই।

হৃৎপিন্ড-শিরা-ধমনীতন্ত্রের প্রধান কাজ হোল সকল প্রয়োজনীয় পদার্থ দেহের সকল অঞ্চলে পৌঁছে দেওয়া। কতকগুলি পদার্থ চলে রক্তস্রোতের সঙ্গেই, আবার আরো অনেকে, এরা প্রধানত গ্যাস, চলে লোহিত কণিকাদের পিঠে চড়ে। প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে আছে 45 থেকে 50 লক্ষ পরিবাহক, সর্বমোট 35 লক্ষ কোটি, বিশ্বের সব চেয়ে দীর্ঘ উটের সারি। রক্তের লোহিত কণিকার আকৃতি অতি ক্ষুদ্র, প্রত্যেকটি কণা আট মাইক্রন, কিন্তু একটির পিছনে একটিকে উটের সারির মতো দাঁড় করালে তারা পৃথিবীকে সাতবার বেড় দিয়ে আসবে নিরক্ষ রেখা বরাবর। একটা তিমি-র শরীরের রক্ত এই রকমের কয়েকটা সারি তৈরি করতে পারে যার প্রত্যেকটি পৃথিবী থেকে সূর্য পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

প্রাণী-শরীরের এই যে পরিবহন ব্যবস্থা এটা গড়ে উঠেছে ক্রমে ক্রমে। জীবিত পদার্থের কয়েকটি টুকরো যখন প্রথম একত্রিত হয়ে এককোষী প্রাণীর সৃষ্টি করল, এবং সমুদ্র থেকে স্বতন্ত্র অস্তিত্বের জন্য একটা আবরণও গড়ে তুলল, প্রকৃতিকে তখন ভাবতে হোল একটি এককোষী প্রাণীর দেহের মধ্যেই একটা পরিবহন ব্যবস্থা সংগঠনের উপায়। সমাধান পাওয়া গেল

অবিলম্বে: প্রকৃতি কোষটিকে তৈরি করলেন আণুবীক্ষণিক এক মহাসমুদ্ররূপে, দিলেন তাতে স্রোত। তাই কোষের ভিতরের সরলতম পরিবহন ব্যবস্থা বজায় আছে আজও, বহুকোষী প্রাণীদের মধ্যেও, এমনকি মানুষের ক্ষেত্রেও। আমাদের শরীরের যে কোন কোষের মধ্যস্থিত প্রোটোপ্লাজম চলমান এবং প্রোটোপ্লাজম-এর স্রোত লক্ষ্য করা যায় এমনকি স্নায়ুকোষেও।

বহুকোষী প্রাণীদের সংগঠন করতে হয়েছিল জটিলতর পরিবহন ব্যবস্থা। এদের মধ্যে আদিমতম জীব স্পঞ্জেরা ব্যবহার করে সেই জল যার মধ্যে তারা বাস করে। সমুদ্রের স্রোতের উপর ততটা নির্ভর করা যায় না, স্পঞ্জ তাই তার শরীরের কেশগুলিকে কাজে লাগায় শরীরের সকল নল ও গর্ত দিয়ে জল যাতে বহে যেতে পারে সব অঞ্চলে অকসিজেন এবং পুষ্টি পৌঁছে দিতে।

উচ্চতর প্রাণীরা তো পুরোপুরিভাবে সমুদ্র থেকে বিছিন্ন হয়ে পড়ল, তাই তাদের নিজেদের স্বতন্ত্র চৌবাচ্চা তৈরি করতে হোল পরিবহনের জন্য। একালে সবচেয়ে বড়ো চৌবাচ্চা আছে একখোলার শামুকদের (গ্যাসট্রোপড বা 'পেটে-পা'-দের) যাদের দেহের মোট আয়তনের নব্বুই শতাংশই রক্ত। এই পরিমাণটা খুবই বেশি যে কালে পতঙ্গদের শুককীটের চৌবাচ্চা দেহের ওজনের 40 শতাংশ আর পূর্ণবয়স্ক পতঙ্গের দেহের ওওজনের মোটে 25 শতাংশ। পাখিদের আর স্তন্যপায়ীদের চৌবাচ্চা আরো ছোট, দেহের ওজনের 7 থেকে 10 শতাংশ। সবচেয়ে ছোট চৌবাচ্চা আছে মাছদের, যে ক্ষেত্রে এর ওজন গোটা দেহের 1·5 থেকে তিন শতাংশ মাত্র। চৌবাচ্চা যত ছোট হবে তত তীব্র বেগে সেটার ব্যবহার হবে, স্রোতও হবে তেমনি বেগবান যাতে একই তরল পদার্থ বরাবর ব্যবহার করা যায় এই পরিবহনের কাজে। সন্দেহ কি যে পোকাদের সেই অলস বিলাসিতা করা সাজে যাতে তারা 30 থেকে 35 মিনিট সময় নিতে পারে সমস্ত তরল পদার্থের একবারের আবর্তনে। মানুষ তা পারে না। আমাদের দেহাভ্যন্তরের চৌবাচ্চার রক্ত একবার আবর্তন সম্পূর্ণ করে 23 সেকেন্ডে, এবং প্রত্যেকদিন করে 3700 টি আবর্তন। এটাই কিন্তু উর্ধ্বসীমা নয়। কুকুরের ক্ষেত্রে একটি আবর্তন নেয় 16 সেকেন্ড, খরগোসের লাগে 7·5 সেকেন্ড, আরো ছোট প্রাণীর লাগে আরো কম সময়।

মেরুদন্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আরো জটিল, কারণ চৌবাচ্চা বড়ো কিন্তু জল আছে বড় কম। এটা ভর্তি করাও সম্ভব নয়। মানুষের সবগুলি

রক্তবহানাড়ীর সম্মিলিত দৈর্ঘ্য হোল এক লক্ষ কিলোমিটার। এদের অনেকগুলিই বেশির ভাগ সময় খালি থাকে কেননা 7 থেকে 10 লিটার রক্ত দিয়ে তো আর এতগুলিকে ভর্তি করা যায় না, আর কেবল সেইসব দেহযন্ত্র যারা কঠিন পরিশ্রম করছে তাদের বেশি করে রক্তের যোগান দেওয়া হয়। এই কারণে, কঠিন কাজগুলি একযোগে অনেকগুলি দেহযন্ত্র করতে পারে না। পেটভরে খাওয়ার পরে পরিপাকতন্ত্রের কাজকর্ম খুব বেড়ে যায়। তখন সেখানে রক্তসঞ্চালন বাড়ে এদিকে মস্তিষ্কের সরবরাহ কমে যাওয়ায় ঠিক ঠিক কাজ তখন সে করতে পারে না, সাধারণত। তাই আমাদের ঘুম পায়।

আভ্যন্তরিক চৌবাচ্চা থেকে জলের চলাচল যথাযথভাবে শুরু করবার জন্যে স্পঞ্জের কেশের থেকে বেশ ভিন্ন পদ্ধতির উদ্ভাবন করতে হয়েছে। পেশী দিয়ে গঠিত পামপ্ দেখা গেল অনেক নির্ভরযোগ্য। আদিমতম পামপ্গুলি ছিল আর কিছুই নয় কেবল একটি স্পন্দমান নাড়ী, অর্থাৎ একটি সরল হৃৎপিন্ড যার ভিতরের রক্তরস ঠেলে ঠেলে দেওয়া হোত আরো ছোট ছোট নাড়ীর ভিতরে আবার সেখান থেকে কোষের অন্তর্বর্তী অঞ্চলে বা কোষমধ্যে। তাদের জলসিক্ত করার পরে রক্তরস ফিরে আসত স্পন্দমান নাড়ীটিতে। এমনি একটা একমুখী পদ্ধতি যথার্থ সঞ্চালন করতে পারে না এবং এই কারণেই পতঙ্গরা, অমেরুদন্ডী প্রাণীদের শীর্ষভাগের প্রাণীরা গড়ে তুলল এমন পামপ্ যা কেবল ঠেলেই যে দেয় তা নয়, টেনেও আনে। এই কারণে এদের হৃৎপিন্ডগুলি বিশেষ পেশীর সাহায্যে স্বতন্ত্রভাবে যুক্ত আছে — পেশীগুলির নাম (Pterygoid) টেরিগয়েড পেশী — যারা হৃৎপিন্ডকে প্রসারিত করতে পারে — এইভাবে সৃষ্টি করে উলটো চাপ, যার ফলে কোষের মধ্যে বহমান তরল পদার্থকে শুষে নেওয়া হয়।

একটি স্পন্দমান নাড়ীর ধারণক্ষমতা অল্প, তাই নিম্নস্তরের প্রাণীদের সাধারণত থাকে অনেকগুলি পামপ-এর কাজ করার যন্ত্র। কেঁচোদের শরীরের প্রধান স্পন্দমান নাড়ীটি বিছানো আছে সারা দেহ জুড়ে, রক্ত এক্ষেত্রে সংবাহিত হয় দেহের পশ্চাদ্ভাগ থেকে সামনের দিকে। পথে রক্ত বহে যায় পাশের নাড়ীগুলিতে, তারা আবার স্পন্দিত হতে হতে আরো ছোট ছোট ধমনীতে রক্তকে প্রবিষ্ট করে দেয়। এই যে অসংখ্য হৃৎপিন্ড-এরা কাজ করে স্বতন্ত্রভাবে, যদি বা কিছু বোঝাপড়া থাকে সেটা সেই অংশের অপর একটি সঙ্গী হৃৎপিন্ডের সঙ্গে। এই হোল এদের সংগঠনের পরাকাষ্ঠা।

উচ্চতর প্রাণীরা কেবল যে বাইরের সমুদ্র থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করেছিল তা-ই নয়, আভ্যন্তরীণ নদীর প্রধান ধারাটি অর্থাৎ স্তন্যপায়ী প্রাণীদের হৃৎপিন্ড-শিরা-ধমনীতন্ত্র একটি সম্পূর্ণ বন্ধ প্রকল্প। কিন্তু এটা ছড়িয়ে আছে অনেকগুলি ঝরণা, রসবহা নাড়ীর ভিতর দিয়ে, তরল পদার্থ যাদের মধ্যে প্রবাহিত হয়, এক কোষ থেকে অন্য কোষের অন্তর্বর্তী অঞ্চল থেকে বা কোষের মধ্যস্থ তরল থেকেও।

তার মানে হোল এই যে কোষকলা বা দেহযন্ত্রগুলি আভ্যন্তরীণ সমুদ্রের জল থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন কিন্তু এদের সেই অধিকার আছে যার বলে এই চলন্ত চৌবাচ্চাতে তারা জল ঢেলে দিতে পারে। সত্যি বলতে আভ্যন্তরীণ সমুদ্রের এই যে আলাদা হয়ে থাকা এটা আপেক্ষিক। ধমনীর জালকপুঞ্জের দেয়ালগুলি অত্যন্ত পাতলা এবং রক্তচাপ বেশি থাকায় তাদের গা থেকে কিছু তরল চুঁইয়ে পড়ে কোষের অন্তর্বর্তী অঞ্চলে। ক্ষরণ আরো বেশি হোত, কেননা কূল তো তাদের ধরে রাখতে পারে নি, যদি না রক্তের অনকোটিক (oncotic) চাপ খুব বেশি থাকত (রক্তে প্রোটিন দ্রবীভূত থাকার দরুণ) যার ফলে দ্রবীভূত প্রোটিন জল থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় না।

বিশ্রামের কালে সামান্য একটু জল ক্ষরিত হয়ে পড়ে কোষকলার উপর, তার সবটাই চলে যায় শিরার জালিকাগুলিতে, যেখানে রক্তচাপ প্লাজমার অনকোটিক চাপের থেকে কম। তরলটা সক্রিয়ভাবে প্লাজমাতে আকর্ষিত হয় প্লাজমার মধ্যস্থিত দ্রবীভূত প্রোটিনের দ্বারা। শিরার জালিকাগুলির মধ্যে যে-বল সক্রিয় হয়ে তরল পদার্থকে ফিরিয়ে আনে রক্তস্রোতের মধ্যে সেটা ধমনীর জালিকাগুলি থেকে যে-বল তরলকে ঠেলে দেয় কোষের অন্তর্বর্তী অঞ্চলে তার দ্বিগুণ। এই কারাণ সবটাই ফিরে যায়।

কিন্তু, কাজের সময় ভিন্ন ব্যাপার। এ সময়ে ধমনীপ্রান্তের রক্তচাপ এত বেশি যে এর দেয়াল না পারে জলকে ধরে রাখতে না প্রোটিনকে। শিরার জালিকাগুলিতে রক্তচাপ মোটামুটি বেশিই, এদিকে অনকোটিক চাপ কমে গেছে প্রোটিন বেরিয়ে যাওয়ার দরুণ। তরলটা রক্তস্রোতে ফিরে যাবার জন্যে না পাবে কোন উদ্দীপক, না পাবে সুযোগ। বিকল্প রাস্তা তার আছে কেবল রস-নাড়ীতন্ত্রে প্রবেশ করা। তাই শরীরের এই রস-বহাতন্ত্রের কাজ হোল অনেকটা শহরের ড্রেনের অনুরূপ, যেগুলি অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হলে পথ, চত্বর জলমগ্ন হওয়া থেকে বাঁচায়।

মনে হতে পারে, সম্পূর্ণ আবদ্ধ তন্ত্র হলে বুঝি হৃৎপিন্ডের কাজ করা

সহজ হোত, আসলে কিন্তু তা নয়। রক্তকে সূক্ষ্ম ধমনীজালিকার মধ্যে পাম্প করে ঠেলে দিতে বল লাগে প্রচুর। ধমনীগুলি যত প্রশাখায়িত হয়ে যায় তাদের ব্যাস তত বেশি হয়ে যায় এবং শেষপর্যন্ত তাদের মোট প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল মহাধমনী বা অ্যাওর্টা (Aorta)-এর (হৃৎপিন্ড থেকে রক্ত প্রথমে যেখানে যায়) ক্ষেত্রফলের 800 গুণ হয়ে যায়। এর ফলে ক্রমশই রোধ বেড়ে যায়। ব্যাপারটা হোল এক লক্ষ থেকে এক লক্ষ ষাট হাজার কোটি মোট জালিকা আছে যাদের মোট দৈর্ঘ্য 60 থেকে 80 হাজার কিলোমিটার। ই. ফ. তসিয়ন, একজন বিশিষ্ট রাশিয়ান শারীরতত্ত্ববিদ গণনা করেছিলেন যে সারা জীবনে মানুষের হৃৎপিন্ড যতটা কাজ করে তার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির সাহায্যে 4810 মিটার উচ্চ ইয়োরোপের সর্বোচ্চ পর্বতশিখর মঁ ব্লাঁ-র চূড়ায় একটা মালবাহী ট্রেনকে ঠেলে তোলা যায়।

বিশ্রামের কালেও মানুষের হৃৎপিন্ড প্রতি মিনিটে 6 লিটার রক্তকে পামপ করে চলে, তার মানে দৈনিক 6 থেকে 10 টন। আমাদের জীবিত কালে হৃৎপিন্ড 150 থেকে 200 হাজার টন রক্তকে পামপ্ করে চলে। তথাপি, এত সব ক্ষমতা সত্বেও মানুষ তার হৃৎপিন্ডের কাজের কথাটা জাঁক করে বলতে পারে না।

যেহেতু বড় প্রাণী আর ছোটপ্রাণীদের হৃৎপিন্ডের কাজের তুলনা সরাসরি করা সহজ নয়, বিজ্ঞানীরা তাই সাধারণত হিসেব করেন প্রতি একশ গ্রাম শরীরের ওজনের তুলনায় এক মিনিটে হৃৎপিন্ড কতটা রক্ত পামপ করতে পারে।

গেঁড়ির মতো ধীর গতির প্রাণীর হৃৎপিন্ডও মানুষের সমান কষ্ট সহ্য করে কাজ করতে পারে আর অন্যান্য সব প্রাণীদের হৃৎপিন্ড আরো তেজের সঙ্গে কাজ করে। কুকুরের হৃৎপিন্ড যেমন প্রতি মিনিটে রক্ত পামপ করতে পারে মানুষের দু'গুণ, বেড়ালের হৃৎপিন্ড করে মানুষের দশগুণ কাজ।

যতক্ষণ হৃৎপিন্ড কাজে করে চলে ততক্ষণ ধমনীতে রক্তের চাপ থাকে বেশ বেশি। ড্রাগন-ফ্লাই-এর মতো ছোট প্রাণীর শুককীটের বা ব্যাঙের রক্তচাপ হতে পারে 30 থেকে 38 মিলিমিটার পারদস্তম্ভ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চাপ থাকে আরো অনেক বেশি। অকটোপাসের বেলায় 60, ইঁদুরের 75, মানুষের 160-180, ঘোড়ার 200 মিলিমিটার পারদ স্তম্ভ।

সাধারণত প্রাণীটা আকারে যত বড় হবে রক্তচাপ তত বেশি হবে। এটা

স্পষ্ট দেখা যায় ঈল বা কুঁচে মাছের ক্ষেত্রে, হাঙর আর অন্য সেইসব মাছদের ক্ষেত্রে যাদের আকারের অনেক তারতম্য হয়ে থাকে। ঈলটা বা হাঙরটা যত লম্বা হবে রক্তের চাপও তত বেশি হবে। অবশ্য এই নিয়মের অনেক ব্যতিক্রম আছে যেমন মোরগের রক্তচাপ ঘোড়ার রক্তচাপের সমান।

সন্দেহ থাকতে পারে না যে প্রকাণ্ড একটি নীল তিমি-র হৃৎপিন্ড, যার ওজন 600 থেকে 700 কিলোগ্রাম, স্বাভাবিকভাবে যদি নাও কাজ করে, তথাপি অনেক বেশি কাজ করবে, তার থেকে পাঁচশ কোটিগুণ ছোট কয়লা কালো টুনটুনির হৃৎপিন্ডের তুলনায় যার ওজন মাত্র 0·15 গ্রাম। সঠিক মূল্যায়নের জন্য তুলনা করা হয় প্রতিগ্রাম হৃৎপিন্ডের পেশী কতটা কাজ করতে পারে। আমাদের হৃৎপিন্ডের প্রতি গ্রাম পেশী করতে পারে প্রতি মিনিটে 4000 গ্রাম-সেন্টিমিটার কার্য, গেঁড়ির হৃৎপিন্ডের সঙ্গে তুলনীয় এই কার্যের মাত্রা। ব্যাঙের হৃৎপিন্ড পারে এর তিনগুণ কাজ করতে, খরগোসের হৃৎপিন্ড পাঁচগুণ, সাদা ইঁদুরের হৃৎপিন্ড পারে 12 গুণ কাজ করতে।

বেশির ভাগ ভূতলবাসী প্রাণীদের শরীরের গঠনভঙ্গি ভূমির সমান্তরাল। তাদের মস্তিষ্ক আর হৃৎপিন্ড আছে একই তলে। এটা খুবই সুবিধাজনক ব্যবস্থা কারণ প্রাণীটার হৃৎপিন্ডকে বেশি খাটতে হয় না মস্তিষ্কের রক্ত সরবরাহ করতে। মানুষের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্যরকম, যেহেতু মানুষের মস্তিষ্ক হৃৎপিন্ড থেকে অনেকটা উঁচুতে রয়েছে। একই ব্যাপার ছয় মিটার উঁচু জিরাফের বেলায় যার হৃৎপিন্ডের অবস্থান তার মস্তিষ্ক থেকে 2 থেকে 3 মিটার নীচে। এই সব প্রাণীর সাধারণ নিয়ম মোতাবেক (মানুষ, মোরগ, জিরাফ) রক্তচাপ বেশি। অনুভূমিক প্রাণীদের হৃৎপিন্ড মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহ করতে পারে না যখন তারা অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে থাকে। একটা খরগোস বা সাপকে খাড়া করে দিলে তারা শীঘ্রই 'অজ্ঞান' হয়ে যাবে মস্তিষ্কের রক্তাল্পতার জন্য। আবার, এদের মাথা নীচু করে দিলেও এরা স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবে না, কারণ মস্তিষ্কের রক্ত সরবরাহে গোলমাল দেখা দেয় রক্তের নিষ্ক্রমণ বিঘ্নিত হওয়ার দরুণ। তাহলেও প্রাণীজগতে পারদর্শী ক্রীড়াবিদের ছড়াছড়ি। একটা সহজ দৃষ্টান্ত হোল বাদুড় যারা কোন পরোয়া করে না কোন্ ভঙ্গিতে তাদের শরীর রইল।

হৃৎপিন্ড-শিরা-ধমনীতন্ত্রের কাজকর্মে একটা প্রয়োজনীয় বিরোধ লক্ষণীয়। একদিকে, পর্যাপ্ত রক্ত সরবরাহের জন্য চাই উচ্চ রক্তচাপ। অন্যদিকে উচ্চ রক্তচাপ থেকে বিপদ ঘটতে পারে কেননা ব্যবস্থাটাতে বিঘ্ন ঘটতে পারে যে

কোন সময়। একটা প্রধান রক্তবহানাড়ী যদি ছিড়ে যায়, মৃত্যু ঘটবে অল্পক্ষণেই অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণের দরুণ।

চাপ স্বাভাবিক রাখার জন্য এই তন্ত্রে আছে নিয়ন্ত্রক কলকব্জা যাদের বলা হয় baro receptor বা চাপের ধারক যন্ত্রাদি। স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে প্রধান ধারকগুলি আছে অ্যাওর্টা (aorta) বা মহাধমনীর বাঁকা অংশে, ক্যারোটিড ধমনীর মধ্যস্থিত গর্তগুলিতে, এবং যন্ত্রনা অনুভাবী স্নায়ুপ্রান্তে।

চাপের কোন পরিবর্তন ঘটলে ধারকগুলি তক্ষুনি খবর পাঠাবে মেডুলা অবলাঙ্গটাতে। চাপের সমতা ফিরিয়ে আনে আংশিকভাবে হৃৎপিন্ড কিন্তু প্রধানত রক্তবহানাড়ীগুলি। ছোট ছোট নাড়ী বা ধমনীর দেয়ালে পেশী আছে যারা কুঁচকে যেতে বা ফেঁপে উঠতে পারে। কুঁচকে গিয়ে তারা রক্তস্রোতে বাধার সৃষ্টি করে যার ফলে রক্তচাপ বাড়ে। ফেঁপে উঠে তারা রক্তচাপ এমনই সঙ্গিন স্তরে নামিয়ে দিতে পারে যে রক্তের সরবরাহ বিপর্যস্ত হয়ে যেতে পারে।

হৃৎপিন্ড সারা জীবন চলতে থাকে অবিরাম, একটা সংকোচের পরে আর একটা, দিবারাত্রি, গ্রীষ্ম, শীত সকল ঋতুতেই। মুরগীর ভ্রূণের ছোট দানার কোষগুচ্ছে কিছু একটা স্পন্দন শুরু করে উনত্রিশ ঘন্টার ভিতরে, তরলগুলির সংবহন শুরু হয় কোন একটা রাস্তায়। হৃৎপিন্ডের এই যে সংকোচন এটা ঘটায় কে? কোথা থেকে সেই আদেশ আসে মুরগীর ভ্রূণকে কাজ শুরু করতে যে বলে? এখনো পর্যন্ত তো সেই মস্তিষ্কের দেখা নেই যে ভবিষ্যতে প্রাণীর প্রাণকার্য নিয়ন্ত্রণ করবে?

যদিও পূর্ণবয়স্ক প্রাণীদের ক্ষেত্রেও হৃৎপিন্ডের চলার বেগের বুনিয়াদী পরিবর্তনগুলি মস্তিষ্কের দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে, হৃৎপিন্ড কিন্তু এই আদেশগুলি ছাড়াই স্বাধীনভাবে নিজের ছন্দ নিজেই স্থির করতে পারে। রূপকের সাহায্য নিয়ে বলা যায় আমাদের হৃৎপিন্ড নিজের চেষ্টাতেই কাজ করে থাকে এবং এই বৈশিষ্ট্য কেন যেন আমরা অনুধাবন করতে ভুলে যাই। ভ্রূণের হৃৎপিন্ডের পেশী থেকে তন্তু নিয়ে যদি তাকে বাড়তে দিই কলাকৃষ্টির বিশেষ পৌষ্টিক মাধ্যমে, তাহলে দেখা যাবে শিশির মধ্যেও তারা কোন আদেশ ছাড়াই ছন্দ বজায় রেখে সংকুচিত হচ্ছে। যেন সংকুচিত না হয়ে তারা থাকতে পারে না।

তাহলেও, কাজের সুবন্দোবস্ত থাকে না একটা হেডকোয়ার্টার না থাকলে।

প্রত্যেক পেশী যদি নিজের খেয়ালে সংকুচিত হতে থাকে তাহলে তাদের একযোগে সংকোচন ঘটবে কখনো সখনো দৈবাৎ। ভ্রূণের জীবনের গোড়ার দিকে তাই হয়ে থাকে। ইঁদুরের ভ্রূণের হৃৎপিন্ডের আলাদা আলাদা অংশ সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় স্পন্দিত হতে থাকে যতদিন না প্রধান কার্যালয় গঠিত হয়ে কাজ আরম্ভ করে। পাখিদের আর স্তন্যপায়ীদের ভ্রূণে এই প্রধান কার্যালয়টি থাকে হৃৎপিন্ডেরই একটা বিশেষ অঞ্চলে যার নাম সাইনো অরিকুলার নোড (Sino auricular node)।

হৃৎপিন্ডের পেশীর কোন স্নায়ু নেই, আদেশগুলি সঞ্চালিত হয় পেশীতন্তুর উপর দিয়ে প্রতি মিনিটে এক মিটার বেগে। এই বেগ অলিন্দগুলির স্বাভাবিক সংকোচনের পক্ষে যথাযথ। হৃৎপিন্ডের নিলয়গুলি আকৃতিতে বড়ো, আবার এদের কাছে আদেশগুলি পৌছে যাওয়া চাই দ্রুততর গতিতে — সুতরাং এদের আছে একটা প্রণালী, যার নাম 'পারকিনজতন্তু' যার উপর দিয়ে উদ্দীপনা সঞ্চালিত হয়ে যায় পাঁচ-ছয় গুণ বেশি দ্রুতবেগে। প্রত্যেক আত্মসম্মানযুক্ত প্রাণীর হৃৎপিন্ডে একটিই প্রধান কার্যালয় আছে যার নাম বেগকারক। একটার বেশি থাকলে বাঁধত গন্ডগোল। তবে অস্বাভাবিক জীবের তো আর অভাব নেই। অ্যাসকিডিয়ন-দের আর কয়েকজাতের টিউনিকেটদের আছে দুটি করে বেগকারক, স্পন্দমান নাড়ীটার দুই প্রান্তে দু'জন। এইসব প্রাণীদের রক্তের স্রোত খানিক সময় অন্তর দিক পরিবর্তন করে থাকে।

মেরুদন্ডীদের হৃৎপিন্ডের স্বচালিত ব্যবস্থার জন্য, শরীরের বাইরে নিয়ে এলেও সেটা কাজ করে চলতে থাকে। হৃদযন্ত্রের সকল নতুন ওষুধ প্রথম পরীক্ষা করা হয় ব্যাঙের শরীর থেকে বের করে নিয়ে আসা হৃৎপিন্ডের উপর, যেটা পরীক্ষার বাতাবরণে অনেক ঘন্টা সচল থাকে।

সাধারণ একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে মৃত্যু ঘটলে হৃৎপিন্ড আপনা আপনি চলা বন্ধ করে। বাস্তবে, সর্বদা এটা ঠিক নয়। রাশিয়ান ডাক্তার আনদ্রেয়েভ একটি সদ্যোজাত শিশুর হৃৎপিন্ড চালিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন তার মৃত্যুর চার দিন পরে।

কয়েক শতাব্দী আগে কেউ ধারণাই করতে পারত না যে এমন ব্যাপার ঘটানো সম্ভব। প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ভেসালিয়স, যিনি পঞ্চম চার্লস-এর চিকিৎসা করেছিলেন, মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিজ্ঞানীর মধ্যে একজন ছিলেন যাঁকে দেহ ব্যবচ্ছেদ করবার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। একটি স্ত্রীলোকের শরীর ব্যবচ্ছেদ

করেছিলেন যে তখনো জীবিত ছিল। দ্বিতীয় ফিলিপ-এর দয়ায় এই অন্যায় এবং ভয়াবহ দন্ডাদেশ লঘু করা হয়, অনুশোচনা ও পুন্যার্জনের জন্য তাঁকে পাঠানো হয়েছিল সাইনাই পর্বতে, তবে জেরুজালেমে তীর্থযাত্রার পথেই ভেসালিয়াস-এর মৃত্যু হয়।

সে যুগের সেই বিখ্যাত এবং জনপ্রিয় বিজ্ঞানীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ দানা বাঁধে এই কারণে যে সন্দেহাতীতভাবে মৃত সেই স্ত্রীলোকটির হৃৎপিন্ডের পেশীগুলি সংকুচিত হয়ে চলেছিল। তার হৃৎপিন্ড কেন কাজ করে চলেছিল মৃত্যুর অনেক ঘন্টা পরেও সেটা নির্ধারণ করা যায় নি। বিস্ময়-বিমূঢ় অসংখ্য মানুষ যারা এই নাটকীয় দৃশ্যের দর্শক ছিল তাদের কারুর মনে সন্দেহের ছায়াও ছিল না যে স্ত্রীলোকটি জীবিত ছিল। ভেসালিয়াস-এর নিজের কথা বলতে গেলে তিনিও নিশ্চিত ছিলেন যে দুর্ঘটনাটা ঘটেছে তাঁরই অসাবধানতার ফলে এবং ঘোষিত শাস্তিটা ছিল ন্যায়সঙ্গত।

আমাদের ব্যক্তিগত সমুদ্রের কুলগুলি ধুইয়ে দেয় তরঙ্গ যার রং নীল নয়, টক্‌টকে লাল। কিন্তু শিরার রক্ত কারবন ডাই অকসাইডে এবং বিপাক থেকে উৎপন্ন পদার্থে সম্পৃক্ত থাকে তাই তাতে আছে নীলের আভাস, যে খবরটা দেখা যাচ্ছে, একাদশ শতাব্দীতেই জানা ছিল অন্তত, খুব সম্ভ্রান্তবংশীয়েরা, যারা ছিল কাসটিল-এর রাজার কৃপাধন্য, বিশ্বাস করত যে তাদের শিরার মধ্যে বহমান রক্তের রং নীল। কেন্দ্রীয় স্পেনের এই রাজবংশ মুরদের তাড়িয়ে দিয়েছিল। এরং অর্থ হোল এই যে তারা প্রমাণ করতে চাইত যে মুরদের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই, মুরদের রক্তের রং আরো কালো — এই ছিল তাদের ধারণা। প্রকৃত পক্ষে কেবল কয়েক জাতের কবচী প্রাণী আছে (চিংড়িজাতীয়) যাদের রক্তের রং সত্যিই নীল।

আমাদের শরীরের এই ফল্গু সমুদ্রের জলে আছে সবকিছুই যা প্রাণীদেহের কোষের পক্ষে দরকারী। নিম্নস্তরের প্রাণীর কোষকলার তরল পদার্থের উপাদানগুলি সাধরণ সমুদ্রজলের সঙ্গে প্রায় অভিন্ন। প্রাণীটা যত উচ্চস্তরের হবে, তার রক্ত-রস, রক্ত গঠিত হবে তত জটিল উপাদান দিয়ে। রক্তে আছে নানাবিধ লবণ ছাড়াও শারীরগতভাবে সক্রিয় কতকগুলি পদার্থ, ভাইটামিন, একাধিক হরমোন, প্রোটিন, চর্বি এমনকি চিনিও। আধুনিক কালে পাখির রক্ত সব চেয়ে সুমিষ্ট আর মাছের রক্তে চিনি আছে সবচেয়ে কম।

রক্তের মুখ্য কাজ পরিবহন। সারা শরীরে সে ছড়িয়ে দেয় উত্তাপ, অন্ত্র থেকে পুষ্টি আর ফুসফুস থেকে অকসিজেন নিয়ে পৌঁছে দেয় যেখানেই প্রয়োজন সেই স্থলে। নিম্নস্তরের প্রাণীদের ক্ষেত্রে অকসিজেন আর অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদার্থগুলি তরলে দ্রবীভূত থাকে যে তরল সারা শরীরে সঞ্চালিত হয়। উচ্চতর প্রাণীরা উদ্ভাবন করেছে একটা বিশেষ পদার্থের যেটা অকসিজেনের প্রাচুর্য থাকলে কেবল যে তার সঙ্গে খুব সহজে যুক্ত হয় তা-ই নয়, ঘাটতির জায়গাতেও সেই অকসিজেনকে তৎকাল ছেড়ে দিতে পারে। এই ধরনের বিশেষ গুণ থাকে কয়েকটি জটিল প্রোটিনের যাদের অণুতে আছে তামা আর লোহার পরমাণু। হিমোসায়ানিন নামের প্রোটিনে আছে তামা, এর রং নীল। হিমোগ্লোবিন এবং অনুরূপ প্রোটিন যার অণুতে লোহা আছে তাদের রং লাল।

হিমোগ্লোবিনের একটি অণুর বলা যেতে পারে দুটি অংশ, একটি সম্পূর্ণ প্রোটিন এবং অন্য অংশটিতে আছে লোহা। দ্বিতীয় অংশটি সকল প্রাণীর ক্ষেত্রেই অভিন্ন কিন্তু প্রথম অংশটিতে আছে কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ যাদের দ্বারা খুবই নিকট সম্বন্ধ যুক্ত প্রাণীদেরও স্বতন্ত্রভাবে চেনা যায়।

রক্তে আছে সমস্ত উপাদান যা আমাদের দেহের কোষগুলির জন্য দরকারী। রক্ত শিরা বা ধমনী দিয়ে চলার কালে যার যা প্রয়োজন সে তা নিয়ে নেয় রক্ত থেকে।

কেবল অকসিজেন-সংযুক্ত পদার্থগুলিকে অক্ষুন্ন রাখা চাই। এই পদার্থগুলি যদি কোষকলার মধ্যে থেকে যায় এবং সেখানেই ভেঙে গিয়ে শরীরের চাহিদা পূরণ করতে ব্যবহৃত হয়ে যায় তাহলে অকসিজেন পরিবহনের কাজটাতে ব্যাঘাতের সৃষ্টি হয়।

গোড়া থেকেই প্রকৃতির চেষ্টা ছিল খুব বড় বড় অণুর সৃষ্টি করা। যাদের আণবিক ওজন হাইড্রোজেন পরমাণুর, মানে সব চেয়ে হালকা পদার্থের, দুগুণ থেকে শুরু করে এক কোটি গুণ পর্যন্ত। এই সব বড় বড় প্রোটিনের অণু দেহকোষের দেয়াল ভেদ করে যেতে পারে না। এরা বেশ বড় বড় গর্ততেও আটকে যায়, তাই রক্তেই এরা থেকে যায় এবং বার বার ব্যবহৃত হতে থাকে। উচ্চতর প্রাণীদের ক্ষেত্রে সমস্যাটার সমাধান হয়েছিল হিমোগ্লোবিনের সাহায্যে যার আণবিক ওজন হাইড্রোজেন পরমাণুর 16 হাজার গুণ। তার ওপর হিমোগ্লবিন যাতে চারপাশের কোষকলার মধ্যে প্রবেশ করতে না পারে তাই এদের রাখা হয়েছে বিশেষ আধারে—রক্তের লোহিতকণার মধ্যে, যারা আমাদের রক্তস্রোতের মধ্যে প্রবহমান।

অধিকাংশ প্রাণীর রক্তকণিকা আকৃতিতে গোল, কিন্তু দু-একটি প্রাণীর ক্ষেত্রে, যেমন উটদের বা লামাদের (Llama) রক্তকণিকা ডিম্বাকার, কেন তা অবশ্য আজও জানা যায়নি।

আদিমকালের প্রাণীদের রক্তকণিকা ছিল বড়ো বেঢপ। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া গুহাবাসী একজাতের উভচর প্রাণীর লোহিতকণা ছিল 35 থেকে 38 মাইক্রণ ব্যাসের। প্রায় সকল উভচরদের ক্ষেত্রে লোহিতকণা এর থেকে অনেক ছোট কিন্তু সময় সময় আয়তনে এরা হতে পারে 1100 ঘন মাইক্রন পর্যন্ত। দেখা গেল এতে অসুবিধা আছে কেন না কোষটা যত বড় হবে তার উপরিতলের ক্ষেত্রফল তুলনায় তত কম হবে, যার ভেতর এবং বাহির দিয়ে অকসিজেন চলা ফেরা করবে। উপরিতলের ক্ষেত্রফলের প্রতিটি

সমান টুকরোর তুলনায় হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে যার ফলে এরা পুরোদমে কাজ করতে পারে না। প্রকৃতি তাই লোহিতকণার আকার ছোট করতে থাকলেন, ক্রমশ পাখির রক্তকণিকার আয়তন হোল 150 ঘন মাইক্রন আর স্তন্য পায়ীদের হোল 70 ঘন মাইক্রন। মানুষের ক্ষেত্রে লোহিতকণার ব্যাস 8 মাইক্রন আর আয়তন 70 ঘন মাইক্রন।

অনেক স্তন্যপায়ীর রক্তে লোহিতকণার আকার আরো ছোট। ছাগলের 4, কৃষ্ণসার হরিণের 2·5 মাইক্রন ব্যাসের। ছাগলদের লোহিতকণা কেন এত ছোট সেটা সহজেই বোঝা যায়। পোষা ছাগল এসেছে তাদের পাহাড়ী পূর্বপুরুষদের থেকে যারা বাস করেছে লঘুচাপের বাতাবরণে। তাই তাদের রক্তে লোহিতকণার সংখ্যা অনেক বেশি, প্রতি ঘন মিলিমিটারে 1·45 কোটি, অন্যদিকে উভচরদের বিপাক তুলনামূলকভাবে অনেক ধিমা হওয়ায় তাদের আছে 40 হাজার থেকে একলাখ সত্তরহাজার লোহিতকণা প্রত্যেক ঘন মিলিমিটারে।

আয়তন কমাবার জন্য, মেরুদণ্ডীদের রক্তের লোহিতকণগুলি হয়ে যায় চ্যাপটা চাকতির আকারের যাতে সেই গভীরতাটা কমানো গেল যতদূর পর্যন্ত অকসিজেনের অণু ব্যাপ্ত হয়ে যাবে। মানুষের ক্ষেত্রে এই চাকতির দুই দিকই অবতল। এর ফলে কোষের আয়তন আরো কমে গেল, ক্ষেত্রফল বাড়ল।

হিমোগ্লোবিনকে রক্তকণার মধ্যে একটা বিশেষ প্রকোষ্ঠে রাখার সুবিধা আছে, কিন্তু কথায় বলে প্রত্যেকটি রুপোলি রেখার পিছনে আছে কালো মেঘ। লোহিতকণা জীবন্ত কোষ হওয়ায় নিজেই যথেষ্ট অকসিজেন খরচ করে। প্রকৃতি অপচয় পছন্দ করেন না। তাই এই অযথা ব্যয় কমাবার জন্যে অনেক চিন্তা করলেন।

যে কোন কোষের প্রধান অংশ হোল তার নিউক্লিয়াস। যদি সযত্নে তাকে সরিয়ে দেওয়া যায় (আধুনিক বিজ্ঞানীদের আয়ত্তাধীন একটা অতি সূক্ষ্ম আণুবীক্ষণিক অপারেশনের দ্বারা) তাহলে নিউক্লিয়াস-বিহীন কোষ তখনো জীবিত থাকলেও টিঁকে থাকতে পারবে না, তার প্রধান কাজগুলি থেমে যাবে, বিপাকের ঘটবে দারুণ গণ্ডগোল। প্রকৃতি স্থির করলেন এই ঘটনাটা কাজে লাগাবেন, তাই তিনি স্তন্যপায়ীদের পূর্ণবয়স্ক লোহিতকণা থেকে কেড়ে নিলেন নিউক্লিয়াস। লোহিতকণার প্রধান কাজ হোল হিমোগ্লোবিনের আধার হয়ে চলাফেরা করা। কাজটাতো নিষ্ক্রিয়, এর কোন ব্যাঘাত ঘটছে না, আর বিপাক কমে যাওয়ার ফলে অকসিজেন খরচেরও বেশ খানিকটা সাশ্রয় হচ্ছে।

রক্তের কাজ কেবল পরিবহনই নয়, আরো অনেক দরকারী কাজ রক্ত করে থাকে। শরীরের নাড়ীগুলির ভেতর দিয়ে বহে যেতে যেতে রক্ত ফুসফুস আর অন্ত্রের পরিবেশের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসে। কিন্তু ফুসফুস আর অন্ত্র হোল জীব-শরীরের সবচেয়ে নোংরা জায়গা। আশ্চর্য কি যে এই অঞ্চল দিয়েই জীবাণু রক্তের মধ্যে প্রবেশ করবে। কেনই বা এমনটি ঘটবে না—রক্ত বেশ একটা পৌষ্টিক মাধ্যম, অকসিজেন আছে প্রচুর। গেট-এ সতর্ক এবং নির্দয় প্রহরীরা যদি না থাকত, তাহলে প্রাণীর জীবনের গতি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেত।

প্রহরী সহজেই পাওয়া গেল বহুসংখ্যায়। প্রাণ-সৃষ্টির আদি যুগে প্রাণীর শরীরের সকল কোষেরই খাদ্য ধরে নিয়ে হজম করার ক্ষমতা ছিল। সেই সময় থেকেই শরীরে মোতায়েন আছে চলমান কোষরাশি, অনেকটা আজকালকার অ্যামিবাদের মতো। এরা কুঁড়ের মতো বসে থাকতে পারেনা, যে কখন তরল স্রোতে ভেসে আসবে সুস্বাদু খাদ্যকণা। বরং এরা সর্বদা খুঁজে চলেছে প্রাত্যহিক রুটির সুলুক। এই ভ্রাম্যমান শিকারীরা — যারা শুরু থেকেই যুদ্ধ ঘোষণা করেছে আক্রমণকারী জীবাণুদের বিরুদ্ধে — এরা শ্বেতকণিকা নামে পরিচিত।

মানুষের রক্তে যত প্রকারের কোষ আছে তাদের মধ্যে শ্বেতকণিকারা আকৃতিতে সব চেয়ে বড়ো, 8 থেকে 20 মাইক্রন। সাদা পোশাকপরা এই শৌচকর্মীরা আমাদের শরীরে পরিপাকের কাজে অংশ নিয়ে থাকত অনেককাল পর্যন্ত — একাজ তারা এখনো করে থাকে উভচরদের শরীরে। তাই এটা আশ্চর্যের বিষয় নয় যে নিম্নস্তরের প্রাণীদের শরীরে শ্বেতকণিকা থাকে খুব বেশি সংখ্যায়। এক ঘনমিলিমিটার মাছের রক্তে আছে ৪০ হাজার শ্বেতকণা, সুস্থ মানুষের শরীরের সঙ্গে তুলনায় দশগুণ।

রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুর সঙ্গে লড়াই করে জিততে গেলে চাই বহুসংখ্যায় শ্বেতকণার বাহিনী, শরীরও তাই বহুসংখ্যায় এদের সৃষ্টি করে। কিন্তু এরা কতদিন বাঁচে সেটা সঠিকভাবে জানা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্বেতকণিকারা অবশ্যই যোদ্ধা এবং সেই কারণে বোধহয় এদের কেউই বেঁচে বর্তে থেকে বৃদ্ধ হয়ে মরে না, মরে লড়াই করে, তার মানে শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখার জন্য যে যুদ্ধ তাতেই এরা মরে। এর থেকেই ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে যে কেন ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষার পরিস্থিতিতে বিভিন্ন প্রাণীর শরীরের শ্বেতকণিকারা কেউ বাঁচে 23 মিনিট কেউ বা পনের দিন।

আরো নির্ভুল তথ্য অবশ্য পাওয়া গেছে লসিকাকোষদের (lymphocytes) সম্বন্ধে। এরা আমাদের শরীরে রক্তের শ্বেতকণিকাদেরই একটা প্রকারভেদ মাত্র। এদের আয়ুষ্কাল দশ থেকে বারো ঘণ্টা, যার অর্থ এই যে শরীর প্রত্যেক দিন দুবার করে এই লসিকাকোষের পুরো ভাণ্ডারটা পরিপূরণ করে নেয়।

শ্বেতকণিকারা কেবল যে রক্তবহা পথগুলি ধরে যেখানে খুশি ঘুরে বেড়ায় তা নয়, দরকার পড়লে সে পথ ছেড়ে, কোষকলার মধ্যে ঢুকে যেতে পারে, সেখানে গভীরে প্রবিষ্ট জীবাণুদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে। শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক জীবাণুদের গিলে ফেলতে গিয়ে শ্বেতকণিকারা জীবাণু-শরীর থেকে নির্গত কড়া বিষে জর্জরিত হয়ে মরে যায়, কিন্তু তারা হার স্বীকার করে না, তারা আক্রমণের জায়গাটাতে ছুটে আসে সারিতে সারিতে, ঝাঁকে, ঝাঁকে, যতক্ষণ না শত্রুর প্রতিরোধ দমিত হয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকটা শ্বেতকণা কুড়িটা পর্যন্ত জীবাণুকে মেরে ফেলতে পারে।

শ্বেতকণারা হাজির হয় জীবাণুদের আশ্রয়দাত্রী শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে। প্রতি মিনিটে মানুষের মুখের গহ্বরে আসছে আড়াইলক্ষ শ্বেতকণা আর তাদের আশিভাগের একভাগ মরে যাচ্ছে প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায়।

শ্বেতকণিকাদের কাজ কেবল জীবাণুদের সঙ্গে লড়াই করাই নয়। এদের আরো একটা বড় কাজ করতে হয়, সব মার খাওয়া, ক্ষয়ে যাওয়া কোষগুলিকে ধ্বংস করে ফেলা। সর্বদা তারা এই ভাঙচুরের কাজ করে চলেছে শরীরের বিভিন্ন কলার গাত্রে, যাতে নতুন কোষের গঠনের জায়গাটা খালি হয়। এই গঠনের কাজে তরুণ শ্বেতকণারাও অংশ নেয়। অন্তত তারা সাহায্য করে হাড়ের গঠনে, বন্ধনীকলা (connectivetissue) এবং পেশীর পুনর্গঠনে।

তরুণবয়সেই শ্বেতকণিকাদের বেছে নিতে হয় তারা বড়ো হয়ে কে কী হবে। কেউ হয়ত তৈরী হোল জীবাণুদের সঙ্গে লড়াই-এর জন্য, কেউ বা হোল চর্বিকোষ, সঙ্গীদের সঙ্গে একজোট হয়ে বসে কুঁড়ের মতো কাল কাটাবার জন্য।

আক্রমণকারী জীবাণুদের কবল থেকে শরীরকে রক্ষা করতে যদি কেবল শ্বেতকণিকাদেরই লড়াই করতে হোত তাহলে তারা পেরে উঠত না। ভাগ্যক্রমে সকল প্রাণীর রক্তেই আছে নানাবিধ পদার্থ যাদের কেউ জীবাণুদের আঠার মতো আটকে দেয়, কেউ বা মেরে ফেলে, কেউ বা দ্রবীভূত করে ফেলে —

যখন জীবাণু রক্তস্রোতের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে যায় — এবং এইভাবে জীবাণু-শরীর থেকে নিঃসৃত বিষকে অদ্রব, নির্দোষ পদার্থে রূপান্তর ঘটিয়ে দেয়। এইসব পদার্থের কতকগুলি আমরা পেয়ে থাকি আমাদের পিতামাতার শরীর থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে, কতকগুলি আমরা নিজেরাই বানাই নানা জাতের শত্রুর সঙ্গে লড়তে লড়তে।

চাপধারক ব্যবস্থা আমাদের রক্তচাপের ওপর চৌকিদারী যত সতর্কভাবেই করুক না কেন, যে কোন মুহূর্তে ব্যবস্থাটা ভেঙ্গে পড়তে পারে। অনেক ক্ষেত্রেই গোলমালটা আসে বাইরে থেকে। যে কোন ক্ষত, তা সে যত ছোটই হোক না কেন, শত শত বা হাজার হাজার ছোট ছোট শিরা বা ধমনীকে ধ্বংস করে ফেলে, সৃষ্টি করে ভাঙনের, যার ফলে আমাদের শরীরস্থ সমুদ্র থেকে তরল পদার্থ বেরিয়ে যেতে থাকে।

সকল প্রাণীকেই নিজের নিজের সমুদ্র দেবার কালে প্রকৃতিকে দিতে হোল একটা আপৎকালীন সেবার ব্যবস্থা, যার কাজ হোল সমুদ্রতটগুলির ভাঙন রোধ করা। শুরু থেকেই এই ব্যবস্থাটা খুব একটা নির্ভরযোগ্য ছিল না। সেই কারণে নিম্নস্তরের প্রাণীদের ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ চৌবাচ্চাটা অনেকটা খালি হয়ে গেলেও বিশেষ হানিকর কোন কুফল দেখা দেয় না। মানুষের ক্ষেত্রে 30 শতাংশ রক্তহানি মৃত্যু ঘটাবে অথচ জাপানী গুবরে পোকার শরীরের 50 শতাংশ রক্ত-রস নিঃশেষ হলেও পোকাটা বেঁচে থাকবে।

সমুদ্রের মাঝখানে জাহাজে যদি ছিদ্র দেখা দেয়, নাবিকেরা ছিদ্রটাকে বন্ধ করে দিতে সচেষ্ট হয়, হাতের কাছে যা পায় তাই দিয়ে। প্রকৃতি রক্তের মধ্যে দিয়ে রেখেছেন তালি লাগাবার উপযোগী অনেকগুলি উপাদান। এরা কতকগুলি বিশেষ কোষ, আকৃতি লাটিমের মতো, নাম থ্রমবোসাইটস্। আকারে এরা খুব ছোট, দুই থেকে চার মাইক্রন এদের ব্যাস। এত ছোট ছোট প্লাগ দিয়ে যে ফুটো বন্ধ করা যায় তাদের আকারও বড় হতে পারতনা যদি না থ্রমবোসাইটস্-এরা জোট বাঁধতে পারত থ্রমবোকাইনেজ নামের এক প্রকার এনজাইম-এর সক্রিয়তার সাহায্যে। এই এনজাইম প্রচুর পরিমাণে থাকে শিরা-ধমনীর সংলগ্ন কোষ-কলাতে, ত্বকের নীচে এবং অন্যান্য সেইসব অঞ্চলে যেখানে আঘাত লাগার বেশি সম্ভাবনা থাকে। সামান্য চোট লাগলেই আহত কলা থেকে খানিকটা থ্রমবোকাইনেজ বেরিয়ে রক্তের সংস্পর্শে আসে, থ্রমবোসাইটস-এরা তখনি একের গায়ে আরেকটা জুড়ে গিয়ে ছোট একটা দলার সৃষ্টি করে, এদিকে

রক্ত ক্রমে ক্রমে আরো বেশি করে গঠনের মালমসলা যুগিয়ে যেতে থাকে, যেমন ধরো জমায়েত হয় প্রতি ঘন মিলিমিটারে দেড় লক্ষ থেকে চার লক্ষ থ্রমবোসাইটস্।

শুধু থ্রমবোসাইটস দিয়ে ফুটো বন্ধ করবার প্লাগ বা ছিপিটা খুব বড়ো হবে না। দলাটা আসলে বাঁধে একটা বিশেষ প্রোটিন ফাইব্রিন-এর ক্রিয়াশীলতার দরুণ, রক্তে যেটা সর্বদাই থাকে ফিবরিনোজেন আকারে। ফাইব্রিনের তন্তুগুলি একটা জাল বানাতে শুরু করে যার মধ্যে থ্রমবোসাইটস্-এর ছোট দলাগুলি, লোহিতকণা আর শ্বেতকণা সবাই আটকা পড়ে যায়। বেশ সাইজমতো একটা ছিপি তৈরি হতে লাগে কয়েকমিনিট মাত্র, আঘাতপ্রাপ্ত ধমনীটা যদি তত ছোট হয় যে তার ভেতরের রক্তের চাপ প্লাগটাকে খুলে দেবার মতো বেশি নয় তাহলে চুঁইয়ে পড়া বন্ধ হয়ে যাবে।

আপৎকালীন ব্যবস্থার জন্য বেশি শক্তি ক্ষয় হোক অর্থাৎ অকসিজেন ব্যয় হোক এটা একটা যুক্তিসিদ্ধ ব্যবস্থা নয়। থ্রমবোসাইটস্দের কাজ হোল কেবল বিপদের সময় একসঙ্গে জুড়ে যাওয়া। এই যে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা যার জন্য থ্রমবোসাইটসদের নিজেদের খাটুনি খুবই নগণ্য — এর জন্য শরীরের সুস্থ অবস্থায় তারা অকসিজেন খরচ করুক এটা ঠিক নয়। এই কারণে প্রকৃতি থ্রমবোসাইটসদের নিউক্লিয়াস দেননি, লোহিতকণাদের মতোই। এবং এইভাবে বিপাকের মাত্রা কমিয়ে রেখেছেন। তাই অকসিজেনের খরচে খানিকটা সাশ্রয় হয়েছে।

অনুমান করা সহজ যে একটা সুনিয়ন্ত্রিত আপৎকালীন সেবার ব্যবস্থা থাকা দরকার রক্তের মধ্যে কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে এই ব্যবস্থাটার দরুণ গভীর একটা সংকটের ঝুঁকিও এসে যায় প্রাণী-শরীরের ওপর। কোন কারণে যদি এই আপৎকালীন ব্যবস্থাটা কার্যকর হয় অসময়ে, খুবই বেদনাদায়ক একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাবে। রক্ত দলা বেঁধে গিয়ে ধমনীকে বন্ধ করে দেবে। এই সম্ভাবনার মোকাবিলা করতে রক্তে আছে আর একটা আপৎকালীন ব্যবস্থা, রক্তের দলা গলিয়ে দেবার ব্যবস্থা। এই জমাট বাঁধাতে না দেবার যে ব্যবস্থা এটা লক্ষ্য রাখে রক্তে থ্রমবিনের অস্তিত্ব আছে কি নেই, ফিবরিনোজেনের সঙ্গে থ্রমবিনের বিক্রিয়ার ফলেই ফিবরিনের সুতোগুলির সৃষ্টি হয়। থ্রমবিনের দেখা পেলেই এই গলিয়ে দেবার ব্যবস্থা তাকে নাকাম করে দেয়।

এই দ্বিতীয় আপৎকালীন ব্যবস্থাটা খুবই কার্যকর। ব্যাঙের রক্তে যদি ভারীমাত্রায় থ্রম্বিন ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, ভয়াবহ কোন কুফল দেখা দেবে না, তৎক্ষনাৎ সেটা অকার্যকর হয়ে যাবে। ব্যাঙের সেই রক্ত পরীক্ষা করলে দেখা যাবে সে রক্ত জমাট বাঁধার ক্ষমতা হারিয়েছে।

প্রথম আপৎকালীন ব্যবস্থাটা কাজ করে স্বচালিতভাবে, দ্বিতীয়টা কাজ করে মস্তিষ্কের আদেশে, আদেশ না পেলে কাজ করবেই না। ব্যাঙের প্রধান কার্যালয় আর্থাৎ মেডুলা অবলাঙগাটা যদি প্রথমে ধ্বংস করে তারপর থ্রম্বিন ইনজেকশন দেওয়া হয় রক্ত তৎক্ষণাৎ জমাট বেঁধে যাবে। দ্বিতীয় আপৎকালীন ব্যবস্থা তো সজাগ রয়েছে কিন্তু বিপদের ঘণ্টা বাজাবে কে?

আপৎকালীন ব্যবস্থাগুলি ছাড়াও রক্তের আছে বড়ো সড়ো মেরামতির দল। রক্তসংবহন ব্যবস্থায় চোট লাগল রক্তটা খুব তাড়াতাড়ি জমাট বাঁধলেই চলবে না, এই জমাট বাঁধা দলাটাকে আবার সরিয়েও ফেলতে হবে। ছিঁড়ে যাওয়া দলাটাকে প্লাগ বা ছিপি দিয়ে বন্ধ করে দিলে ঘা-টা সেরে উঠতে বাধার সৃষ্টি হয়। মেরামতের দল যখন কলাগুলির পুনর্বিন্যাস করে তখন তারা আবার এই দলাটাকে গলিয়েও দেয়।

অসংখ্য প্রহরী, নিয়ন্ত্রণ আর আপৎকালীন সেবার ব্যবস্থা দিয়ে আমাদের শরীর প্রহরায় রত আছে নানা বিপদের মধ্যে আমাদের আভ্যন্তরীণ সমুদ্রের জল যাতে অবিরাম বহমান থাকতে পারে এবং তার উপাদানগুলির মাত্রায় কোন ভেজাল না মেশে।

জলবিজ্ঞান

প্রকৃতি সর্বদা চেষ্টা করেন দেহযন্ত্রদের দিয়ে বাড়তি অস্বাভাবিক কিছু কাজ করিয়ে নিতে। হৃৎপিন্ড-শিরা-ধমনীতন্ত্রের কাজ অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট এবং দায়িত্বশীল হওয়া সত্ত্বেও এই দুর্ভাগ্য তারা এড়াতে পারেনি কেননা প্রকৃতির আগ্রহ জাগল রক্তসংবহনের দরুণ সৃষ্ট চাপকে কীভাবে কাজে লাগান যায় সেটা পরখ করে দেখার।

উচ্চ রক্তচাপ শরীরের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে জানা আছে কারণ এই রোগে রক্তসংবহন ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়ে রক্তবহা নাড়ীগুলির ক্ষতি হতে পারে। প্রকৃতি কিন্তু এই ঘটনাটার সুযোগ নিলেন। কয়েক জাতের গিরগিটি যাদের নাম নিউট (newts) বা শিংওয়ালা ব্যাঙ (hornedtoads) মেকসিকোর

মরুভূমির বাসিন্দা-এরা এদের মাথার ধমনীগুলির স্থানীয় উচ্চচাপকে আত্মরক্ষার কাজে ব্যবহার করে থাকে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে গেলে এই ঘটনাটা খুব অস্বাভাবিক কিছু নয়। রক্ত যখন অস্বাভাবিক চাপে মাথার চূড়ায়, শিঁরদাড়ায় আর মাথা ও শরীরের থেকে বেরিয়ে আসা প্রত্যঙ্গগুলি দিয়ে বহে যায় তখন সেই প্রত্যঙ্গগুলি ফুলে ওঠে, খাড়া হয়ে যায়, তাদের রং বদলায় এবং জানোয়ারটাকে ভয়াবহ দেখায়।

শিংওয়ালা ব্যাঙদের আত্মরক্ষার এটাই একমাত্র উপায় নয়। প্রকৃতি তাদের বেশ অভিনব এক যন্ত্র দিয়েছেন। গিরগিটিটা যখন আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে কোণঠাসা হয়ে রয়েছে তখন তার একটা বিশেষ পেশী, নাম obturator পেশী, চাপ দেয় একটা প্রধান ধমনীর ওপর, যার ফলে মাথার ধমনীগুলির রক্তচাপ খুব বেড়ে যায়। এই কারণে চোখের পল্লবগুলিকে খুলতে বা বন্ধ করতে যে ঝিল্লি কাজ করে সেই ঝিল্লির ছোট ছোট ধমনীগুলি সেই বাড়তি রক্তচাপ সহ্য করতে পারে না এবং ছিঁড়ে যায়, আক্রমণকারীর দেহের ওপর ছিটকে পড়ে রক্তের ধারা। এই আচমকা রক্তবৃষ্টির ফলে অনেক সময় আক্রমণকারী পালিয়ে যায়। এই অস্ত্রটি এক থেকে দেড়মিটার দূরত্ব পর্যন্ত কার্যকর। এই obturator পেশীর দ্বিতীয় কাজটা খোলসছাড়ার সঙ্গে জড়িত। সরীসৃপদের শরীর সারা জীবন ধরেই বাড়ে। শিংওয়ালা ব্যাঙ প্রত্যেক বছর তার গাত্রচর্ম পালটায়। জামা-কাপড় ছাড়া অনেক সময় হয়ে দাঁড়ায় বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এই সময় obturator পেশী দেখায় তার কায়দা। মাথার ধমনীগুলির রক্তচাপ বাড়লে ছোট বড় সকল ধমনীই ফুলে ওঠে, পুরোন চামড়া যায় ছিঁড়ে। মাথার চামড়া ছিঁড়ে গেলে গিরগিটিটাকে কেবল হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসতে হয় এই নতুন ছিদ্রটা দিয়ে, যেন সে তার ওভার-অলটা ছেড়ে ফেলছে।

হৃৎপিণ্ড-শিরা-ধমনীতন্ত্রকে এই সব দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজকর্ম করতে দেওয়া কিন্তু ভাল নয়। কিন্তু পাম্প আর যোগোযোগ ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হয়ে যাবার পরে প্রকৃতির জলবিজ্ঞানে আগ্রহ বাড়ল। প্রথমত প্রকৃতি আন্দাজ করলেন যে তরলকে যদি কলা-র কোষগুলির অন্তর্বর্তী জায়গাগুলিতে আর গর্তগুলিতে ঠেলে দেওয়া যায় তাহলে সেই তরল পেশীর টারগর (turgor) বা টান বাড়িয়ে দেবে অর্থাৎ পেশীর বল কিছুটা বাড়বে। জলবিজ্ঞানসম্ভূত কাঠামো তৈরির সেটাই প্রথম ধাপ।

শুনতে মজা লাগবে যে এই ধরনের স্থাপত্য মানুষ ব্যবহার করতে শুরু করেছে এই বিংশ শতাব্দীতেই, এবং এখনো এই রীতির বহুল ব্যবহার চালু হয়নি। উচ্চচাপে বাতাসকে ব্যবহার করা হয়েছে বেশি কার্যকরভাবে। মনে মনে কল্পনা করো এক সারি বুলডজার আর দীর্ঘপথ পাড়ি দেবার গাড়ি ঝোপ জঙ্গল পেরিয়ে যাচ্ছে নির্মাণ কাজের অঞ্চলের দিকে। কয়েকঘণ্টার মধ্যে কর্মীদের থাকবার জায়গাটা পরিষ্কার করা হয়ে গেল।

তারপর ট্রাক থেকে নামানো হোল অনতিগুরুভার কতকগুলি প্যাকিং বাকস। পাম্প চালু হবার আধঘণ্টার মধ্যে দ্বিতল ক্যানভাস-এর বাড়ির সারি তৈরি হয়ে গেল, যাদের কড়ি-বরগা সব বাতাস দিয়ে ফোলানো, সেই জঙ্গল কেটে উদ্ধার করা অঞ্চলে।

সুবিধাজনক, সময় সঙেখপকারী, সুব্যবহার্য এই স্থাপত্যগুলি খুবই নির্ভরযোগ্য। তা ছাড়া এই ক্যানভাসের বাড়িগুলি বেশ গরমও হতে পারে যদি তাদের দেয়ালগুলি দু-তিন স্তরে বাতাস-ফোলানো রাবার মেশানো ক্যানভাস দিয়ে তৈরি হয়।

প্রাণীরাও জানে তরল-স্থিতি-সম্ভূত কাঠামোর ব্যবহার-এর প্রধান সুবিধা হোল এই যে যতক্ষণ দরকার ততক্ষণই একে গড়ে রাখা যায়। দরকার ফুরালো, প্রণালীটার চাপ কমিয়ে দেওয়া হোল, জলস্থিতি-সম্ভূত কাঠামোর আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না। এটা ঠিকই যে হাড়ের মতো মজবুত ও নির্ভরযোগ্য নয় এই কাঠামো, আর যে-সব ক্ষেত্রে খুঁটিগুলির স্থায়ী হওয়া দরকার সে সব জয়েগায় এই জল-স্থিতি-সম্ভূত কাঠামোর বদলে আরো দৃঢ় নির্মাণকৌশল কাজে লাগানো হয়েছে। কিন্তু অস্থায়ী কাঠামোর জন্য জলবিজ্ঞান আরো সুবিধাজনক প্রমাণিত হয়েছে। প্রকৃতি এই আবিষ্কারটা জীবজগতের বিবর্তনের সকল স্তরেই প্রয়োগ করেছেন, অতিক্ষুদ্র নিম্ন শ্রেণীর প্রাণী থেকে সকল উচ্চবর্গের প্রাণীর ক্ষেত্রেও, মানুষকেও ধরে। গর্তওয়ালা শরীরে রক্তকে কার্যকর তরল পদার্থ হিসেবে প্রয়োগের সুদৃষ্টান্ত দেখানো যায়।

তরল-গতি বিজ্ঞানের প্রয়োগগুলি আরো চাঞ্চল্যকর। এদের বিকাশের ক্ষেত্রে অতি আদিম সরল প্রণালী থেকে অতি আধুনিক বিদগ্ধ ব্যবস্থা — সবই আছে। সব থেকে প্রাচীন প্রণালীর নিদর্শন পাওয়া যায় দুইখোলার শামুকদের জলত্যাগের জন্য সাইফন নল ব্যবস্থায়। জীবিত কালে এই
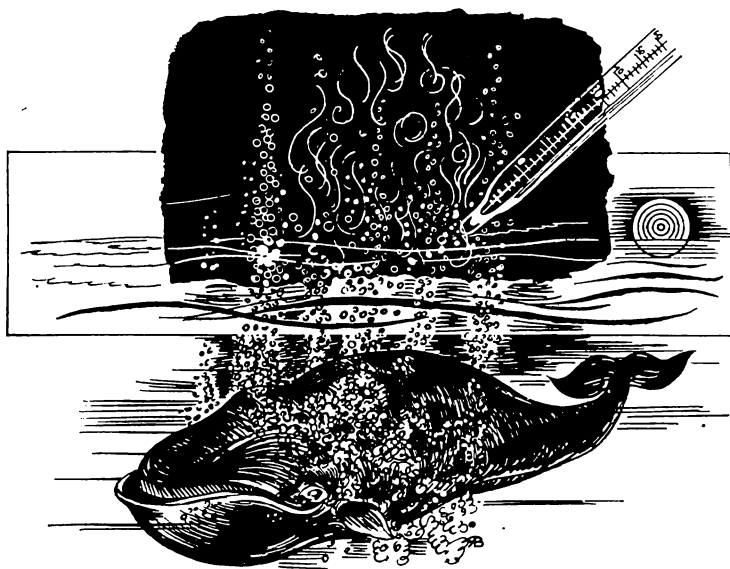
প্রাণীরা জল থেকে পেয়ে থাকে অকসিজেন, খাদ্য, অতিক্ষুদ্র জীবাণু এবং উদ্ভিদের যাদের এরা ঢাকনার গর্তের মধ্যে শুষে নেয়। জলটা যখন কারবন ডাই অকসাইডে সম্পৃক্ত এবং অন্যান্য বর্জ্য পদার্থে দূষিত হয়ে যায় তখন সেটা বের করে দেওয়া হয় বিশেষ একটা সাইফন নলের সাহায্যে। শামুকটা নিশ্চয় চাইবে যে এই নোংরা পদার্থগুলি তার শরীর থেকে বেশ খানিকটা দূরে সরিয়ে দেওয়া হোক যাতে সেগুলি আবার তার ঢাকনার গর্তে না ফিরে আসে। তাই ব্যাখ্যা পাওয়া যায় কেন এই সাইফন নল বেশ বড়, যদিও এই নলে কোন পেশী নেই, টানলেও বাড়ে না। ঢাকনা যখন বন্ধ থাকে আর জল গর্তে ঢোকা বন্ধ হয়ে যায় তখন এই সাইফন নল গুটিয়ে যায়, কিন্তু যেইমাত্র তরল পদার্থ প্রবহমান হয় অমনি নলটা সোজা এবং বেশ টান-টান লম্বা হয়ে যায়।

মাকড়সার পায়ের জল-গতিবিজ্ঞানসম্ভূত প্রণালীগুলি তাদের চলাফেরার সঙ্গে জড়িত। অষ্টপদী প্রাণীদের প্রত্যেক পায়ে আছে ছয় বা সাতটা করে খণ্ড — অন্য কোন প্রাণীর মতোই পাগুলি ভাঁজ করার জন্য নির্দিষ্ট পেশী সংকুচিত করতে হয় কিন্তু ছড়িয়ে দেবার সময় কাইটিন (chitin) এর পোশাক পরা পায়ের ভিতরের চাপ বাড়িয়ে দিতে হয়।

তরল-গতিবিজ্ঞানসম্ভূত প্রযুক্তিগুলি গর্ত খোঁড়ার জন্যও বেশ উপযোগী। ভিজে মাটির মধ্যদিয়ে সুড়ঙ্গ কাটবার সময় কেঁচো তার সামনের প্রান্তের গোল পেশীগুলিকে যথাসাধ্য সংকুচিত করে নেয়। তাই তার মাথাটা হয়ে যায় এক ধরনের ধারালো তুরপুণ (মাটিটা শুকনো থাকলে কেঁচো সেটা আর্দ্র করে নেয়)। এবারে সে মাটির চাঙড়ের মধ্যে খোঁজে ছোট একটা ফাঁক।

খুঁজে না পেলে কেঁচোটা তার শরীরের সামনের প্রান্ত দিয়ে মাটির মধ্যে ধাক্কা দিতে থাকে, তার খাদ্যনালীতে আছে তরল-গতিবিজ্ঞানের একটা যন্ত্র ব্যবস্থা, তারই সাহায্যে। জলের চাপ 2 মিলিমিটার জলস্তম্ভ থেকে বাড়িয়ে 14 মিলিমিটার জলস্তম্ভ করে দিলে তা থেকে সৃষ্ট জলের দণ্ড দিয়ে 8.5 গ্রাম-বলের ধাক্কা দেওয়া সম্ভব হয়। কিছুটা গভীরতার মধ্যে ঢুকতে পারলে কেঁচো তার শরীরের সামনের প্রান্তটার চাপ বাড়িয়ে দিয়ে সেটা ফোলায়, তাই গর্তটা বড় হয়ে যায়। মাটি যদি বেশ শক্ত না হয়, এই প্রণালী পুণঃপুণঃ প্রয়োগ করে তোমাদের চোখের সামনে কেঁচোটা তার গোটা শরীরটা মাটির মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছে দেখতে পাবে। আরো শক্তিধর সাইপানকিউলিড-এরা (sipunclids), মাটি খোঁড়ার কালে যে চাপ এরা সৃষ্টি করতে পারে সেটা 600 মিলিমিটার জলস্তম্ভের তুল্য।

জল-গতিবিজ্ঞান সম্ভূত নিখুঁত যন্ত্র ব্যবস্থায় তুল্য আর কেউ নয়, এবং এর প্রয়ে গকুশলতার বিকাশ ঘটেছে তারা-মাছ, সী-আরচিন (sea-urchins), বৃটল্-স্টার আর সমুদ্রিক কাঁকুড় বা sea-cucumbers দের মধ্যে। তারা-মাছের বাহুগুলিতে আছে সুষমভাবে সজ্জিত গর্ত বা নালীর সারি, জলের মতো তরল পদার্থে পূর্ণ। এই বাহুগুলির তলার দিকে আছে সরু সরু নলের আকারে অসংখ্য পা, যার মধ্যে নালীর থেকে শাখায়িত যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে। তারা-মাছের চলার কালে, এই তরল পদার্থ পেঁৗছে যায় তার নলের আকারের পাগুলির মধ্যে, সেগুলি ফুলে ওঠে, যেদিকে যাবে সেদিকে প্রলম্বিত হয়ে যায়। আঁকড়ে ধরার মতো কিছু যদি পেল এই বাহু বা পদসংলগ্ন আকর্ষণীগুলি, তাদের পেশীদের হয় সংকোচন, নালীর ভিতরের তরলকে চাপ দিয়ে ঠেলে দেয়, তারা-মাছ সামান্য এগিয়ে যায় গুঁড়ি মেরে। এবারে নল-পা সেই মাটিকে ছেড়ে দেয় যার ওপর দিয়ে তারা মাছ এগোচ্ছে, আবার সেই নলগুলি তরলে ভরে যায়, চক্রটা আবার শুরু হয়। এ থেকে দেখা গেল হৃৎপিণ্ডই একমাত্র পাম্প্ নয়, প্রকৃতি তাঁর

সৃষ্ট প্রাণীদের দিয়ে বিভিন্ন প্রাণকার্য সম্পন্ন করাতে নানা প্রকারের পাম্প-ব্যবস্থার প্রয়োগ করেছেন।

জ্বালানী কাঠ কোথায় পাওয়া যায় বলতো?

সৌরজগতের বাকি গ্রহদের মতো পৃথিবীর জলবায়ুও বেশ বিচিত্র। দক্ষিণ মেরুতে আছি কতকগুলি মনোরম জায়গা যেখানে তাপাঙ্ক নেমে যায় শূন্যের নীচে 88°C পর্যন্ত, আবার আফ্রিকার কোন অঞ্চলে কখনো কখনো পৌঁছে যায় শূন্যের ওপরে 55°C পর্যন্ত। এগুলি অবশ্য ওপরের আর নীচের সীমা, দেখা যায়, ভূপৃষ্ঠের সামান্য কয়েকটি অঞ্চলে। মুখ্যত, এই পৃথিবীর আবহাওয়া এর থেকে অনেক সহনীয়; খুব সম্ভবত, এই কারণেই জীবিত প্রাণীর সমুদায় প্রাণকার্য যে উত্তাপ-সীমার মধ্যে সংঘটিত হয়ে থাকে সেটা শূন্য থেকে চল্লিশ ডিগ্রির ভেতরে। বিস্তারটা নেহাৎ কম নয়, তবুও অনেক প্রাণী আছে যাদের কাছে এই প্রান্তসীমা দুটির পরিসরটি সংকীর্ণ বোধ হয়।

যেমন ধরো, কয়েক জাতের শেওলা আছে যারা বাঁচে, বংশবৃদ্ধি করে এবং আপাত দৃষ্টিতে আরাম পায় 70°C থেকে 90°C এর মধ্যে। অন্যদিকে জীবন বহমান চিরন্তন তুষারাচ্ছন্ন মেরু প্রদেশেও। এই অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারটা করেছিলেন হোরেস বেনেডিকটদ সওসুর, একজন সুইশ প্রকৃতিবিজ্ঞানী তাঁর অভিযান থেকে। এই অভিযানের সহযোগী বিজ্ঞানীরা আর একটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন যেটা তাঁদের বিমূঢ় করেছিল। এই অভিযানেই আবিষ্কৃত হয় কয়েকটি অঞ্চল যেখানে তুষারের রং রক্তের মতো লাল। দৃশ্যটা চমকে দেবার মতোই।

অচিরেই জানা গেল বরফের এই অস্বাভাবিক রং অতি ক্ষুদ্র এককোষী শেওলাদের দরুণ যারা বরফের উপরিতল ঢেকে রেখেছিল। এই শেওলাগুলির নাম দেওয়া হয়েছে তুষার-ক্লামিডোমোনাস, সুমেরু এবং দক্ষিণমেরুর অনেকগুলি অঞ্চলে এদের পাওয়া যায়, বিশ্বের সর্বোচ্চ গিরিচূড়াগুলিতে, ককেশাস পর্বতেও।

বর্তমানে বিজ্ঞানীরা সন্ধান পেয়েছেন অন্তত 140টি প্রজাতির উদ্ভিদের যারা পাকাপাকিভাবে বরফের বা তুষারের মধ্যে থাকে। কেউ বেগুণী, কেউ লাল, বাদামী বা সবুজ, রংটা আবার ধার দেয় সেই তুষারকেই।

যথাযথ বৃদ্ধি, পুষ্টির জন্য ক্ল্যামিডোমেনাসদের চাই পর্যাপ্ত সূর্যালোক আর বেশ নীচু তাপমাত্রা। তাই তাদের দেখা মেলে কেবল মেরু অঞ্চলে আর অত্যুচ্চ পর্বতচূড়ায়। অস্বাভাবিক শৈত্য সহ্য করবার যে ক্ষমতা বিজ্ঞানীদের প্রথম প্রথম বিস্মিত করত, আজ সেটা স্বাভাবিক ধরে নেওয়া হয়। আরো বিস্ময়কর ব্যাপার হোল এই যে এরা উত্তাপকে ভয় পায়। তুষার-ক্ল্যামিডোমোনাস-এরা 4°C-এর মতো মৃদু উত্তাপও সহ্য করতে পারে না, আমাদের কাছে যা বেশ শীতলই বোধ হবে। পৃথিবীতে যত রকমের জীব বা উদ্ভিদ আছে তাদের মধ্যে উত্তাপের ভয় ক্ল্যামিডোমোনাসের-এর সব থেকে বেশি। মনে রাখতে হবে যে একই প্রজাতির জীব সকল প্রকার জলবায়ুতেই বাস করে মেরু অঞ্চল থেকে বিষুবরেখা পর্যন্ত। সর্বব্যপী এই প্রাণীবর্গের কয়েকটি বংশধারার মধ্যে উত্তাপ এবং শৈত্য সহ্য করবার ক্ষমতার মধ্যে প্রচুর তারতম্য দেখা যায়। সুমেরু মহাসাগরে গ্রীনলাণ্ডের কাছে থাকে পেটে ত্রিবলী-আঁকা কীটেরা। এরা 6°C বা 7°C তাপমাত্রার জলে বাঁচতে পারে না অথচ এদের জ্ঞাতিরা থাকে ভারত মহাসাগরে, 24°C তাপমাত্রা অনায়াসে সহ্য করে।

যে সব কবচী প্রাণী আরব উপদ্বীপের চারধারের উষ্ণ এবং কিছুটা লবণাক্ত জলে থাকে, প্রাণীজগতে তারাই সবচেয়ে তাপপ্রেমী। 35°C তাপাঙ্কে তাদের খুব ঠাণ্ডা লাগে এবং তাপমাত্রা এর থেকে নেমে গেলে তারা বাঁচে না।

বেশির ভাগ প্রাণী কিন্তু এমন শীতকাতুরে নয়। অতি আদিম প্রাণীরা যেমন ছত্রাকের রেণুকণারা বেঁচে থাকতে পারে পরম শূন্য তাপমাত্রার খুব কাছাকাছি শৈত্যেও অর্থাৎ প্রায় —273°C-র কাছে। এমনকি পতঙ্গদের মতো উন্নত প্রাণীরা বা তাদের ডিম বা মূককীটেরা সহ্য করতে পারে যথেষ্ট শৈত্য। এদের মধ্যে অনেকে উত্তরাঞ্চলের প্রচণ্ড তুষারপাত সহ্য করে থাকে, —30°C শীতের মধ্যে খোলা জায়গায় শীতকালটা কাটায়। পরীক্ষাগারে এরা —80°C থেকে —250°C তাপমাত্রার শৈত্য সহ্য করতে পেরেছে এমন নজির আছে।

অনেক প্রাণী, প্রবল শৈত্য বা প্রচণ্ড গরম সহ্য করতে পারে, তাদের মুখ্য প্রাণকার্যগুলি সম্পাদন করতে একটা সীমিত পরিধির তাপমাত্রার প্রয়োজন বোধ করে কেন?

যে কোন পদার্থে উত্তাপ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে অন্তস্থ অণুগুলির মানে যে

সব অণু দিয়ে জীবদেহ গঠিত হয়েছে তাদেরই সঞ্চালনকে। উত্তাপ কমলে ক্রমশ অণুদের চলাচলের বেগও কমে যায় এবং এর ফলে রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলিও হ্রাস পায়, শেষ পর্যন্ত এই বিক্রিয়াগুলি চলে এত ধিমাগতিতে যে প্রাণকার্য আর চলতে পারে না। এটা ঘটে তাপমাত্রা 0°C-এর থেকে নিচে নেমে গেলে, যখন শরীরের তরলগুলি জমে যায়, কেননা মুখ্য রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলি জলে দ্রব অবস্থাতেই কেবল ঘটতে পারে।

প্রাণী-শরীরে উত্তাপের সর্বোচ্চ সীমাটা নির্ভর করে চর্বি আর প্রোটিনের সাংগঠনিক স্থায়িত্বের ওপর। 40°C-এর বেশি উত্তাপে গরম করলে তাদের এমন পরিবর্তন হয়ে যায় যে কোষগুলি মরে যায়। এই কারণে সকল প্রাণী চেষ্টা করে সুবিধাজনক তাপসীমার মধ্যে বাস করতে। এই উদ্দেশ্যটা তারা সাধন করে থাকে নানা উপায়ে।

এই পৃথিবীতে কিছু poikilo thermic বা শীতল রক্তের প্রাণী আছে যাদের শরীরের উত্তাপ পরিবেশের উত্তাপের ওপর নির্ভরশীল। বাইরে যখন ঠান্ডা তখন নিজেদের গরম রাখতে এরা কতকগুলি অত্যন্ত উন্নত পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে থাকে।

উচ্চশ্রেণীর প্রাণীরা (homoiothermic বা উষ্ণরক্তের প্রাণীরা) নিজেদের শরীরের উত্তাপ অপরিবর্তিত রাখতে পারে তাপসৃষ্টি ক'রে।

এই তাপ সৃষ্টি কিন্তু যেকোন প্রাণীর শরীরের যে কোন কোষ করতে পারে যদি সেই কোষ বিপাকে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। এমনি একটা কোষ সব সময়েই পরিপার্শ্বের থেকে বেশি উত্তপ্ত, তা সেই বেশিটুকু এক ডিগ্রির হাজার ভাগের একভাগ হলেও সেটা বেশি। সুতরাং স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে প্রায়ই দেখা যায় একটি উক্তি, যে শীতল রক্তের প্রাণীদের দেহের উত্তাপ পরিপার্শ্বের তাপাঙ্কের সমান, — উক্তিটা একটু বিভ্রান্তিকর। স্বভাবতই ছোট ছোট প্রাণীরা খুব সামান্য তাপই সৃষ্টি করতে পারে এবং পরিবেশের কাছে খুব সহজেই সেই তাপটুকু খুইয়ে বসে। কাজেকাজেই বলা শক্ত যে এইসব প্রাণীদের দেহের উত্তাপ পরিবেশের থেকে বেশি কি কম। বড়ো সড়ো প্রাণীদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা স্বতন্ত্র কেননা তারা তাপ সৃষ্টি করে অনেক বেশি, আবার সেই তাপ ধরেও রাখতে পারে অনেক বেশি সময়।

পাহাড়ী নদীর জলে বাস করে যে-সব ছোট ট্রাউট আছে, তাদের দেহের উত্তাপ জল থেকে মাত্র 0.0012 ডিগ্রি বেশি, অপরপক্ষে বড়ো বড়ো টুনা

বা মারলিন মাছদের শরীরের উত্তাপ জল থেকে অন্তত ছয় ডিগ্রি বেশি।

শীতল রক্তের প্রাণীদের পক্ষে উত্তাপ বজায় রাখার সহজতম উপায় হোল নিজেদের বসবাসের জন্য আরামদায়ক একটা জায়গা খুঁজে বার করা যেখানে ছোটখাট একটা সহনীয় আবহ পরিমন্ডল আছে। শীতের সময়ে এদের অনেকে গর্তে ঢুকে যায়, অন্যেরা গভীর নদী বা হ্রদের তলদেশে আশ্রয় নিয়ে নিজস্ব ছোটখাট আবহ পরিমণ্ডল গড়ে নেয়। এমনকি উদ্ভিদেরাও এটা করতে পারে। জানা আছে যে জঙ্গল ফাঁকা মাঠের চেয়ে অনেক বেশি সহনীয়।

যে সমস্যাটা বহুকাল পর্যন্ত রহস্যে ঢাকা ছিল সেটা হচ্ছে পূর্ববর্ণিত তুষারের শেওলারা কেমন করে অতিশীতল তাপঙ্কের মধ্যে থেকেও ভারীমাত্রায় বিপাক বজায় রাখে বা প্রবলভাবে বংশবৃদ্ধি করতে পারে। কোথা থেকে তারা শক্তি পেয়ে থাকে? এই গ্রহের অন্য কোন প্রাণীতো এই কাজ করতে পারে না।

সম্প্রতি জানা গেছে তুষারের শেওলারা নিজেদের জন্য সুবিধাজনক পরিবেশের ব্যবস্থা করে থাকে। তুষারের ওপরে তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে একা একা বাস করে না পরন্তু একত্রে জড়ো হয়ে কলোনী ক'রে বাস করে। রৌদ্রোজ্জ্বল আবাহাওয়াতে ঘোর বর্ণের শেওলাদের জটলাগুলি উত্তপ্ত হয়ে পরিপার্শ্বের তুষারকে গলিয়ে দেয়। এর ফলে প্রত্যেকটি কলোনী ছোট গর্তের মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ দেখতে পায়। উপরিতলের জলটা প্রায় জমে যায়, এবং ছোট ছোট গামলার মধ্যে শেওলাগুলি বাস করে পাতলা বরফের আস্তরণের নীচে। এই গামলাগুলি সবুজঘর হিসেবে কাজ করে, যেখানকার উত্তাপ 0°C-এর ওপরেই থাকে।

তা না হয় হোল, কিন্তু কেবল 0°C উত্তাপই তো আর শেওলাদের সবকিছু প্রয়োজন মিটিয়ে দিচ্ছে না। বিজ্ঞানীদের ধারণা যে ক্লামিডোমোনাসদের আছে এমন একটা যন্ত্রব্যবস্থা যেটা অনেকটা অর্ধপরিবাহী কোন যন্ত্রাংশের অনুরূপ। বিদ্যুৎ সৃষ্টির জন্য অর্ধপরিবাহী পদার্থের একটি প্রান্ত উত্তপ্ত করা হয় এবং অন্যপ্রান্ত ঠাণ্ডা করা হয়। দুই প্রান্তের উত্তাপের প্রভেদ যত বাড়ে, উৎপন্ন তড়িতের পরিমাণও তত বেশি হয়।

এই রকমটাই ঘটে থাকে তুষার-শেওলাদের ক্ষেত্রে এক প্রান্ত রৌদ্রে যখন

উত্তপ্ত হয় অন্য প্রান্ত তখন বেশি পরিমাণে তাপ মোক্ষণ করে থাকে। সম্ভবত এই প্রক্রিয়াতেই এই শেওলারা নিজেদের প্রাণকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি পেয়ে থাকে।

প্রচুর পরিমাণে জন্মালেও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবকণারা কখনও বিফলে নষ্ট হয় না। খাদ্য যদি থাকে তবে যাদের তা দরকার তাদেরকেও পাওয়া যাবে, হোলোই বা জায়গাটা দক্ষিণ মেরু। এই মহাদেশটি আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে বিরাট একটা মৃত অঞ্চল। কিলোমিটার গভীর বরফে ঢাকা একটি দেশ যেখানে বছরের মধ্যে দশ এগার মাস শুধু তুষার-ঝড় আর শিলাবৃষ্টি রাজত্ব করে, বাকি সময়টাতে থাকে অপেক্ষাকৃত হালকা তুষারপাত। সাধারণত ধারণা করা হয়ে থাকে মুষ্টিমেয় যে কয়টি প্রাণী এই মহাদেশে বাস করে, যেমন সীল, পেঙ্গুইন আর কয়েক জাতের পাখি — এরা থাকে উপকূলের সন্নিকটে আর মহাদেশের বাকি অঞ্চল নিষ্প্রাণ, প্রকৃত অবস্থা তা নয়। দক্ষিণমেরু অঞ্চলে অনেক বছরের পর্যবেক্ষণের পরে বিজ্ঞানীরা খুঁজে পেয়েছেন প্রায় পঞ্চাশ জাতের কীট পতঙ্গ ও অন্যান্য প্রাণী এই চিরতুষারের রাজ্যে। কাজে কাজে এই নির্দয় মহাদেশের গভীরেও প্রাণের অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

যে প্রাণীটিকে সবচেয়ে দূরের প্রান্তে বাস করতে দেখা গেছে সেটা একটা ছোট মাকড়সা, বৃটিশ অভিযাত্রী দল যার সন্ধান পেয়েছেন দক্ষিণমেরুর 500 কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে। এই মাকড়সা বাস করে ছত্রাক ও শেওলার বাগানে। শেওলাদের কলোনীগুলি যদি কাছাকাছি হয়, ছোট ছোট সবুজঘরগুলি সেক্ষেত্রে জুড়ে গিয়ে তুষারের নীচে একটি যৌথ ব্যবস্থার সৃষ্টি করে। এইখানে মাকড়সারা আশ্রয় নেয়। এখানে খাদ্যের প্রচুর সরবরাহ, খোলা জায়গার থেকে উষ্ণতাও অনেক বেশি। তাছাড়া মাকড়সাগুলি কৃষ্ণবর্ণের হওয়ার দরুণ সূর্য থেকেও তাপ শোষণ করতে পারে। মেরু প্রদেশের হ্রস্ব গ্রীষ্মকাল অতীত হলে মাকড়সারা শীতকালীন নিদ্রায় মগ্ন হয়।

অন্যান্য প্রাণীরাও সূর্য থেকে শক্তি আহরণ করে। যে সব কীটপতঙ্গ মেরু অঞ্চলে সুউচ্চ পর্বতে বাস করে তাদের গাত্রবর্ণ ঘোর, যাতে তারা সূর্যরশ্মিকে আরো ভালভাবে আত্মস্থ করতে পারে। এই কারণে এই সব কীট পতঙ্গের শরীরের উত্তাপ রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়াতে পরিপার্শ্বের থেকে বেশি থাকে।

আবার আরো প্রাণী আছে যারা প্রাপ্ত তাপকে নিয়ন্ত্রণ করতে জানে। এই কাজটাও বিশেষ জরুরী কেননা তা না হলে রৌদ্রতপ্ত আবহাওয়াতে বেশি উত্তপ্ত হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। অনেক উভচর আর সরীসৃপদের ত্বকে আছে বিশেষ রং তৈরি করার কোষসমূহ যারা তাদের ক্ষেত্রফলের হেরফের ঘটাতে পারে। রংদার কোষগুলি আকৃতিতে যখন ছোট তখন প্রাণীটার ত্বকের রং হালকা, সূর্যরশ্মি সেই ত্বকে ভালভাবে প্রতিফলিত হয়ে যায়। কোষগুলির বৃদ্ধি ঘটলে ত্বকের রং অনেকটা ঘোর হয়ে যায়, সূর্যরশ্মি ভাল করে শুষে নিতে পারে সেই ঘোর বর্ণের ত্বক। প্রাণীটার শরীর উত্তপ্ত হয়, কিন্তু একটা সীমার বাইরে যায় না। গরম বেশি পড়ল তো রংদার কোষগুলি গুটিয়ে যেতে থাকল, এইভাবে তাপ শুষে নেওয়ার মাত্রাটাও কমে গেল।

মুক্তারং-এর প্রজাপতি অন্য একটা উপায় উদ্ভাবন করেছে। শরীরের উত্তাপ এরা রাখে 32.5°C-35·5°C সীমার মধ্যে। উজ্জ্বল আবহাওয়াতে প্রজাপতিটা এই তাপমাত্রা প্রায় নিখুঁতভাবে বজায় রাখে, বাইরের উত্তাপ যাই হোক না কেন। তাপ ধরবার জন্য এরা প্রধানত পাখার উপরিতলকে ব্যবহার করে। প্রজাপতিটা উত্তাপ ভালভাবে পেতে পারে, যদি পাখাগুলি সম্পূর্ণভাবে আলোর দিকে মেলে ধরা থাকে যাতে সূর্যরশ্মি পাখার ওপর লম্বভাবে পড়ে। সূর্যরশ্মি আপতনের কোণ যতই সূক্ষ্ম হবে পাখাগুলি তত কম উত্তপ্ত হবে। প্রজাপতিরা কতটা উত্তাপ নেবে সেটা তারা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে পাখার অবস্থানের হেরফের ঘটিয়ে। শরীরের তাপমাত্রা যখন কম তখন পাখাগুলিকে এমনভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয় যাতে সর্বাধিক তাপ তারা শুষে নিতে পারে। শরীরের তাপাঙ্ক যেই 35°C-তে পৌঁছে গেল, প্রজাপতিটা পাখার অবস্থান বদলাতে থাকে এমনভাবে যেন তারা আর তাপ শুষে নিতে না পারে।

উইপোকারাও এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে নিজেদের বাসা নির্মাণের সময়। মাটির ভেতরে বাস করেও এরা যে এমন দর্শণীয় বাসা তৈরি করে থাকে তার কারণ হোল এই যে মাটির মধ্যে তারা পর্যাপ্ত তাপ পায় না। গরমদেশে উইপোকারা খুব উঁচু, চ্যাপটা আকারের উইঢিবি তৈরি করে, সরু দিকটা থাকে দক্ষিণমুখী। দুপুরে, যখন সূর্যের তাপ অত্যন্ত প্রখর, তখন সেই রশ্মিগুলি উইঢিবির গা ঘেঁসে চলে যায়, ঢিবিটা রক্ষা পায় অতিরিক্ত উত্তপ্ত হওয়া থেকে, কিন্তু দিনের অন্য সময়ে, সূর্যোদয়

থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত, সূর্যরশ্মিগুলি পাশের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে উইটিবিটাকে গরম রাখে।

উষ্ণরক্তের প্রাণীরা তাদের শরীরের উত্তাপ অপরিবর্তিত রাখতে পারে সূর্যের উত্তাপের সহায়তা ছাড়াও। আবহাওয়া যখন ঠাণ্ডা তখন তারা প্রচুর তাপ সৃষ্টি করে থাকে আর গরমের সময় বাড়তি তাপ ছেড়েও দিতে পারে। সাধারণভাবে বলতে গেলে আমাদের এই গ্রহের প্রাণীরা শীতল আবহাওয়াতে বাস করার জন্য নিজেদের বেশি খাপ খাইয়ে নিতে পারে উত্তপ্ত আবহাওয়ার তুলনায়।

অনেক প্রাণী আছে যারা বরফ-জমা আবহাওয়া বেশ সহ্য করতে পারে নিজেদের শরীরের তাপাঙ্কের হেরফের না ঘটিয়ে, এমনকি যখন পরিপার্শ্বের সঙ্গে তুলনায় দেহস্থ তাপমাত্রার প্রভেদ 80°C পর্যন্ত। এই ধরনের অনেক জীবজন্তু পাওয়া যায় সুমেরু অঞ্চলে। যেমন ধরো, উইলোগ্রাউজ নামের পাখিদের শরীরের উত্তাপ 43°C। এই গ্রাউজেরা এই তাপমাত্রা বজায় রাখতে পারে বাইরে যখন এমনকি —40°C তাপাঙ্ক।

উষ্ণরক্তের প্রাণীরা নিজেদের শরীরের তাপমাত্রা মোটামুটি অভিন্ন রাখতে এবং ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া থেকে বাঁচতে অনেকগুলি উপায় উদ্ভাবন করেছে। বাতাসের তাপমাত্রা যেই কমতে থাকল, অমনি তাপ-অপরিবাহী ব্যবস্থাগুলি আরো ভালভাবে কাজ করতে শুরু করল। ত্বকের শিরা-ধমনীগুলি সর্বপ্রথম গুটিয়ে যেতে থাকে, ত্বক ঠাণ্ডা হতে থাকে, তাপ বিকিরণের মাত্রা কমে যায়। পালক, পশম, লোম, সব খাড়া হয়ে ওঠে, যাতে তার মধ্যে আরো বাতাস ঢুকতে পারে। সকলেই জানে যে নিষ্কম্প বাতাস, তাপ-অপরিবাহিতা-র দিক দিয়ে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ মাধ্যম, প্রথম হোল বায়ুশূন্যতা। এই ব্যাপারটা কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রেও ঘটে। শীতবোধ হলে আমাদের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, আমাদের শরীরের যে ছোট ছোট লোমগুলি থেকে গেছে তারা সবাই খাড়া হয়ে ওঠে। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে এর দ্বারা আমরা উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারি না।

এই সব প্রকরণের শেষেও যদি ফলোদয় হোল না, আর প্রাণীদেহ যদি ঠাণ্ডাই হতে থাকল, তখন কাঁপুনি শুরু হয়ে গেল। সাধারণ ধারণার পরিপন্থী হলেও কাঁপুনি কিন্তু একেবারে নিরর্থক ব্যাপার নয়। পেশীর সংকোচনের সঙ্গে সঙ্গে বেশ খানিকটা তাপের সৃষ্টি হয়। অতএব, কাঁপুনি এই তাপসৃষ্টিতে সহায়তা করে।

কেবল উষ্ণরক্তের প্রাণীদেরই কাঁপুনি লাগে কিন্তু অন্য প্রাণীরাও নানাভাবে পেশীর কাজের সাহায্যে তাপসৃষ্টি বাড়িয়ে তুলতে পারে। সরীসৃপেরা, কেবল কয়েকটি প্রজাতি ছাড়া, নিজেদের শাবকদের প্রতি খুব একটা যত্ন নেয় না, কিন্তু বিজ্ঞানীরা অনেক দিন থেকেই জানেন যে কয়েক জাতের ময়ালসাপ ডিম পেড়ে সেখান থেকে চলে যায় না, বরং সেই ডিমগুলির চারপাশে বেড় দিয়ে বসে থাকে এবং বাচ্চা ফুটে বেরোন পর্যন্ত তাদের পাহারা দেয়।

অবশ্য তেমন প্রাণী খুব কমই পাওয়া যাবে যারা ডিমে তা দিতে নিবিষ্ট মায়ের মতো সাংঘাতিক পাহারাদারকে ঘাঁটাতে সাহসী হবে। কিন্তু আসল কথাটা হোল এই যে স্ত্রী-ময়াল সাপ যদিও ভক্ষকদের হাত থেকে ডিমগুলি রক্ষা করে কিন্তু তার প্রধান চিন্তা হোল ডিমগুলিকে গরম রাখা।

এতো বেশ মজার কথা, সাপেরা তো জানি ঠাণ্ডা রক্তের প্রাণী — তাহলেও একটা সাপকে যদি কিছুক্ষণ ছোটানো যায় তারপর সে খানিকটা গরম হয়ে যায়। বাতাসের তাপমাত্রা যদি বেশ ওপরের দিকে থাকে তাহলে সাপটা স্তব্ধ হয়ে থাকে কিন্তু যেইমাত্র ঠাণ্ডা পড়ল অমনি তার কুণ্ডলি পাকানো পেশীগুলির কাজ শুরু হয়ে গেল, তারা সংকুচিত আর প্রসারিত হতে থাকল, ময়াল মায়ের নিজের ইচ্ছানুসারে, যার ফলে তার শরীরটা কখনো মোটা কখনো সরু হতে থাকে। ময়ালটা যত তাড়াতাড়ি পারে এই কাজ করে চলে নিজের প্রবল দৈহিক শক্তির সাহায্যে, যতক্ষণ না এই উপায়ে সে নিজে বেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং ডিমগুলিকে গরম রাখে ঠিক তা-দেওয়া মুরগী মায়েরই মতো।

অনুরূপ পদ্ধতির প্রয়োগ করে থাকে পতঙ্গরা। তারা উড়তে পারে তখনই যখন তাদের শরীর বেশ গরম হয়ে ওঠে। এই কারণে ময়ূর-প্রজাপতি তার পাখাগুলি ঝাপটা দেয় গরম হয়ে ওঠার জন্য, তাই বাইরের উত্তাপ যখন 10°C, তখনো সে পারে তার শরীরের উত্তাপ 35°C বা এমন কি 37°C পর্যন্ত তুলে দিতে ওড়বার কালে, এই তাপাঙ্ক তো গরম রক্তের প্রাণীদের শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপ।

পেশীর এই কঠোর পরিশ্রমের ফলে প্রচুর পরিমাণে তাপ সঞ্জাত হয়ে থাকে কিন্তু উষ্ণরক্তের প্রাণীরা কেবল কাঁপুনির সাহায্যে উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে না। তাদের বিপাকের প্রক্রিয়াগুলি আরো তীব্র হয়ে ওঠে তাই

রাসায়নিক উপায়ে উদ্ভূত তাপের পরিমাণ প্রবলভাবে বেড়ে যায়।

শীতল রক্তের প্রাণীরাও কখনো কখনো বিপাক তীব্রতর করে থাকে কিন্তু সেটা তারা করে থাকে অনেক সহজ উপায়ে। বেশি তাপসৃষ্টির জন্য তারা বেশি করে খেতে থাকে। এই ব্যাপারে মৌমাছিরা সবচেয়ে তৎপর। একটা মৌমাছি কেবল নিজের একার চেষ্টায় অন্য যে কোন পতঙ্গের মতো প্রয়োজনীয় শরীরের উত্তাপ বজায় রাখতে পারে না, কিন্তু একটা মৌমাছি পরিবারকে সামগ্রিকভাবে স্বয়ম্ভর একটি গোষ্ঠী হিসেবে উষ্ণরক্তের বলা যেতে পারে। অন্যান্য পতঙ্গদের মতো মৌমাছিরা কিন্তু শীতে ঘুমোয় না। আবহাওয়া যখন তীব্র শীতল, তাপাঙ্ক যখন নেমে যায়—30°C পর্যন্ত, মৌমাছিরা সে সময়ে তাদের বাসার অর্থাৎ শীতের মরশুমের এই ক্লাবের ভেতরের উত্তাপ 35°C পর্যন্ত বজায় রাখে।

ক্লাবটা গড়ে ওঠে শীতকালের ঠান্ডা আবহাওয়া শুরু হবার সাথে সাথেই। বাইরের তাপমাত্রা যত নেমে যেতে থাকে মৌমাছিরা তত ঘনিষ্ট হয়ে বসে রাণীকে ঘিরে যার ফলে, মস্ত একটা জমাট বাঁধা বর্তুলাকার দঙ্গলের সৃষ্টি হয়। রাণীর খুব কাছাকাছি যারা থাকে তারা প্রচুর পরিমাণে খুব বেশি তাপ-শক্তিসমৃদ্ধ মধু খেয়ে নেয় যা থেকে দেহে অনেক তাপ সঞ্জাত হয়, এই তাপ ছড়িয়ে যায় বাইরের স্তরের মৌমাছিদের গায়ে। এই বাইরের স্তরের পতঙ্গগুলি খুব ঘেসাঘেসি করে বসে তৈরি করে তাপ-অপরিবাহী স্তরের একটা ঘন জটলা। যখন শীত আর সহ্য করতে পারেনা তখন তারা ঠেলাঠেলি করে অন্য মৌমাছিদের সরিয়ে ভেতরের দিকে ঢুকে যায়, ভেতরের স্তরের মৌমাছিদের আবাহাওয়ায় মুক্ত করে দেয়। এই একটানা স্থান পরিবর্তন চলে সারা শীতকাল ধরে, এদিকে চলছে কিলো কিলো মধুপান।

মৌমাছিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাপ উৎপাদন করতে পারে তাদের শূককীটেরা — বিস্মিত হবার কিছু নেই কারণ তাদের দেখা শোনার জন্য যে ধাত্রীরা নিযুক্ত আছে তারা বাচ্চাদের খাওয়ায় দৈনিক 1300 বার। শীতকালে কিন্তু আলাদা আলাদা প্রকোষ্ঠের মধ্যে শুইয়ে রাখা প্রত্যেকটা শূককীটের পক্ষে উত্তপ্ত থাকা কঠিন হয়ে ওঠে। চাকের উত্তাপ অন্তত 35°C হতে হবে শূককীটগুলির প্রাণরক্ষার জন্য। উত্তাপ যাতে সেই মাত্রায় থাকে সেজন্য কর্মী-মৌমাছিরা চাকের ওপর একত্রে ঘেসাঘেসি করে বসে থাকে তাপ-অপরিবাহী একটা ঘন স্তর তৈরি করে নিজেদের শরীর দিয়ে

ঠাণ্ডার কবল থেকে শূককীটদের বাঁচায়। এতেও যদি কাজ না হয় তখন মৌমাছিরা তাদের পাগুলি ঘসতে থাকে, পাখাগুলি ঝাপটায় এবং এইভাবে বাসার উত্তাপ বাড়িয়ে ছানাপোনাদের রক্ষা করে।

অভিন্ন তাপমাত্রা বজায় রাখা হয় কেবল বাসার মাঝখানটিতে, যেখানে বাচ্চারা জন্মায় ও বড় হয়ে ওঠে। চাকের কিনারার দিকে উত্তাপ অনেক কম হতে পারে। তেমনি, উষ্ণরক্তের প্রাণীদের ক্ষেত্রেও শরীরের একেবারে ভেতরের দিকে উত্তাপ অভিন্ন রাখা হলেও, ত্বকের, বিশেষত হাত ও পায়ের উত্তাপ অনেক কম হতে পারে। তিমি বা সীলদের পাখনা, পাহাড়ী ছাগল বা বলগা হরিণের পাগুলির তাপমাত্রা নীচের দিকে 10°C পর্যন্ত হতে পারে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে এত নিম্ন তাপমাত্রা কিন্তু পেশীর কাজে ব্যাঘাত ঘটায় না।

স্বাস্থ্যের কোন হানি না ঘটিয়ে শরীরের কয়েকটি স্থান অনাবৃত রেখে শীতল তাপাঙ্ক সহ্য করতে শেখা কোন মানুষের পক্ষে কঠিন নয়। উত্তরের দেশগুলিতে থাকে যে-সব মানুষ তারা তাদের মুখমণ্ডল আচ্ছাদিত করে না, এমনকি প্রবল তুষারপাতেও। অস্ট্রেলিয়ার আদিম বাসিন্দারা তাদের পাগুলি 12°C থেকে 15°C পর্যন্ত শৈত্য সহ্য করতে পারে। শীতের রাত্রিতেও তারা বরাবরের অভ্যাস মতো খোলা জায়গায় ঘুমোয় ঝিমিয়ে পড়া মিটমিটে আঁচের আগুনের পাশে, এমনকি শরীর না ঢেকেও। আগুনে তাদের শরীরের একদিকটা তাপ পায়, অন্যদিকটা আর হাতপাগুলি ঠাণ্ডায় থাকে। ইউরোপীয়রা অবশ্য এভাবে ঘুমোতে পারবে না, পায়ে সামান্য ঠাণ্ডা লাগলেই তারা জেগে উঠবে।

জলের প্রাণীদের ক্ষেত্রে এটা বেশ জরুরী যে তাদের হাতপাগুলি যেন ঠাণ্ডা না হয়ে যায়। তিমি আর সীলদের শরীরটি বড় হয়ে ওঠে খুব পুরু চর্বির স্তরের বহিরাবরণের ভেতরে যেখানে রক্তবাহনাড়ীর বিস্তৃতি খুব কম। এই কারণে এই সব প্রাণীরা, যারা খুব ঠাণ্ডা জলে সাধারণত বাস করে, চর্বির সাহায্যে প্রায় সবটুকু তাপই সংরক্ষণ করতে পারে। কিন্তু পাখনা বা সাঁতার দেবার প্রত্যঙ্গগুলির কথা স্বতন্ত্র কেননা এগুলি তো আর চর্বির দ্বারা সুরক্ষিত নয় আর তা ছাড়া এই অঞ্চলগুলিতে সুবিন্যস্ত রক্ত-সংবহনব্যবস্থা রয়েছে কারণ পেশীর কাজের জন্য পর্যাপ্ত রক্তের অনুপ্রবেশ হওয়া দরকার। গরমরক্ত যখন প্রত্যঙ্গগুলিতে আসে অনেকটা তাপ তখন এইসব প্রাকৃতিক দুর্বল স্থানগুলি দিয়ে বেরিয়ে যায়। পাখনাওয়ালা প্রাণীরা টিকে থাকতে

পারতই না যদি না তারা বিবর্তনের সাথে সাথে একটা বিস্ময়কর কায়দা আয়ত্ত করত।

মুখ্য যে-ধমনীগুলি দিয়ে রক্ত পাখনা বা সাঁতার কাটার প্রত্যঙ্গগুলিতে সংবাহিত হয় তাদের জড়িয়ে রেখেছে কতকগুলি ছোট ছোট শিরার জটলা। এই শিরাগুলি সেই রক্তকে হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়ে নিয়ে যায়, যে-রক্ত তার তাপ খুইয়েছে শরীরের প্রান্তদেশে, ধমনীর রক্ত তার তাপের অনেকটাই শিরার রক্তে পরিবাহিত করে দিয়েছে পাখনা পেশীতে পেঁছানোর আগেই, তাই তারপরে বেশি তাপ হারায় না। তপ্ত-হয়ে-ওঠা শিরার রক্ত সাধারণ রক্ত-সংবহনব্যবস্থায় ফিরে যায় তাই প্রাণীটা আর শীতল হয়ে যায় না। প্রকৃতির এই আশ্চর্য তাপ বিনিময়ের যন্ত্রের সাহায্যেই সম্ভব হয়েছে শরীরের প্রান্তদেশে পেঁছানোর আগে রক্তের বাড়তি তাপ চর্বির দেয়ালের গোড়াতেই হারানো। এই ধরনের ব্যবস্থা দেখা যায় পেঙ্গুইনের বগলের নীচে। এর ফলে তাদের ঊর্ধ্বাঙ্গের প্রান্তদুটি দিয়ে তাপ বেরিয়ে যেতে পারেনা।

উষ্ণরক্তের প্রাণীদের ফুসফুস হোল আর একটা গর্ত যেখান দিয়ে ঠাণ্ডা ঢোকে। এই ফুসফুসে ঠাণ্ডা বাতাস সরাসরি রক্তের সংস্পর্শে আসে। ফুসফুসের ভেতরের ক্ষেত্রফল খুব বেশি (সাধারণ উচ্চতার একজন মানুষের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ হোল 90 বর্গমিটার বা সমস্ত ত্বকের প্রায় পঞ্চাশ গুণ)। তাহলে তো ফুসফুসের মধ্যে রক্তের জড়িয়ে যাবার কথা, আর তাই যদি হয় তাহলে তো গোটা প্রাণীটাই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। তা কিন্তু কার্যত হয় না। গ্রীষ্মকালে ফুসফুস থেকে বেরিয়ে আসা রক্ত ফুসফুসে প্রবেশকারী রক্তের থেকে ঠাণ্ডা হয়ে যায় এবং বিপরীতটা ঘটে শীতের সময়। যদিও এই পরিবর্তনগুলি মাত্রার দিক থেকে খুবই নগণ্য, 0·03 ডিগ্রির বেশি নয়, কিন্তু তথাপি সেটাই যথেষ্ট শীতে এবং গ্রীষ্মে প্রাণীদেহের উত্তাপ সমান রাখার পক্ষে।

ফুসফুস থেকে বেরিয়ে আসা রক্ত গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা হয় কারণ বাষ্পীভবন প্রক্রিয়াতে তাপের খরচ হয়ে থাকে। কিছুকাল আগে পর্যন্ত খুব সামান্যই জানা ছিল শীতকালে রক্ত কেমন করে গরম থাকে। বহুদিন আগেই নির্ণীত হয়ে গেছে যে, বাতাস নাক, কান, গলা, শ্বাসনালী এবং ক্লোমশাখা দিয়ে যেতে গরম হতে থাকে সেসব স্থানের বাতাসের সংস্পর্শে এসে এবং ক্রমশ উত্তাপের বৈষম্য মিলিয়ে যায়। অথচ শীতের বাতাস ফুসফুসে ঢোকার সময় তখনো সেটা রক্ত থেকে অনেক ঠাণ্ডা এবং রক্তকে নিশ্চয়ই ঠাণ্ডা করে থাকে। তা

সত্ত্বেও, মানুষ এবং অন্যান্য উষ্ণরক্তের প্রাণীদের ফুসফুস বা শ্বাসযন্ত্রটা হোল তাপের একটা প্রধান উৎস। ফুসফুসের কোষকলায় আছে উচ্চ-ক্যালোরি-পুষ্ট নানা প্রকারের চর্বি। শীতের সময়ে আর কেবল সেই সময়েই এই চর্বিগুলি তারা জ্বালিয়ে ফেলতে থাকে যার ফলে প্রচুর তাপ-শক্তি মুক্ত হয়—তাপ-অপরিবাহী একটা বিভেদপ্রাচীরের সৃষ্টি হওয়ার ফলে প্রাণীটা শীতল হয়ে যায় না। অর্থাৎ, এই রন্ধ্রটাও বেশ নিরাপদে পূরণ হয়ে যায়।

মানুষ সাধারণত নিজের শরীরটা জুড়োয় ফুসফুস বা ত্বক থেকে বাষ্পীভবনের সাহায্যে। অনেক প্রাণীর কাছে শরীর ঠান্ডা রাখার ব্যাপারটা একটা কঠিন সমস্যা। ইঁদুর জাতীয় প্রাণীর স্বেদগ্রন্থি নেই। তাই গরম পড়লে তারা হাঁপাতে থাকে, এইভাবে ফুসফুস থেকে বেশি পরিমাণে জল বাষ্পীভূত হতে থাকে। কুকুরকে আর গরুদেরকেও গ্রীষ্মকালে হাঁপাতে দেখা যায়।

দ্রুত বেগে হাঁপানোর ফলেও যদি শরীর ঠান্ডা না হয়, ইঁদুরেরা তখন নিজেদের গায়ে নিজেদের থুথু মাখায়। উষ্ণ মরুভূমি অঞ্চলের বাসিন্দা উত্তর আমেরিকার অপোসাম আর অস্ট্রেলিয়ার অঙ্কগর্ভ ক্যাঙারুদেরও অনুরূপ আচরণ করতে দেখা যায়।

মৌমাছিরা বাষ্পীভবন আর বায়ুসঞ্চালন এই দুটি পদ্ধতিরই সাহায্য নেয়। তাদের বাসার উত্তাপ বিপজ্জনকভাবে বেড়ে গেলে কিছু কিছু মৌমাছি মৌচাকগুলিতে জল ছিটোতে শুরু করে, অন্যেরা বাসার প্রবেশ পথে নিজেদের পাখা দিয়ে ফূর্তির সঙ্গে বাতাস করতে থাকে, অন্তর্বাহী ঝঞ্ঝার সৃষ্টি হওয়াতে বাষ্পীভবন দ্রুত হতে থাকে।

এমনকি জলজীবী প্রাণীদের পক্ষেও শরীরকে শীতল রাখা সহজ ব্যাপার নয়। যদিও জল বাতাস থেকে 20 থেকে 27 গুণ বেশি তাপ-পরিবাহী, তিমি বা সীলদের শরীর বিশেষ শীতল হতে পারে না কেন না তাদের ত্বকের নীচে আছে চর্বির পুরু স্তর। তিমির শরীরের ভেতরের একটা বিশেষ ব্যবস্থা যদি না থাকত তাহলে দ্রুত বেগে (অর্থাৎ 36 কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায়) চলার কালে প্রত্যেক পাঁচ মিনিটে তিমির শরীরের উত্তাপ এক ডিগ্রি করে বেড়ে যেত। তিমি আর সীল-এরা তাদের ত্বক-স্থিত শিরা-ধমনীর জালিকাপুঞ্জের সাহায্যে শরীরকে শীতল করে রাখে। তিমির যখন শীত করে তখন ত্বকের ধমনীগুলি কুঁচকে যায় তাই তাদের মধ্যে রক্ত আর থাকে না। প্রাণীটা যখন ছুটছে তখন শরীরের উত্তাপ বাড়তে থাকে,

গরম রক্ত এসে পেঁছায় ত্বকে—সেখানে এসে জুড়িয়ে যায়। আরও একটা ব্যবস্থা আছে। পেশীকে কঠোর পরিশ্রম করালে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়, পাখনার দিকে ছড়িয়ে থাকা ধমনীগুলি তখন রক্তস্রোতে পুষ্ট হয়ে ফুলে ওঠে, সেখান থেকে পেঁছায় সন্নিহিত শিরাগুলিতে যারা এতক্ষণ ছিল নিষ্কর্মা। তাপের বিনিময়ব্যবস্থা এর ফলে বিঘ্নিত হয়ে যায় এবং পাখনা দিয়ে সেই তাপ অপসারিত হয়ে যায় পরিপার্শ্বের জলে।

তিমিরা শরীরের উত্তাপ কমাবার জন্য আরো একটা পদ্ধতির প্রয়োগ করতে পারে। যে সময় তারা খুব উত্তপ্ত হয়ে ওঠে তখন তারা তাদের নাকের গহ্বর, মুখের ভেতরটা সব জল দিয়ে কুলকুচো করতে শুরু করে দেয়, জোরালো ফোয়ারার মতো গরম জল নাক মুখ দিয় ছাড়তে থাকে।

এই যে সব কুশল পদ্ধতি এদের প্রয়োগ করার পরেও যদি বাঞ্ছিত ফল লাভ না হয় আর শরীরের উত্তাপ যদি বাড়তেই থাকে তাহলে শেষ পর্যন্ত মস্তিষ্কের ক্ষতির ফলে শক্ দেখা দেবে উত্তাপ যদি খুব বেশি বেড়ে যায়। মনে রাখতে হবে প্রাণীদের বাইরের উত্তাপের বৃদ্ধি সহ্য করার ক্ষমতা আভ্যন্তরীণ উত্তাপবৃদ্ধির মাত্রার চেয়ে অনেক কম (আভ্যন্তরীণ উত্তাপ বৃদ্ধি ঘটে থাকে শরীরের অন্তস্থ প্রাণকার্য থেকে)। উষ্ণ আবহাওয়াতে রৌদ্রের দরুণ যদি কোন মানুষের শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি পেয়ে 38.6°C মাত্রায় পেঁছায় তাহলে সে জ্ঞান হারাবে, অথচ খুব কঠোর পরিশ্রমের সময় তার শরীরের উত্তাপ বেড়ে 40°C হয়ে যেতে পারে কোন হানি না ঘটিয়ে আর রোগ জীবাণুর আক্রমণে তো কত সময়েই দেহস্থ তাপমাত্রা বেড়ে 42°C-এর দাগে পেঁছে যায়।

একটা নির্দিষ্ট, অভিন্ন শারীরিক উত্তাপ প্রাণীদের সব ক্ষেত্রে যে জরুরী তা নয়। তাই যে-সব প্রাণী মরুভূমি অঞ্চলে থাকে যেখানে দিনের ও রাতের তাপমাত্রায় ব্যবধান খুব বেশি থাকে, তারা চিরাচরিত উষ্ণরক্তের ব্যবস্থাটার পরিবর্তন করে নিয়েছে।

মরুভূমির জাহাজ নামে খ্যাত উটেরা অন্যান্য উষ্ণরক্তের প্রাণীদের থেকে অনেক বেশি অভ্যস্ত বালুর মধ্যে বেঁচে থাকতে। এরা শারীরিক উত্তাপের হ্রাসবৃদ্ধি সহ্য করতে পারে 5.5°C পর্যন্ত। মরুভূমিতে শীতের রাত্রিতে উটের শরীরের তাপমাত্রা কমে যায় 35°C পর্যন্ত। তাতে তাদের সুবিধেই হয়, কারণ উটকে আর বিপাকজ শক্তি খরচ করতে হয় না শরীরের উত্তাপ বাড়িয়ে নেবার জন্য। দিনের বেলায় এদের শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়

40.5°C পর্যন্ত, উট এই উত্তাপ কমাবার কোন চেষ্টাই করে না। কিন্তু উত্তাপ যখন কমে যায় এমনকি মাত্র এক বা আধ ডিগ্রি পর্যন্ত, উট তখন সেই বাড়তি তাপ ছেড়ে দিতে থাকে পরিশ্রম করার কালে। দেহস্থ তাপমাত্রা খুব সংকীর্ণ সীমার মধ্যে রাখা সম্ভবপর হয় না কোন সমস্যার সৃষ্টি না ক'রে — যদি না এজন্য কোন বিশেষ দেহযন্ত্রের ব্যবস্থা থাকে। আদিম জীবেরা, যাদের নিজেদের থার্মোমিটার নেই, তারা প্রায়শই পড়ে বেকায়দায়। তাপ-প্রেমী জীবাণুরা থাকে পীট কয়লার স্তূপের মধ্যে, আগুনের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা কী করে করতে হয় সেটা এদের জানা নেই। বিপাকজ তাপ কখনো কখনো এত বেশি মাত্রায় এরা উৎপাদন করে ফেলে যে কয়লার স্তূপে আগুন ধরে যায় স্বতস্ফূর্তভাবে। তাদেরই যে-সব জ্ঞাতি তুলোর পাঁজ, শন বা মেস্তাপাট-এর গাঁঠরি-র মধ্যে আশ্রয় নিয়ে থাকে জাহাজের খোলের ভেতরে স্যাঁতস্যাতে পরিবেশে, তারাও তাপপ্রেমী আর কয়লা-স্তূপের বাসিন্দাদের মতোই বুদ্ধিহীন। এদের বংশবৃদ্ধি যদি খুব দ্রুত হয় তাহলে জলে ভাসমান জাহাজটাতেই এরা আগুন ধরিয়ে দিতে পারে।

উষ্ণরক্তের প্রাণীদের রক্তের তাপমাত্রা (সেই সঙ্গে শরীরের তাপমাত্রাও) থাকে মস্তিষ্কের তাপ-নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রের আর ত্বকস্থিত তাপ-ধারকগুলির কঠোর তত্ত্বাবধানে। প্রকৃতি যখন চিত্তাকর্ষক একটা কিছু আবিষ্কার করেই ফেলেন, তখন তিনি মাঝপথে থেমে যান না। কতকগুলি প্রাণীর ক্ষেত্রে তাপ-ধারকগুলির বিকাশ এতদূর পর্যন্ত এগিয়েছে যে তারাই হোল খাদ্য খুঁজে নেবার প্রধান অবলম্বন।

শীতলরক্তের প্রাণীরা ত্বকের তাপ-নির্ধারণ ক্ষমতার ব্যাপারে বিশারদ। তাদের পক্ষে এই যন্ত্রব্যবস্থা ব্যবহার করা সহজতর, উষ্ণরক্তের প্রাণীদের সঙ্গে তুলনায়, কারণ শেষোক্তদের ক্ষেত্রে শরীরের তাপমাত্রা বেশি থাকায় খুব দুর্বল তাপ-বৈষম্য দূর থেকে টের পাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অনেক পতঙ্গদের আছে খুব সংবেদনশীল তাপ-ধারক যেমন মৌমাছি, মশা, ছারপোকা, ঝিঁঝিপোকা, এটুলি পোকা আবার এ ছাড়া আছে বোড়া সাপ, ময়াল সাপ, কটকটি সাপ (Rattle Snake) এবং অন্যান্য সরীসৃপদেরও। পতঙ্গদের বেলায় দূরস্থ তাপপ্রবাহ ধরতে সক্ষম তাপ-ধারকগুলি থাকে তাদের শুঁড়ে আর যে ধারকগুলি ধরতে পারে মাটির উত্তাপ তারা থাকে পায়ে, দুটো শুঁড় থাকায় মোটামুটি নির্ভুলভাবে তারা উত্তপ্ত জায়গাটার হদিস পেয়ে যায়। তাপপ্রবাহ থেকে যখন বুঝতে পারে শিকার কাছেই আছে

মশা তখন শরীরটাকে ঘোরাতে থাকে যতক্ষণ না দুটো শুঁড়েই অনুভব করে একই তাপমাত্রা — এক একটা শুঁড় কিন্তু তিন মিলিমিটারের থেকে বেশি লম্বা নয়।

লক্ষ্যবস্তুর দিকে পেঁছানোর নির্দেশ কিন্তু পতঙ্গরা বেশ নির্ভুলভাবে সংবেদনার সঙ্গে পেয়ে যায়, রকেট, প্রতিরোধকারী ক্ষেপণাস্ত্র বা বিমান-ইঞ্জিনের উদ্ভাবনা যাঁরা করে থাকেন তাঁরাও কিন্তু এই সংবেদনশীলতার মাত্রার ব্যাপারে পতঙ্গদের কাছে হার স্বীকার করবেন।

বড়ো বড়ো রক্ত-শোষা ছারপোকা একটিমাত্র শুঁড়ের সাহায্যে টের পায় উত্তাপের উৎস। শুঁড়টাকে বিভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সে সহজেই বুঝতে পারে যে শুঁড়টা যখন, ধরা যাক, ডানদিকে ফেরানো হয় তখন সেটা সবচেয়ে তাড়াতাড়ি উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। তার মানে সেই দিকেই সবচেয়ে কাছে একটা তাপের উৎস। তাই, চলো যাই সেদিক পানে।

মানুষে মানুষে ত্বকের তাপমাত্রার যথেষ্ট হেরফের হয়ে থাকে। তাই, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ছারপোকা আকর্ষণ করে অন্যের তুলনায় বেশি। গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় নদী বা হ্রদের ধারে বেড়াতে গিয়ে তোমাদের মধ্যে অনেকে হয়ত লক্ষ্য করেছ ঝাঁকে ঝাঁকে মশা তোমাদের ঘিরে ধরেছে রক্তের লোভে, হয়ত অবাক হয়ে ভেবেছ আচ্ছা, ওই যে লোকটা সারা সন্ধ্যাটা ছিপ ফেলে বসে মাছ ধরছে ওর কত সহ্যশক্তি।

কিন্তু ঠিক সহ্যের ব্যাপার এটা নয়। হাঁটছে যে লোক হন্ হন্ করে মশার হাত থেকে বাঁচবার জন্য, তার শরীর অনেক বেশি গরম আর তাই অনেক বেশি আকর্ষণীয় মশাদের কাছে, চুপচাপ নদীর পাড়ে যে দাঁড়িয়ে থাকে তার শরীরের সঙ্গে তুলনায়। এই কারণেই মাছ ধরতে বসেছে যারা তারা মশার হাতে অনেক কম নাকাল হয়, নদীর ধারে যারা বেড়ায় তাদের থেকে।

সরীসৃপদের মধ্যে জোড়া জোড়া তাপধারক যন্ত্র থাকে তাদের নাকে, চোখের নীচে, কখনো বা নীচের ঠোঁটে। এদের গঠনশৈলী খুব সাধারণ, একটা ছোট খাঁজ, যার নীচে আছে খুবই কোমল একটা পর্দা, পনের মাইক্রণ থেকেও কম পুরু, যার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে অসংখ্য স্নায়ুর প্রান্তভাগ। পর্দাটা ঢেকে রেখেছে বাতাসে পূর্ণ একটা গর্ত যার ফলে চার পাশের কোষকলাকে উত্তপ্ত করতে গিয়ে তাপক্ষয় না হয় — তা সে যতটুকু সামান্যই হোক। এই পর্দা যে তাপমাত্রার প্রভেদ ধরতে সক্ষম সেটা 0·002°C-এর

থেকেও কম এবং এর জন্য তাপক্ষয় হয় প্রতি সেকেণ্ডে 0.000000005 ক্যালোরি।

তাইতো সাপ দূরস্থ বস্তুর অবস্থান নির্ণয় করতে পারে যদি সেই বস্তুর তাপমাত্রার প্রভেদ পরিবেশ থেকে কেবল 0.1°C হয়। বলাবাহুল্য যে এই অত্যাশ্চর্য সংবেদনার ফলে সাপ কখনোই লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না পীচের মতো ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত্রিতেও ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকা একটা কবোষ্ণ ইঁদুর বা ইষত্তপ্ত ব্যাঙকে ধরতে গিয়ে।

উষ্ণরক্তের প্রাণীদের তাপধারক যন্ত্রগুলির গঠনশৈলী আরো সরল। অস্ট্রেলিয়া আর নিউগিনির বাসিন্দা মেগাপোডিস বা ঢিবির পাখিরা ডিম পাড়ে বিশেষ ধরনের ইনকিউবেটর — অর্থাৎ পচা পাতার বড়ো বড়ো ঢিবিতে। পাতা পচছে তাই ইনকিউবেটরের ভেতরে বেশ উচ্চ তাপমাত্রা বজায় থাকে। এই ইনকিউবেটরের দেখাশোনা করে পুরুষ পাখিরা বুদ্ধিশূন্য মেয়েদের থেকে যারা প্রযুক্তির ব্যাপার খানিকটা বেশি বোঝে। এই যে শ্রমবণ্টন এর পেছনে যুক্তি আছে কেননা পুরুষ পাখির ঠোঁট থার্মোমিটার হিসেবে উৎকৃষ্ট। পাতার ঢিবির মধ্যে মাঝে মাঝে ঠোঁট গুঁজে দিয়ে পুরুষ পাখিটা পাতার স্তূপের তাপমাত্রার আন্দাজ করে নেয়। উত্তাপ যদি হয় 33°C-এর থেকে বেশি পাখিটা তখন স্তূপের পাতাগুলি ঘেঁটে দিতে থাকে যাতে কিছুটা তাপ বেরিয়ে যায় আবার উত্তাপ যদি কম হয় পাখিটা তখন আরো পচা পাতা এনে জড়ো করে, জ্বালানি যুগিয়ে যায়।

থার্মোমিটারটা কিন্তু খুবই সরল। ঠোঁটের তাপমাত্রা 33°C। পাখিটা কেবল তুলনা করে ঢিবির ভেতরের উত্তাপ তার থেকে বেশি না কম। একাজ মানুষও করতে পারে।

ঠিক যেন রূপকথা
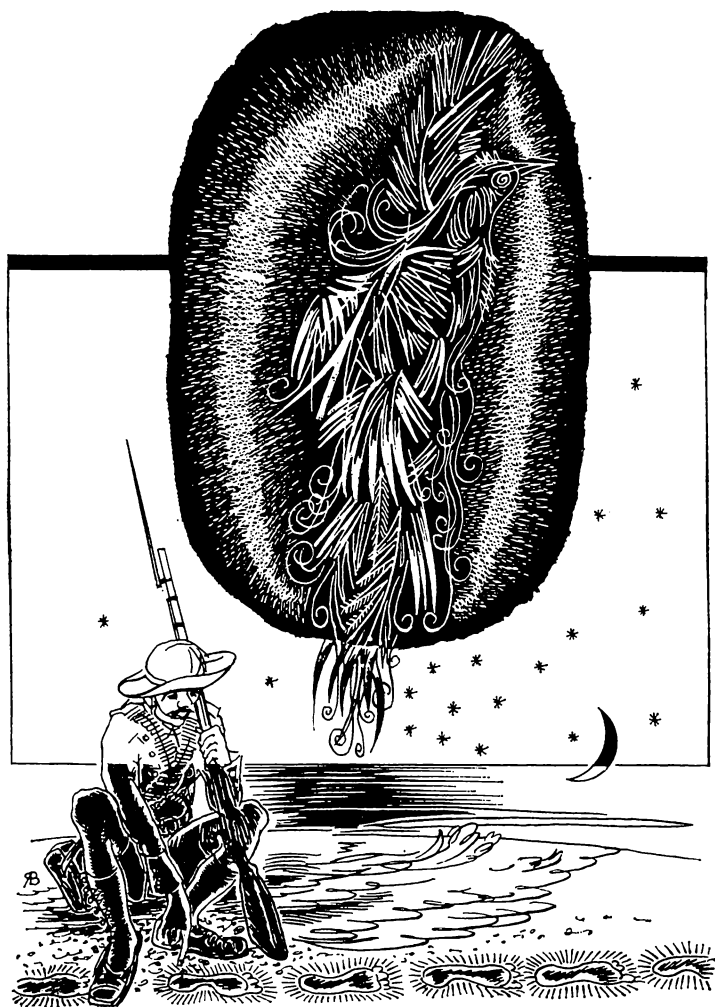
কোন এক কালে, কোন এক রাজ্যে বেরেনদেই নামে এক রাজা বা জার ছিলেন। তার ছিল অপূর্ব একটা ফলের বাগিচা। সেই বাগিচায় ছিল একটা আপেল গাছ, তাতে ফলত সোনার আপেল।

এক চোর সেই বাগিচায় ঢুকে সোনার আপেল নিয়ে যায় চুরি করে। জার আদেশ দিলেন তাঁর ছোট ছেলে ইভানকে বাগিচাটা পাহারা দিতে। অনেক রাত পর্যন্ত ইভান টহল দেয় সারা বাগান, কই কোন চোর সে দেখতে পায় না। ঠিক যখন মাঝরাত্তির, বাগান গেল আলোয় ভরে, ইভান দেখল একটা আগুনের পাখি এসে বসেছে আপেল গাছের ডালে, ছিঁড়ে নিচ্ছে আপেল। ইভান প্রায় ধরে ফেলেছিল পাখিটার ল্যাজ কিন্তু হাত ফসকে সেটা পালিয়ে গেল। ইভানের হাতে রইল শুধু একটা পালক, কিন্তু সেই পালকের ছটায় মনে হচ্ছিল যেন সারা বাগানে আগুন ধরে গেছে।

রাশিয়ার পুরানো কালের রূপকথায় আছে অপূর্ব আগুনের পাখির কথা। সবাই হয়ত গল্পটা শুনেছে কিন্তু কজন জানে যে আগুনের পাখিটা সত্যিকারের পাখি আর, ভাগ্যবান যারা এই পাখি দেখেছে তারা শুধু জার-এর ছেলেরাই নয়।

1864 সালের নয়ই সেপ্টেম্বর স্টারাইয়া লাডোগাতে সেন্ট জর্জ-এর গির্জার এক পুরোহিত, নাম থিয়োডোর, গির্জায় ফিরছিলেন নামকরণের একটা উৎসবের শেষে। একটা টিলার ওপর গির্জাটা দাঁড়িয়ে আছে বিশাল ভলখভ নদীর তীরে। উষ্ণ সন্ধ্যা, ঘনমেঘ আকাশ থেকে ঝুঁকে নেমে আসছে। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে শরতে যেমন প্রায়ই পড়ে থাকে। পুরোহিতের বোধ হয় একটু বেশিমাত্রায় পান করা হয়েছিল, পা তাঁর অনেকক্ষণ থেকেই চলতে চাইছিল না, এবারে বুঝি একেবারেই অচল হোল। থিয়োডোর হোঁচট খেলেন আলখাল্লায় পা জড়িয়ে কাদায় পিচ্ছিল জমির ওপর। তিনি পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

ঝির ঝির বৃষ্টির শব্দ ডুবিয়ে দিচ্ছিল অন্যসব শব্দকে। নৈঃশব্দ্যে মাঝে মাঝে ছেদ পড়ছিল নদীর ধারে বেঁধে রাখা একটা ঘোড়ার গলার টুংটাং শব্দে, মাঝে মাঝে ভলখভ থেকে হাঁসেরা দল বেঁধে উড়ে যাচ্ছিল। হাঁসেদের
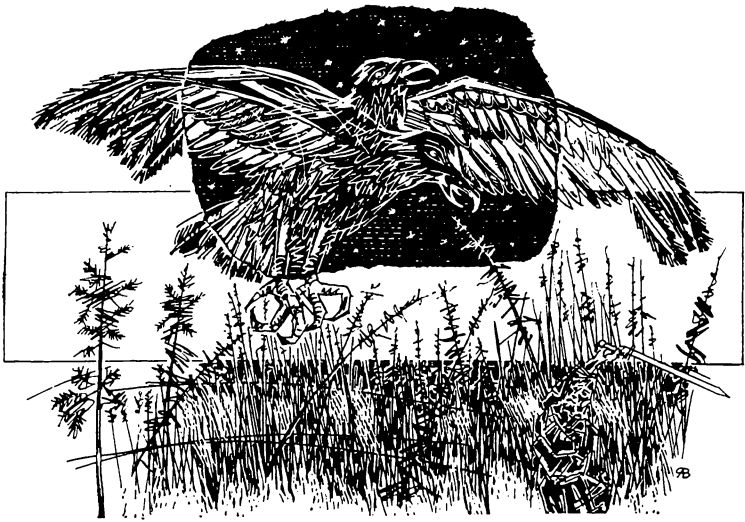
উড়ে যাওয়ার শব্দে থিয়োডোর ভয় পাচ্ছিলেন, কাঁপা কাঁপা হাত দিয়ে কেবলই শরীরে ক্রসচিহ্ন আঁকছিলেন। কোনরকমে কিছুদূর তিনি নিজেকে টেনে নিয়ে চলেন, টিলাটা খুঁজতে থাকেন, অন্ধকারের মধ্যেও তাঁর ধারণা সেটার খুব কাছেই তিনি রয়েছেন। হঠাৎ একটা আলো, নেমে আসা উল্কার মতো তাঁর দিকে ছুটে আসে। পরমুহূর্তে সেটা হয়ে যায় একটা উজ্জ্বল আগুনের গোলা, ডানা ঝাপটানোর শব্দও শোনা যায়, তার পরে আলো আর আওয়াজ দুইই অন্তর্হিত হয়ে যায়। পুরোহিত ভয়ে চমকে উঠে ঘাসের মধ্যে পড়ে গেলেন। নিজের পায়ে যখন আবার দাঁড়ালেন পাখিটার দিকে ঘুসি ছুঁড়লেন খানিকক্ষণ, সে অবশ্য বহু পূর্বেই উড়ে গেছে। সকালবেলায় থিয়োডোর তাঁর যজমানদের শোনালেন শয়তানের কাহিনী, যে নাকি এসেছিল আগুনের পাখির বেশ ধরে, তাঁকে টিলা থেকে ফেলে দেবার চেষ্টা করেছিল। তিনি শয়তানকে খুব ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

গির্জার অধ্যক্ষ থিয়োডোরের পার্টিতে যাওয়া পছন্দ করতেন না। তিনি এই বিধান দিলেন যাতে পুরোহিতকে পুনর্বার প্রেতযোনির হাতে না পড়তে হয়, তাই তাঁকে ঈশ্বর-পুত্রের মায়ের ছবির সামনে দিনে পঞ্চাশবার হাঁটু নোয়াতে হবে। তবে এতে কোন সুরাহা হোল না। খুব শীঘ্রই গুজব ছড়ালো যে একটা আগুনের পাখিকে নাকি সে তল্লাটে দেখা যাচ্ছে। প্রত্যেক

রাত্রে কেউ না কেউ কোথাও না কোথাও তাকে দেখতে লাগল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হলেই, হাঁসেরা যখন নেমে আসত তখন তাদের সঙ্গে একটা জ্বলজ্বলে হাঁসও নামত। সেপ্টেম্বর মাসের প্রায় শেষ পর্যন্ত সেটা আসত, সব সময়ই সেটা একা। তার পরে আর তাকে দেখা যেত না, দক্ষিণ দিকে শেষবারের মতো সেটা উড়ে গিয়েছিল।

আগুনে-পাখি দেখা গেছে অন্যান্য জায়গাতেও। আর্কএনজেল শহরের অদূরে সমুদ্রতীরে যে-সব মৎস-শিকারীরা বাস করে তারা দেখতে পেয়েছিল দুটো জ্বলজ্বলে হাঁস, ধরবার চেষ্টাও করেছিল কিন্তু পারে নি। জ্বলজ্বলে ঈগল-পেচা বা সাধারণ পেচা ইয়ারোসালভল্-এর লোকেরা বহুবার দেখেছে, জার্মানিতে, ফ্রান্সে, ইংলন্ডেও এদের দেখা গেছে। কিন্তু বোধ হয় সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনাটা ঘটেছিল কৃষ্ণ সমুদ্রে লোবিয়াঝি (রাজহংস) দ্বীপের কাছে। স্থানীয় একজন ধীবর সেভাসতপল-এর একজন ওয়ারেণ্ট অফিসারকে বলেছিল তার দেখা একটা উজ্জ্বল হাঁসের কথা। রাত্রে সেই অফিসার সেই অত্যাশ্চর্য দৃশ্য দেখলেন তো বটেই, সেই দুষ্প্রাপ্য পাখিটাকে হত্যাও করলেন। তার পালকগুলি থেকেই আলো বিচ্ছুরিত হোত। ধীবরের বাড়িতে হাঁসটাকে যখন আনা হোল তখন তার দ্যুতিতে ঘরটার রোশনাই তেমন জোরালো হোল না বটে, তবুও সেই আলোতে বই পড়া গেল। পালকগুলি রাতভোর জ্বলজ্বল করতে থাকল, কিন্তু পরের দিন সেভাসতপল-এ নিয়ে যাবার পরে তাদের উজ্জ্বলতার প্রায় সবটাই নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। কত অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটে এই পৃথিবীতে। ফাদার থিয়োডোরই যে কেবল সেগুলির জন্য শয়াতনকে দায়ী করেছেন তা নয়, অনুরূপ পরিস্থিতিতে আরো অনেকেই করেছে ঠিক এমনি আচরণ।

গত শতাব্দীর শেষ নাগাত ভারত মহাসাগরের কয়েকটি দ্বীপের বাসিন্দারাও খুবই বিচলিত হয়েছিল উপরে বর্ণিত ঘটনাগুলির তুল্য রহস্যময় কয়েকটি ঘটনার ফলে।

নিউগিনি দ্বীপ আবিষ্কৃত হয়েছিল ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ায়। তাহলেও সেখানকার অক্ষত বনগুলি ছিল এমনই দুর্ভেদ্য আর সেখানে বাস করত এমনই লড়াকু আদিম জাতীয় মানুষ যে ইয়োরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তি এই দ্বীপ জয় করে নেবার চেষ্টাই করে নি। তিনশ বছর পরে ওলন্দাজেরা এই দ্বীপের পশ্চিম প্রান্তে একটা উপনিবেশ গড়ে তোলে। ততদিনে তীর সংলগ্ন অঞ্চলের স্থানীয় মানুষেরা তাদের শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের চিনে ফেলেছে

এবং যথাসাধ্য বাধা দিয়েছে। পাপুয়া-র বীর যোদ্ধারা জঙ্গলের জীবনে অভ্যস্ত ছিল — বিষাক্ত তীরের সাহায্যে শর যোজনা করতে তারা ছিল বিশেষ নিপুণ। আশ্চর্য কি যে ঔপনিবেশিকেরা এদের দারুণ ভয় করত। পাপুয়ানদের উল্কি-আঁকা কালো শরীর, নাকে কানে কত অলঙ্কার, তাই দেখতে তারা ভীতিজনক। তাছাড়া তাদের স্বভাব ছিল নিঃশব্দে আবির্ভাব আর অন্তর্ধানের। তাইত তাদের শত্রুদের ছিল এদের সম্বন্ধে কুসংস্কারপূর্ণ ভীতি। এই কারণে ওলন্দাজেরা এই দেশের নাম দিয়েছিল শয়তানের দেশ।

ঔপনিবেশিকেরা পড়েছিল খুবই মুস্কিলে, তাই তারা তাদের বাসস্থানগুলি গড়ে তুলেছিল দুরধিগম্য স্থানে — নিজেদের সুরক্ষার জন্য। এই ভাবে তারা গড়ে তুলেছিল বাবো শহর, ছোট একচিলতে বালুময় তীরভূমিতে, দ্বীপের বাকি অংশ থেকে ত্রিশ কিলোমিটার ব্যবধানে — যেখানে দুর্ভেদ্য সুন্দরীর জঙ্গল, চোরাই কাদা আর জলাভূমি। এর ওপরেও, তাদের পত্তন করা নগর রক্ষা করতে হোত সজাগভাবে, কারণ পাপুয়ানরা মাঝে মাঝে শহরটা আক্রমণ করত সুন্দরীর জঙ্গলের দিক থেকে, আবার সমুদ্র থেকেও।

সে রাত্রের কথা বাবো শহরের মানুষ দীর্ঘ দিন ভুলতে পারে নি। আবহাওয়া ছিল অত্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ। সারা আকাশ ঢাকা আছে ভারী কালো মেঘে, বিকেল থেকে সেই মেঘ যেন হুমড়ি খেয়ে নেমে আসছিল। রাত্তিরে আকাশে কে যেন কালো পিচ ঢেলে দিয়ে গেছে, বাতাসের কান্না আর ঢেউ-এর গর্জন ছাপিয়ে উঠছে আর সব শব্দকে। সমুদ্রতীরে যে লোকটি পাহারা দিচ্ছিল সে আজ যেন বড়ই অসহায় বোধ করছে। তাই সে টহল দেবার কালে নিজের অজ্ঞাতে তীর সংলগ্ন বাড়িগুলি ঘেঁসেই চলছিল। ঢেউ-এর ঝাপটা থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করছিল। চোখ টান্ টান্ করে কালিমাখা অন্ধকারে দেখতে চেষ্টা করছিল। কান পেতে শুনতে চেষ্টা করছিল কান ফাটানো ঢেউ-এর গর্জনের মধ্যে অস্বাভাবিক কোন শব্দ শোনা যায় কি না যা ইঙ্গিত করে বিপদের। হঠাৎ তার মনে হোল তীরের ওপর যেন আলো দেখা যাচ্ছে— যদিও খুবই অস্পষ্ট। আলোটা যেন কাছে আসছিল। তীর বরাবর এক চিলতে জমির ওপর দিয়ে বুঝি হেঁটে চলেছে সেই আলো। তারপরে সেই আলো হয়ে ওঠে আরো উজ্জ্বল। একসারি আলার ছাপ কাছে আসতে থাকে। পরমুহূর্তে রক্ষী দেখতে পেল বালির ওপর একসারি জ্বলজ্বলে

পায়ের ছাপ, মানুষের পায়ের ছাপ। যেন তারা শূন্য থেকে এসে শূন্যে মিলিয়ে গেল কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে।

ভয়ে প্রায় জ্ঞানহারা হয়ে সৈনিকটি অপেক্ষা করতে থাকে তার পরের টহলদার এসে পেঁছানর জন্য। রহস্যটা আরো ভয়াবহ হয়ে ওঠে পরের দিন সকালে যখন জানা যায় পাশের একটা বাড়ি থেকে একজন মানুষ নিখোঁজ হয়েছে। রাত্রে সে বাইরে গিয়েছিল আর ফেরেনি।

সকলের বিশ্বাস হোল যে কেবল শয়তানের পক্ষেই সম্ভব এই ধরনের আগুনেরপায়ের ছাপ রেখে যাওয়া, বা একটা লোককে চুরি করে নিয়ে যাওয়া। পাপুয়ানদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হোল, তারা স্বীকার করল যে এ কাজ করেছে 'সোয়াঙ্গি' বা শয়তান।

তখন থেকে সোয়াঙ্গির আগুন-রাঙা পায়ের ছাপ মাঝে মাঝে বাবো শহরে দেখা যেতে লাগল। শয়তানটা আসে অন্ধকার দুর্যোগময় রাত্রিতে, আর এলেই কোন না কোন বিপদ ঘটে। কখনো বা একখানা বেঁধে রাখা নৌকা সমুদ্রে ভেসে হারিয়ে যায়, নয়তো গৃহস্থের শুয়োর চলে যায় জঙ্গলে।

সোয়াঙ্গি নিশ্চয় সমুদ্রবাসী শয়তান কারণ তার পায়ের ছাপ পাওয়া যায় কেবল সমুদ্রতীরেই। যাই হোক শয়তানের উপস্থিতি সম্বন্ধে ভ্রান্ত বিশ্বাস অচিরেই ঘুচে গেল যখন একজন ওলন্দাজ বাসিন্দার এই অভি-জ্ঞতাটি হোল: এক সন্ধ্যায়, অন্ধকার যখন ঘনিয়ে আসছে, সে দেখতে গিয়েছিল নৌকাগুলি ঠিক মতো বেঁধে রাখা হয়েছে কি না। তার পড়শীরা তার দিকে তাকাতে গিয়ে সভয়ে দেখল যে তার পেছনে রয়েছে একসারি উজ্জ্বল পায়ের ছাপ। সন্দেহ করা হোল এই হতভাগ্য লোকটির রয়েছে শয়তানের সঙ্গে যোগসাজস। তার পরিণাম হয়ত হোত জনতার আইনে বিচার — অর্থাৎ মৃত্যু। কিন্তু উদ্ধারের রাস্তাটা পাওয়া গেল আচমকা। যে লোকগুলিকে বলা হয়েছিল ওকে ধরে আনতে, ভিজেবালির ওপরে তারা সবাই রেখে যেতে থাকে আগুনে-পদচিহ্ন। এর পরে জানা গেল যে কোন কোন রাত্রিতে বালির ওপর দিয়ে যে কেউ হেঁটে গেলেই তার পায়ের ছাপগুলি জ্বলজ্বল করতে থাকে।

তাহলে কে ছিল সেই রহস্যময় 'সমুদ্রের সোয়াঙ্গি', কেমন করেই বা সে ভেজাবালি জ্বালিয়ে দিত? কোথা থেকেই বা আসত সেই প্রাণীগুলি যারা ছিল রূপকথার 'আগুনে-পাখি'র ছোট সংস্করণ? বিজ্ঞানীরা এই রহস্যের

সমাধান করবার আগে কেটে গেল অনেক কাল। ওলন্দাজ ঔপনিবেশিকেরা অনেকগুলি আতঙ্কিত বছর পাপুয়াতে কাটিয়েছে ইতিমধ্যে।

রহস্যের সমাধান

শয়তান, তা সে জলেই থাকুক কিম্বা শুকনো ডাঙায়, সে বেচারার কোন হাত ছিল না এই আগুনে-পাখি বা জ্বলজ্বলে পায়ের ছাপের ব্যাপারে। প্রকৃতিতে ব্যাপকভাবে দেখা যায় এই জৈবরশ্মি। অনেকেই হয়ত দেখে থাকবে। তোমরা কেউ কেউ দেখে থাকবে পচাকাঠ থেকে অপূর্ব আলোর দীপ্তি দেখা যাচ্ছে, বা সমুদ্রের জল যেন জ্বলছে। এই ব্যাপারটা প্রাচীন কালের লোকেরা জানত, কিন্তু এর রহস্যটা অনেক দিন পর্যন্ত অজানা ছিল। পরবর্তী মানুষ জানতে পেরেছে কাঠের বা জলের থেকে আলোর আভার জন্যে দায়ী উপরিতলে বসবাসকারী অতিক্ষুদ্র জীবকণা। তবে জীবাণুরাই যে এই পৃথিবীতে আলোকবিকিরণকারী প্রাণী তা নয়। অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণীর আছে এই গুণ। আধুনিক বিজ্ঞানের গোচরে আছে অন্তত 1100 প্রজাতির প্রাণী যাদের জৈবরশ্মি পরিপার্শ্বের ম্লানতা খানিকটা ঘোচায়।

এই জৈবরশ্মি কোষের বাইরে থেকে বা ভিতর যেকে সক্রিয় হতে পারে। প্রথম ক্ষেত্রের প্রাণীদের আছে দু'ধরনের কোষ। একধরনের কোষের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে হলুদ রঙের এক প্রকার পদার্থ থাকে — এই পদার্থের নাম লুসিফারিন। বাকি কোষগুলিতে একটি এনজাইমের গুঁড়ো যার নাম লুসিফারেজ। লুসিফারিন জারিত হয় লুসিফারেজের সাহায্যে এবং এর ফলে প্রাণীটা দীপ্যমান হয়ে থাকে। প্রভাময়তা প্রকাশ পেতে পারে কেবল জলের মধ্যেই প্রচুর অকসিজেনের সহায়তায়।

কোষের মধ্যেকার প্রভাময়তার ক্ষেত্রে লুসিফারিন আর লুসিফারেজ এই দুটো পদার্থই থাকে একই কোষের ভেতর। এই ধরনের প্রভাময়তার প্রকৃত পদ্ধতিটা এখনো স্পষ্টভাবে জানা যায় নি। একটা সম্ভাবনা এই হতে পারে যে, প্রাণীটা প্রচুর পরিমাণে মুক্ত অকসিজেন কোষের মধ্যে ছেড়ে দিতে থাকে।

জীবন্ত প্রাণীর প্রভাময়তা বা জৈবরশ্মির ব্যাপারটা বিস্ময়কর। সত্যিই তো, এই আপাত অস্বাভাবিক ধর্মটার উৎপত্তি কোথা থেকে হোল। এই

প্রশ্নটা নিয়ে বিজ্ঞানীরা চিন্তাভাবনা করেছেন কয়েক পুরুষ ধরে। কেবল সম্প্রতিই জানা গেল যে ঘটনাটার মধ্যে আর কোন ধাঁধা নেই।

জৈবরশ্মির বিষয়ে কিছু আলোকপাত করা যাবে এমনি পরীক্ষা শুধু হয়েছিল কিছুবেশি ত্রিশ বছর পূর্বে। সোভিয়েত বিজ্ঞানী ভ. লেপেশকিন এবং আ. গুরভিচ প্রায় সকল প্রকারের পরিচিত গাছপালার কোষের মধ্যে পেলেন ক্ষীণ প্রভাময়তার হদিস। এই রশ্মি এতই ক্ষীণ যে এর অস্তিত্ব টের পাওয়া ও তীব্রতা পরিমাপ করবার মতো সূক্ষ্ম সংবেদনশীল যন্ত্রই উদ্ভাবন করা যায় নি। তেমন যন্ত্র কিন্তু অধুনা তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এইসব যন্ত্র ব্যবহার করে আধুনিক বিজ্ঞানীরা এই তথ্য প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন যে রাসায়নিক প্রভাময়তা অর্থাৎ রাসায়নিক শক্তির সরাসরি আলোকে রূপান্তর খুবই একটা সাধারণ ঘটনা। অনেক পদার্থ, যার মধ্যে আছে কয়েকটি স্নেহজাতীয় পদার্থ, জারণের সময় আলেক বিকিরণ করে থাকে। দেখা যাচ্ছে যে উদ্ভিদ বা প্রাণীর শরীরস্থ কোষকলা সর্বদাই দীপ্তিমান, বিশেষকরে তারা যখন কর্মরত, তখন তাদের প্রভার তীব্রতা বেড়ে যায়। যেমন ধরো ব্যাঙের সংকোচমান হৃৎপিন্ডের উপরিতল নিরন্তর উজ্জ্বল।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রাণীদেহস্থ কোষকলার জৈবরশ্মি মেদ বা লিপিড-এর জারণ থেকেই সম্ভূত হচ্ছে। রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলস্বরূপ উত্তেজিত অণুদের মধ্যেকার ইলেকট্রণগুলির স্থানান্তর হয় নিম্নতর থেকে উচ্চতর শক্তির স্তরে। এই ইলেকট্রণগুলি যখন আবার পূর্বেকার স্তরে ফিরে আসে, তখন মুক্ত হওয়া শক্তি কাজে লাগে, হয় নতুনতর রাসায়নিক বন্ধণী সৃষ্টির কাজে, নতুবা সেটা দৃশ্যমান হয় আলোকের তেজকণা (quanta) রূপে। এই যে প্রক্রিয়াটা ঘটছে এটা কিন্তু সালোক সংশ্লেষের ঠিক বিপরীত, কেননা সেক্ষেত্রে আলোকের কাজ হোল ইলেকট্রনকে উচ্চতর শক্তির স্তরে উন্নীত করা এবং তজ্জনিত মুক্ত শক্তিটার শ্বেতসার সংশ্লেষের কাজে ব্যবহৃত হওয়া।

ক্রমে ক্রমে আরো জানা গেল, প্রাণীদেহের এই যে ক্ষীণ জৈবরশ্মি এটা কিন্তু লিপিড-এর আকস্মিক বা সবিরাম জারণেই যে শুধ দেখা যায় তা নয়, পরন্তু প্রাণকার্য নির্বাহ হওয়ার জন্য যে সব রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে তার ফলেও অবিরাম এই জৈবরশ্মির উদ্ভব ঘটছে। এমন একটা ব্যবস্থা যখন আছে তখন কোন কোন প্রাণী এরই উন্নতি ও বিকাশ ঘটিয়ে কাজে লাগাবে সে কথা বলাই বাহুল্য। আমাদের এই গ্রহে এরকম প্রাণী আছে অনেকগুলি কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশেরাই, মানুষও বাদ যায় না, খুবই ক্ষীণ শক্তির
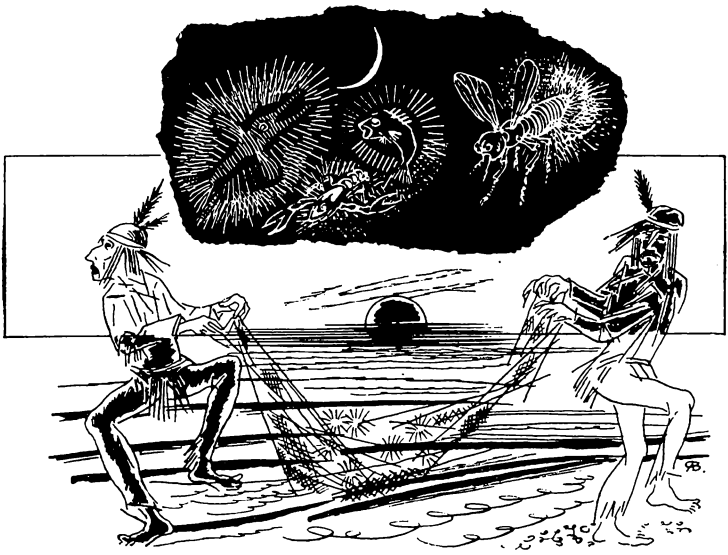
আলোক বিকিরণ করতে পারে।

দীপ্তিমান যত প্রাণী আছে তারা প্রায় সবাই থাকে সমুদ্রে। সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি যারা তারা হোল পেরিডিনিয়ান, ল্যাজযুক্ত ছোট ছোট উদ্ভিদ। সমুদ্র-পৃষ্ঠের জায়গায় জায়গায় অতি অপূর্ব সুন্দর আলো ঝলমল করা অঞ্চল দেখতে পাওয়া যায় তার জন্য এরাই দায়ী। শান্ত অবস্থাতে এই পেরিডিনিয়ম-রা কিন্তু জ্বলজ্বল করে না। জলের আলোড়নে চঞ্চল হলেই, যেমন হয়ে থাকে একটা জাহাজ চলে গেলে, পেরিডিনিয়ানেরা ঝলসে ওঠে ঢেউ-এর মাথায়, উত্তেজনার ফলে উদ্ভূত আলোক শক্তিটা ক্ষয় করে ফেলে। কয়েক মুহূর্ত পরেই আবার নিষ্প্রভ হয়ে যায়।

কোন ডুবুরী যদি সাহস করে জলের নীচে নামে রাত্রিকালে, জলের মধ্যে পেরিডিনিয়নেরা যেখানে থিকথিক করছে, তাহলে সে দেখবে এক অত্যাশ্চর্য দৃশ্য। ডুবুরীর প্রতিটি নড়াচড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন আতসবাজির শুরু হয়ে যায়। তার মুখোসের চারপাশে হাজার হাজার স্ফুলিঙ্গ নেচে বেড়াচ্ছে, কারা যেন ডজন ডজন ফুলঝুরি জ্বালিয়েছে একসঙ্গে। দৃশ্যটা মনের মধ্যে ভেসে থাকবে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত।

এই পেরিডিনিয়ানেরা যখন তীরে এসে আছড়ে পড়ে ঢেউ-এর মাথায় চেপে, তারা তক্ষুণি ধ্বংস হয়ে যায় না। ভিজে বালিতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার পরে আবার তারা জ্বলজ্বল করতে থাকে। সমুদ্রতীরে কোন লোক হেঁটে বেড়ালে একসারি উজ্জ্বল পদচিহ্ন রেখে যায়। উজ্জ্বলতাটা মানুষের পায়ের চাপের দরুণ পেরিডিনিয়ানদের উত্তেজিত হয়ে ওঠার ফলেই দৃশ্যমান হয়।

অগ্নিময় পদচিহ্ন কেবল নিউগিনির সমুদ্রতটে যে দেখা গেছে তা নয় — ক্রান্তীয় বা মেরু অঞ্চলেও এর দৃষ্টান্ত আছে। এন. এ. ই. নরডেনস্কিওলড্ একজন বিখ্যাত অভিযাত্রী। তিনি বর্ণনা করেছেন সমুদ্রজলে ধোয়া তুষারের ওপর অগ্নিময় পদচিহ্নের কথা। এগুলি তিনি দেখেছিলেন স্পিটসবার্জেন-এর উপকূলে আর ডেলং দ্বীপে। এক্ষেত্রেও পেরিডিনিয়ান-এরাই ছিল দায়ী কিংবা কোপেপড বা নামান্তরে মেটরিডিয়া-এরা।

মুষ্টিমেয় কয়েকটি বড় প্রাণী আছে যারা লুসিফারিন সৃষ্টি করতে পারে। অনেককে হয়ত দীপ্তিমান দেখা যায় কিন্তু তার কারণ তাদের শরীরের ওপর বসবাসকারী ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র উদ্ভিদের দরুণ। এই ধরনের সহাবস্থানের নাম সিমবায়োসিস। এক প্রকারের সমঝোতা দুটি ভিন্ন জাতের প্রাণীর মধ্যে যার ফলে উভয় পক্ষেরই লাভ হয়ে থাকে।

আশ্রয়দাতা তার দীপ্তিমান ক্ষুদে বন্ধুদের সর্বপ্রকারের আতিথ্যে আপ্যায়িত করে, পরিবর্তে কৃতজ্ঞ অতিথিরা মুগ্ধকর আলোতে সাজায় গৃহস্বামীর দেহ।

সিমবায়োসিস-এর প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই দুটি প্রাণীর পরস্পরের জন্য প্রয়োজনটা এমনই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে আলাদাভাবে তারা বেঁচেই থাকতে পারে না। এছাড়া অর্থাৎ এই শত-শতাব্দীর ঘনিষ্ঠ সহযোগ ছাড়াও কখনো কখনো সাময়িক সহাবস্থানের দৃষ্টান্ত দেখা যায় পরিবেশের আনুকূল্য থাকলে। কদাচিৎ এই দীপ্তিমান উদ্বাস্তুরা পাখির ডানার পালকের ওপর আশ্রয় নিয়ে রূপকথার সৃজন করে থাকে। এই সব আগুনে পাখিরা প্রায় সবাই পানকৌড়ি, জলপিপি প্রভৃতি পাখি, যাদের বাস সমুদ্র তীরে। এদের পালকগুলি ছেয়ে থাকে সম্ভবত অসংখ্য সামুদ্রিক জীব ও উদ্ভিদের কণা দিয়ে। অপরপক্ষে ঈগল-পেচা বা সাধারণ পেচারা আক্রান্ত হয়ে থাকে একধরনের উজ্জ্বল ছত্রাকের দ্বারা, কেননা এদের স্থায়ী বাসস্থান পচাকাঠের গর্তের ভেতরে।

প্রাণী জগতের দীপ্তিমান সদস্যদের প্রায় সবাই বাস করে মহাসমুদ্রে। অধিক সংখ্যায় এদের দেখতে পাওয়া যায় সমুদ্রের গভীরে। এর কারণ, সমুদ্রের গভীর তলদেশের নিচ্ছিদ্র অন্ধকার কেবল জীবন্ত প্রাণীদেহ থেকে বিকিরিত প্রভা থেকেই আলোকিত হতে পারে। এদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট যারা, তারা আলোক সৃষ্টি করতে পারে সারা দেহ দিয়েই, আর যারা আকৃতিতে বড়ো তাদের আছে আলোকসৃষ্টির জন্য বিশেষ দেহযন্ত্র। কিছু প্রাণী আছে, যেমন কয়েকটি জাতের শিরঃপাদ বা অকটোপাস আর গভীর সমুদ্রের মাছ, যারা তাদের দীপ্তিমান দেহযন্ত্রগুলিকে প্রায় নিখুঁত করে তুলেছে। তবে, যেসব প্রাণী জলের উপরিতলে বাস করে, তারাও খুব পেছিয়ে নেই। আমেরিকার উপকূলের কাছে প্রশান্ত আর আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রে ছোট ছোট দলে দেখা যায় গায়ক মাছদের। আকৃতিতে বড়ো নয়, 25-35 সে.মি.এদের দৈর্ঘ্য। এদের পর্যবেক্ষণ করা চাই উপকূলের কাছে যখন জলে এরা ডিম ছেড়ে যায়, নদীমুখে বা সমুদ্রের অগভীর খাড়িতে। ডিমছাড়া হয়ে গেলে স্ত্রী-মাছেরা চলে যায় আর পুরুষ মাছেরা ডিমগুলি পাহারা দিতে থাকে বাচ্চা জন্মানো পর্যন্ত।

'মাছের মতো বোবা' এই উপমাটা কিন্তু এই মাছদের ক্ষেত্রে খাটবে না, কারণ এরা শব্দ করতে পারে। পাহারাদার পুরুষমাছগুলি সর্বদা গুণগুণ করে গান গাইছে — বোধহয় শিকারীদের তাড়াবার জন্যে। পাহারাদার এই মাছের খ্যাতি ছড়িয়েছে সারজেন্ট নামে হয়ত এইভাবে পাহারা দেবার অভ্যাসের জন্যই।

তবে সারজেন্ট নামের আর একটা কারণ হয়ত এদের ত্বকের বিশেষ রং আর তার ওপর সারি সারি উজ্জ্বল বুটি যেমন থাকে সারজেনটদের কোটের পালিশ করা বোতামের সারি। এদের আছে খুবই জটিল লণ্ঠনের মতো প্রভাকর দেহযন্ত্র, সংখ্যায় প্রায় তিনশ। দেখতে এগুলি যেন জীবন্ত, ছোট ছোট টর্চলাইট।

এই প্রভাকর দেহযন্ত্রের বাইরেটা ঘোর বর্ণের অনচ্ছ একটা পর্দা, ভেতরটা চকচকে তাই আলোক প্রতিফলিত করতে পারে। সামনে আছে একটা স্বচ্ছ পরকলা যেটা আলোর রেশগুলিকে ঘন করে। ভেতরটা তাই অন্ধকারে পিচ্ছিল প্রভার সৃষ্টি করে। এই মাছ অবশ্য আলোকের জন্য এই লন্ঠন

ব্যবহার করে না। অনেকের মতে মিলন ঋতুতেই এই আলোক বিচ্ছুরণ দেখা যায়।

ভক্ষ্য স্কুইড আর কতকগুলি প্রাণী আছে যারা তাদের প্রভাকর দেহযন্ত্র ব্যবহার করে আলোকের জন্য। এই যন্ত্রগুলি আকৃতিতে বড়, শরীরের সামনের দিকে এগুলি অবস্থিত, অনেকসময় চোখের ওপরে, কখনো বা চোখের ভেতরে, তাই যে দিকে প্রাণীটা তাকায় সে দিকটা আলোকিত হয়ে যায়। এই সব প্রাণীদের চোখের মধ্যে একটা ব্যবস্থা আছে যা দিয়ে এই আলোক বিকিরণ দরকার হলে তারা বন্ধ করে দিতে পারে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই চোখের পাতার মতো একটা চামড়ার পর্দা ঢেকে দেয় এই প্রভাকর দেহযন্ত্রের ওপরটা।

জীবিত প্রাণীর দ্বারা বিকিরিত আলোকের অনেকগুলি রং হতে পারে, সাদা, নীলচে-সবুজ, চূণী-লাল। কখনো বা প্রাণীটার থাকে তিন চারটে রঙের লন্ঠন। রঙীন আলোর কয়েকটা সুবিধা আছে কিন্তু অনেক প্রাণীই তো আছে যারা রঙীন আলো সৃষ্টি করতে পারে না তাই তারা বর্ণহীন আলোকরশ্মি চালিত করে দেয় তাদের লণ্ঠনের রঙীন লেন্সের মধ্য দিয়ে— এইভাবে তারা সৃষ্টি করে মনলোভা রঙীন দীপ্তি। জীবন্ত টর্চলাইটের ভেতরের এই যে রঙীন শ্লেষ্মা সেটা কিন্তু আসলে দীপ্তিমান জীবাণুদের সমষ্টি। এইভাবে, ক্ষুদ্র প্রাণীরা বেঁচে থাকে বৃহৎ প্রাণীর শরীর আশ্রয় করে।

আবার অন্যরকমও হয়ে থাকে। পৃথিবীর প্রায় সকল সমুদ্রেই আছে লেজবিশিষ্ট জীবকণা, যাদের নাম নকটিলুকি (Noctilucae)। আকৃতিতে এরা অতি ক্ষুদ্র বলের মতো, 2 মিলিমিটারের থেকে বড় নয়। বলের একদিকে আছে মুখ, যেটা একটা গভীর গর্ত মাত্র। উত্তল লেন্সের সাহায্যে একটা নকটিলুকাকে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে আড়াআড়িভাবে আছে একটা লম্বা শুঁড় আর লম্বালম্বিভাবে একটা বেঁটে লেজ।

নকটিলুকিরা আলো ধরে রেখে বিকিরণ করতে পারে। ক্রান্তীয় অঞ্চলের সমুদ্রের বাসিন্দা এই প্রাণীদের শরীরে আশ্রয় নিয়ে থাকে অসংখ্য ক্রিপটোমোনাড-এরা আণুবীক্ষণিক লেজবিশিষ্ট প্রাণী, ক্রিপটোমোনডিনাবগীয়। কেন এই ঘনিষ্ঠ সহাবস্থান? ক্রিপটোমোনাডদের শরীরে ক্লোরোফিল আছে। সবুজ উদ্ভিদের মতো এরা পরিবেশ থেকে কার্বন ডাই অকসাইড নিয়ে তা থেকে স্টার্চ সংশ্লেষণ করতে পারে কিন্তু

আলোর সাহায্যেই কেবল তা সম্ভব। তাই নকটিলুকি-র ছেড়ে দেওয়া মুক্ত আলো আর অপর্যাপ্ত কারবন ডাই অকসাইড নিয়ে ক্রিপটোমোনাডেরা স্টার্চ সংশ্লেষণ করতে পারে রাত্রিতেও। নকটিলুকিরাও এই সহাবস্থান থেকে উপকৃত হয়। ক্রিপটোমোনাডেরা নকটিলুকির শরীর থেকে ক্ষতিকর কারবন ডাই অকসাইড বিতাড়নে সাহায্য করে আবার সালোক সংশ্লেষণ থেকে উৎপন্ন অকসিজেনটাও তাদের সরবরাহ করে থাকে।

জীবন্ত এই সব লন্ঠনেরা ক্রান্তীয় সমুদ্রের গভীর অতলে বা উষ্ণমন্ডলের গভীর জঙ্গলে যদিও থাকতে ভালবাসে, তাহলেও উত্তরাঞ্চলের বনের মধ্যেও ছোট ছোট জীবন্ত লণ্ঠন দেখতে পাওয়া যায়। রাশিয়ার বনাঞ্চলে গ্রীষ্মঋতুই সবচেয়ে মনোরম। গাছের নীচে নানা ধরনের ঘাসের অপার বিস্তার। ঝোপঝাড়ের ফাঁকে সূর্যের আলোর বন্যা, স্ট্রবেরি সবেমাত্র পাকছে। সন্ধার অন্ধকার যখন জঙ্গলে নেমে আসে, উজ্জ্বল ছোট ছোট সবুজ লণ্ঠন জ্বলে ওঠে পথের ধারে, ঝোপেঝাড়ে, চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়ে তারা যেন ছড়িয়ে দেয় রহস্যময় বিচিত্র সৌন্দর্য। মনে হবে খুব ছোট ছোট কতকগুলো দুষ্টু তারা আকাশে খেলতে খেলতে খুব কড়া মাষ্টার মশাই-এর হাত থেকে পালিয়ে এসে ঘন ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে পড়েছে। এরা আসলে তারাও নয় বা জঙ্গলের মধ্যে পথিকের ফেলে দেওয়া জ্বলন্ত কাঠকয়লাও নয়।

একটা টুকরো হাতে নিয়ে দেখ — আরে, এ যে ঠান্ডা। আলোটা আসে একটা ছোট পতঙ্গের শরীর থেকে, এদের নাম জোনাকি। পতঙ্গটা নিশাচর, দিনে আদৌ দেখা যায় না, ঘন ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। রাত্রি এলে এরা শিকারে বেরোয়। প্রাণীটা মাংসাশী, গেঁড়ি, মাকড়সা আর অন্য ছোট ছোট পতঙ্গকে ধরে এরা খায়।

এই পতঙ্গদের স্ত্রী আর পুরুষদের মধ্যে আকৃতিগত অনেক পার্থক্য রয়েছে। স্ত্রী পতঙ্গটা বড়, লম্বায় দুই থেকে তিন সেন্টিমিটার। মাথা আর বুকের অংশগুলো ছোট, তিন জোড়া পা আছে। পেটটা বড়, মাংসল। সারা শরীরটা ধূসর-বাদামী, কেবল পেটের তলায় শেষের তিনটি খাঁজ সাদা। এই খাঁজ তিনটি থেকেই আলো বিচ্ছুরিত হয়। পেটের তলার অংশের খোলাটা পাতলা, আলোটা সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ে, ওপরদিকের খোলাটা ঘোর বর্ণের এবং পুরু হওয়ায় পিঠের দিক থেকে আলো মোটেই ছড়ায় না।

দিনের বেলায় স্ত্রী পতঙ্গটা তলপেটটা মাটিতে চেপে থাকে, তাকে আদৌ দেখতে পাওয়া যায় না। রাত্রি নেমে এলে, লুকানো জায়গা থেকে বেরিয়ে

এসে স্ত্রী পতঙ্গ উঠে পড়ে উঁচু একটা ঘাসের আগায়, ঝুলে থাকে তলপেটটা ওপরদিকে রেখে। বিচ্ছুরিত আলোটা দেখতে পাওয়া যায় ওপর থেকে, পুরুষ পতঙ্গেরা তাতেই আকর্ষিত হয়। একটা জোনাকি ধরে বই-এর পাতার ওপর রেখে লাইন ধরে এগিয়ে গেলে বইটা তুমি পড়তে পারবে।

পুরুষ জোনাকি আকারে অনেক ছোট। এরা ভাল উড়তে পারে তবে খুব সামান্যই আলো বিকিরণ করতে পারে।

ইয়োরোপীয় রাশিয়াতে কেবল এক জাতের জোনাকি বাস করে। ককেশাস অঞ্চলে দেখা পাওয়া যায় ভিন্ন একটা জাতেরও। এদিক সেদিক ওড়ার কালে লাল একটা স্ফুলিঙ্গের মতো এরা ছুটে বেড়ায়, দক্ষিণাঞ্চলের অন্ধকার রাত্রিতে পর্যবেক্ষককে মুগ্ধ করে। যদিও দীপ্যমানতা একটা ব্যাপকভাবে লক্ষণীয় ঘটনা, তথাপি আশ্চর্যের কথা হলেও, আমরা এখনো জানি না যে অধিকাংশ জীবিত প্রাণী কীভাবে এই উৎপন্ন আলোর ব্যবহার করে। তবে জঙ্গলের জোনাকিদের বেলায় অবস্থাটা স্বতন্ত্র। আমরা জানি যে আলোর সহায়তায় পুরুষ জোনাকি মিলনঋতুতে খুঁজে নেয় তার সঙ্গিনীকে। ক্রান্তীয় অঞ্চলে বহু প্রজাতির জোনাকি বাস করে, তাই তারা বিকিরণ করে হ্রস্ব ঝিকমিকিয়ে ওঠা আলোর ঝলক। স্ত্রী-পতঙ্গেরা যদি কেবল স্থিরভাবেই জ্বলতে থাকত তাহলে তাদের পুরুষ সঙ্গীরা নিঃসন্দেহে বিভ্রান্ত হোত, এবং সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যেত, কারণ স্ত্রী-পতঙ্গের কাছে ভিন জাতের প্রেমপ্রার্থী এসে হাজির হলেই স্ত্রীপতঙ্গ তাকে খেয়ে ফেলত।

তাই এই ধরনের ভুলভ্রান্তি এড়াবার জন্য জোনাকিরা খুবই উন্নত একটা ভাব বিনিময় ব্যবস্থা উদ্ভাবন করে নিয়েছে। জঙ্গলের মধ্যদিয়ে রাত্রে উড়ে বেড়াবার কালে পুরুষ জোনাকি ছন্দোময় আলোর ঝিলিক দিতে দিতে সঙ্গিনীর কাছে প্রার্থনা পাঠিয়ে দেয়। মাটিতে বা গাছের ডালে বসে স্ত্রী-পতঙ্গটা জবাবী আলোর ইঙ্গিত পাঠায় নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে, তাই ঝিকমিক-মিটমিট বহুধা ইঙ্গিতের বুনট গড়ে ওঠে পুরুষ আর স্ত্রী-জোনাকীর মধ্যে। এই যে প্রার্থনা আর সাড়া এদের মধ্যে সময়ের ব্যবধানটা থেকে পুরুষ পতঙ্গটা স্থির করে নেয় কোনটি তার নিজের গোষ্ঠীর স্ত্রী-জোনাকি। স্ত্রী-জোনাকিটা যদি ভুল করে সাড়া দিয়ে ফেলে একটু আগে বা একটু পরে, তাহলে হতভাগ্য প্রেমিককে সেই ভুলের মাশুল নিজের জীবন দিয়ে দিতে হয়।

যাই হোক, এই যে ইঙ্গিত বিনিময়ের ব্যবস্থা এটা কিন্তু সর্বত্র অনুসৃত হয় না। আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন ভদ্রলোকেরা মেয়েদের খেয়ালের পরোয়া করে না। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জোনাকিরা অন্ধকার রাত্রিতে সঙ্গিনী খুঁজে পাবার জন্য ছুটে বেড়ায় না। তার বদলে তারা নিজেরাই জঙ্গলের মধ্যে একটা খোলামেলা জায়গায় গাছের ডালে আরাম করে বসে অন্ধকারের মধ্যে আলোর বার্তা পাঠাতে থাকে। সবাই মিলে — তা সে দলটা যত বড়ই হোক — একসঙ্গে মিটমিট করে জ্বলতে থাকে। রাত্রে বন ভেসে ওঠে ছন্দোময় আলোকমালায় — উৎসবের দিনে যেমন আলোক সজ্জায় শহরের বাড়িগুলি সাজানো হয়, দৃশ্যটা তারই অনুরূপ। স্ত্রী-জোনাকি খুঁজে নেয় আলোর বার্তা নিয়ে অপেক্ষমান নিজের নিজের সঙ্গীকে, স্পন্দমান আলোর ছন্দটাকে নিবিষ্টভাবে চিনে নেয় যাতে নির্বাচনে ভুল না হয়। এর পরে একেকটি স্ত্রী-জোনাকি মিলিত হয় একেকটি পুরুষ সঙ্গীর সাথে।

দীপ্যমানতা শত্রুর বিপক্ষে আত্মরক্ষার জন্যও কাজে লাগানো হয়ে থাকে। মহাসমুদ্রের অতলে বাস করে অকাটাপাস। আক্রান্ত হলে এরা শত্রুর মুখের সামনে তরল আগুনের একটা মেঘের কুণ্ডলী রেখে দিয়ে সরে পড়ে। আকৃতিতে এই কুণ্ডলীটা ওদের নিজেদেরই সদৃশ্য। জিঘাংসু শত্রু ভুল করে এই উজ্জ্বল প্রতিভূটাকে আক্রমণ করে বসে আসল স্কুইডটা ততক্ষণে অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে।

এই ছলনাটা ছোট ছোট চিংড়িজাতীয় ক্রে-ফিশও কাজে লাগায়। গভীর সমুদ্রের বাসিন্দা চিংড়িদের মুখের কাছে বিশেষ গ্রন্থি আছে যেখান থেকে একটা আলোর পর্দা বিছিয়ে দেয় — প্রাণীটা বিপন্ন হলে। এইভাবে একঝাঁক চিংড়ি যখন আক্রান্ত হয় তখন অসংখ্য আলোর ফুটকি তাদের আড়াল করে শত্রুর সামনে থেকে। তার পরে চিংড়িরা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে যায়।

অনেক প্রাণী আছে যারা ঝলসে ওঠে শত্রুর চোয়ালের নীচে পড়ার কালে। এটাও একটা পালাবার ছল কেননা খাদক প্রাণীটা ভয় পেয়ে বা ঘাবড়ে গিয়ে মুখটা খুলে ফেলে — পালাবার জন্যে শিকার চাইছিলও তাই। কতকগুলি পোকা আছে যারা এই কায়দায় দক্ষ। কেটে দুটুকরো করলে পশ্চাদ্ভাগটা আলো বিকিরণ করতে থাকে, সামনের অংশটা পালায়। গভীর সমুদ্রের একজন পথদ্রষ্টা অভিযাত্রী উইলিয়াম বীব (Wilian Beebe) দেখেছিলেন একটা পোকা একট স্কাটল মাছের চোয়ালের নীচে আটকা পড়ে ধিকি ধিকি জ্বলছে। পোকাটাকে তিনি চিনতে পারেন নি তবে তাঁর

চোখের সামনেই কামড় খেয়ে সেটা দ্‌টুকরো হয়ে গেল। লেজের দিকটা ঝলমল করে উঠল, সঙ্গে সঙ্গেই সেই অংশটা ভক্ষিত হয়ে গেল, মাথার দিকের আলোটা নিবে গেল, সেদিকটা ছ্‌টে পালিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। বেশীর ভাগ কীটেরাই শরীরের কোন অংশ খ্‌ইয়ে আবার তা গজিয়ে নিতে পারে — তাই এই পোকাটাও হয়ত অচিরেই ফিরে পাবে তার ল্যাজটা। মনে হতে পারে দীপ্যমানতার উদ্দেশ্য একটাই, আক্রমণকারীকে বিভ্রান্ত করা, যার ফলে শরীরের কম দরকার অংশকে হারিয়ে প্রধান অংশটাকে বাঁচানো যায়। টিকটিকিদের ল্যাজ ফেলে দিয়ে পালানোও একই উদ্দেশ্যে।

প্রশ্নাতীতভাবে বলা যায় না যে প্রাণীরা এই জীবন্ত আলোর খবর রাখে এবং নিজেদের বাঁচাবার জন্য সেটা কাজে লাগায়। হয়ত বা আলোটা ব্যবহার করা হয় বার্তা পাঠানোর কাজে। নিঃসন্দেহে সার্ডিন মাছের চোয়ালের মধ্যে পড়ে ক্রে-ফিশ যখন উজ্জ্বল আলোর ঝলকটা পাঠায় তখন সেটা বিপদের সংকেত ছাড়া আর কিছ্‌ই নয়, দলের বাকি মাছেরা যা থেকে সাবধান হতে পারবে। ঢেউ-এর মাথায় চড়ে নকটিল্‌কি যখন আলো

ঝলসায় তখন হয়ত তারা বাকি সবাইকে জলের গভীরে ডুবে যাবার সংকেত দেয়। কিন্তু এ সবই আন্দাজে বলা হয়, সত্যের কত কাছাকাছি এই আন্দাজগুলি সেটা বলা শক্ত। যেমন ধরো, কেউ তো জানে না নকটিলুকিদের কী লাভ হয় দীপ্যমানতা থাকার জন্য।

দীপ্তিমান প্রাণীদের বেশির ভাগই বাস করে গভীর অন্ধকারে। তাই মনে হতে পারে যে এইসব প্রাণীরা তাদের আলোগুলি ব্যবহার করে প্রকৃতই আলোর জন্য। কিন্তু ভাল করে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে বেশির ভাগ প্রাণী তাদের প্রভাময় অঙ্গগুলি কাজে লাগায় পরস্পরকে খুঁজে পাবার জন্য, রং ও নকসার সাহায্যে আত্মীয় পরিজনদের চিনে নিতে বা শিকারকে আকর্ষণ করবার জন্য।

গভীর সমুদ্রের ছিপ-ফেলা মাছের আছে একটা চমৎকার ব্যবস্থা। এদের পিঠের পাখনার আছে একটা খুব লম্বা ডাঁটি, অন্যগুলি থেকে সম্পূর্ণ উলটো দিকে অর্থাৎ সামনের দিকে বেড়েছে, লেজের দিকে নয়। দানবটার মুখের ঠিক সামনে এই অদ্ভুত ছিপটার শেষ প্রান্তে একটা টোপ ঝোলানো আছে, নাশপাতির গড়নের উজ্জ্বল রঙের একটা পুরু অংশ যেটা প্রায়ই জ্বলজ্বল করে। বলাবাহুল্য, জলের নীচের কোন বাসিন্দার কৌতূহল যদি তার নিরাপত্তাবোধকে ছাপিয়ে যায় তখন সে নিজেকে দেখতে পাবে এই বিশাল গুপ্তঘাতক মহামৎসের চোয়ালের ভেতরে, টুঁ শব্দ করবার অবকাশ সে পাবে না।

আগুনে-পাখি, মানুষের কাজে

রাশিয়ান রূপকথার জার বেরেনদেই যখন আগুনে-পাখির কথা শুনলেন, তখন তাঁর বাসনা হোল এই আজব পাখির একটি চাই তার বাগানে। এই ইচ্ছা কেবল তাঁর একারই নয়। প্রাচীন কালেও মানুষ জান্তব আলোর ব্যবহার করেছে তাদের নিজেদের বাড়িতে।

ব্রাজিলের ক্রান্তীয় অরণ্যে পাওয়া যায় এক জাতের ব্যাঙের ছাতা যার টুপির নীচেটা দীপ্তমান। সেখানকার লোকেরা এই ব্যাঙের ছাতা ব্যবহার করে মশাল হিসেবে। আলোটা খুব উজ্জ্বল নয়, তবে জঙ্গলের মধ্যে ঝোপঝাড় বাঁচিয়ে পথ দেখে চলার কাজটা চলে যায়।

সমুদ্রের দীপ্তিমান ক্রে-ফিশ তো যুদ্ধের সময় জাপানী সৈন্যদল ব্যবহার

করেছিল। প্রত্যেক সৈনিকের কাছে থাকত এক বাকস এই ক্রে-ফিশ। শুকনো অবস্থায় ক্রে-ফিশ আলো ছড়ায় না, কিন্তু ভিজয়ে দিলে তখন সেটা হয়ে যায় খাসা একটি লন্ঠন। সৈনিকটি যেখানেই থাকুক, নিঃশব্দে ভেসে-আসা সাবমেরিনে অথবা গভীর ক্রান্তীয় জঙ্গলে, বা অপার স্তেপভূমিতে, আলো তার একটা দরকার হবেই, ম্যাপ পড়তে বা রিপোর্ট লিখতে। কিন্তু ইলেকট্রিক টর্চ ব্যবহার করা যাবে না, দেশলাইও জ্বালা যাবে না — দূর থেকে দেখা যাবে। এই সব বাতির ঠিক বিপরীত ক্রে-ফিশের মিটমিটে আলো কয়েক পা দূর থেকেও দেখা যাবে না। এই ধরনের আলোর বিশেষ সুবিধা, ব্যবহারকারীকে দেখা যায় না।

দীপ্তিমান প্রাণীদের ব্যবহার করা যায় আমাদের ঘরবাড়ি আলোকিত করার জন্যও। এজন্য দরকার অনাড়ম্বর, জীবাণুদেহ দিয়ে তৈরি বিশেষ লণ্ঠন। কাঁচের বাল্‌বের মধ্যে জীবাণুমেশানো সমুদ্রের জল ধরে রাখা হয় এই লন্ঠনে।

একটি জীবাণু থেকে যেটুকু আলো পাওয়া যাবে সেটাতো অতি সামান্য। একটা মোমবাতির উজ্জ্বলতার সমান আলো পেতে হলে 5×10^{14} জীবাণু লাগবে। তবে এই জীবাণুরা আকারে এত ছোট যে তাদের দিয়ে বেশ উজ্জ্বল বাতি তৈরি করা যায়। এমনি লন্ঠন তৈরি করে ব্যবহার করা হয়েছিল 1935 সালে, প্যারিসের মহাসমুদ্র চর্চা সংস্থা-র ভবনকে আলোকিত করবার কাজে, সেখানে তখন ওই সংস্থার একটা আন্তর্জাতিক অধিবেশনের অনুষ্ঠান হয়েছিল।

এই আণবিক শক্তি আর দানবাকার তড়িৎ-কেন্দ্রের যুগে মানুষ কি আবার দীপ্তিমান প্রাণীকে ব্যবহার করবে? সম্ভবত করবে। গত কয়েক বছরে সমুদ্রের গভীরে নিবিড় গবেষণা হয়েছে। সমুদ্রের তলদেশে বাড়ি তৈরি করে সেখানে মানুষ দীর্ঘকাল বসবাস করেছে, কাজ করেছে। জলের নীচে আলোকসজ্জার জন্য প্রাকৃতিক লন্ঠন অর্থাৎ সামুদ্রিক জীবাণুর প্রয়োগ করার মৎলবটাতে অনেক বিজ্ঞানী ঝুঁকেছেন এবং অনেক সাড়াও পাওয়া যাচ্ছে এই পদ্ধতির স্বপক্ষে।

আরো গভীর আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে অবশ্য রাসায়নিক শক্তিকে কৃত্রিম উপায়ে সরাসরি আলোক শক্তিতে রূপান্তর করার বিষয়টাতে। এই প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি বাতিগুলি দামের দিক দিয়ে হবে বিশেষ উপযোগী — চিরাচরিত ইলেকট্রিক বাতির সঙ্গে তুলনায়। আসল কথা হোল জৈবরশ্মির ক্ষেত্রে শক্তির

সবটাই আলোতে রূপান্তরিত হয় যায় যেখানে ইলেকট্রিক বাতির বেলায় হয় শতকরা বারোভাগ মাত্র। আর একটা সুবিধার কথাও উপেক্ষণীয় নয় যে এই সব বাতির জন্য দীর্ঘ দূরত্বের ইলেকট্রিক তারেরও প্রয়োজন হবে না। এই প্রকল্পটার রূপায়ন খুব সম্ভব ঘটবে। রসায়নের অভূতপূর্ব বিকাশ আমাদের জন্য এনে দেবে আরো কত দর্শণীয় আবিষ্কার।
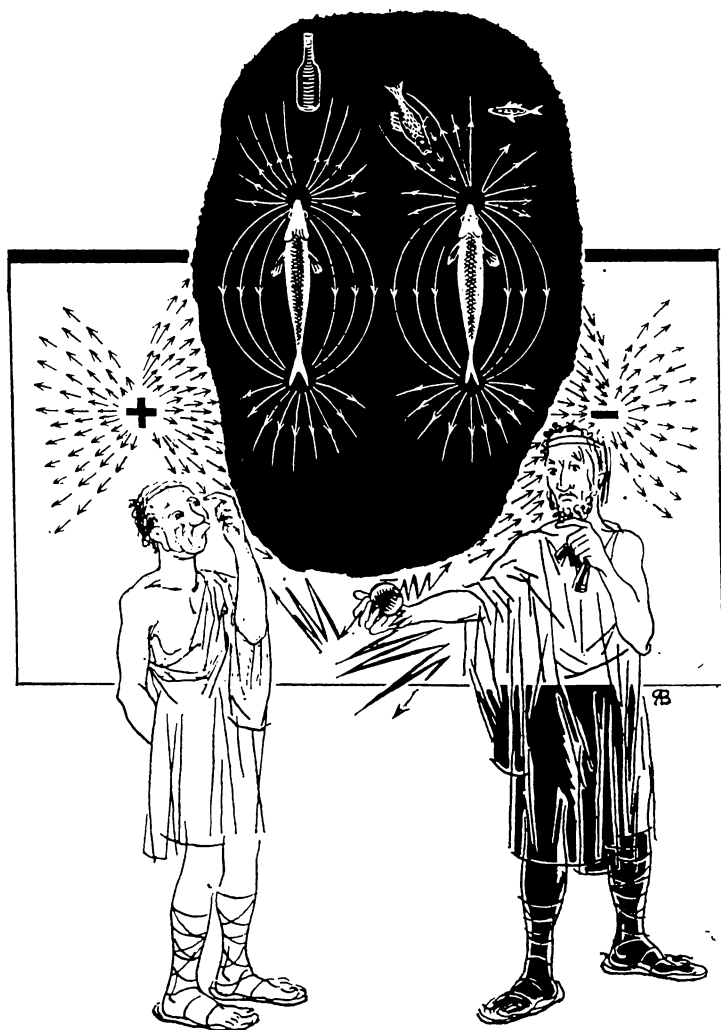
সর্বব্যাপী উচ্চশক্তির বৈদ্যুতিক তারের জাল দিয়ে ঢাকা, বিরাট বিরাট শক্তিকেন্দ্র অধ্যুষিত এই পৃথিবীতে বাস করবায় কালে একালের লোকে ভুলে যায় যে বৈদ্যুতিক শক্তি আবিষ্কৃত হয়েছিল প্রাণীদেহ থেকেই। সাড়ে চার হাজার বছর আগে ঈজিপসিয়ানরা বৈদ্যুতিক শক্তির বিষয়ে আবহিত ছিল। সোককারা-তে একটা সমাধির মধ্যে আছে তড়িৎশক্তি সম্পন্ন মাগুর মাছের একটা প্রতিভূ — এই মাগুর মাছগুলি বাস করে নীলনদের উপরিভাগে।

ইয়োরোপে তড়িৎশক্তি আবিষ্কার করেছিলেন গ্রীক দার্শনিক থেলিস (মিলেটাস বাসী) খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন একটুকরো অম্বরকে যদি ঘসা যায় তাহলে সেটা ছোট ছোট নানা বস্তুকে প্রথমে আকর্ষণ আর তারপরে বিকর্ষণ করবে।

তাঁর আবিষ্কার অবশ্য পরবর্তি কুড়ি শতাব্দীর মধ্যে কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। অবশেষে উইলিয়াম গিলবার্ট-এর মাথায় আবার নতুন করে বিভিন্ন পদার্থ ঘসে দেখে ফলটা কী হয় জানবার আগ্রহ জাগল: পদার্থগুলি ছিল কাঁচের টুকরো, লাক্ষা, গন্ধক এমনি অনেক কিছু। তাঁর পরীক্ষার ফলাফলের বিস্তারিত এবং অকপট বিবরণ তিনি লিখে যান 1600 খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত দ'ম্যাগনেট গ্রন্থে। ইলেকট্রিসিটি শব্দটা তিনিই সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন, অম্বর-এর গ্রীক প্রতিশব্দ ইলেকট্রন থেকে।

গিলবার্ট-এর গ্রন্থখানি এই প্রাকৃতিক ঘটনার বিষয়ে কিছুটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল বটে, কিন্তু তড়িৎ-বিষয়ে অনুসন্ধান এর পরেও কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় খেয়ালী বিজ্ঞানীর চর্চার বিষয় হয়ে রইল — মানবজাতির জীবনধারাকে প্রভাবিত করার ব্যাপারে তড়িতের কোন সম্ভাব্য ভূমিকার কথা কেউ তখনো ভাবেনি।

হয়ত আরো অনেকদিন কেটে যেত তড়িৎশক্তির বিষয়ে বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধান ত্বরান্বিত হবার আগে, যদি না বোলগনার শারীরতত্ত্বের অধ্যাপক গ্যালভানি-র স্ত্রী গোমাংস আর ইটালিয়ানদের অতিপ্রিয় ব্যাঙের ঠ্যাং আনতে মাংসের দোকানে যেতেন।

এই কাহিনীতে বলা হয়েছে যে তামার আংটাতে ঝোলনো সারি সারি ব্যাঙের ঠ্যাং সিনোরা গ্যালভানির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ভয়ে, বিস্ময়ে তিনি লক্ষ করলেন যে এই দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা ঠ্যাংগুলি যখনই লোহা স্পর্শ করছে তখনি কেঁপে উঠছে, যেন তারা জ্যান্ত হয়ে উঠছে। লোকে বলে এই অত্যাশ্চর্য ঘটনার কথা তিনি তাঁর স্বামীকে বার বার শোনাতেন, বলতেন মাংস বিক্রেতার ভূত প্রেতের সঙ্গে দোস্তি আছে। একই কাহিনী বার বার শুনে অধ্যাপক শেষ পর্যন্ত ঠিক করলেন মাংসের দোকানটা একবার ঘুরে দেখে আসবেন।

লুইজি গ্যালভানি জানতেন বছর তিরিশ আগে একটা পরীক্ষায় মৃত মানবদেহের পেশী কুঁচকে গিয়েছিল তড়িৎ কতৃক আহিত লেডেন জার-এর স্পর্শে। তাই স্বভাবতই মাংসের দোকানে ব্যাঙের পা কোঁচকানোটা নিসর্গের তড়িৎ-আধানের প্রভাবে ঘটছে বলে ধরে নিয়েছিলেন। তাই স্ত্রীকে শান্ত করবার জন্য এই বিজ্ঞানী মনস্থ করলেন ব্যাংদিয়ে নিজের বাড়িতেই পরীক্ষা চালাবেন। এক মেঘলা রাত্রে পরীক্ষাটা তো দারুণভাবে সফল হোল। বারান্দার রেলিঙে তামার আংটা থেকে ঝুলিয়ে রাখা ব্যাঙের ঠ্যাং তো বার বার নেচে উঠতে লাগল, যেন তারা জ্যান্ত।

ঝড়বৃষ্টি অবশ্য এই পেশী সংকোচনের জন্য আদৌ দায়ী ছিল না, ঠিক যেমন দায়ী ছিল না প্রেতযোনি। খুব সম্ভব বাতাসে যখন ব্যাঙের শরীরটা দুলছিল তখন মাঝে মাঝে বারান্দার রেলিঙে সেটা ঠেকছিল, তামা ও লোহার মধ্যে একটা তড়িৎবাহী পথের সৃষ্টি হচ্ছিল। বিষম দুটি ধাতুর মধ্যে তড়িৎপ্রবাহের সৃষ্টি হচ্ছিল — যেমনটা হবারই কথা — ঘটাচ্ছিল পেশীর সংকোচন। এই ব্যাপারটা যিনি সর্বপ্রথম বুঝতে পেরেছিলেন তিনি ভৌতবিজ্ঞান ও শারীরবিদ্যায় পণ্ডিত ইটালিয়ান বিজ্ঞানী আলেসান্দ্রো ভল্টা। তাই বলে গ্যালভানির আবিষ্কারের কৃতিত্বটা অবশ্য ছোট হয়ে যাচ্ছে না।

গ্যালভানি তড়িত নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষায় এমনই বিমোহিত হয়েছিলেন যে তিনি তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই বিষয়টি নিয়ে মগ্ন ছিলেন। তাঁর প্রথম দিকের পর্যবেক্ষণগুলির বিবরণ তিনি প্রকাশ করেন 1791 খৃষ্টাব্দে। এই প্রকাশনার ফলে এবং সম্ভবত সিনোরা গ্যালভানির মিশুকে স্বভাবের জন্যও, শীঘ্রই চাঞ্চল্যকর গুজব ছড়ালো যে তড়িৎ ব্যবহার করে মৃত প্রাণীর দেহে আবার প্রাণসঞ্চার করা গেছে, কাজে কাজেই মানুষের

মনে দুঃসাহসী কল্পনা সঞ্জাত হওয়ার ব্যাপারে যোগাল ইন্ধন।

পরবর্তী অনুসন্ধানগুলি থেকে গ্যালভানি শেষ পর্যন্ত দৃঢ়মনা হলেন যে প্রাণ ও তড়িতের মধ্যে রয়েছে গভীর আন্তঃসম্পর্ক এবং প্রাণী সকল প্রাণকার্যের জন্য নির্ভর করে কোন একটা তড়িৎশক্তির ওপর। এই দৃঢ় বিশ্বাসের ফলে তিনি ভলটার মত মানতে পারেননি। গ্যালভানি মৃত ব্যাংকে স্পর্শ করালেন লোহা আর তামার দ্রব্য দিয়ে, দেখলেন যে সত্যিই বাতাস থেকে তড়িৎ আসছে না। কিন্তু সত্যিই কি সেটা উৎপন্ন হচ্ছে লোহা আর তামার মধ্যে, যেমন বলছেন ভলটা, অথবা ব্যাঙের দেহ থেকেই? গ্যালভানি বিশ্বাস করতে পারেননি যে জীবনের সঙ্গে এমন অকৃত্রিম যোগযুক্ত ঘটনার উদ্ভব জড় বস্তু থেকে হতে পারে।

তখনো পর্যন্ত বিজ্ঞানের কাছে পরিচিত ছিল তড়িতের মাত্র দুটি উৎস—ঘর্ষণের দ্বারা উৎপন্ন তড়িৎ আর তড়িৎ-মাছ — টরপেডো সংকর মাছ বা স্কেট। কিন্তু ঘর্ষণের দ্বারা তো ধাতুতে তড়িতের প্রকাশ দেখা যায় না, তাই সন্দেহের শেষ দানাটিও মুছে গেল গ্যালভানির মন থেকে। এর পরে তিনি আবার পরীক্ষা করে দেখাতে সক্ষম হলেন প্রাণীদেহ থেকে তড়িতের উৎপাদন।

পরীক্ষাটা করে দেখানো খুব সহজ। ব্যাঙের একটা স্নায়ু কেটে নিয়ে ধনুকের মতো বাঁকানো হোল। ব্যাঙের একটা পা কেটে তার একদিকে রইল কিছুটা উন্মুক্ত করা আর একটা স্নায়ুর এক প্রান্ত। এখন এই ধনুকের মতো বাঁকানো স্নায়ুটির এক প্রান্ত ঠেকানো হোল কেটে ফেলা পেশীর মুক্ত করা স্নায়ু প্রান্তে, অন্য প্রান্তটি স্পর্শ করানো হোল পেশীর মধ্যস্থিত স্নায়ুটির অপর প্রান্তে। স্নায়ু দুটির দু'প্রান্ত যেই ঠেকানো হোল অমনি পেশীটা কুঁচকে গেল। প্রমাণ হয়ে গেল জৈব তড়িতের অস্তিত্ব।

পরীক্ষাগুলি বার বার করে দেখানো হোল ডজন ডজন পরীক্ষাগারে। জীববিজ্ঞানী, ভৌতবিজ্ঞানী, গণিতজ্ঞ, শারীরতত্ত্ববেত্তা, সবাই ব্যাং নিয়ে মেতে উঠলেন। আগে ব্যাং ছিল জীববিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পরীক্ষার জন্য বহুল ব্যবহৃত প্রাণী, এখন ক্রমশ সেটা হয়ে উঠল ভৌতবিজ্ঞানীর হাতে তড়িৎ-শক্তির একটা সুবিধাজনক উৎস, আর অত্যন্ত সুবেদী পরিমাপের যন্ত্র।

আশ্চর্য কি, যে এই সর্বব্যাপী যন্ত্র হাতে নিয়ে আর প্রত্যহ জৈব তড়িৎ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে ভৌতবিজ্ঞানীরা এটাই আসল তড়িৎ বলে

বিশ্বাস করলেন আর বিষম ধাতুর সংস্পর্শে উৎপন্ন তড়িৎকে দুর্জ্ঞেয় একটা ব্যাপার বলে মেনে নিলেন। তাই ভল্‌টা যখন তাঁর গ্যালভানিক ব্যাটারি তৈরি করলেন তখন তিনি এর নাম দিলেন, কৃত্রিম তড়িৎ-যন্ত্র, এই নামকরণ যে দৈবাৎ করা হোল তা কিন্তু নয়।

আবার, প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োজনেও যে তড়িৎসম্পর্কিত জ্ঞানের আরো বিকাশ ঘটল তাও নয়। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। সেই কতকাল আগে 1838 সালে রাশিয়ান আকাদেমীর সদস্য বিজ্ঞানী ব. এস. জেকবি নেভা নদীতে এক অশ্ব-শক্তির বৈদ্যুতিক মোটরে চালিত একটা নৌকা চালিয়ে সেনট্‌ পিটরেসবার্গ-এর পথচারিদের চমকে দিয়েছিলেন। মনে রেখো প্রথম বাষ্পীয় ইনজিনের ক্ষমতাও এক অশ্ব-শক্তির চেয়ে বেশি ছিল না। আরো অন্তত কুড়ি বছর কেটে যায় শিল্পে বৈদ্যুতিক মোটরের ব্যবহার চালু হতে।

সেই সময় থেকেই তড়িৎ-ইনজিনিয়ারিং-এর ক্রমবিকাশ শারীর-তড়িতের ছোট ছোট পারঙ্গমতাকে পিছনে ঠেলে দিল। তথাপি, জ্ঞানের এই শাখাটির অল্পবিস্তর প্রসার কখনোই একেবারে থেমে যায়নি। প্রায় একশ বছর আগে দেখানো হয় যে তড়িৎ-ব্যাপার যে কেবল প্রান্তিক স্নায়ুর পরিবাহিতাতেই লক্ষণীয় তা নয়, মস্তিষ্ক থেকেও এই তড়িৎ উৎপন্ন হয়। সে সময়ে এত দুর্বল তাড়িৎক্রিয়ার চর্চার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাদি ছিল না—তবুও বিজ্ঞানীরা দমে যাননি। বিশিষ্ট রাশিয়ান শারীরতত্ত্ববিদ নিকোলাই ভেদেনস্কি একটা টেলিফোন যন্ত্র ব্যবহার করতেন স্নায়ুর মধ্য দিয়ে সঞ্চালিত বার্তা শোনবার জন্য। অনুসন্ধানের জন্য উপযোগী পর্যাপ্ত যন্ত্রাদি নির্মিত হতে হতে 1930 সাল এসে গেল। তখন থেকে শারীর-তড়িৎ-বিজ্ঞানের গবেষণা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।

তড়িৎপরিবাহী তার আর স্নায়ু

পৃথিবীতে বসবাসের জন্য কোটি কোটি জাতের প্রাণীর সৃষ্টিকার্যটা উদ্ভাবক ও স্থপতি হিসেবে প্রকৃতি বেশ উত্তমরূপেই করতে সক্ষম হয়েছেন, পুনঃ পুনঃ মেরামত আর উন্নতিও করে চলেছেন। এই প্রক্রিয়াতে অনেকগুলি চমৎকার আবিষ্কারও ঘটে গেছে। এতগুলি, যে বিজ্ঞানীরা নিয়ন্ত্রণ, অবস্থান বা স্থানিক সন্নিবেশের ব্যাপারে যতকিছুই না উদ্ভাবন করে থাকুন, দেখা যাবে স্মরণাতীত কাল থেকে প্রকৃতি তার ব্যবহার আগে ভাগেই করেছেন।

সম্ভবত একটি মাত্র আবিষ্কার প্রকৃতি করতে পারেন নি — চাকা আবিষ্কার — যার জন্য মানুষ পুরো কৃতিত্ব দাবী করতে পারে।

তাই, সন্দেহ কি যে পরম্পরাগতভাবেই মানুষের প্রতিভা থেকে সৃষ্ট সরল, সহজবোধ্য যন্ত্রাদিগুলিকে তুলনা করা হয়ে থাকে প্রকৃতির বুদ্ধিমত্তা থেকে উদ্ভূত সৃষ্টি কর্মগুলির সঙ্গে। এইভাবে তুলনা করে বৈজ্ঞানিকেরা অনেক জটিল কার্যধারা উপলব্ধি করতে পারেন, ঠিক যেমন নিজের ভাষায় কথা বলা আমাদের পক্ষে সহজতর হয়।

তাই, এমনকি গত শতাব্দীতে যখন মস্তিষ্ক নিয়ে গবেষণা এগিয়ে চলেছিল, মুখ্যত মস্তিষ্কের গঠনের ওপর, সে সময় একটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা গেল কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র আর বড় শহরের টেলিফোন একসচেঞ্জের মধ্যে। সত্যিই, সাদৃশ্যটা অস্বীকার করা যায় না। এই টেলিফোন একসচেঞ্জটা, মানে মস্তিষ্ক বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, মানে দেহের সকল যন্ত্রাদি থেকে, নিয়তই পাচ্ছে অসংখ্য বার্তা যারা প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে স্নায়ুর মধ্যে দিয়ে — ঠিক যেন তারের মধ্য দিয়ে বহে যাচ্ছে তড়িৎপ্রবাহ। মস্তিষ্কে পেঁৗছে দরকারী খবরগুলি বেছে নেওয়া হচ্ছে, সাজানো হচ্ছে, আর তার পরে তাদের কঠোর নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে বিশেষ বিশেষ বিভাগে পাঠানো হচ্ছে, যেখানে সেগুলি যাচাই করা হচ্ছে, খবরগুলি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। এইভাবে দ্রুত পারস্পরিক আলোচনার ফলে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে, নিমেষের মধ্যে স্নায়ুর রাস্তা ধরে প্রান্তে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে নির্দেশ — পেশীতে, গ্রন্থিতে, আরো অন্যান্য দেহযন্ত্র।

সাদৃশ্যটা সত্যিই চমক জাগানো কেননা টেলিফোনের তারের মধ্য দিয়েই বা কি আর স্নায়ুর মধ্য দিয়েই বা কি, প্রবাহিত হয়ে চলেছে কিন্তু একই তড়িৎ। প্রথম যিনি এটা প্রমাণ করেছিলেন তিনি গ্যালভানি, এবং তাঁর কাল থেকে আজ পর্যন্ত হাজার হাজার পরীক্ষা প্রমাণ করেছে যে, যে কোন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উজ্জীবন তড়িৎ-তরঙ্গে গ্রথিত হয়ে মস্তিষ্কে পেঁৗছায়। মস্তিষ্কের মধ্যেও যতগুলি বার্তা সংবাহিত হয়ে চলেছে তার বিভিন্ন অংশের মধ্যে তারা প্রেরিত হচ্ছে তড়িৎ-তরঙ্গ রূপেই।

কোন প্রযুক্তিবিদ যদি এই প্রাকৃতিক টেলিফোন একসচেঞ্জের কার্যধারাটা খুঁটিয়ে দেখে তাহলে সে প্রথমেই আশ্চর্য হবে যে এই তড়িৎ-তরঙ্গ বেশ মন্থর গতিতে পাঠানো হয়ে থাকে। স্তন্যপায়ীদের স্নায়ুতন্ত্রে এই গতিবেগের মান হোল প্রতি সেকেণ্ডে 0.5 মিটার থেকে 100 মিটার।

মনে রাখতে হবে তড়িৎপ্রবাহ আসলে নিয়ন্ত্রিত গতিতে ইলেকট্রনেরই স্রোত। যদিও ইলেকট্রন চলে প্রতি সেকেন্ডে এক মিলিমিটার বেগে, যে তড়িৎ-চৌম্বকক্ষেত্র এই গতির সৃষ্টি করে সেটা ছড়িয়ে পড়ে প্রায় আলোকের গতির সমান বেগে। তড়িৎকে মস্কো থেকে ভ্লাডিভসটক-এ প্রবাহিত করলে দশহাজার কিলোমিটার দূরে তড়িৎবাহী তারের অপর প্রান্তস্থ ইলেকট্রনের সচল হতে সময় লাগবে এক সেকেন্ডের ত্রিশভাগের এক ভাগ।

আমাদের প্রযুক্তিবিদ আরো বিস্ময়ে হতবাক হবে যদি স্নায়ুশৈলীর এক একটি স্নায়ুতন্তুর রোধ সে মেপে দেখে। এই রোধ অত্যন্ত বেশি। এক মিটার দৈর্ঘ্যের স্নায়তন্তুর রোধ 1600 কোটি কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের তামার তারের রোধের সমান। খানিকটা চিন্তা করার পরে আমাদের প্রযুক্তিবিদ সিদ্ধান্ত নেবে যে এই ধরনের টেলিফোন একসচেঞ্জ দিয়ে বার্তাবিনিময় কেবল তাহলেই সম্ভব হবে যদি জায়গায় জায়গায় তড়িৎশক্তির অবর কেন্দ্র (substation) রাখা হয়।

আসল ব্যাপারটা কিন্তু এই সিদ্ধান্ত থেকে বিশেষ আলাদা নয়। সঞ্জীবনকে ছড়িয়ে যা দেয় সেটা কিন্তু ধারক-যন্ত্রের নিজের শক্তি নয় — বা স্নায়ুকেন্দ্রের শক্তিও নয়, আসলে সেই শক্তি উৎপন্ন হয় স্নায়ুর মধ্যেই।

যে তন্তুগুলি দিয়ে স্নায়ুগুলি গড়ে উঠেছে তারা হোল নার্ভকোষ থেকে শাখায়িত কতকগুলি শুঁড়। দৈর্ঘ্যের তুলনায় তাদের প্রস্থ নগণ্য — 0.1 থেকে 10 মাইক্রন পর্যন্ত।

স্তন্যপায়ীদের স্নায়ুতন্ত্র দুই প্রকারের স্নায়ুতন্তু দিয়ে গঠিত। পাতলা, নগ্ন তন্তু, যার আচ্ছাদনের পর্দাটা এতই পাতলা যে সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখা যায় না, আর আছে তথাকথিত মেডুলেটেড তন্তু যেগুলি পুরু মাইওলিন-এর আবরণ দিয়ে ঢাকা। এই খোসা বা আবরণটির উদ্দেশ্য হোল স্নায়ুশৈলীর মধ্যে ঘন সন্নিবিষ্ট এক গোছা স্নায়ুতন্তুকে স্বতন্ত্র রেখে অপরিবাহী ব্যবধান বজায় রাখা, একটি তন্তুর উজ্জীবন আরেকটায় সংবাহিত না হবার জন্য, অন্যথায় অকল্পনীয় বিশৃঙ্খলা অবধারিত ছিল।

একটা ব্যাপার বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেননি, এই বাইরের আবরণটা তড়িৎপরিবাহী তারের আচ্ছাদনের মতো একটানা নয় কেন, কেনই বা এতগুলি ছোট ছোট টুকরো দিয়ে তৈরি, মাঝে মাঝে এক এক মিলিমিটার

অন্তর ছোট ছোট আংটা দিয়ে আটকানো যার ফলে উদ্ভূত হয়েছে রানভিয়ে-র পর্বসমষ্টি (Ranvier's nooles), যার ভেতরে স্নায়ুটা নগ্ন থাকে।

স্নায়ুর পাতলা পর্দার ভেতর দিয়ে কিছু কিছু পদার্থ প্রবেশ করতে পারে কতকগুলি পারে না। পটাসিয়াম আর হাইড্রোজেনের ধনাত্মক আয়ন (Cations)-এর মধ্যে দিয়ে অনায়াসে যাতায়াত করতে পারে কিন্তু আরো বড় বড় ধনাত্মক আয়নের যেমন সোডিয়ামের আর ঋণাত্মক আয়নের (anions) সম্মুখে এই পর্দা দুর্ভেদ্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়। মনে রাখবে যে ধনাত্মক আয়নের আছে ধনাত্মক (positive) আধান আর ঋণাত্মক আয়নের আছে ঋণাত্মক (negative) আধান।

সাধারণত, পর্দার দুপাশের আয়নের ঘনত্ব সমান নয়। তন্তুর মধ্যে, সোডিয়াম আর ক্লোরিন আয়নের পরিমাণ কলার মধ্যস্থিত তরলরসের মধ্যেকার অনুরূপ আয়নের দশভাগের একভাগ, এদিকে তন্তুর মধ্যস্থিত পটাসিয়াম আয়নের পরিমাণ বহিস্থ পটাসিয়াম আয়নের থেকে অন্তত বিশগুণ বেশি। তাই পটাসিয়ামের ধনাত্মক আয়নগুলি স্নায়ুতন্তুর বাইরে ছুটে যায় এবং সেখানে অর্থাৎ পর্দাটার বাইরের তলে আস্তানা নেয়। ঋণাত্মক আয়নেরা পটাসিয়ামকে অনুসরণ করে বেরিয়ে যেতে পারে না, তাই স্নায়ুতন্তুর ভেতরের তলটার আধান ঋনাত্মক হয়ে থাকে। এই কারণে বিশ্রামকালে পর্দার ভেতরের তলটা সর্বদা ঋণাত্মকভাবে আহিত থাকে বাইরেটাতে থাকে ধনাত্মক আধান। এই দুটি আধানের অন্তর বা বিভবপ্রভেদ 50 থেকে 70 মিলিভোল্টের মধ্যে থাকে।

এই বিভবপ্রভেদ ততক্ষণ বজায় থাকে যতক্ষণ না কোন উদ্দীপক, স্নায়ুকোষ, স্নায়ুপ্রান্তর কোন অংশে সঞ্জীবনের সৃষ্টি করে। সঞ্জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই পর্দার বেধ্যতায় পরিবর্তন ঘটে সেই অংশে। পর্দাট সোডিয়ামের আয়নের কাছে বেধ্য হয়ে যায়, তাই তারা ছুটে বাইরে চলে আসে, ফলে পর্দাটা নতুনভাবে আহিত হয়ে যায়। বাইরেটা হয়ে যায় ঋণাত্মক ভেতরটা ধনাত্মক। এর ফলে স্নায়ুতন্তুর দুটি সন্নিহিত অঞ্চলের প্রোটোপ্লাজম, যাদের মধ্যে কোন বেড়া বা আগড় নেই ভিন্ন ধরনে আহিত হয়ে থাকে।

এই অবস্থাতো বেশিক্ষণ থাকতে পারে না, এই দুটি অঞ্চলের মধ্যে তড়িৎপ্রবাহ বহে যেতে বাধ্য, ফলে একটি স্পন্দনের উদ্ভব হয়। তড়িৎপ্রবাহের ফলে স্নায়ুতন্তুর পরবর্তী অংশটি আবার সঞ্জীবিত হবে, সেখানেও পর্দাটা সোডিয়াম আয়নের কাছে বেধ্য হয়ে যাবে, আবার সেটা ধনাত্মকভাবে আহিত
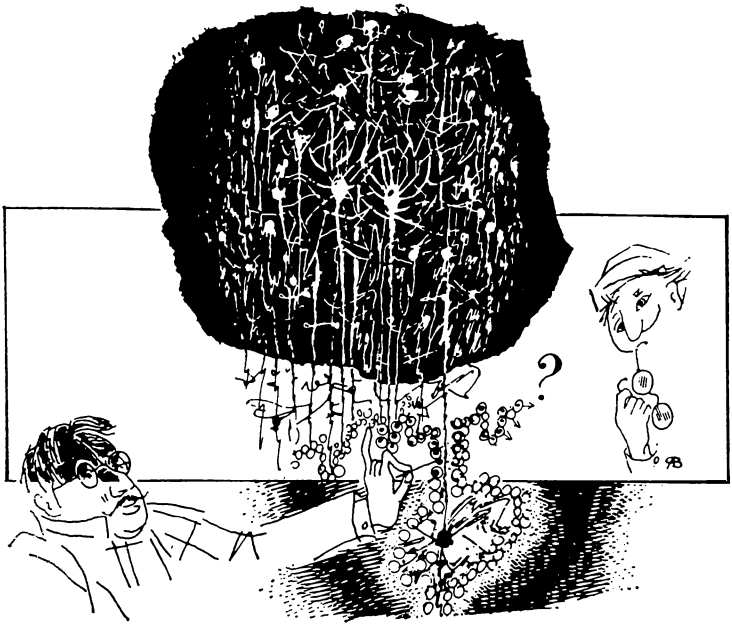
হয়ে যাবে। একই ঘটনা ঘটবে নতুনভাবে সঞ্জীবিত স্নায়ুতন্তুর অংশটি আর তার পাশেরটার মধ্যে এবং প্রক্রিয়াটা পুনঃপুনঃ ঘটতে থাকবে। স্নায়ুর স্পন্দন এগিয়ে চলবে স্নায়ুর তন্তু ধরে একই প্রক্রিয়ার অসংখ্য পুণরনুষ্ঠানের সাথে সাথে।

এই তো গেল পাতলা পর্দার স্নায়ুতন্তুর মধ্য দিয়ে উদ্দীপনার সঞ্চার কী ভাবে হয় তার বিবরণ। এই ধরনের ছোট ছোট বেষ্টনীর মধ্য দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ চলতে পারে না অপরিবাহী মাইওলিন আচ্ছাদিত তন্তুর অংশগুলি দিয়ে। মেডুলেটেড স্নায়ুর ক্ষেত্রে পুরো প্রক্রিয়াটা ঘটতে থাকে রানভিয়ে-র পর্বগুলিতে — তারা বোধ হয় আছেই এই কাজের জন্যই। মেডুলেটেড তন্তুতে উদ্দীপনা ছড়িয়ে যায় একটা রানভিয়ে-র পর্ব থেকে পাশেরটায়, তাই এর বেগও পাতলা তন্তুর মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত তড়িৎপ্রবাহের বেগের থেকে অনেক বেশি।

ধাতব পরিবাহকের মধ্য দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ তাহলে ইলেকট্রনের নিয়মিত সঞ্চালন যেটা প্রায় তাৎক্ষণিক এবং পরিবাহকটার সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য বরাবর

ঘটে থাকে। পক্ষান্তরে, স্নায়ুর একটি স্পন্দন হচ্ছে স্নায়ুতন্তু বরাবর উত্তেজনার গতি যা তড়িৎপ্রবাহ সৃষ্টি করে, সেই সঙ্গে উত্তেজনাটা স্নায়ুর পরবর্তী অংশে সঞ্চারিত হয়ে যায়।

এই উপায়ে উত্তেজনার যে এগিয়ে যাওয়া, এটা স্নায়ু-স্পন্দনের দুটি বৈশিষ্ট্যকে ব্যাখ্যা করে। প্রথমত, স্নায়বিক স্পন্দন স্নায়তন্তুর রাস্তা ধরে এগিয়ে যাওয়ার কালে কখনোই নিবে যায় না, পরন্তু শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এর তীব্রতা অক্ষুন্ন থাকে। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেকটি স্পন্দন একটার পর একটা যে কোন স্নায়তন্তু দিয়েই এগিয়ে যাক না কেন পরস্পরে সম্পূর্ণভাবে অভিন্ন। এরা স্নায়ু-স্পন্দনের তীব্রতা বা অন্য কোন বৈশিষ্ট্যকে সূচিত করে না, এদের প্রকৃতি নির্ণীত হয় সেই স্নায়ুতন্তুর প্রকৃতি দিয়ে, যার মধ্য দিয়ে স্পন্দনটা বহে চলেছে।

এই ব্যাপারটা একবার দেখানো হয়েছিল ভারি চমৎকার একটা পরীক্ষার দ্বারা। জেলি-ফিশ-এর ছত্রাকার শরীরের বাইরের দিকে আছে বৃত্তাকারে একটি স্নায়ু। স্নায়ুর আকৃতি থেকে এর গঠন ভিন্ন ধরনের হলেও সে কথা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক। স্নায়ুর একটি স্পন্দন বৃত্তের উভয় দিকেই ব্যাপ্ত হতে থাকে যেমন ঘটে থাকে সাধারণ স্নায়ুতে। এই বৃত্তের এক অংশকে যদি উত্তেজিত করা হয় তাহলে দুটি স্পন্দন দুপ্রান্ত দিয়ে যেতে যেতে ছাতার অপর দিকে মিলে পরস্পরকে নিবিয়ে দেয়।

বিজ্ঞানীরা এই বৃত্তের এক অংশকে উত্তেজিত করে সংলগ্ন অঞ্চলকে অবরোধের আড়ালে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। তার মানে উত্তেজন্যটা একই দিকে ছড়িয়ে যেতে সক্ষম হোল। এই স্পন্দনটা যখন পুরো বৃত্তটা ঘুরে এলো তখন অবরোধটা সরিয়ে নেওয়া হোল, তাই স্পন্দনটা পাক খেতে থাকল, একবার, দুবার, অনেক বার। পরীক্ষাটা চব্বিশ ঘণ্টা ধরে চালিয়ে দেখা গেছে যে স্পন্দনটা বহেই চলেছে, দ্রুতি বা তীব্রতা কিছুই না হারিয়ে। পরীক্ষাটা চালিয়ে যাওয়া যেত প্রাণীটার মৃত্যু পর্যন্ত বা যতক্ষণ না সেটা ক্লান্তিতে নিতান্তই অবসন্ন হয়ে পড়ছে।

তড়িতের প্রাথমিক আবিষ্কারের সময় থেকে আড়াই হাজার বছর কেটে যাওয়ার পরে ইয়োরোপীয়েরা তড়িৎকে প্রযুক্তির কাছে লাগাতে পেরেছিল। ডাক্তারেরা কিন্তু চিকিৎসার ক্ষেত্রে তড়িৎ ব্যবহার করেছেন তড়িতের বিষয়ে ভাল করে কিছু জানবার আগে থেকেই। রোমক সাম্রাজ্যের বড় বড় চিকিৎসকেরা, যেমন ক্লডিয়াস গ্যালেণ তাদের রোগীদের চিকিৎসা করতেন জ্যান্ত বিদ্যুৎ-কেন্দ্র অর্থাৎ গভীর জলের মাছের সাহায্যে।

বড় বড় স্কেট বা টর্পেডো সংকর মাছ পাওয়া যায় ভূমধ্যসাগরে আর অন্যান্য সমুদ্রেও। এদের অদ্ভুত শিকারের অভ্যাসের বিষয়ে রোমান-রা অবহিত ছিল। তারা জানত যে স্কেট কখনো শিকারকে তাড়া করে না বা লুকানো জায়গা থেকে শিকারের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে না। ধীরে ধীরে শান্তভাবে জলের নীচে এরা সাঁতার কেটে বেড়ায়। কিন্তু যখনই ছোট একটা মাছ বা কাঁকড়া বা অকটোপাস কাছে আসে তাদের যেন কী একটা মর্মান্তিক ব্যাপার ঘটে যায়। অসাবধান প্রাণীগুলি প্রচন্ডভাবে ঝাঁকুনি খেয়ে মরে যায়। স্কেট শান্তভাবে শিকারকে মুখে তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে চলে যায়।

রোমান-রা বিশ্বাস করত যে শিকারকে দেখতে পেলে এই বিদঘুটে মাছ জলে কোন বিষাক্ত রস নিঃসরণ করে থাকে। বিষটা মানুষের শরীরের ওপরও ক্রিয়াশীল, তবে মানুষের মৃত্যু ঘটাতে পারে না। এই মাছকে স্পর্শ করলে মনে হবে হাতে যেন সাংঘাতিক একটা ধাক্কা লাগল, হাতটা ঝাঁকি দিয়ে পিছিয়ে নিতে হয়। রোমান চিকিৎসকেরা বিশ্বাস করতেন যে স্কেটের বিষের আছে প্রচুর রোগ নিরাময় ক্ষমতা, তাই স্কেট মাছদের ধরে সমুদ্রজল-ভরা পুকুরে রাখা হোত চিকিৎসার কাজে ব্যবহারের জন্য।

এমন ধরনের মত হাজার দুই বছর আগে বেশ প্রচলিত ছিল। স্কেটের রহস্যের উদ্ধার হয়েছে অতি সম্প্রতিকালে। এই বিপজ্জনক মাছটা দেখা গেছে জ্যান্ত বিদ্যুৎ-কেন্দ্র বিশেষ, ছোট ছোট জন্তু কাছে এলে তড়িৎমোক্ষণের সাহায্যে তাদের মেরে ফেলতে পারে। ক্রমে ক্রমে আরো অনেকগুলি তড়িৎ-মাছের খবর পাওয়া গেছে, যাদের কেউ স্কেটদের থেকে অনেক বেশি বিপজ্জনক।

ইলেকট্রিক ঈল বা কুঁচে মাছ নিশাচর। কেবল রাত্রি হলেই এরা শিকার

খুঁজতে বেরোয়। এদের শরীর থেকে যে বৈদ্যুতিক শক্ পাওয়া যায় তার শক্তি এত বেশি যে বড় বড় প্রাণীও অজ্ঞান হয়ে যাবে। ছোট প্রাণীরা তো প্রাণ হারাবে অচিরেই। দক্ষিণ আমেরিকার ইনডিয়ান-এরা এই বিপজ্জনক মাছকে খুব ভালভাবেই চেনে, তাই যেখানে এই মাছ থাকে সেই সব নদী হেঁটে পার হবার ঝুঁকি তারা কখনোই নেবে না।

ইয়োরোপীয়-রা অবশ্য এই সব বড় বড় বিদ্যুৎ-কেন্দ্রের খবর পেয়েছে কয়েক শতাব্দী পরে। আমেরিকা আবিষ্কারের অনতিপরেই ঝাঁকে ঝাঁকে নিষ্ঠুর, কঠোর প্রকৃতির অভিযাত্রীর দল সেখানে ছুটে যায় সোনার সন্ধানে। মাছেদের তড়িৎমোক্ষণের কোপটা পড়েছিল তাদেরই ঘাড়ে।

আমেরিকার প্রথম স্প্যানিশ বিজেতারা এই ধনরত্নভরা রূপকথার দেশের গল্পটা ছড়িয়েছিল। এল্ ডোরাডো, দক্ষিণ মহাদেশের জঙ্গলের গভীরে লুকানো দেশ যার রাস্তাগুলি সোনায় মোড়া ।এই পৌরাণিক দেশের খোঁজে দলে দলে লোকে বেরিয়ে পড়েছিল। এমনি একটা দল, তাদের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমেই হোক আমাজন নদীর দূরপ্রান্ত পর্যন্ত ভেদ করে যেতে পেরেছিল। এই দলের নেতৃত্ব করছিলেন ডে'সিকা। স্পেনীয়-রা তো নদীর উজান ঠেলে মাস কয়েক পালতোলা নৌকা চালিয়ে গিয়ে পৌঁছাল তার উৎসের কাছাকাছি। মস্ত চওড়া একটা নদী, আমাজেনেরই একটা উপনদী, সেখানে তো সেটা একটা অগভীর ঝরণামাত্র। এই ধারাটা ধরে নৌকা বেয়ে আর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, তাই দলটা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পায়ে হেঁটে চলল।

দুর্ভেদ্য ঝোপঝাড়, দুরধিগম্য কাদা পথ আটকায়। প্রতি পদে বিপদ মুখিয়ে আছে। প্রকাণ্ড কুমির, বিষাক্ত সব সাপ আর বোয়া (Boa) বা ময়াল, আর আছে হিংস্র ইনডিয়ানদের দল। শ্বেতাঙ্গ বিজেতারা এই সব অস্বস্তিকর, ভয়-জাগানো উপদ্রবের সম্বন্ধে অবহিত ছিল, তার ওপর ছিল ঝাঁকে ঝাঁকে ডাঁশ আর মশা, দলের কতজন লোক আক্রান্ত হোল ম্যালেরিয়ায় ক্রান্তীয় দেশজ জ্বরে, আরো নানান অসুখে। দলটাকে এক পা এগিয়ে যেতেও জঙ্গলের ঘন সবুজ দেয়াল আক্ষরিক অর্থে কেটে পথ করে নিতে হচ্ছিল।

একদিন দলটা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে পড়ল বিস্তৃত এক জলাভূমির সামনে। তখন শুখার সময়, জলাটা প্রায় শুকিয়ে এসেছে। কেবল বহুদূরে জলাভূমির মাঝামাঝি কয়েকটা খানখন্দে তখনো জল ছিল, মধ্যদিনের রোদে
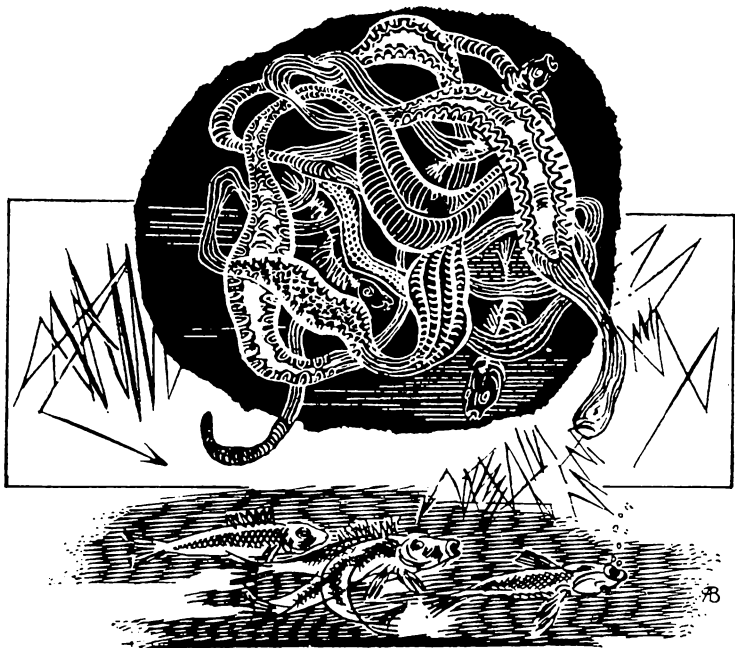
তারা ঝলমল করছিল। ইয়োরোপীয়েরা তো স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল, ভাবল আগামী কয়েকটা ঘণ্টা যাত্রাটা হবে নির্ঝঞ্ঝাট।

তো ঝঞ্ঝাট সত্যি বলতে কিছু ছিল না যতক্ষণ না দলটা পৌঁছাল জলার মধ্যিখানের জলভর্তি এই খানাগুলির কাছে। ইনডিয়ান কুলিদের তো ভয়ের চোটে চোখ ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, তারা সাফ বলে দিল জলের ওপর দিয়ে হেঁটে তারা যাবে না। শ্বেতাঙ্গরা বুঝতে পারল না এত ভয়টা কিসের। খানার জল এতই অগভীর যে কুমির বা আনাকোণ্ডা সাপ গা ঢাকা দিয়ে সেখানে লুকিয়ে থাকতে পারবে না, দক্ষিণ আমেরিকার নদীর ত্রাসের কারণ রাক্ষুসে মাছ পিরানহা-এরাও সেখানে বাস করে বলে জানা নেই।

শ্বেতাঙ্গদের একজন তো সন্ত্রস্ত কুলিদের অভয় দিতে জলে নেমে এগিয়ে গেল। কয়েক পা মাত্র যেতে না যেতেই সে ভয়ার্ত আর্তনাদ করেই চিৎপাত, যেন প্রচণ্ডজোরে কেউ তাকে ঘুসি মেরে ফেলে দিয়েছে। তার দুই সঙ্গী দৌড়ে গেছে তাকে সাহায্য করতে, সঙ্গে সঙ্গে সেই অদৃশ্য শত্রুর হাতে মার খেয়ে তারা কাদার মধ্যে পড়েছে ছিটকে।

বেশ কয়েক ঘণ্টা কেটে যাবার পরেই কেবল তাদের বাকি সঙ্গীরা খুব সাবধানে জলে নামতে ভরসা পেল, আহত সঙ্গীদের দেহগুলি শুকনো ডাঙ্গায় উঠিয়ে নিয়ে এল। লোক তিনটি বেঁচে গেল কিন্তু দলটা আর এগিয়ে যেতে পারল না। অদৃশ্য শত্রুর হাতে মার-খাওয়া লোক তিনটির পাগুলি অসাড় হয়ে গিয়েছিল। রাত্রি নাগাত অবশ্য পাগুলিতে আবার নড়াচড়ার ক্ষমতা ক্রমশ ফিরে আসতে থাকে তবে সম্পূর্ণ সুস্থ হতে তাদের লেগে গেল কয়েকটা দিন। অন্য অভিযাত্রীদের মতোই ডে'সিকা-র ছিল কুসংস্কারে বিশ্বাস তাই দলটাকে তিনি ফিরে যাবার নির্দেশ দিলেন।

এইভাবে ইয়োরোপীয়েরা সর্বপ্রথম জলের নীচের আর একটি শক্তিকেন্দ্রের খবর পেল — ইলেকট্রিক ঈল (Electric Eel) বা কুঁচে মাছের শরীরস্থ তড়িতের আধার। এই মাছটা আকৃতিতে বেশ বড়, দেড় থেকে দুমিটার দৈর্ঘ্যে আর ওজনেও 15 থেকে 20 কিলোগ্রাম।

ইনডিয়ানদের একটা ভাষায় এই কুঁচে মাছের নাম আরিমা যার অর্থ, 'যে অসাড় করে দেয়'। স্থানীয় উপজাতীয় মানুষের বিশ্বাস এই মাছের মাংস এবং তড়িতের শক্-এর আছে রোগ নিরাময় করবার ক্ষমতা। তড়িৎ-চিকিৎসার প্রয়োগ সম্ভবত ইয়োরোপের অনেক আগেই আমেরিকাতে হয়েছিল, তারিখটা অবশ্য আমরা নির্ণয় করে বলতে পারব না।

মাছেরা তড়িৎ সৃষ্টি করতে পারে, এই উক্তিতে অবশ্য আশ্চর্য হবে না, এই পরিচ্ছেদের শুরুটা পড়বার পরে। আশ্চর্যের যেটা তা হোল দুর্বল তড়িৎমোক্ষণের বদলে আফ্রিকার মাগুর মাছ (Catfish) বা আমেরিকান কুঁচে মাছ আর টরপেডো সংকর মাছ অত্যন্ত প্রবল শক্তির তড়িৎমোক্ষণ করতে পারে।

মাগুর মাছ তো 400 ভোল্ট শক্তির তড়িৎপ্রবাহের সৃষ্টি করতে পারে — ঈল-এরা পারে আরো জোরালো তড়িৎশক্তি উৎপন্ন করতে — 600 ভোল্ট (একবার মনে করে দেখ, বাড়িতে আমাদের নিত্য ব্যবহার্য তড়িতের শক্তির কথাটা, 127 থেকে 220 ভোল্টের মধ্যেই সেটা থাকে সীমাবদ্ধ)। ঈলের তড়িৎ-কেন্দ্রে উৎপন্ন শক্তির সাধ্যসীমা 1000 ওয়াট পর্যন্ত। এত উচ্চ-শক্তি থাকা ঈল-এর পক্ষে প্রয়োজনীয় কেননা মিঠে জল তো তড়িৎ-পরিবাহক হিসেবে বেশ নিকৃষ্ট পদার্থ, তাই শক্তিটা এর থেকে কম হলে সেটা কার্যকর হবে কেবলমাত্র খুব কাছাকাছি জায়গায়। অপরদিকে টরপেডো সংকর মাছের কথা ভাবো, তারা তো খুবই অল্প শক্তির তড়িৎ উৎপাদন করেই সন্তুষ্ট

রয়েছে, মাত্র 60 ভোল্ট। হবে না কেন, সংকর মাছ যে সমুদ্রের বাসিন্দা, আর সমুদ্রজলের তড়িৎ-পরিবাহিতা অতি চমৎকার—তাই তড়িৎপ্রবাহের তীব্রতা 60 আমপেয়ার পর্যন্ত হতে পারে। পরিসংখ্যানগুলি অবশ্যই বিস্ময় উদ্রেক করবে।

প্রকৃতি কেমন করে এই বিদ্যুত-কেন্দ্রগুলির রূপরেখা তৈরি করলেন? খসড়া নমুনার জন্যই কী বা কাকে প্রথম ব্যবহার করলেন?

যে কোন সাধারণ প্রাণীর শরীরের মধ্যে তীব্রতম তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন হয় বড় বড় পেশীগুলিতে, যেমন চলাফেরা নিয়ন্ত্রণকারী পেশীগুলিতে বা হৃৎপিন্ডে। কতকগুলি মাছ সাঁতার দিয়ে যাবার কালে দেখা যায় তাদের চারদিকে একটা তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়েছে। এই তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রটা শক্তিশালী হয় নল-আকৃতির মাছদের বেলায়, যেমন কুঁচে, পাঁকাল ইত্যাদি আর কয়েকটা আদিম জাতের মাছের বেলায়ও যারা শক্তি খরচ করার ব্যাপারে মিতব্যয়ী হতে শেখেনি। চলন্ত একটা ল্যামপ্রে (lamprey)-এর মাথার কাছে কয়েক'শ মাইক্রোভোল্ট তড়িৎ-স্পন্দন পরিমাপ করা যায় যে কোন সময়ে।

বিস্ময়ের কথা হোত যদি প্রকৃতি এই তড়িতের উপস্থিতিটার যথাযথ ব্যবহার করার ব্যাপারে তৎপর না হতেন। দেখা যাচ্ছে আমাদের এই গ্রহে মাছের আবির্ভাবের শুরু থেকেই তিনি ইলেকট্রিকাল ইনজিনিয়ারিং নিয়ে মেতে উঠেছিলেন। মস্তিষ্কের প্রাথমিক নমুনাগুলি আর প্রান্তিক স্নায়ুতন্ত্রের নমুনাগুলির রূপায়ণ সম্পন্ন ক'রে, নিয়ন্ত্রণের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থাটা গড়ে ফেললেন জটিল তড়িৎঘটিত যন্ত্রপাতি দিয়ে, তার পরে বোধহয় ভাবছিলেন তড়িৎকে আর কোন কোন কাজে লাগানো যায়। তাঁকে বাহবা দিতেই হবে কেননা অনুসন্ধানটা নিস্ফল হয়নি। অন্তত মাছদের ক্ষেত্রে তড়িৎ মানে ভারী দরকারী একটা ব্যাপার অন্য প্রাণীদের সঙ্গে তুলনায়।

তথাকথিত ইলেকট্রিক ঈল মাছেরা তো শক্তিশালী তড়িৎ উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তুলতে থাকল। পেশী আর স্নায়ুপ্রান্ত হোল যন্ত্রাংশ, তড়িৎ-যন্ত্রের প্রান্তিক প্লেটের স্থান এরা নিল।

তড়িৎযন্ত্র কিন্তু বেশ বড়ো সড়োই হোল, সারা দেহের ওজনের চারভাগের বা তিনভাগের একভাগ। ইলেকট্রিক ঈল-এর দেহের দৈর্ঘ্যের চার-পঞ্চমাংশ হোল এই যন্ত্রের দৈর্ঘ্য, মাগুর মাছের বেলায় সারা দেহটাই। যন্ত্রটা হোল

সারিবদ্ধভাবে সাজানো অসংখ্য প্লেট। একটা সারির সব প্লেটগুলি একটার পেছনে আর একটার যোগ রয়েছে, সারিগুলির আবার প্রান্তগুলি একসঙ্গে গ্রন্থিবদ্ধ।

স্নায়ুর স্পন্দনে দেহকাঠামোর পেশীর সংকোচন ঘটলে (এই তড়িৎ-যন্ত্র তো দেহকাঠামোর পেশীর চার পাশেই গড়ে উঠেছে), একটা তড়িৎমোক্ষণ ঘটে যায়। একটা স্পন্দন যখন পেশীকলা-র স্নায়ুপ্রান্তে পৌঁছায়, তখন সেখানে একটি পদার্থের নিঃসরণ হয়ে থাকে যাকে আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে মেডিয়েটর (mediator) বা ঘটক। এই মেডিয়েটরই পেশীকোষের সংকোচন ঘটায়। এই সংকোচন আবার আরেকটা তড়িৎমোক্ষণ ঘটালো। বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি নির্মাণের কালে প্রকৃতি এই প্রান্তিক প্লেট আর বিবর্তিত পেশী-কোষগুলিকে এই উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করলেন। এরা সংকোচনের ক্ষমতাটা হারালো কিন্তু স্পন্দন সৃষ্টির ক্ষমতা এদের বজায় রইল।

তড়িৎ-যন্ত্রের প্লেটগুলিতে তড়িৎ স্পন্দনের উৎপত্তির কৌশলটা, স্নায়ুতে, প্রান্তিক প্লেটে বা পেশীতন্তুতে তড়িৎ উদ্ভবের কায়দা থেকে অভিন্ন। এমনকি এই স্পন্দনের তড়িৎ বিভব 150 ভোল্ট ও স্নায়ু বা পেশীর স্পন্দনের বিভব চাপের অনুরূপ। কিন্তু, যেমন ধরো ইলেকট্রিক ঈল-এর ক্ষেত্রে প্লেটগুলি তো একটার পেছনে আর একটা এমনি সারি দিয়ে সংযুক্ত (in series), সারিগুলির প্রান্তগুলি আবার গ্রন্থিবদ্ধ (in parallel)। প্রত্যেক সারিতে আছে 6000 থেকে 10000 প্লেট তাই মোট ভোল্টেজ বা তড়িৎ-সঞ্চালক বল 600V হতে পারে। টরপেডো সংকর মাছের তড়িৎ যন্ত্রের এক সারিতে থাকে 1000 সংখ্যক প্লেট কিন্তু এমনি সারি থাকতে পারে মোট 200, যাদের সবগুলিরই দুটি প্রান্ত গ্রন্থিবদ্ধ। তাই তো এদের তড়িৎ-সঞ্চালক বল বা ভোল্টেজ বেশি না হলেও তড়িৎপ্রবাহের তীব্রতা খুব বেশি হতে পারে।

এমনি জটিল একটা যন্ত্রব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মস্তিষ্কে আছে বিশেষ একটা আজ্ঞাকারী গোষ্ঠী। ইলেকট্রিক মাছের মেডুলাতে আছে ইলেকট্রিক লোব আর ডিম্বাকৃতি নিউক্লিয়াই। ডিম্বাকৃতি নিউক্লিয়াই হোল হেডকোয়ার্টার যেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে থাকে যে সাংঘাতিক এই সমরাস্ত্রটা ব্যবহার করা হবে কিনা। যদি হয় তাহলে ইলেকট্রিক লোবে যথাযথ আদেশবার্তা পাঠিয়ে দেওয়া হয় হেডকোয়ার্টার থেকে। ইলেকট্রিক লোব তড়িৎমোক্ষণ সংহতি ও বিন্যাসের জটিল কাজগুলি করে থাকে। প্রকৃত

পক্ষে তড়িৎমোক্ষণ পূর্ণমাত্রায় করতে হলে তড়িৎ-যন্ত্রের প্রত্যেকটি প্লেট থেকে মোক্ষণ হওয়া চাই একসঙ্গে, ইলেকট্রিক লোবের কাজ হোল সেটাই নিষ্পন্ন করা। যুগপৎ তড়িৎমোক্ষণের জন্যই চাই তড়িৎ-যন্ত্রের প্রত্যেকটি প্লেটে আদেশবার্তা, মানে স্নায়ুর স্পন্দনেরা তো খুব দ্রুত গতিতে চলে না, মাছের মেরুরজ্জু দিয়ে এর গতিবেগ সেকেন্ডে 30 মিটার। তড়িৎ-যন্ত্রের যে সব প্লেট শরীরের উর্ধ্বভাগ, মানে মাথার দিকে আছে সেখানে আদেশবার্তা পেঁছে যায় অনেক আগে, এক থেকে দেড়মিটার দূরস্থিত নিম্ন প্রান্তের বা লেজের দিকে পৌঁছানোর বেশ আগেই।

তাহলে ইলেকট্রিক মাছেরা এই আদেশটা তড়িৎ যন্ত্রের সর্বত্র যুগপৎ পায় কি করে? সম্ভবত আদেশটা লেজের দিকে পাঠানো হয় কিছুটা আগে, সামনের অংশের চেয়ে, হয়ত বা মাছটা এই স্নায়ু-স্পন্দনের গতিবেগটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তার ওপর মাছের শরীরটা তো তার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে তাই নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতিটাও পালটাচ্ছে — মাছটা বড় হচ্ছে, তড়িৎ-যন্ত্রটাও বড় হচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে এই আদেশবার্তাগুলিরও ঘটছে বিবর্তন।

নির্ণায়ক আর স্পন্দনলেখ

ঈল, টরপেডো সংকর আর মাগুর, কেবল এই তিন প্রকারের মাছেরই যে তড়িৎ-যন্ত্র আছে তা নয়। এ ছাড়াও অন্তত তিনশ জাতের মাছের খবর পাওয়া গেছে যারা অল্প শক্তির তড়িৎ মোক্ষণ করতে পারে — 0.2 থেকে 2 ভোল্ট পর্যন্ত। বিজ্ঞানীরা আগে ভাবতেন এই তড়িৎ তারা খুব ছোট ছোট প্রাণীকে হত্যা করার কাজে লাগায়। কিন্তু খুব খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করেও এই মতটা ঠিক বলে প্রমাণ করা যায় নি। অতি সম্প্রতিকালেই কেবল জানা গেছে এই অল্প শক্তির তড়িৎ-যন্ত্রের উপযোগিতা।

এই সব মাছের তড়িৎ-যন্ত্রাদির বিকাশ হয়েছিল উচ্চতর আধানের তড়িৎ মোক্ষণের ক্ষমতা বাড়াবার দিকে না গিয়ে তড়িতের প্রতি সংবেদনশীলতার উন্নতি সাধন ক'রে। দেখা গেল এই সব মাছদের অনেকেই নিশাচর, বাস করে কাদাজলে, অনেককে আবার, যেমন নীলনদের মরমিরাস-কে (mormyrus), পাঁকের মধ্যে মাথা ডুবিয়ে খাবার খুঁজতে হয়। কাদাজলের মধ্যে রাত্রিবেলায় বিপজ্জনক শত্রুর হদিস পাওয়া বেশ কঠিন।

ইলেকট্রিক মাছেরা সম্পূর্ণ অন্ধকারের মধ্যেও আগুয়ান শত্রুর হদিস পেতে উদ্ভাবন করল অদ্ভুত এক যন্ত্র।

শিকারের জন্য যে সব মাছ তড়িতের ব্যবহার করে তাদের আছে কেবল একটা তড়িৎ শক্তির কেন্দ্র, কিন্তু নীলনদের মরমিরাসদের আছে এছাড়াও অতি সূক্ষ্ম সংবেদনশীল তড়িৎ ধারক যন্ত্র। এই মাছের শক্তিকেন্দ্রটা তো প্রতি সেকেণ্ডে তিনশটি তড়িৎ-স্পন্দন মোক্ষণ করতে পারে যার ফলে অল্প শক্তির একটা তড়িৎ-ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয় যার চেহারাটা অপরিবর্তিত থাকে, বল-রেখাগুলি মাথার দিকে কেন্দ্রিত হয়। আর সব মাছের থেকে স্বতন্ত্র, ইলেকট্রিক মাছেরা সাঁতার দেবার কালে দেহটাকে বাঁকায় না, তাই শরীরের চার পাশের তড়িৎ-ক্ষেত্রটা তাদের চলার কালে বিঘ্নিত হয় না। কিন্তু কাছাকাছি যদি একটা বড় মাছ আসে তক্ষুণী তড়িৎ-ক্ষেত্রের সমতা বিঘ্নিত হয়ে যায়। মাছের শরীরের পরিবাহিতা পরিপার্শ্বের জলের থেকে অনেক বেশি, তাই বল-রেখাগুলি আগুয়ান মাছটার দিকে আকর্ষিত হয়। মরমিরাস-এর তড়িৎ-সুবেদী দেহযন্ত্র তৎক্ষণাৎ তাকে সতর্ক করে দেয় যে শত্রু আসছে, মাছটা তাই পালাতে পারে। মরমিরাস এই অদ্ভুত নিশানাজ্ঞাপক যন্ত্রের সাহায্যে কেবল যে শত্রুর হাত থেকে পালায় তা নয়, সামনের আগড়, বাধাগুলিও সহজেই এড়াতে পারে, ঠিক যেমন বাদুড়েরা পারে তাদের প্রতিধ্বনী-শ্রবণ যন্ত্রের সাহায্যে। জলে যেসব বস্তুতে মাছটার ধাককা লাগা সম্ভব তারা সবাই তড়িতের কাছে কুপরিবাহী। এই বস্তুগুলি তাই বল-রেখাগুলিকে বিকর্ষণ করে, তাই মরমিরাস জীবিত প্রাণী আর জড় বস্তুর প্রভেদটা নির্ধারণ করতে পারে।

সমুদ্রের বা মিঠে জলের ল্যামপ্রেরা শিকারের অবস্থান নির্ণয় করে তড়িৎ-নির্ণায়কের সাহায্যে। মিঠে জলের জলাশয়ের কাদার মধ্যে এই যন্ত্রটা খুবই উপযোগী। আমেরিকার উপকূলের কাছে আটলান্টিক মহাসাগরের ক্রান্তীয় অঞ্চলের বাসিন্দা অত্যাশ্চর্য ছুরিমাছের নিশানাজ্ঞাপক যন্ত্রটি আছে তার লেজে। জলের নীচে পাথরের ফাটলের মধ্যে, জলজ ঝাঁঝির জঙ্গলে পিছু সাঁতার কাটতে কাটতে ছুরিমাছ প্রত্যেকটি গর্তের মধ্যে একবার করে লেজটি ঢুকিয়ে দিতে থাকে। ভেতরে যদি শত্রু থাকে লুকিয়ে, মাছটা তৎক্ষণাৎ পালিয়ে যায়।

মরমিরাসের নিকট আত্মীয় জিমনারকাস শিকারকে তাড়া করার কালে রাডারের অনুরূপ একটা যন্ত্র ব্যবহার করে থাকে, শিকারকে চিহ্নিত করতে।

মরমিরাস বা তাদের জ্ঞাতি গোষ্ঠীর মাছদের পক্ষে এই রাডার পদ্ধতি কার্যকর হতে পারে ত্বকের তড়িৎ-সংবেদী ধারকগুলির সংবেদনশীলতা অত্যন্ত প্রখর হলেই। বস্তুত, জিমনারকাস-এরা তড়িৎপ্রবাহের সামান্যতম প্রভেদও অনুভব করতে পারে, প্রভেদের মাত্রাটা ধরো, 0.000000000000003 অ্যামপেয়ার। এত সংবেদনশীল বলেই এরা সহজেই ধরতে পারে কোন গাজন মাছটা (gudgeon) বঁড়শি বেঁধা টোপ, কোনটাই বা শুধু গাজন। সন্দেহকি জিমনারকাস বিপজ্জনক টোপটা কস্মিনকালেও স্পর্শ করবে না।

অনেক মাছ, এমনকি সরীসৃপ-এরাও তড়িতের ব্যাপারে অত্যন্ত স্পর্শকাতর। যে যন্ত্র দিয়ে এরা তড়িৎ অনুভব করে সেটা ত্বকের ওপরের একটা দীর্ঘ পার্শ্বরেখা। আর, টরপেডো সংকর মাছের আছে লোরেনজিনি-র অ্যামপুলি।

সাধারণ সকল সংকর মাছ আর জিমনারকাসদের নিজের নিজের অল্পশক্তির তড়িৎ-কেন্দ্র আছে। আজ পর্যন্ত আমরা জানি না কী উদ্দেশ্যে এই উৎপাদন কেন্দ্রগুলি আছে, তবে স্কেট বা সংকর মাছদের তড়িতে স্পর্শকাতরতার বিষয়ে কিছু কিছু তথ্য ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে।

লোরেনজিনি-র আমপুলির (Lorenzini's Ampoulae) কথা 1678 সাল থেকেই জানা আছে যখন সেই ইটালিয়ান অভিযাত্রী এগুলির বিবরণ দেন, যাঁর নাম আজও বহন করছে এই দেহযন্ত্র। লোরেনজিনি মনে করতেন এই অ্যামপুলি একধরনের শ্লেষ্মাগ্রন্থি, মাছের ত্বকে যাদের বেশি সংখ্যায় পাওয়া যায়। কিন্তু এই প্রান্তিক নালীর ভেতরকার ঘন, চটচটে দলাগুলি আর আসল অ্যামপুলির মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম ঘন তরল দেখে ধারণা হয় যে যন্ত্রগুলির নিশ্চয় কোন বিশেষ কাজ আছে, কেবল শ্লেষ্মানিষেক ছাড়াও। লোবেনজিনির অভিমত অবশ্য পরবর্তী আড়াইশ বছর টিঁকে ছিল, হয়ত কেবল এই কারণেই যে এই যন্ত্রগুলি নিয়ে কেউই গভীরভাবে চর্চা করে নি।

গত কয়েক দশকে কিন্তু জানা যায় যে লোরেনজিনির অ্যামপুলিতে অল্পশক্তির তড়িৎ-ক্ষেত্রের প্রতি তীব্র সংবেদনশীলতা রয়েছে। পিঠে-কাঁটা সংকর মাছ (the thornback ray) অনুভব করতে পারে অতিনগণ্য শক্তির তড়িৎ-ক্ষেত্র, যার ক্ষীণতা হতে পারে 0.02 থেকে 0.01 মাইক্রোভোল্ট প্রতি সেন্টিমিটারে। সাড়া দিতে গিয়ে এরা হৃদযন্ত্রের পেশীর সংকোচনের বেগ
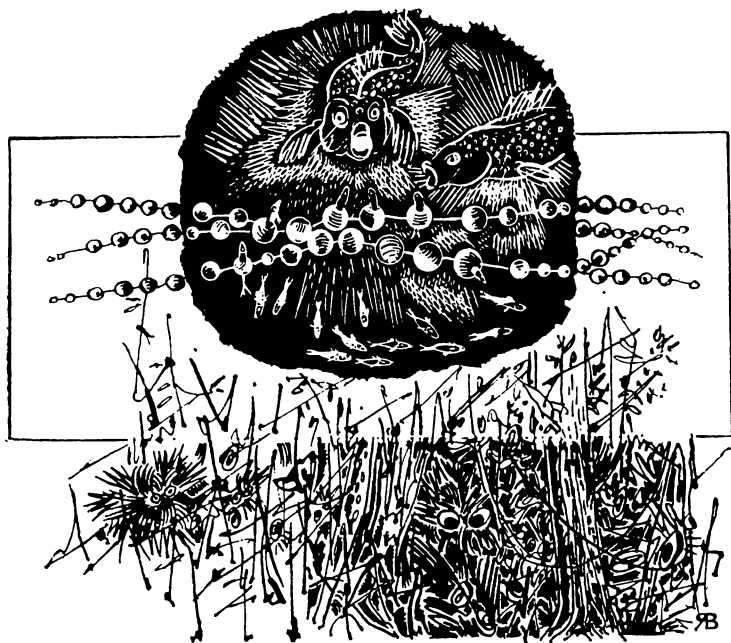
কমিয়ে দেয়। অর্থাৎ টরপেডো সংকর মাছদের তড়িৎ-সংবেদনা জিমনারকাসদের থেকে 30-50 গুণ বেশি তীব্র।

এর থেকে খোলসা হয়ে গেল লরেনজিনি-র অ্যামপুলির গঠন বৈচিত্রের ব্যাপারটা। ত্বকের তড়িৎ পরিবাহিতা বেশ উচ্চ। এই ত্বকের পুরুত্বের মধ্যে অবস্থিত তড়িৎধারক যন্ত্রের স্পর্শকাতরতা তীব্র হতে গেলে চাই বাইরের পরিমণ্ডলের সঙ্গে সংসগ্রকারী একটা বিশেষ তড়িৎ পরিবাহক। উৎকৃষ্ট তড়িৎবাহী পদার্থ দিয়ে পূর্ণ এই নালীগুলির কাজই হোল তাই। আসল অ্যামপুলটা আর এই নালীর দেয়াল মাছের নিজের পেশীতে উৎপন্ন তড়িৎ আধানকে আড়াল করে রাখে তড়িৎ-ধারকগুলি থেকে। এই অ্যামপুল-এর ত্বকে আছে ধারক কোষ যারা স্নায়ুতন্তু দিয়ে সংযুক্ত। প্রতিটি কোষের মাথায় আছে ছোট একটা করে রোম, অ্যামপুলের গহ্বরের দিকে প্রলম্বিত। এই রোমগুলিই ধারকযন্ত্রের সংবেদনা অনুভবকারী প্রত্যঙ্গ। ধারকটা ব্যবহার ক'রে পিঠে-কাঁটা সংকর মাছ অনুভব করতে পারে অন্য মাছের শরীরের মধ্যে প্রবাহিত জৈব তড়িৎপ্রবাহ। তাই টরপেডো সংকর খুঁজে বের করে

আর আক্রমণ করে লুকিয়ে থাকা অসন্দিগ্ধ সুন্দর সুন্দর তরুণ চ্যাপটা মাছদের — কেবলমাত্র তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস কালে স্পন্দমান পেশী থেকে উদ্ভূত ছন্দময় তড়িৎমোক্ষণের হদিস পেয়ে।

জলের নিচের এই স্পন্দনলেখ মনোবিজ্ঞানীর কাছে মূল্যবান সম্পদ। তোমাদের যদি কখনো দলবদ্ধ সেই সব জাতের মাছদের আচরণ অনুধাবন করে দেখার সুযোগ ঘটে যেমন ম্যাকারেল জাতের মাছদের তাহলে তোমরা বিস্ময়ে মুগ্ধ হবে যখন দেখবে শত শত বা হাজার হাজার মাছের একটা ঝাঁক কেমন সবাই একসঙ্গে দিক পরিবর্তন করে যেন কুচকাওয়াজের আদেশের অণুসরণ করছে। আজও আমরা জানি না যে এই আদেশ কে দেয় বা কী করেই বা এটা পৌঁছে যায় প্রত্যেক মাছের কাছে। হতে পারে, মনের ভাব পাঠ করবার জন্য লাগে ক্ষীণ তড়িৎ-স্পন্দন। জৈব তড়িৎপ্রবাহ সকল পেশী ও স্নায়ুতে উৎপন্ন হয়ে থাকে, সর্বাগ্রে এবং প্রধানত মস্তিষ্কে, যে আবার নির্দেশ দেয় সকল ক্রিয়াশীল দেহযন্ত্রকে। হতে পারে যে এই আদেশগুলি সকলের কাছে পৌঁছবার জন্য তড়িৎ সংকেত বেরিয়ে আসে মাছের শরীরের বাইরেও, কেননা সমুদ্র তো তড়িতের একটা চমৎকার পরিবাহক।
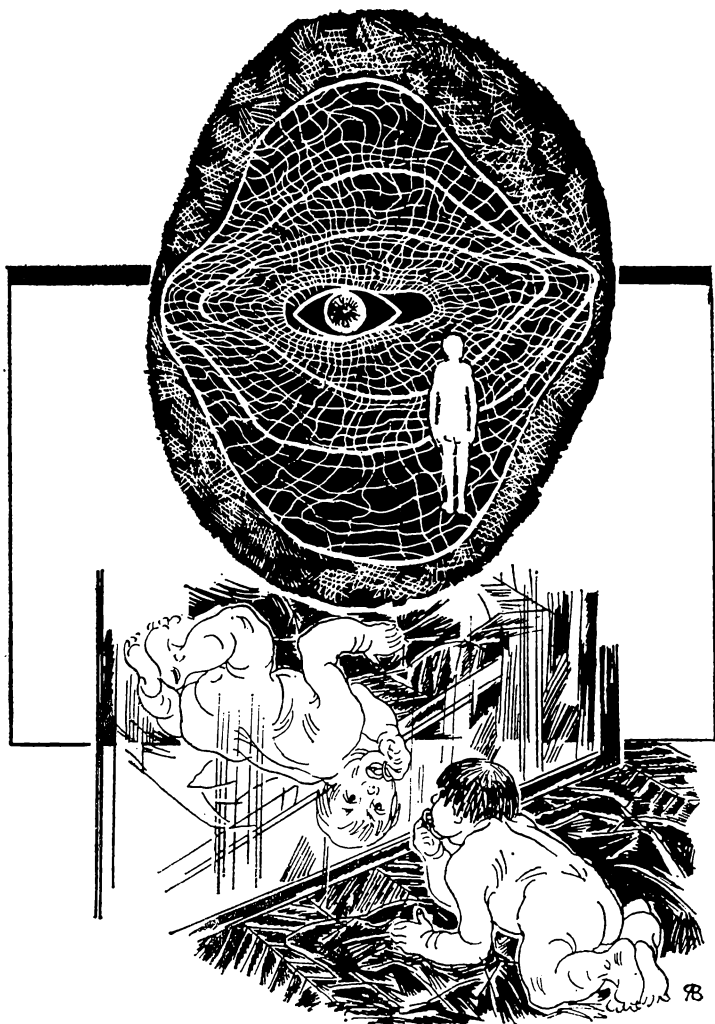
সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মস্তিষ্কে অবিরাম এসে পৌঁছচ্চে তথ্য-প্রবাহ, যোগাযোগের অসংখ্য সূত্র ধরে। শ্রবণযন্ত্রের স্নায়ুর আছে 30,000 পরিবাহী তন্তু, দৃষ্টিযন্ত্রের আছে আরো অনেক বেশি, প্রায় 900,000। যে পরিমাণ তথ্য কেবল শ্রবণযন্ত্র থেকেই আসছে সেটা হবে প্রতি সেকেণ্ডে কয়েক অযুত তথ্যের টুকরো, আর চক্ষু থেকে পাঠানো তথ্যের পরিমাণ হবে কয়েক নিযুত। মস্তিষ্ককে তো এতসব তথ্যকে বাছাই করতে হবে, দরকারী তথ্যগুলিকে বেছে নিতে হবে কম দরকারী আর অবান্তর তথ্যের বোঝা থেকে। কেননা, মানুষের মস্তিষ্ক প্রতি সেকেণ্ডে পঞ্চাশটির বেশি তথ্যের টুকরো আত্মস্থ করতে পারে না।

সকালে ঘুম ভাঙার আগে থেকেই মস্তিষ্ক তার কাজ শুরু করে। তাকে তো তার ধারক-যন্ত্রগুলি সুরে বেঁধে নিতে হবে, অসংখ্য দরকারী তথ্য যাতে সেখানে ধরা দিতে পারে। কাজটা সোজা নয়, কেননা মানুষ বা জীবজন্তুর মস্তিষ্কে আছে নানা প্রকারের ধারক, যাদের প্রত্যেকে কেবল এক এক প্রকারের বীজমন্ত্রবদ্ধ তথ্যই উপলব্ধি করতে পারে।

কোন প্রাণীর তাহলে কতগুলো যোগাযোগের সূত্র থাকতে পারে? কতগুলি পথ দিয়েই বা তারা তথ্য সংগ্রহ করে থাকে?

তথ্য সংগ্রহ করবার জন্য নির্দিষ্ট ধারকযন্ত্রগুলিকে সাধারণভাবে আমরা জ্ঞানেন্দ্রিয় আখ্যা দিয়ে থাকি। বিজ্ঞানীরা ছয়টি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করেন — অর্থাৎ প্রধান ছয়টি — এরা হোল দৃষ্টি, শ্রুতি, স্বাদ, গন্ধ, স্পর্শ সম্বন্ধীয় আর ভারসাম্যের বোধ সম্বন্ধীয় একটি।

প্রধান নয় যারা তাদের সংখ্যা অগণ্য। যেমন ধরো ত্বকেই আছে অসংখ্য ধারক। কেউ হালকা স্পর্শে সাড়া দেয় (স্পর্শানুভূতির জন্য এরা দায়ী), কেউ বা সাড়া দেয় একটু জোরালো আঘাতে, আর তাদের সঞ্জীবনে বেদনা অনুভূত হয়। আর এক প্রকারের ধারক শৈত্যে হয় সংবেদিত, চতুর্থ একটির সঞ্জীবন হয়ত হয় উষ্ণতায়। ত্বকের ধারকদের দীর্ঘ তালিকার মধ্যে কয়েকটির কথাই বলা হোল।

দেহের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রাদিতেও আছে নির্দিষ্ট ভূমিকায় নানা জাতের

ধারকযন্ত্র। পাকস্থলীতে প্রবিষ্ট খাদ্যের মান পরীক্ষার জন্য আছে একটা ধারক, রক্তের চাপ উপলব্ধি করতে আছে অন্য একটা, আবার রক্তে দ্রবীভূত কারবন ডাই অকসাইডের পরিমাণটা জানতে পারে অন্য একটা ধারক। এরা কাজ করে চলেছে কিন্তু সে কথা আমরা জানতেও পারি না। আভ্যন্তরীণ দেহযন্ত্র থেকে যেসব তথ্য অবিরাম মস্তিষ্ককে পাঠানো হয়ে থাকে তারা কখনো আমাদের চেতনাকে ভেদ করে না।

বিজ্ঞানীরা এই জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির কার্যধারা ভাল করে বুঝবার ব্যাপারে বরাবরই খুব আগ্রহী। বিগত কয়েক বছরে অনুসন্ধানটা তীব্র হয়েছে, ইলেকট্রন-মাইক্রোস্কোপ অনুসন্ধাণের সহায়ক হিসেবে ব্যবহার শুরু হওয়া থেকে। এটা বোঝা সহজ, কেননা সাধারণ অণুবীক্ষণযন্ত্র কেবল দশ গুণ থেকে পনেরশ গুণ বড় করে দেখাতে পারে আর, ইলেকট্রন-মাইক্রোস্কোপের বিবর্ধন হতে পারে পারে বিশ, চল্লিশ, ষাট এমনকি একশ হাজার গুণ। এর ফলে বিজ্ঞানীরা অনেক গোপন রহস্যের দিকে দৃষ্টি দিতে পারলেন।

তাঁরা এই অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারটা করলেন যে সকল জ্ঞানেন্দ্রিয়েরই ধারক কোষগুলি (মানে, উদ্দীপনা যারা উপলব্ধি করে থাকে) গঠনের দিক দিয়ে প্রায় অভিন্ন। তাদের সকলেরই আছে বেশ সচল একটি ছোট কেশ বা ফ্লাজেলাম (flagellum)। এই ফ্লাজেলামগুলি সকল প্রকার ধারকযন্ত্রের ক্ষেত্রেই দেখতে প্রায় একরকম। প্রত্যেক ফ্ল্যাজেলামের আছে দুটি করে কেন্দ্রীয় তন্তু আর তাদের ঘিরে আছে নয় জোড়া করে চলমান তন্তু। ফ্ল্যাজেলামের আকৃতি কদাচিৎ অন্যরকম হয়ে থাকে।

যে কোন ধারক কোষের ফ্ল্যাজেলামের কাজটা হোল ঠিক যেন রেডিও সেটের অ্যানটেনার অনুরূপ, তাই তাদেরকে বলা হয়ে থাকে ধারক অ্যানটেনা। এই অ্যানটেনা দিয়েই আমরা উপলব্ধি করে থাকি বাইরের জগৎটাকে। দৃষ্টান্ত হিসেবে, চোখের ধারক কোষদের যে অ্যানটেনা, তারা তো আলোক শক্তি বা ফোটনের স্পর্শে সাড়া দেয়। ঘ্রাণ-যন্ত্রের অ্যানটেনা গন্ধযুক্ত পদার্থের অণুর স্পর্শে সাড়া দেয়। শ্রবণযন্ত্রের ধারক কোষেরা সাড়া দেয় শব্দ-তরঙ্গের শক্তির স্পর্শে বা শব্দের স্পর্শে।

এই অ্যানটেনাদের সংবেদনশীলতা বিস্ময়কর। একটি ফোটনে নিহিত শক্তি, মানে সামান্যতম আলোকের কণা একটি দৃষ্টিকোষকে জাগিয়ে তুলতে পারে। গন্ধকোষ ধরতে পারে গন্ধযুক্ত একটি অণুর গন্ধ। শব্দকোষকে উত্তেজিত করতে হলে কানের পর্দাকে স্পন্দিত হতে হবে কেবল

0.000 000 000 6 মিলিমিটার বিস্তারে অর্থাৎ কিনা সবচেয়ে ছোট যে পরমাণু হাইড্রোজেন, তার ব্যাসের দশভাগের এক ভাগ।

এই অ্যানটেনারা সর্বদা নড়ছে, যেন বহির্জগত থেকে উদ্দীপনা খুঁজে বেড়াচ্ছে। এইসব সচল অ্যানটেনারা বাইরের উদ্দীপনার সন্ধান সক্রিয়ভাবে করে চলেছে।

সংবেদনার ধারক কোষগুলি অবশ্য বিভিন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রে হুবহু একরকমের নয়। বেশ খানিকটা করে মৌলিক পার্থক্য আছে তাদের মধ্যে। যেমন ধরো, দৃষ্টিকোষগুলিতে থাকে একটা পদার্থ যার নাম দৃষ্টি-বেগুনী, আলোকের স্পর্শে যারা কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই যে সালোক রাসায়নিক বিক্রিয়া, দৃষ্টির অনুভূতি আসে এর থেকেই। অন্যান্য জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ধারক কোষগুলিতে কিন্তু দৃষ্টি-বেগুনী থাকে না। কোন কোন বিশেষ পদার্থের দরুণ তারা উদ্দীপনার উপলব্ধি করতে পারে তা অবশ্য এখনো জানা যায় নি।

কত নিযুত বছর ধরে আমাদের এই গ্রহে জীবজগৎ হেঁটে চলেছে বিবর্তনের পথ ধরে আদিমতম এক কোষী প্রাণী থেকে, যারা বাইরের উদ্দীপনা উপলব্ধি করতে পারত কি পারত না, পৌঁছেচে এসে আজকের মানুষে যাদের আছে অসংখ্য নিখুঁত, অত্যন্ত সুবেদী জ্ঞানেন্দ্রিয়। মনে হতে পারে মানুষে আর ইনফিউসোরিয়াম-এ কোন মিলই আর নেই, কিন্তু আসলে তা নয়। মানুষ বা পাখি, বা মাছ বা পতঙ্গ বা গেঁড়ি বা অন্য যে কোন প্রাণী বাইরের জগৎটাকে উপলব্ধি করতে এবং পরিপার্শ্ব থেকে উদ্দীপনা নিয়ে সাড়া দিতে সচল অ্যানটেনা ব্যবহার করে যাদের গঠন প্রায় অভিন্ন। এমনকি এক কোষী প্রাণীরাও, যেমন ইউগ্লেনা সচল অ্যানটেনা ব্যবহার করে। এই অ্যানটেনাগুলির গঠনশৈলীটা এমনই নিখুঁত হয়েছিল যে তারা টিঁকে গেছে শত শত কোটি বছর। পৃথিবীর জীবিত প্রাণীরা প্রাণসৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত অপরিবর্তিত রাখতে পেরেছে তাদের সচল অ্যানটেনাগুলিকে।

কোথা থেকে এলো এ সব?

প্রধান ছয়টি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে তিনটির মহত্ত্ব আমাদের কাছে খুব বেশি। স্বাদ আর গন্ধবোধ যদি আমরা হারিয়ে ফেলি তাহলে বোধহয় খুব একটা চিন্তা আমরা করব না। স্পর্শশক্তি হারানোটাও বোধহয় সহ্য হয়ে

যায় কিন্তু দৃষ্টি, শ্রবণ আর ভারসাম্য হারালে ভারী অসুবিধায় পড়তে হয়।

মানুষের কাছে যে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অন্য প্রাণীর ক্ষেত্রে গুরুত্বের বিচারে তারা সমান জরুরী নাও হতে পারে। প্রাণীজগতে অনেকেরই দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ। কতকগুলি প্রাণী তো পুরোপুরি অন্ধ। অনেকে কালা, বা কানে কম শোনে, তবুও বেশ ভালভাবেই তো জীবন নির্বাহ করে থাকে। তবে, ভারসাম্যের বোধজ্ঞাপক জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কথা বলতে গেলে, এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইন্দ্রিয় এবং বহুকোষী প্রাণীদের প্রায় সকলেরই এই বোধ বিদ্যমান। এমনকি এককোষী প্রাণীদের ক্ষেত্রেও জীববিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন কতকগুলি দেহাংশ যারা আবছাভাবে উচ্চতর প্রাণীর ভারসাম্য রক্ষার দেহযন্ত্রের সদৃশ। পরজীবি ইনফিউসোরিয়া-র আছে এমনি একটা ব্যবস্থা। এদের থাকে একটা বিশেষ গর্ত, দেহগাত্রের ওপর ছোট একটা থলি যার মধ্যে আছে কিছুটা দানাবাঁধা পদার্থ আকৃতিতে যেটা বহুকোষী প্রাণীর স্টাটোসিসট-এর (Statocysts) অনুরূপ (ল্যাবিরিনথ বা গোলকধাঁধা থলি, স্থির অবস্থায় ভারসাম্য বজায় রাখার দেহযন্ত্র)। যদি কোনদিন প্রমাণিত হয় যে এই গর্তটা প্রকৃতই এই কাজটা করে থাকে তাহলে আশ্চর্যের কিছু নেই। কেননা এই পৃথিবীর দূর দূর প্রান্ত হয়ত ঢাকা আছে মসীলিপ্ত অন্ধকারে, অনেক স্থান থাকতে পারে শব্দ যেখানে পৌঁছায় না, কিন্তু পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ সর্বব্যাপী এবং এর হাত থেকে রেহাই নেই।

প্রাণসৃষ্টির ব্যাপারে আলোক সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল এমন বিশ্বাস অসঙ্গত নয়। সে যাই হোক, আলোকের প্রতি সংবেদন যা কিনা আদিম জৈব পদার্থেও লক্ষণীয়, ক্রমে ক্রমে বিশেষ দেহযন্ত্রের সৃষ্টি করল — দৃষ্টিযন্ত্র। এমনকি আজকের দিনের এককোষী প্রাণী ফ্ল্যাজেলেটা আলোক উপলব্ধি করতে পারে। এককোষী প্রাণীদের, বিশেষ করে পেরিডিনিয়া-দের (যাদের অনেকে আবার আলোক বিকিরণও করে থাকে) আছে বড় বড় চোখ। এই চক্ষুগুলি বাটির আকারের। খানিকটা লালচে চর্বির মতো আলোকসুবেদী পদার্থ পেরিডিনিয়ামের শরীরের সামনের ভাগে ফ্ল্যাজেলামটার মূলে জমা থাকে সেই বাটিতে। সেই রঙের পিণ্ডের মধ্যে আছে স্বচ্ছ একদানা স্টার্চ যেটা আলোককে কেন্দ্রীভূত বা প্রতিসরিত করতে পারে।

মানুষের পক্ষে প্রধান তিনটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রাচীনতম দুটি হোল দৃষ্টি আর ভারসাম্য বোধ। দুটির মধ্যে বৈসাদৃশ্যই বেশি প্রকট, কেবল একটি বৈশিষ্ট্য উভয়ের আছে। যদিও দৃষ্টি আর ভারসাম্যজ্ঞাপক জ্ঞানেন্দ্রিয়দের

উভয়েরই বিবর্তনের ধাপে ধাপে উন্নতিকল্পে ঘটেছে নানাবিধ আকৃতি ও ব্যবহারগত পরিবর্তন, যান্ত্রিক কৌশল ও নির্দিষ্ট কাজের ব্যাপারে তাদের মধ্যে প্রভেদটা সামান্যই, যখন তুলনা করি বিভিন্ন প্রাণীর শব্দবিশ্লেষক আর শব্দধারক কোষকলার সঙ্গে। এর সহজবোধ্য কারণ হোল দৃষ্টিশক্তি আর ভারসাম্যবোধের জন্য দেহযন্ত্রগুলির বিকাশ ঘটেছে এক একটি ধ্রুব, অপরিবর্তিত জাগতিক উপাদান কারণের প্রভাবে, ভারসাম্যবোধ গড়ে উঠেছে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে আর দৃষ্টির উদ্ভব হয়েছে সূর্যের আলোকের প্রভাবে। কিন্তু এই পৃথিবীতে কোন কালেই একটা ধ্রুব মানের শব্দের উৎস ছিল না।

আমাদের গ্রহে প্রাণের যখন শুরু হোল তখন চারিদিক ছিল স্তব্ধতায় ভরা। কেবল ছিল মেঘের গর্জন আর আদিম সমুদ্রের ঢেউগুলির মসীকৃষ্ণ পাথরের তটের ওপর আছড়ে পড়ার শব্দ। কিন্তু এই শব্দগুলিতে প্রাণীদের কোন আগ্রহ ছিল না। প্রাণীরা নিজেদের ক্রমবিকাশের পথে আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে যাবার পরে যখন তারা ঘুরে বেড়াতে আর একজন অন্যকে গিলে খেতে শিখল, তখনই কেবল পৃথিবীতে ক্ষীণ শব্দ আলাদা করে চিনতে পারা গেল। এই শব্দের উৎপত্তি শরীরগতভাবেই, প্রাণীরা নিজেরাই এই শব্দ সৃষ্টি করেছিল। এর থেকেই গড়ে উঠল শব্দবিশ্লেষক ইন্দ্রিয় আর শব্দ দিয়ে সংকেত পাঠাবার ব্যবস্থা।

নানাবিধ ধারক যন্ত্রব্যবস্থা, বিস্তৃত থেকে খুব সংকীর্ণ পর্দার শব্দ আলাদা করে বুঝতে পারার জন্য ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠল সর্ববিধ শব্দের উৎসের পুরো সারগমটা ধরতে পারার যন্ত্রাদি।

কয়েক জাতের বাদুড় আছে যারা প্রতি সেকেণ্ডে 360 হাজার কম্পনাঙ্কের তীব্র শব্দ বেশ ভাল শুনতে পায়, তবে তারা নীচু পর্দার শব্দও শুনতে পায়। এদের শ্রবণযন্ত্রে ধরা পড়ে পনেরটা স্বর-সপ্তক। রাত্রিকালের মথ, যারা এই বাদুড়ের খাদ্য, তাদের এই বিশাল স্বরগ্রামে কোন প্রয়োজন নেই। তাদের পাখায় অবস্থিত শ্রবণপর্দা ধরতে পারে কেবল শ্রুতিসীমার বাইরে বাদুড়ের প্রেরিত সংকেতগুলি। এই সীমাবদ্ধ কাজের জন্য তৈরি যন্ত্রের কৌশলটা খুবই সরল। একটা করে পর্দা, বাতাস-ভরা থলি আর মোট দুটো সুবেদী স্নায়ুকোষ। তাদের একমাত্র কাজ হোল বাদুড় সাধারণত যে শব্দ করে সেটা ধরে ফেলা এবং একটা আদেশ পাঠানো, যার ফলে মথটা উড়তে উড়তে খুব সত্বর দিক পরিবর্তন করে ফেলে।

আলোক বিশ্লেষণের দেহযন্ত্রের বিকাশ ঘটেছে সূর্যালোকের প্রভাবে, সেই কারণে যন্ত্রটা খুব জটিল হবার দরকার হয়নি। অনেক প্রাণীরই চক্ষু কেবল মাত্র তিনটি তরঙ্গ-সপ্তকের আলোকরশ্মি উপলব্ধি করতে পারে। তাই আলোক-অনুভূতির কম্পনাঙ্কের পাল্লাটা শব্দের অনুভূতির পাল্লার পাঁচ ভাগের একভাগ মাত্র।

আলোকের প্রতি উদাসীন প্রাণী তো আদৌ দেখা যায় না আমাদের এই গ্রহে। এমনকি চক্ষুহীন এককোষী প্রাণীরাও আলোক আর অন্ধকারের প্রভেদটা ধরতে পারে। আলোকের প্রতি সংবেদনা কয়েকটি রাসায়নিক বিক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল যেগুলি আলোকের উপস্থিতিতে বেগবান হয়। তাই, বহুকোষী জীবের শরীরের যে কোন কোষের প্রোটোপ্লাজম আলোককে উপলব্ধি করতে পারে, সেজন্য চক্ষুর দরকার হয় না।

দৃষ্টির জন্য বিশেষ দেহযন্ত্রের বিবর্তনের পূর্বে এই কাজ করত কতকগুলি বিশেষ আলোকসুবেদী কোষ যারা বাকি দেহকোষসমষ্টি থেকে অনেক বেশি সাড়া দিতে পারত খুব দুর্বল শক্তির আলোকজনিত উদ্দীপনাতে। আজকের দিনেও কয়েকটি প্রাণী আছে যাদের শরীরে এই আলোকসুবেদী কোষগুলি বিদ্যমান। এদের একটি আমাদের অতি পরিচিত কেঁচো। এদের চোখ নেই, কিন্তু ত্বকের ওপর যত্রতত্র ছড়ানো আলোকসুবেদী কোষ থাকায় এরা বেশ আনন্দেই আছে। এই কোষগুলির সাহায্যে উজ্জ্বলতার সামান্যতম হ্রাসবৃদ্ধি এরা অনুভব পারে — চক্ষুষ্মান মানুষও যে প্রভেদ ধরতে পারে না। এইরকম সারা দেহে ছড়িয়ে থাকা আলোকসুবেদী কোষ থেকেই আস্তে আস্তে গড়ে উঠেছে চক্ষু, বিবর্তনের সঙ্গে ধাপে ধাপে। গোড়ায় কেবল আলোকসুবেদী কতকগুলি কোষ নিয়ে ত্বকের ওপর একটা ফোঁটার মতো দাগের সৃষ্টি হয়েছিল। এই ফোঁটা-দাগ আলোক আর অন্ধকারের প্রভেদটা ধরতে পারে, কিন্তু এরা বলতে পারে না আলোটা আসছে কোন দিক থেকে।

এর পরে চক্ষুর ক্রমবিকাশ ঘটল এই ভাবে। এই আলোকসুবেদী কোষপুঞ্জ এর পরে পেল একটা স্বচ্ছ ঢাকনা আর রঙীন কোষ দিয়ে তৈরি কয়েকটা পর্দা যাদের কাজ হোল চোখের ভেতরে বিভিন্ন দিক থেকে আলোককে আসতে না দেওয়া। এর পরে আলোকসুবেদী দাগগুলি গর্তে বা এমনকি থলিতে বিবর্তিত হোল, চক্ষু নাম দেওয়া যেতে পারে এমনি দেহযন্ত্রের আদিম সংস্করণের হোল উদ্ভব। এই চক্ষুগুলি কেবল একদিক

থেকে আলোক রশ্মি এলে সেটা অনুভব করতে পারে, তাই আপতিত আলোকের উৎসের দিক নির্ণয় সহজেই করতে পারে। এই ধরণের আদিম চক্ষুযন্ত্র থেকে উচ্চতর প্রাণীদের চক্ষুযন্ত্রের বিবর্তনের মধ্যে একটা ধাপই বাকি রইল। চোখকে কেবল আলোক রশ্মিকে প্রতিসারিত করা আর আলোক-উৎসের উজ্জ্বলতা আর দূরত্ব অনুসারে স্বচালিতভাবে চক্ষুগোলকের আকারের তারতম্য ঘটানোর কায়দাগুলি শিখতে হোল, সব শেষে উদ্ভাবন করে নিতে হোল সক্রিয়ভাবে নড়াচড়া করানোর কৌশল, যার ফলে দৃষ্টিসম্বন্ধীয় খবরাখবরগুলি পাবার জন্য প্রাণীটা করতে শিখল সক্রিয় অনুসন্ধান।

অমেরুদণ্ডীদের মধ্যে সবচেয়ে উন্নত ধরনের চক্ষুব্যবস্থা আছে শিরঃপাদ গোষ্ঠীর (Cephalopoda) প্রাণীদের। এদের দৃষ্টিশক্তি উচ্চতর মেরুদণ্ডীদের থেকে কোন অংশেই ন্যূন নয়। অমেরুদণ্ডীদের আর একটি শাখা সন্ধিপদ (arthropods) গোষ্ঠীর জীবেরা বিবর্তনের সরণীতে বেশ অগ্রসর কিন্তু দৃষ্টির ব্যাপারে নয়। ঘাটতিটা এরা পুরিয়ে নিয়েছে বহু সংখ্যক আলোকসুবেদী ocelli-এর (এগুলি কতকগুলি পিরামিড যাদের ভূমি বাইরের দিকে এবং স্ফটিক-স্বচ্ছ পরকলার মতো) সমষ্টি দিয়ে গঠিত কয়েকটি জটিল গঠনশৈলীর যৌগিক চক্ষু দিয়ে, প্রত্যেকটা চক্ষুতে আছে কয়েক শত বা কয়েক হাজার পিরামিড। প্রত্যেকটা পিরামিডের মিলিত প্রচেষ্টায় পতঙ্গরা বা কবচী প্রাণীরা কিছুটা হ্রস্ব দৃষ্টি হলেও বস্তুর আকার ও আকৃতি উপলব্ধি করতে পারে।

মেরুদণ্ডীদের চক্ষুর বিবর্তনের ইতিহাসটা শুরু হয়েছিল ভিন্ন রাস্তায়। অনেকগুলি সাগর বা মহাসমুদ্রের উপকূলের সমীপস্থ অঞ্চলে বাস করে কতকগুলি ছোট ছোট আজব প্রাণী, নাম এদের ল্যানসেলেট। দেখতে অনেকটা ছোট ছোট মাছের মতো, শল্যবিদের ছুরির ফলার সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে আকৃতিতে, তাই ল্যানসেট থেকেই এদের নামকরণ। এই ল্যানসেলেটদের গোটা মস্তিষ্কটায় এদের দৃষ্টিযন্ত্র। ল্যানসেলেটদের স্বচ্ছ দেহ-বরাবর প্রলম্বিত স্নায়ুকাণ্ডে যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে আলোকসুবেদী কোষ। তাই এরা আলো আর অন্ধকারের প্রভেদটা ধরতে পারে। এদের যে জীবনধারা তাতে এই ক্ষমতাটুকুই যথেষ্ট।

দেখা যাচ্ছে মেরুদণ্ডীদের পূর্বপুরুষেরা ল্যানসেলেটদের মতোই মস্তিষ্ক দিয়ে দেখতে পেত। কিন্তু তাদের শরীরটা যখন আর স্বচ্ছ রইল না তখন

আলোকসংবেদী কোষগুচ্ছগুলিকে মস্তিষ্ক থেকে বেরিয়ে আসতে হোল। সকল মেরুদন্ডীদের ক্ষেত্রেই চক্ষুর বিবর্তন এই ধারাতেই এগিয়ে চলল।

ভ্রূণের ক্রমপরিণতির একটা পর্যায়ে এসে মস্তিষ্ক থেকে দুটি স্বতন্ত্র টুকরো বেরিয়ে এসে ক্রমশ চক্ষুতে পরিণত হয়। তার মানে আমাদের চোখ দুটি আসলে মস্তিষ্কেরই দুটি টুকরো বাইরে বেরিয়ে এসেছে সূর্যের আলোকের সামনে।

মেরুদন্ডীদের চক্ষুর আরো পরিণতি চলল একই ধারায়। তাদের আলোক প্রতিসরণ ব্যবস্থা, চক্ষু-লেনসের সংকোচন, প্রসারণ ব্যবস্থা এবং চক্ষুকে নড়াচড়া করানোর জন্য পেশীব্যবস্থা গড়ে উঠল। যান্ত্রিক কৌশলগুলি ক্রমশ জটিল হতে হতে আমাদের আজকের দিনের চক্ষুতে এসে ঠেকেছে, যে চক্ষু সব চেয়ে জঘন্য হাতের লেখার জঙ্গল থেকে পাঠোদ্ধার করতে পারে, পারে বর্ণবৈচিত্র্যের মধ্যে খুব সূক্ষ্ম প্রভেদ ধরতে। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীদের মস্তিষ্কও হয়েছে আরো জটিল। চক্ষু তো কেবল আলোক ধরবার একটা যন্ত্র মাত্র, ঠিক যেন একটা ক্যামেরা। যা দিয়ে আমরা সত্যি 'দেখি' সেটা তো মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ক চোখের ভেতরে অবস্থিত লক্ষ লক্ষ আলোকসংবেদী কোষ থেকে পাওয়া তথ্যগুলি জুড়ে জুড়ে একটি সম্পূর্ণ ছবি তৈরি করে। চোখে তোলা ছবিগুলি মস্তিষ্কের পরীক্ষাগারে ডিভেলপ করা হয়।

শব্দবিশ্লেষক যন্ত্র বা কান এসেছে প্রাণীদের বিবর্তনের অনেক পরের পর্যায়ে। অমেরুদন্ডীদের অনেকগুলি নীচের ধাপের প্রাণীদের তো এই যন্ত্র আদপেই নেইামেরুদন্ডীদের মধ্যে মাছেরাই প্রথম যারা শ্রবণযন্ত্র পেল। ল্যাবিরিনথ বা ভারসাম্য নির্ধারক যন্ত্র থেকে ছোট একটা টুকরো আলাদা হয়ে পরিণত হোল শ্রবণযন্ত্রে, উচ্চতর প্রাণীদের ক্ষেত্রে যেটা পূর্ণবিকশিত ককলিয়া (cochlea) যন্ত্রে পরিণত হোল, যার অন্য নাম করটি-এর যন্ত্র, শ্রবণ কার্যের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ।

এই করটি-এর (Corti) যন্ত্র আসলে একটা ধারক যন্ত্র, যেটা অনুভব করতে পারে দ্রুত পরিবর্তনশীল অতি সামান্যতম চাপের প্রভেদ। কানের পর্দার পরিপার্শ্বের বায়বীয় মাধ্যমে দ্রুত চাপের তারতম্য ঘটলে সেটা কানের পর্দাকে প্রভাবিত বা আন্দোলিত করে। কানের পর্দার আন্দোলন কানের কয়েকটা ছোট ছোট হাড় দিয়ে গঠিত যন্ত্রব্যবস্থা মারফৎ পরিবাহিত হয়ে পৌঁছায় ডিম্বাকৃতি জানালাতে এবং ল্যাবিরিনথ-এর তরল পদার্থে। এইভাবে সেই আন্দোলন এসে পৌঁছায় করটি-এর যন্ত্রাংশে, যার তন্তুগুলি

তীব্র অনুনাদের সহায়তায় উজ্জীবিত করে তোলে শ্রুতিস্নায়ুর ধারকগুলিকে। কানের সংবেদনশীলতা কিন্তু বাস্তবিকই বিস্ময়কর। মানুষের কান সেই শব্দ ধরতে পারে যা সৃষ্টি করে 0.0001 মাইক্রোবার চাপ (0.0001 ডাইন প্রতি বর্গসেন্টিমিটারে) এই চাপ ককলীয়া-র পর্দাকে স্থানচ্যুত করে কতটুকু জানো? 0.00000000001 সেন্টিমিটার। দূরত্বটা সব চেয়ে ছোট হাইড্রোজেন অণুর ব্যাসের হাজার ভাগের একভাগ। শ্রবণশক্তির ব্যাপারে মানুষ কিন্তু বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন নয়। অনেক প্রাণী আছে যারা এর চেয়ে দুর্বল শব্দ শুনতে পায়। তাহলেও, যেহেতু মানুষ নিজেই বড় বেশি কোলাহলের সৃষ্টি করে তাই সে যে এর চেয়ে বেশি শুনতে পায় না সেটা ভালই। আরো জরুরী খবর হোল এই যে খুব জোরালো শব্দ যেমন 2000 বার (ডাইন/বর্গ.সে.মি) পর্যন্ত সে শুনে সহ্য করতে পারে, তার শ্রবণযন্ত্র বিকল হয় না। কয়েক জাতের সাদা ইঁদুরের তো জোরালো আওয়াজ শুনলেই তড়কার আক্রমণ হয়, যার থেকে তাদের মৃত্যুও ঘটতে পারে।

মানবজাতির অবস্থাটা কী হোত যদি মানুষের কান তীব্র আওয়াজ সহ্য করতে না পারত। তবে একটা সুবিধে হোত, যুদ্ধে রক্তারক্তির দরকার হোত না, সৈন্যেরা তো শত্রুর গুলিতে মরত না তারা মরত তাদের নিজেদের রাইফেলের আওয়াজেই। কামান আবিষ্কারের পর্যাইটাই আসত না।

তীব্র আওয়াজ অবশ্য মানুষের মৃত্যু ঘটায় না কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী কোলাহলের চাপের ফলে কানের ভেতরে বা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে কঠিন ব্যাধির সৃষ্টি হতে পারে। কোলাহল-বিরোধী আন্দোলনকে তাই স্বাগত জানাতে হবে, সর্বত্র। ছোট বা বড় বড় শহরে এই আন্দোলনে আমাদের সব চেয়ে বড় বন্ধু হোল বৃক্ষ। মেপল্-এর ছড়ানো শাখা প্রশাখা, বাতাবীলেবুর কোঁকড়ানো মাথাগুলি আর পপলার-এর ঘন পত্রসন্নিবেশ শব্দপ্রদমক হিসেবে ভারি **কার্যকর।**

অন্যান্য প্রাণীদের সঙ্গে তুলনায় মানুষের কান যে কেবল সংবেদনশীলতার দিক দিয়ে নিকৃষ্ট তাই নয়। প্রথমত আমরা উপলব্ধি করতে পারি একটা ছোট পাল্লার শব্দ-তরঙ্গ। কম্পনাঙ্কের মান যদি নীচের দিকে প্রতি সেকেন্ডে 16 থেকে 18 হয় তখন আর সেই শব্দকে আমরা অবিচ্ছিন্ন শব্দ বলে ধরতে পারি না। আবার এই মান যদি সেকেন্ডে 20,000 কম্পনে গিয়ে পৌঁছায়, আমাদের কানের কাছে শব্দটা অন্তর্হিত হয়ে যায়। কান তখন আর এত দ্রুত চাপের হ্রাসবৃদ্ধি অনুভব করতে পারে না। মস্তিষ্ককে সে তখন খবর
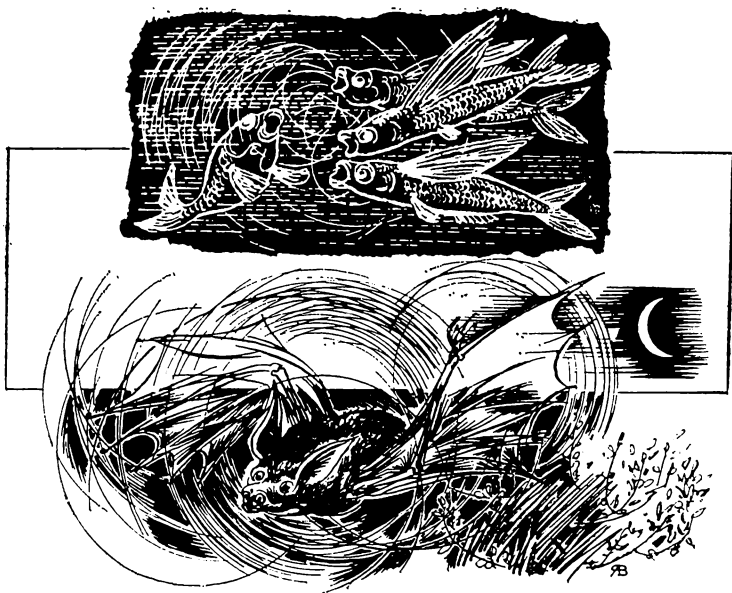
পাঠানো বন্ধ করে দেয়, আমাদের মনে হবে চারিদিক নিস্তব্ধ। সেকেণ্ডে 20,000 কম্পন কিন্তু খুব একটা বেশিমাত্রার শব্দ নয়। আমাদের নিত্যবন্ধু কুকুর প্রতি সেকেণ্ডে 38,000 কম্পনের শব্দ অনুভব করতে পারে। এই মাত্রাটাও খুবই কম, যদি মনে রাখো যে তিমি আর ডলফিনেরা শুনতে পায় 100,000 থেকে 125,000 টি কম্পন প্রতি সেকেণ্ডে আর বাদুড়েরা শুনতে প্রায় প্রতি সেকেণ্ডে 300,000 কম্পনাঙ্কের শব্দতরঙ্গ।

যেসব প্রাণীর কান অতিশব্দ (মানুষের কানে শ্রাব্য শব্দের উচ্চসীমার ওপরে) উপলব্ধি করতে পারে তারা সেগুলি নিজেরাও সৃষ্টি করতে পারে কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের যে, আমাদের কানে তারা পৌঁছায় না। তাই 'মাছের মতো বোবা' প্রবাদটি আজকের বিজ্ঞানের কাছে অর্থহীন। মাছেরা যদি আমাদের মতোই পরছিদ্রান্বেষী হোত, তাহলে তারা নিশ্চয় আমাদের সম্বন্ধে বলত, 'মানুষের মতো কালা'। সে যাই হোক, মানুষকে সৃষ্টি করার কালে প্রকৃতি যে তাকে উচ্চ কম্পনাঙ্কের শব্দ শোনার ব্যাপারে অক্ষম করেছেন সেটা, আরো নানা ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি তাঁর বিচক্ষণতারই নিদর্শন। কার্যত আমাদের লোকসান হচ্ছে না, কেবলমাত্র শিকার খুঁজতে ব্যস্ত বাদুড়ের

কিচ্‌কিচ্‌ শব্দ আর মাছেদের পরস্পরের মধ্যে গল্পগাছা আড়িপেতে শোনাটা হচ্ছে না। আমাদের নিজেদের কথাবার্তায় আমরা তো প্রতি সেকেণ্ডে 500 থেকে 2000 টি কম্পন সৃষ্টি করে বেশ ভালই চালাচ্ছি।

মানুষ আর উচ্চতর জীবেরা দ্বিকর্ণশ্রাবী, অর্থাৎ আমরা শুনে থাকি দুটি কান দিয়ে। শব্দের উৎপত্তিস্থলটাকে চিহ্নিত করতে এই ব্যাপারটা খুব সাহায্য করে। শব্দ-তরঙ্গ বাতাসে ছড়িয়ে যেতে থাকে প্রতি সেকেণ্ডে 340 মিটার বেগে। সাধারণত একটা শব্দ দুটি কানে ঠিক একই সময়ে এসে পৌঁছায় না। কেবল আমাদের মুখ যদি শব্দের উৎপত্তিস্থলের দিকে ফেরানো থাকে তাহলেই আমাদের দুটি কানে শব্দ একই সময়ে প্রবেশ করে। দুটি কানে শব্দ দুটি বিভিন্ন সময়ে এসে পৌঁছানোর মধ্যে 0.0001 সেকেণ্ড পর্যন্ত সময়ের তারতম্য মানুষ অনুভব করতে পারে।

একবার ভেবে দেখ তো, মস্তিষ্ক কত অল্প সময়ের ব্যবধান অনুভব করতে পারে। শেয়াল মানুষের থেকে নির্ভুলভাবে শব্দের উৎস নির্ণয় করতে পারে। তাদের দুটো কানের মধ্যে দূরত্ব দশ সেন্টিমিটার অর্থাৎ এক কানে শব্দ এসে পৌঁছানোর 0.0003 সেকেণ্ড পরে অন্য কানে এসে পৌঁছায়, এবং সাধারণত আরো দ্রুত। শব্দের উৎস নির্ণয় করতে শেয়াল মাথাটা ঘোরাতে থাকে যতক্ষণ না দুটো কানেই শব্দ একই সময়ে এসে পৌঁছচ্ছে।

প্রাণীরা সাধারণত এক একটা শব্দ এসে পৌঁছানোর মধ্যে যে সময়ের ব্যবধান সেটা পরিমাপ করতে এবং মনে রাখতে খুব পটু। কুকুর ঠিক ধরতে পারে প্রতি মিনিটে একশ বার বাজছে যে মেট্রোনোম তার সঙ্গে প্রতি মিনিটে আটানব্বুই বার বাজছে এমনি মেট্রোনোমের শব্দের প্রভেদ, এমনকি বাজনাটা যদি সেই একই মেট্রোনোমের হয় তাহলেও। পেশাধারী সঙ্গীতজ্ঞের শিক্ষিত কানও মনে করবে যে দুটি শব্দের লয় অভিন্ন।

মানুষের কান মনুষ্যেতর জন্তুদের কানের থেকে নানা দিক দিয়ে নিকৃষ্ট। তবে একটা ব্যাপারে মানুষের কানের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসম্বাদিত। কোন প্রাণী দ্রুত পরিবর্তনশীল শব্দপ্রবাহকে বিশ্লেষণ করতে পারে না। এটা করতে আমাদের পারতেই হবে, তা না হলে কথা বলা শেখাই হোত না।

তৃতীয় নয়ন

স্টেশনে ট্রেন এসে দাঁড়ায়, একট্রেনভর্তি ছেলে মেয়ে ছুটিতে বেড়াতে চলেছে। দৈত্যাকার লাল ইনজিনটার গতি কমে আসে, ব্রেক কষার শব্দ শোনা যায়। পেছনে রেলের লাইনের ওপর সর্পিল ভঙ্গিতে এক ডজন সুদৃশ্য গাঢ়-সবুজ কামরা আস্তে আস্তে থামে, চওড়া জানলাগুলি ঝক্ ঝক্ করছে। সাদা সাদা নাক কাঁচের ওপর লেপটে থাকে, জোড়া জোড়া চোখ, কালো, ধূসর, নীল, সবুজ সর্বত্র দেখা যায় লাইন ধরে ভূমির সমান্তরাল তিনটি বা চারটি সারিতে। বিরাট একটা রূপকথার দানবের মতো, আগুয়ান ট্রেনটা যেন শহর দেখছে হাজার খানেক উৎসুক চোখ দিয়ে।

'ঠিক যেন হাজার চোখের একটা দৈত্য', ভিড়ের মধ্যে কেউ যেন বলে ওঠে। উপমাটা লাগসই কিন্তু। সত্যিই টেনটাকে দেখাচ্ছে যেন একটা টারবেলারিয়া কেননা এই পোকাটার শরীরের সামনেটায় আছে বুটি দেওয়া অতি ছোট আকারের চোখের সারি। ট্রেনের নড়াচড়াও এই পোকাটার মতোই মসৃণ, ধীর, আঁকা বাঁকা গতি।

চক্ষু অতি জরুরী জ্ঞানেন্দ্রিয়। সন্দেহ কি, বহু প্রাণীর রয়েছে ডজন ডজন, কখনো বা শত শত চোখ। জীবটার চোখগুলি যত হবে আদিম ধাঁচের, তত বেশি সংখ্যায় তার চোখ থাকা দরকার নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য। অন্যপক্ষে, চক্ষু যত নিখুঁত হবে তার সংখ্যা সেই হারে কম হলেই চলবে। এমনকি একচক্ষু প্রাণীও আছে, এদের নাম কোপিপোড়া, 'সাইক্লোপিস'ও বলা হয় গ্রীক পুরাণোক্ত একচক্ষুবিশিষ্ট দৈত্যদের কথা স্মরণ ক'রে। মাথার সামনে একটিমাত্র চোখই এরা জীবন নির্বাহের পক্ষে পর্যাপ্ত মনে করে।

ঠিক কতগুলি চোখ থাকলে সর্বদিক দিয়ে আদর্শস্থানীয় হোঁত বল দেখি! প্রশ্নটার উত্তর কিন্তু যত সোজা ভাবছ ততটা নয়। কোন প্রাণীর কয়টি চোখের প্রয়োজন সেটা নির্ভর করে চোখগুলির গুণমান আর প্রাণীটার জীবনধারার ওপর। আজকের যুগের কতকগুলি প্রাণী আছে যাদের এককালে খুবই উন্নত চোখ ছিল কিন্তু পরবর্তী যুগে সম্পূর্ণ অন্ধকার পরিবেশে বাস করতে করতে চোখগুলি লয়প্রাপ্ত হয়ে গেছে। ঠিক এই ব্যাপার ঘটেছে মেকসিকোর গুহাবাসী মাছদের বেলায়।

মনে হয় এই ব্যাপারে প্রকৃতির ওপর ভরসা রাখা যেতে পারে। চক্ষুর

বিবর্তনের শুরুতে প্রত্যেক প্রজাতির জীব বেঁচে থাকার তাগিদে যতগুলি পারল চক্ষু যোগাড় করে নিল। বিশেষত মেরুদণ্ডীরা, যাদের মধ্যে আছে মানুষ, তাদের জটিল, অত্যন্ত উন্নত মস্তিষ্ক আর নিখুঁত চক্ষু নিয়ে দেখল যে গোটাতিনেক চোখই যথেষ্ট। লিখতে গিয়ে ভুল করে বসিনি, সংখ্যাটা সত্যি সত্যিই তিন।

মাছ, উভচর, সরীসৃপ, এমনকি স্তন্যপায়ীদের আর আমাদের প্রত্যেকেরই আছে তিনটি করে চোখ। সাধারণত আমরা তৃতীয় চক্ষুটার কথা ভুলে থাকি বা জানিই না তার অস্তিত্বের কথা। এর কারণ এই যে এই বাড়তি চক্ষুটা আমাদের মস্তিষ্কের গভীর অন্তরালে লুকানো আছে, বাইরে থেকে সেটা দেখা যায় না। একে চক্ষু আখ্যা দেওয়া হয় না, বলা হয় পিনীয়াল গ্রন্থি। মেরুদণ্ডীদের বিবর্তনের প্রবাহে এই এককালের আসল চক্ষু বিবর্তিত হয়ে একটি আসল গ্রন্থিতে পরিণত হয়েছে।

রহস্যে ঢাকা এই চক্ষু আকৃতিতে বড়ো নয়। মানুষের ক্ষেত্রে এর ওজন 0.1 থেকে 0.2 গ্রাম অর্থাৎ এ যুগের কুমিরের বা অধুনালুপ্ত দৈত্যাকার প্যাঙ্গোলিনের তৃতীয় নয়নের থেকে অনেক ছোট।নিম্ন শ্রেণীর মেরুদণ্ডীদের ক্ষেত্রে এই দেহযন্ত্রের আকৃতি সাধারণ চোখের থেকে প্রায় অভিন্ন। এর বাইরের দিকে আছে একটা স্ফটিক-স্বচ্ছ লেনস, ভেতরটা পূর্ণ আছে স্বচ্ছ জেলি দিয়ে, যার নাম চটচটে অবয়ব, আর আছে অসম্পূর্ণ রেটিনা যাতে আছে আলোকসুবেদী কোষ, আরো আছে শিরাধমনীতন্ত্রের পর্দার আভাস। এই চোখেরও, প্রকৃত চক্ষুর মতো আছে নিজস্ব স্নায়ু।

বিজ্ঞানীদের বিস্ময়ের কথাটা কল্পনা করে দেখ, একশ বছর আগে যখন তাঁরা সর্বপ্রথম আবিষ্কার করলেন এই তৃতীয় নয়নের অস্তিত্ব। অসংখ্য অদ্ভুত অদ্ভুত অভিমত প্রস্তাবিত হতে থাকল। মস্তিষ্কের মধ্যে বসে এই চক্ষু কী দেখছে গোপনে গোপনে? এমন হতে পারে কি যে, মানুষ এই চক্ষু দিয়ে নিজের চিন্তা ও ভাবাবেগগুলি অনুধাবন করে দেখে? এমনিধারা কত না আজগুবি ধারণা ব্যক্ত করা হয়েছিল।

তৃতীয় নয়নের কাজগুলি ব্যাখ্যাত হোল যখন দেখা গেল যে সব মেরুদণ্ডীদেরই রয়েছে এই চক্ষু। বেশির ভাগ মেরুদণ্ডীদের, ক্ষেত্রে, যেমন ব্যাঙের ক্ষেত্র, এর অবস্থানটা হোল মাথার খুলির চাঁদি বা মধ্যেস্থলে ত্বকের নীচে, সিনসিপিটাল অঞ্চলে, গিরগিটিদের ক্ষেত্রে এটা আছে চামড়ার ঠিক নীচে, যদিও আঁশ দিয়ে ঢাকা। ইগুয়ানা বা দক্ষিণ আমেরিকাবাসী প্রকাণ্ড

গোসাপদের এই আঁশ আবার স্বচ্ছ, নিউজিল্যাণ্ডের গোসাপ টুয়াটারাদের ক্ষেত্রে এই চোখ ঢাকা আছে স্বচ্ছ, পাতলা একটা পর্দা দিয়ে। নিঃসন্দেহে এই চক্ষু দেখতে পায়।

এই অন্তস্থ চক্ষু কী কাজ করে বিজ্ঞানীরা সেটা দেখতে ব্যগ্র হলেন। পরীক্ষা করে জানা গেছে যে আলোকে এই চক্ষু সাড়া দেয়, রঙের বৈচিত্র্যও ধরতে পারে। এই ক্ষমতাটা কিন্তু তুচ্ছ করবার নয় কেননা অনেক প্রাণীর বেলাতেই স্বাভাবিক দুটি চক্ষুও বর্ণে বর্ণে প্রভেদ ধরতে পারে না।

টুয়াটারা একটি অত্যন্ত আদিম প্রাণী — বলা যায় জীবন্ত ফসিল বা জীবাশ্ম। এই গোসাপেরা বাস করত সেই প্রাচীন যুগে যে কালে এই পৃথিবীতে বাস করত দৈত্যাকার প্যাঙ্গোলিনেরা এবং সেই যুগ থেকে আজ পর্যন্ত এদের বিশেষ কিছু বিবর্তন হয় নি। হয়ত সেই সুদূর অতীত কালে সকল প্রাণীই তৃতীয় নয়ন নিয়মিত ব্যবহার করত। এই অভিমতটা এখন সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। প্যালেওনটোলজিস্ট-এরা (Paleontologists) মানে সেই সব বৈজ্ঞানিক যাঁরা অবলুপ্ত প্রাণীদের বিষয়ে চর্চা করেন, তাঁরা অবলুপ্ত দৈত্যাকার প্যাঙ্গোলিনের মাথার খুলির ওপরের অংশে একটা গর্ত দেখে চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত হলেন। এখন এটা স্পষ্ট হয়েছে যে এই গর্তটা তৃতীয় নয়নের বসবার খোপ, দু পাশের দুটি চোখের গর্ত থেকে সামান্য ছোট। কোন সন্দেহ নেই যে আদিম যুগে জীবেরা তিনটে চোখেরই পূর্ণব্যবহার করত। ভেবে দেখ কত সুবিধে হোত যদি জল থেকে ডাঙায় ওঠার আগে মাথাটি জলের উপরিতলের কাছাকাছি এনে তৃতীয় চক্ষুটি দিয়ে একবার বাইরের জগতের অবস্থাটা দেখে নিতে পারতে। হিংস্র জন্তুদের পক্ষেও এই তৃতীয় নয়নটা দরকারী একটা হাতিয়ার হতে পারত, তারা সর্বদা সশঙ্কিত, শিকার বুঝি পালিয়ে গেল, আর শিকারদের ক্ষেত্রে এই চক্ষু কত উপযোগী হোত সে কথা বলাই বাহুল্য।

তাহলে, তৃতীয় নয়নের উদ্ভব ও আদিম কার্যকলাপের ব্যাপারটা খোলসা হয়ে গেল। যেটা এখনো রহস্যে ঢাকা রইল সেটা হোল, আধুনিক যুগের প্রাণীদের তাহলে কেন এই চোখ আছে। সরীসৃপদের অনেকেই এই চক্ষু দিয়ে দেখতে পায় না কেননা চক্ষুটা ঢাকা থাকে আঁশ দিয়ে। আবার অন্যপক্ষে যদি এই চক্ষু সম্পূর্ণ নিরর্থক হোত তাহলে এর টিঁকে থাকার সম্ভাবনা তিমি-র পেছনের পায়ের টিঁকে থাকার সম্ভাবনার চেয়ে বেশি থাকত না। বিজ্ঞানীরা অবহিত আছেন যে, যেসব দেহযন্ত্রের ব্যবহার ফুরিয়ে যায় তাদের

অবলুপ্তিও ঘটে যায়। তাই, তৃতীয় নয়নের টিঁকে থাকার অর্থ হোল এই যে বর্তমান যুগের প্রাণীদের ক্ষেত্রেও তৃতীয় নয়নের কোন না কোন কাজ আছে। কিন্তু কী-ধরনের কাজ? বিজ্ঞানীরা অনুসন্ধান চালিয়ে গেলেন।

ক্রমে ক্রমে আবিষ্কৃত হতে থাকে যে শীতল রক্তের প্রাণীরা এই চক্ষু ব্যবহার করে থারমোমিটার হিসেবে। এই প্রাণীরা তাদের শরীরের উষ্ণতা অপরিবর্তিত রাখতে পারে না। তারা এই উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে উত্তপ্ত সূর্যালোক থেকে দিনের বেলায় এবং শীতের রাতে তুষারের হাত থেকে লুকিয়ে থেকে। কিন্তু শরীরটা খুব বেশি উত্তপ্ত বা শীতল হয়েই যদি গেল তাহলে তো তখন লুকানোর পক্ষে বেশ বিলম্ব হয়ে গেছে। প্রাণীটার তো সর্দি গর্মি হতে পারে, কিংবা ঠাণ্ডায় জমে সে মরে যেতে পারে। তৃতীয় চক্ষু বাইরের উষ্ণতার পরিমাপ করতে পারে, প্রাণীটাকে সাবধান করে দেয় যে এক্ষুণি লুকিয়ে পড়তে হবে, তা না হলে অত্যধিক গরমে বা দারুণ ঠাণ্ডার শিকার হতে হবে। প্রাণীটার ত্বক আসলে তাপরশ্মির পক্ষে কোন বাধার সৃষ্টি করতে পারে না।

তৃতীয় নয়নের কিন্তু এই একটাই কাজ নয়। উভচরদের ক্ষেত্রে ত্বকের রঙের নিয়ন্ত্রণও করে থাকে এই তৃতীয় চক্ষু। একটা ব্যাঙাচিকে আধঘণ্টা কাল অন্ধকার ঘরে রেখে দিলে দেখা যাবে যে তার রংটা হালকা হয়ে গেছে। কিন্তু সেই ব্যাঙাচির তৃতীয় চক্ষুটা অপসারিত করে নিলে আর রঙের পরিবর্তন সে করতে পারবে না। জানা গেছে যে তৃতীয় নয়ন একটা বিশেষ হরমোন তৈরি করে — মেলাটোনিন, যেটা ত্বকের রং কিছুটা ক্ষয় করে দিতে পারে। আলোক এই হরমোনের উৎপাদন প্রদমিত করে দিতে পারে।

স্তন্যপায়ীদের এই তৃতীয় নয়নটা যদিও করোটির মধ্যে অনেক ভেতরে লুকানো থাকে, তাসত্ত্বেও বাইরে কি ঘটছে না ঘটছে সে কিন্তু ঠিক ঠিক খবর রেখে চলেছে। সময়টা দিন না রাত সেটাও এই তৃতীয় নয়ন অনুভব করতে পারে। মনে হয় এই যন্ত্রটি খবর পেয়ে যায় সরাসরি। যে স্নায়ুগুলি এই তৃতীয় নয়নে প্রবেশ করে সেগুলি আসে কাঁধের ওপরের স্নায়ু-জট বা যোগাযোগ কেন্দ্র থেকে। আসলে আছে কয়েকটা সংবেদক স্নায়ুর শাখা যারা অন্যান্য কাজের সঙ্গে পেশীকে সঞ্জীবিত করে আর চোখের তারার ছিদ্রকে বিস্তৃত করে থাকে। আমরা সবাই জানি যে অন্ধকারে চোখের তারার ছিদ্র বড় হয়ে যায়। খুবই সম্ভব যে দিন-রাত্রির ক্রমান্বয় এবং অন্যান্য কারণে উজ্জ্বলতার হেরফের পিনীয়াল গ্রন্থির ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবিত করে।
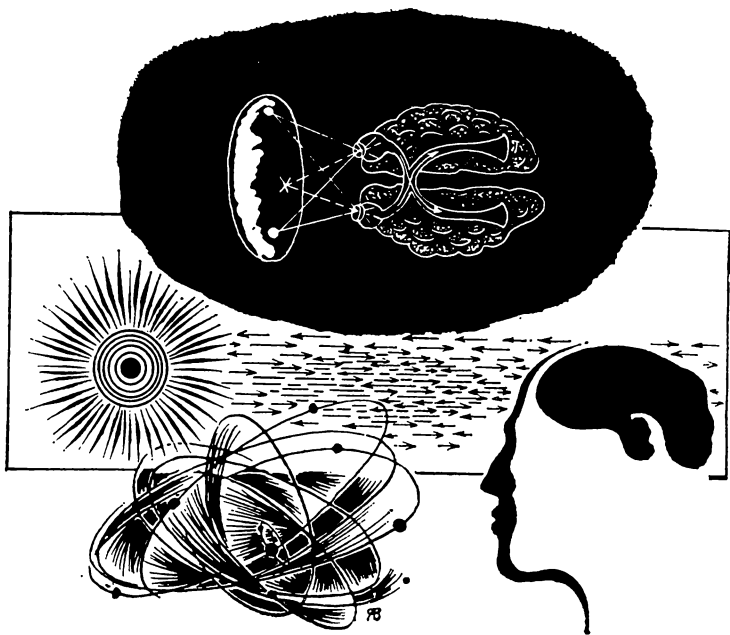
ইঁদুরদের যদি দীর্ঘকাল আলোকের মধ্যে রেখে দেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে তাদের পিনীয়াল গ্রন্থির ওজনের লক্ষণীয় হ্রাস ঘটেছে। অপরপক্ষে, দীর্ঘকাল অন্ধকারের মধ্যে বাস কিন্তু এই অন্তশ্চক্ষুকে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করে না।

তৃতীয় নয়নের কাজকর্ম শুধু যে ত্বকের রং আর তাপের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে সীমাবদ্ধ তা নয়। সর্বাত্মক অনুসন্ধান করে জানা গেছে যে মানুষের এই তৃতীয় নয়ন প্রকৃত একটি গ্রন্থিতে পরিণত হয়েছে, যদিও গ্রন্থিটি কিছু অসাধারণ। পিনীয়াল গ্রন্থি ছাড়া আর কোন গ্রন্থিতে সাধারণ স্নায়ুকোষ বা astrocytes থাকে না, যে স্নায়ুকোষ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় মস্তিষ্কের অর্ধমণ্ডলে। কী উদ্দেশ্যে এই স্নায়ুকোষগুলি একটা গ্রন্থির সঙ্গে এমন নিবিড়ভাবে মিশে থাকবে সেটা অবশ্য জানা যায়নি।

এই মুহূর্তে পিনীয়াল গ্রন্থি নিয়ে গবেষণা চলছে বিশ্বজুড়ে বহু পরীক্ষাগারে। ব্যাঙাচি বিজ্ঞানীকে ইঙ্গিত দিল যে এই তৃতীয় নয়ন উচ্চতর প্রাণীর শরীরেও হয়ত হরমোন উৎপন্ন করে। এই ধারণা সমর্থিত হয়েছে। যে হরমোন উৎপন্ন হয়ে থাকে সেটা মস্তিষ্কের আর একটা অঞ্চলে,

হাইপোথ্যালামিক-হাইপোফাইসিয়াল জটলাতে কাজ করে, এই অঞ্চল শরীরের জল আর লবণের অনুপাতসাম্য, রক্তের দ্রব্যসমষ্টি, পরিপাক, যৌন পরিণতি, যৌন-আচার এবং সবচেয়ে বড় কথা মানসিক ভাবাবেগগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। তারমানে, এক কথায় এই অঞ্চল নির্ধারণ করে আমাদের মনের সমুদায় ক্রিয়াকলাপ। প্রাণীদের ওপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে কমবয়সী ইঁদুরের তৃতীয় নয়ন অপসারিত করে ফেললে তারা বেড়ে ওঠে তাড়াতাড়ি, শরীরগুলি সাধারণের থেকে আকৃতিতে বড় হয়। তাদের শারীরিক পূর্ণতা ঘটে তাড়াতাড়ি এবং তারা বাচ্চা দেয় অল্প সময়ের ব্যবধানে। তৃতীয় নয়ন না থাকলে মুরগীর ক্ষেত্রেও অনুরূপ ফল পাওয়া গেছে। তারা তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে, মুরগীরা ডিমও দেয় অনেক বেশি। মানব শিশুদের মধ্যে যাদের পিনীয়াল গ্রন্থির কাজকর্ম বিঘ্নিত হয়েছে বা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে ব্যাধির ফলে, তাদের যৌবনোদ্গম ঘটে যায় অত্যন্ত জলদি, আর তাদের প্রজননের দেহযন্ত্রাদি খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে এবং আকৃতিতেও হয় অত্যন্ত বৃহদাকার। অপরপক্ষে, পিনীয়াল গ্রন্থি থেকে নির্যাস নিয়ে নিয়মিত সেবন করালে যৌনপূর্ণতা বিলম্বিত হয় এবং পূর্ণবয়স্ক প্রাণীর যৌন গ্রন্থিগুলি শুকিয়ে যায়। এইসব প্রাণীরা বাচ্চা দেয় কদাচিৎ আর যৌন কার্যকলাপও এদের অনেক কম।

আরো অনুসন্ধান ও চর্চার ফলে আরো কতকগুলি কৌতুহলজাগানো খবর পাওয়া গেছে। জানা গেছে পিনীয়াল গ্রন্থি রক্তের শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে অংশ নেয়, কাজ করে হয়ত পিটুইটারি গ্রন্থির সহযোগে অথবা সরাসরি প্যানক্রিয়াস-এর ওপর। যদি পিনীয়াল গ্রন্থির নির্যাস প্রাণীদেহে প্রবিষ্ট করা হয়, শরীরে জলের বিপাকের ব্যবস্থায় তীব্র পরিবর্তন ঘটে। কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে তৃতীয় নয়ন অ্যাড্রিনাল আর থাইরয়েড গ্রন্থির কাজ কর্মকে প্রভাবিত করে।

মানুষ এবং অন্য প্রাণীদের নিয়ে গবেষণা থেকে ধারণা হয় যে পিনীয়াল গ্রন্থি ক্রিয়াশীল থাকে জন্ম থেকে শুরু করে বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত যদিও তাদের কাজকর্মের ধর্ম বদলায় বয়সের সঙ্গে। এই ধারণাটা আসে পিনীয়াল গ্রন্থির কোষকলাতে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস আর লোহা-র আবির্ভাব লক্ষ্য করার পরে। সদ্যোজাত শিশুদের মস্তিষ্কে এই 'বালুকণা' কিন্তু কখনো পাওয়া যায় না। পনের বছরের নীচের বয়সের ছেলে-মেয়েদের মস্তিষ্কেও কদাচিৎ পাওয়া যায়, কিন্তু আরো বেশি বয়সে এই বালু-র পরিমাণ বাড়তে

থাকে প্রত্যেক বছর। অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানতে পারি যে চোখের ভেতর একটুকরো বালি পড়লে কত কষ্ট দেয়। তাই, বিশ্বাস করা শক্ত যে তৃতীয় নয়নের মধ্যে এক চিমটে বালি থাকবে অথচ তার কাজকর্মে বাধার সৃষ্টি করবে না।

তৃতীয় নয়ন আবিষ্কৃত হওয়া থেকে অনেক বিস্ময়কর ব্যাপার আমরা জেনেছি এর বিষয়ে। এখনো পর্যন্ত এর সব কাজের বিষয়ে আমাদের জানা শেষ হয়নি। পরীক্ষা চলছে এবং খুবই সম্ভব এই রহস্যজনক এবং এখনো অপরিজ্ঞাত দেহযন্ত্রের বিষয়ে বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধান আরো কয়েকটি বিস্ময়ের সৃষ্টি করবে।

আলোকের অত্যাশ্চর্য জগৎ

ভৌতবিদ্যা একটি অতি সুপ্রাচীন বিজ্ঞান। প্রথম আলোকযন্ত্র — চ্যাপটা আয়না, অনাদিকাল থেকেই জানা আছে। আলোককে একটি রশ্মিতে কেন্দ্রিত করতে বা সমানভাবে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম বর্তুলাকার আয়না আবিষ্কৃত হয়েছে অনেক পরে। প্রথম দিকে আয়না তৈরি হোত ধাতু দিয়ে। কাঁচের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে আলোকতত্ত্বের চর্চার নতুন দিগন্ত খুলে যায়, কিন্তু কাঁচকে পালিশ করে পরকলা বা লেন্স তৈরি করার কৌশল মানুষের মাথায় আসতে আরো অনেক দিন লেগেছিল।

আতসকাঁচের ভেতর দিয়ে বস্তুকে বড় করে দেখার বাসনা সেকালের শিক্ষিত লোকের কল্পনায় আসে এর পর। ছোট ছোট বস্তুকে আতসকাঁচের সাহায্যে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিরীক্ষণ করে দেখতে অনেকেই ভালবাসত, যারা আরো উদ্ভাবনশীল তারা টুপির সঙ্গে এই কাঁচ বেঁধে বা ঝুলিয়ে রেখে চলা ফেরা করত, ব্যবহার করত এক ধরনের চশমার মতো। কিছু কাল এগুলি সৌখিন অলঙ্কার হয়ে চালু রইল। এই কাঁচগুলি থেকে ক্রমশ বর্তমান কালের বাইনোকুলার বা টেলিসকোপের বিবর্তন হতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল। উদ্ভাবকেরা আদপেই ভাবেননি প্রকৃতির কাছে কার্যত তাঁরা কত কিছু কর্জ নিয়েছেন। বস্তুত আমাদের চক্ষু আধুনিক আলোক বা টেলিভিশন ক্যামেরা থেকে কোন অংশেই ন্যূন নয়। চক্ষুর মধ্যে আছে বিশেষ ব্যবস্থা যার সাহায্যে আলোকরশ্মিকে প্রতিসরিত করে চোখের পশ্চাদ্ভাগের ভেতরের তলে কেন্দ্রিত করা হয়। আছে একটা পর্দা, চোখের

মধ্যে কতটা আলো প্রবেশ করবে সেটা নিয়ন্ত্রণ করতে, আর আছে আলোক-সংবেদী পদার্থের কণানিচয়। এই পদার্থ-কণাদের সঞ্জীবন পরিবাহিত হয়ে যায় চক্ষুর স্নায়ুতন্তুর মধ্যে দিয়ে মস্তিষ্কের পশ্চাদ্ভাগে যেখানে স্পন্দনগুলির শ্রেণীবিন্যাস করা হয়, ঠিক যেমন করা হয় টেলিভিশনের পর্দায়, যার ফলে দৃষ্টির সংবেদনা ও দৃশ্যমান চিত্র তৈরি হয়ে যায়।

কোন একটা বস্তুকে স্পষ্টভাবে দেখতে হলে তার চিত্রটা আলোকসংবেদী পদার্থ-কণাগুলির ওপর তীক্ষ্নভাবে কেন্দ্রিত হওয়া চাই। আধুনিক ক্যামেরাতে এই কাজটা করা হয় লেনসের অবস্থানটা বদলিয়ে। প্রকৃতিও এই একই কৌশল বেছে নিয়েছিলেন আদিম মেরুদণ্ডীদের চোখের ক্ষেত্রে। মাছ আর উভচরদের চোখে আছে দানাবাঁধা স্ফটিক-স্বচ্ছ লেনস, চোখের ভেতরে আলোক প্রতিসরণের জন্য প্রধান মাধ্যমই সেই লেনস, আর আছে বলয়াকৃতি বিশেষ একটা পেশী যা দিয়ে এই লেনসকে চক্ষুর অক্ষ বরাবর নাড়াচাড়া করা যায়।

সরীসৃপ, পাখি আর স্তন্যপায়ীদের আছে একটা ভিন্ন ব্যবস্থা যেটা আজ পর্যন্ত আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা কাজে লাগায় নি। এই কৌশলের সাহায্যে আলোক কেন্দ্রিত হয় দানা-বাঁধা স্ফটিক-স্বচ্ছ লেনসের বক্রতার হেরফের ঘটিয়ে, অর্থাৎ লেনসের আলোক প্রতিসরণ ক্ষমতাটা বাড়িয়ে বা কমিয়ে। চার পাশের বলয়াকার পেশীর সাহায্যেই এটা করা হয়।

পাখিরা আর সরীসৃপেরা এই দানাবাঁধা লেনসের আকারটা বদলাতে পারে লেনসের বাইরের পেশীতে চাপ দিয়ে — এভাবে লেনসটাকে আরো গোল করে ফেলা যায়। স্তন্যপায়ীদের বেলায় এই বলয়াকৃতি পেশী সব দিক থেকে টেনে লেনসটাকে বাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে, তার মানে লেনসটা চ্যাপটা হয়ে যায়। পেশীটা আলগা হলে লেনস ফিরে পায় তার আগের বক্রতা। পেশীর চাপে প্রভাবিত হয় মুখ্যত লেনসের সামনের দিকের তলটা যার বক্রতার ব্যাসার্দ্ধ 6 থেকে 10 মিলিমিটার পর্যন্ত কম বেশি হয়ে থাকে। পেছনের দিকের ব্যাসার্দ্ধের হেরফের অর্ধ মিলিমিটারের বেশি কখনোই হয় না।

স্তন্যপায়ীদের চোখের আলোক প্রতিসরণ ব্যবস্থাটার পরিকল্পনা করার কালে প্রকৃতি একটা সাংঘাতিক ভুল করে ফেলেন। তিনি তো স্বপ্নেও ভাবেননি যে প্রাণীগোষ্ঠীর উচ্চতম প্রতিনিধি, মানে মানুষ নানা ধরনের ছোট ছোট আঁকিড় মাকিড় উদ্ভাবন করে তাদের নাম দেবে বর্ণমালা আর

সেগুলি ব্যবহার করবে বাণী বিনিময়ের কাজে। তার মানে মানুষকে হতে হবে বেশ খানিকটা হ্রস্বদৃষ্টি যাতে সে তার নিজের সৃষ্ট আঁকাজোকাগুলি পড়তে পারে। তখন থেকেই মানুষের অসুবিধে শুরু হয়ে গেল, যেজন্য প্রকৃতিই দায়ী। আমাদের স্ফটিক-স্বচ্ছ দানাবাঁধা লেনসটা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার স্থিতিস্থাপকতা হারিয়ে বসে। টানলে এটা বাড়ে কিন্তু আলগা করলে আর পূর্বের আকৃতি ফিরে পায় না। তাই লোকে বয়স বাড়লে দীর্ঘদৃষ্টি হয়ে যায় যেজন্য চশমা ব্যবহার করা দরকারী হয়ে পড়ে।

চোখের আলোক প্রতিসরণ ক্ষমতা মূলত করনিয়া (Cornea) বা চোখের মণির প্রতিসরণ ক্ষমতা আর স্ফটিক-স্বচ্ছ দানাবাঁধা লেনসের প্রতিসরণ ক্ষমতার মিলিত ফল। চোখের মণি আর তার পেছনের স্বচ্ছ তরল পদার্থের প্রতিসরণাঙ্ক প্রায় জলের প্রতিসরণাঙ্কের সমান। এই কারণে জলের নীচে আমাদের দৃষ্টি সাংঘাতিকভাবে ব্যাহত হয়। যে রশ্মিগুলি চোখে এসে পৌঁছায়, চোখের মণির ভেতরে সেটা প্রতিসরিত না হয়েই ঢোকে তাই দানা বাঁধা লেনস একলা তাদের ঠিক মতো কেন্দ্রিত করতে পারে না আলোকসুবেদী পদার্থসমূহের কাছে। জলের নীচে লোকে তাই এতই দীর্ঘদৃষ্টি হয়ে যায় যে সকল বস্তুকেই তা সে যতদূরেই থাকুক দেখতে পায় যেন খুব কাছেই রয়েছে। কেবল বড় বড় বস্তুই সে দেখতে পায়, তাও বেশ অস্পষ্টভাবে। ডুবুরীরা মাথায় হেলমেট পরে অ্যাকোয়ালাঙ (aqualungs) নিয়ে জলে নামে, তারা জলের মধ্যে স্পষ্ট দেখতে পায়, কেন না তাদের চোখ সরাসরি জলের স্পর্শ পায় না — কাঁচের আড়ালে থাকে, থাকে বাতাসের একটা পাতলা ব্যবধান। তাই আলোককে কেন্দ্রিত করতে চোখের মণি আর দানাবাঁধা লেনস যুগপৎ সক্রিয় হতে পারে। প্রত্যেকটি মূর্তি বা আকৃতি তারা দেখে পরিষ্কার, কেবল সব কিছু যেন নিজের আকারের থেকে এক তৃতীয়াংশ বড় হয়ে গেছে। অ্যাকোয়ালাঙ-পরিহিত শিকারীদের জলের নীচের অভিযানের গল্প শুনতে বসে এই কথাটা মনে রাখবে কিন্তু।

চক্ষুর প্রতিসরণ ক্ষমতা কেবল চক্ষু-মণি বা দানাবাঁধা লেনস-এর বক্রতার ওপরই নির্ভর করে না, পরন্তু এই চক্ষু-মণি বা লেনস যে পদার্থ দিয়ে তৈরি, তার ওপরও।

মাছের চক্ষু-মণি জলের মধ্যে আলোক প্রতিসরণ মানুষের চক্ষু-মণির থেকে ভালভাবে করতে পারে না। মাছেরা তাই সে চেষ্টাও করে না। তাদের চক্ষু-মণি প্রায় চ্যাপটা কিন্তু এই অসুবিধেটা পুষিয়ে যায় তাদের লেনসের

বর্তুলাকৃতির জন্য। তিমি-র চক্ষু-মণি উত্তল, তার প্রতিসরণাঙ্ক ও বেশি, তাই চক্ষু-মণি আর লেনস দুটোই আলোককে কেন্দ্রিত করার কাজে সক্রিয় হয়।

প্রত্যেক প্রজাতির জীবের চক্ষুর বিকাশ ঘটেছে এমনভাবে যাতে তাদের পরিবেশের পক্ষে সেই চক্ষু উপযোগী হয়। তাই, যাদের জলের ভেতরে আর ডাঙাতেও দেখতে হবে তারা পড়ল উভয়সঙ্কটে। হয়, যে কোন একটা মাধ্যমে দেখার উপযোগী দৃষ্টি বেছে নাও নতুবা চোখের অনেক ভাঙচুর ঘটতে দাও। চ্যাং মাছের চোখ ডাঙার প্রাণীর চোখের অনুরূপ। এইছোট মাছটা তীরের ধারের গাছে চড়তে ভালবাসে, জলের বাইরে বেশ কয়েক ঘণ্টা কাটায়। জলের নীচে সে একেবারেই দেখতে পায় না, কিন্তু সেটা কোন জরুরী ব্যাপারই নয়, কেননা যেসব ডোবাতে এরা থাকে তার ঘোলা জলে এমনিতেই কিছু দেখা যায় না।

নাগরদোলা-গুবরে পোকারা বাস করে স্বচ্ছ জলে। এরা কি করবে তা স্থির করতে অনেক দ্বিধা করল, তাই প্রকৃতি এদের দিলেন দুজোড়া চোখ, এক জোড়া জলের নীচে থাকার সময় কাজে লাগে, অন্য জোড়া জলের বাইরে। এমনি দাক্ষিণ্য তিনি আবার দেখিয়েছেন মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার হ্রদবাসী চার চক্ষুর মাছদেরও। এই মাছেরা টুক্ করে জল থেকে লাফ দিয়ে উড়ে-বেড়ানো পতঙ্গটাকে ধরে খায়।

প্রকৃত পক্ষে চার চোখের মাছদের দুটো সাধারণ চোখই আছে, কেবল তাদের চোখের মণির ছিদ্রটা ওপর-নীচে লম্বালম্বিভাবে বিস্তারিত, মাঝ বরাবর একটা বিশেষ প্রচ্ছদ দিয়ে দুটি ভাগে আলাদা করা আছে। ওপরের অংশে আলোক প্রতিসরণের স্বচ্ছ মাধ্যমটা বাতাসের পরিবেশে দেখার উপযোগী, নীচের অংশটা জলের মধ্যে দেখার পক্ষে প্রশস্ত।

দ্রুতগামী প্রাণীদের চক্ষু গড়তে গিয়ে প্রকৃতির আবার চিন্তায় মাথাধরে গেল। করমোর‍্যান্ট-এর চাই দীর্ঘদৃষ্টি, অন্য যে কোন পাখিরই মতো, কিন্তু জলের মধ্যে মাছ ধরতে তাদের খুব কাছাকাছি স্পষ্ট দেখার দৃষ্টি থাকা বিশেষ দরকার। কোন যুবক মানুষেরও চোখের প্রতিসরণ ক্ষমতা 15D (Diopter)-এরবেশি নয় ($D = 1/f$ মিটার), কিন্তু করমোর‍্যাণ্ট-এর চোখের প্রতিসরণ ক্ষমতা 40 D থেকে 50 D। এর কল্যানে করমোরান্ট জলের নীচের ঘাসের মধ্যে দ্রুত অপসৃয়মান ছোট মাছকেও যেমন দেখতে পায়, তেমনি তার মাথার অনেক ওপরে উড্ডীন ঈগলকেও দেখতে অসুবিধে হয় না।

সীলদের জাতের সকলেই, আর সামুদ্রিক সাপদেরও অনেকে জলে বা ডাঙায় দেখে ভালই। পেঙ্গুইনেরা কিন্তু জলের বাইরে বড়ই হ্রস্বদৃষ্টি।

আধুনিক কালের জীবদের আলোকের প্রতি সংবেদনশীলতায় প্রচুর তারতম্য দেখা যায়। কারণটা পরিষ্কার। আমাদের ভূমণ্ডলে স্থানভেদে উজ্জ্বলতার প্রচুর হেরফের দেখা যায়, এই দেখ ঝলমলে রোদ, এই মেঘলা, আবার এলো অন্ধকার রাত্রি। কত প্রাণী পাকাপাকিভাবে অন্ধকারে থাকে, মাটির নীচে, গুহার মধ্যে, মহাসমুদ্রের অতল তলদেশে।

অনেকে দিনে ঘুমোয়, আশ্রয়স্থল থেকে বেরোয় কেবল রাত্রি হলেই। এই সব প্রাণীদের হয় খুব বড় বড় সংবেদনশীল চোখ আছে, অথবা তাদের চোখ একেবারেই খারাপ হয়ে গেছে, না থাকলেও তাদের কিছু যায় আসে না।

কখনো কখনো চোখগুলি প্রকাণ্ড হয়ে যায়। গভীর সমুদ্রের শামুকদের চোখের ব্যাস 20 সেন্টিমিটার পর্যন্ত হতে পারে, তেমনি ছোট ছোট অ্যামফিপডদের (amphipods) চোখের দৈর্ঘ্য তাদের গোটা দেহের এক-তৃতীয়াংশ হয়ে থাকে। গভীর জলের মছে আর শামুকদের চোখ আকৃতিতে টেলিসকোপের চোঙ-এর মতো হয়, সেই সঙ্গে চোখের মণির ছিদ্রটা হয় বেশ বড়োসড়ো। এর ফলে চোখের মধ্যে যতগুলি সম্ভব আলোকরশ্মি ধরে নেওয়া সম্ভব হয়, সম্ভব হয় তাদের কেন্দ্রিত করে আলোকসংবেদী কণানিচয়ের ওপর ফেলা। স্পষ্ট দেখার জন্য পেচার দরকার হয় মানুষের চোখের সঙ্গে তুলনায় একশ ভাগের একভাগ মাত্র আলোক।

গভীর জলের মাছদের আর শিকারী পশুদের চোখের আছে আর একটা বৈশিষ্ট্য। তাদের চোখের ভেতরের তলে আছে আলোক বিকিরণকারী পদার্থের একটা আস্তর যার নাম টেপটাম লুসিডাম (tapetum lucidum), আপতিত আলোককে যে প্রলেপ ভালভাবে প্রতিফলিত করতে পারে। এরই কারণে বেড়ালরে চোখ অন্ধকারে জ্বলতে থাকে। বেড়াল কি নেকড়ে বা কুমির, এদের কারুর চোখ থেকে আলো বেরোয় না। এরা কেবল চাঁদের বা তারার বা দূরাগত কোন বাতির ক্ষীণ রশ্মিগুলিকে প্রতিফলিত করে দেয় যখন সেই রশ্মিগুলি চোখের ভিতরের তলে কেন্দ্রিত হয়। সম্পূর্ণ অন্ধকারে তাদের চোখ জ্বলবে না।

জঙ্গলের মধ্যে পথ হাতড়ে যাচ্ছে যে পথিক গভীর রাতে, তার হবে ভয় জাগানো অনুভূতি, যখন দেখবে চারদিক থেকে জ্বলজ্বলে চোখ তার ওপর
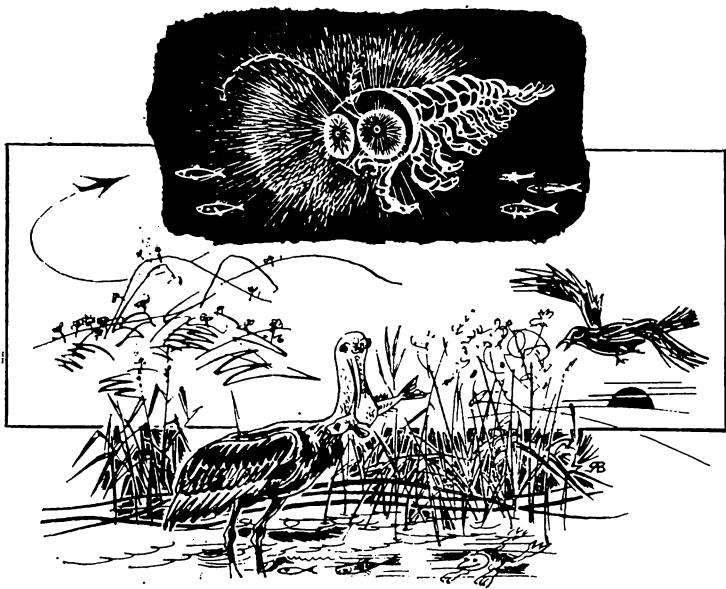
লক্ষ্য রাখছে। তবে টেপটাম লসিডামকে একটা দরকারী কাজ করতে হয় কেবল রাতের বেলায় মানুষকে ভয় দেখানো ছাড়াও। এর কাজ হোল আপতিত রশ্মিকে প্রতিফলিত করে আলোকসংবেদী পদার্থ-কণা সমষ্টির ওপর ফেলে তাদের কাজটাকে আরো সুসম্বদ্ধ করা। চোখে টেপটাম লুসিডাম-এর আস্তর থাকলে মাঝে মাঝে এসে পড়া ক্ষণিক আলোক বিন্দুগুলির পূর্ণব্যবহার চোখ করতে পারে। দুঃখের কথা এই মহামূল্যবান কৌশল থেকে মানুষ বঞ্চিত, তাই আমাদের চোখের জন্য আমরা ধরা পড়ে যাব না অন্ধকারে অন্য মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য যদি ঘাপটি মেরে বসে থাকি।

এই আলোকসংবেদী কণা দু'প্রকারের। এদের নাম রডস আর কোনস, বাংলায় বেলন আর শঙ্কু। মানুষের চোখে আছে 70 লক্ষ করে শঙ্কু, বেলনের সংখ্যা অনেক বেশি, প্রত্যেক চোখে আছে 13 কোটি। এই আলোকসংবেদী কোষগুলির বণ্টন কিন্তু অসমান, শঙ্কুগুলির বসতি দৃষ্টিক্ষেত্রের কেন্দ্রের কাছে বেশি ঘন। এদের ঘনত্ব হলদে-ফোঁটা অঞ্চলে অত্যন্ত বেশি — এই হলদে-ফোঁটা (yellow spot) অঞ্চল দিয়ে আমরা কোন বস্তুকে ভাল করে খুঁটিয়ে দেখি।

শঙ্কুদের আর একটা কাজ হোল রঙের অনুভূতি। সব প্রাণীর কিন্তু রঙের অনুভূতি নেই। উচ্চতর মেরুদন্ডীদেরই প্রথমে রঙের অনুভূতি দেখা যায়। শিরঃপাদ, কবচী আর অনেক পতঙ্গ কিন্তু রঙের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ। পতঙ্গরা আবার এই ব্যাপারে বাকি সকলের থেকে শ্রেষ্ঠ। তারা দেখতে পায় অতি-বেগুনী রশ্মি যা মানুষের কাছে অদৃশ্য। তারা দেখে অত্যাশ্চর্য একটা জগৎ, যার খবর আমরা কেবল অতি সম্প্রতি পেয়েছি অতিবেগুনী-সুবেদী ফিলমে ফোটো তুলে।

দিনের বেলায় চলাফেরা করে যেসব মেরুদণ্ডী প্রাণী তারা বর্ণবিচার বেশ ভাল মতোই করতে পারে। অনেক মাছ, উভচর, সরীসৃপ আর পাখিদেরও বর্ণজ্ঞান রয়েছে। প্রকৃতি এই ব্যাপারে কৃপণ হলেন কেবল স্তন্যপায়ীদের বেলাতেই। হয়ত এর কারণ হোল এই যে আমাদের পূর্বপুরুষেরা ছিল নিশাচর। এমনকি আমাদের প্রকৃত বন্ধু যে কুকুর, মানুষের কাছে যে কতকিছুই না শিখেছে, সেও পারে নি বর্ণের ধারণাটা আয়ত্ত করতে। খুর-ওয়ালা জানোয়ারদের অবস্থাটাও কিছু আহামরি গোছের নয়। এরাও পারে না বর্ণে বর্ণে প্রভেদ ধরতে। ষাঁড় লাল রং পছন্দ করে না, এই বিশ্বাস খুব প্রচলিত থাকলেও একথা বলতেই হবে যে সমান উজ্জ্বলতার লাল, নীল, সবুজ বা এমনকি কালো রংও ষাঁড় আলাদা করে ধরতে পারে না। দেখা যাচ্ছে স্তন্যপায়ীদের মধ্যে কেবল মানুষ আর বাঁদর বর্ণের বিচিত্রতা উপভোগ করতে পারে।

চোখের হলদে-ফোঁটা অঞ্চলের মস্তিষ্ককে কোন বস্তুর বিষয়ে খুঁটিনাটি তথ্য সরবরাহ করতে পারার এই যে ক্ষমতা, এটা দেখা যাচ্ছে এই অঞ্চলে সুবেদী কণার প্রাচুর্যের কারণেই। আর একটা কারণ হোল এই যে প্রত্যেক শঙ্কুর আছে নিজস্ব স্নায়ুতন্তু। বেলনদের নিজের নিজের স্নায়ুতন্তু নেই, তাদের তাই একটি স্নায়ুকোষের চারপাশে দল বেঁধে থাকতে হয়।

দুটি বিন্দুর চিত্র যদি হলদে-ফোঁটা অঞ্চলে দুটি ভিন্ন ভিন্ন শঙ্কুর ওপর এসে পড়ে তাহলে আমরা দুটি বিন্দুকে স্বতন্ত্র দেখব। দৃষ্টিক্ষেত্রের কিনারার অঞ্চলকে ব্যবহার ক'রে আমরা দুটি বিন্দুকে স্বতন্ত্রভাবে অনুভব করতে পারব, যদি চিত্র দুটি বিভিন্ন দুটি বেলনসমষ্টির ওপর আপতিত হয়। যদি বিন্দু দুটির চিত্র কেন্দ্রিত হয়ে পড়ে একই বেলন গোষ্ঠীর ওপর, চক্ষু তাহলে তাদের দেখবে একটি বিন্দুরূপে। সন্দেহ কি ঈগল বা হাড়গিলেরা আকাশের অনেক উঁচু থেকে শিকারকে ছোঁ মেরে ধরতে পারে,

কেননা তাদের চোখে দুটো, এমনকি তিনটে করে হলদে-ফোঁটা অঞ্চল থাকে।

হলদে-ফোঁটা অঞ্চলের বাইরেও দৃষ্টিক্ষেত্রের মধ্যবর্তী অঞ্চলে শঙ্কু-কণা থাকে তবে তাদের ঘনত্ব অনেক কম। কিনারায় থাকে কেবল বেলন, শঙ্কু একেবারেই নয়। বেলনদের সংবেদনশীলতা কিন্তু অনেক বেশি। কতকগুলি বেলন তাদের সংকেতগুলিকে পাঠায় একই স্নায়ুকোষে। তাই বেলনদের যৌথ প্রচেষ্টায় গোধূলির আলো-আধারীতে খুবই অল্পমাত্রায় সঞ্জীবিত হলেও তারা একটিমাত্র স্নায়ুকোষকে উত্তেজিত করতে পারে তাই চক্ষু এই অবস্থাতেও খানিকটা দেখতে পায়। কিন্তু শঙ্কুদের নিজের নিজের স্নায়ুকোষ থাকলেও গোধূলির ঝাপসা আলোতে তারা একেবারেই অকেজো।

ঝাপসা আলোতে দেখবার জন্য আমরা বেলনদের মুখাপেক্ষী — তখন কিন্তু শঙ্কুরা দৃষ্টিপথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই হলদে-ফোঁটা অঞ্চলে আলোককে কেন্দ্রিত করবার অভ্যাস যদি আমাদের না থাকত তাহলে কিন্তু রাত্রে আমরা আরো ভালো দেখতে পেতাম। এই কারণে রাত্রিকালে আমরা সেই সব বস্তুকে ভাল দেখতে পাই যাদের চিত্র বিম্বিত হয়েছে চক্ষু-দর্পণের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। এটা সম্ভব হয় যদি আমরা যে বস্তুকে দেখতে চাই তার দিকে সরাসরি না তাকাই।

চক্ষু-দর্পণরা রেটিনা-র (Retina) অনেকটা অংশ যা দিয়ে দিবাভাগে আমরা কত নির্ভুলভাবে দেখে থাকি, রাত্রে হয়ে যায় সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অকেজো। প্রসঙ্গত, দিনের বেলাতেও রেটিনার সবটা আমরা ব্যবহার করি না। হলদে-ফোঁটার কাছাকাছি আছে অন্ধ-ফোঁটা (the blindspot) যেখানে চক্ষু-স্নায়ুর তন্তু চলে এসেছে রেটিনার উপরিতলে। এই অঞ্চলে আলোকসংবেদী কণা মোটেই নেই তাই এই অঞ্চল কি বা দিন কিবা রাত্রি কোন সময়েই দৃষ্টির জন্য কাজে লাগে না।

বিস্ময়ের কথা এই যে অন্ধ-ফোঁটা আমাদের দৃষ্টিক্ষেত্রকে তো কই আড়াল করে না। এর কারণ কতকটা এই রূপ যে দু'চোখ দিয়ে আমরা যখন বিশ্বভুবন দেখি তখন এককেটা চোখের অন্ধ-ফোঁটা দৃশ্যবস্তুর চিত্রটার আলাদা আলাদা অংশকে আড়াল করে থাকে। কোন বস্তুকে নিরীক্ষণ করার কালে চক্ষু কখনো স্থির থাকে না। আকৃতিটার সারাগায়ে প্রত্যেকটা খুঁটিনাটির ওপর দৃষ্টি যেন সরে সরে যেতে থাকে, তার ওপর চক্ষু দুটি অল্প অল্প কাঁপতে থাকে। বস্তুটার চিত্র বেশ দ্রুত রেটিনা বা চক্ষু-দর্পণের ওপর দিয়ে চলে যায়, আমরা দেখি সম্পূর্ণ চিত্রটাকে।

আলোকসংবেদী কণার যেহেতু ঘনত্ব নানাবিধ তাই আমরা সেই সব বস্তু দেখতে পাই যাদের আমরা স্পষ্টভাবে নিরীক্ষণ করে দেখি। এটা ভালই কেননা আমাদের মনঃ সংযোগ আমরা কেন্দ্রিত করতে পারি মুখ্য বস্তুগুলিতে। শিকারীপ্রাণী আর পাখিদের বেলায় ব্যাপারটা অন্যরকম। শিকার খুঁজতে তাদের চাই বিস্তারিত দৃষ্টিক্ষেত্র। চিরকালের মতন প্রকৃতি রাস্তা একটা বের করলেন।

অ্যাকোয়ালাঙ নিয়ে তুমি কি কখনো তীর থেকে অনেকটা দূরে সমুদ্রের মধ্যে নেমে গেছ ঝাঁপ দিয়ে? সেখানে তোমার কি একা বোধ হয় নি? ডাইনে তাকাও, বাঁয়ে তাকাও, সামনে, পেছনে, ওপরে বা নীচে সর্বত্র তুমি দেখবে সেই একই নীলচে ধূসর কুয়াসা, বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। শূন্যতাটা সম্পূর্ণ, অপার। চক্ষুর জন্য নিবিষ্ট হয়ে দেখার মতো কিছুই নেই। মহাকাশও এমন নিঃসঙ্গ নয়। সেখানে যাহোক উজ্জ্বল দিবাকর আছেন, আছে লক্ষ লক্ষ ফুল্লতারার চক্‌মকানো ভিড়।

বাহির সমুদ্রে যেসব মাছ থাকে তাদেরও কম নিঃসঙ্গ লাগে না। তারা যে নিজের দলে ঝাঁকের মধ্যে থাকে এটা কোন দৈব দুর্ঘটনা নয়। এই নিঃসীম শূণ্যতার মাঝে যে কোন বস্তুর দেখা পেলেই দৃষ্টি যাবে আটকে। চোখ ফিরিয়ে নিতে, বা কাছে গিয়ে না পৌঁছে থাকতে পারে কার সাধ্য। মাছ ধরার একটা কৌশলের মূলমন্ত্র হোল এই ঘটনা।

এই অতি সহজ মাছ ধরার সরঞ্জামটা হোল মস্ত লম্বা একটা সূতোর আগায় আছে একটা ওলন (plumb-bob) আর তার সঙ্গে ছোট ছোট সূতো দিয়ে বাঁধা এক গোছা বঁড়শি। টোপ লাগবে না। ওলন, দড়ি আর বঁড়শির গোছাকে 30 থেকে 50 মিটার দূরে ছুঁড়ে দাও জলের ভেতর, মাঝে মাঝে একটু করে টান দিতে থাকো। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখবে দড়িতে কাঁপুনি শুরু হয়েছে, তার মানে বঁড়শিতে মাছ আটকেছে। এখন শুধু সাবধানে টান দিতে দিতে নৌকাতে তুলে নাও।

প্রথম প্রথম আশ্চর্য লাগবে যে টোপ নেই কিছু নেই শুধু বঁড়শি মাছ কেন গিলে ফেলে বা মাছের পেটে, পিঠে, কখনো বা ল্যাজে বঁড়শি বিঁধে যায় কেন। এর মধ্যে আজব কিছু নেই কিন্তু। শূন্যতার পীড়ায় কষ্ট পেতে পেতে মাছ যখন দেখে নতুন একটা অজানা বস্তু তখন তার থেকে চোখ ফেরাতে সে পারে না। চেটে দেখে, চার পাশে নেচে, গা ঘসে, ওলট পালট খেয়ে তার স্পর্শ নিতে নিতে বঁড়শিতে আটকা পড়ে যায়, মাছুড়ে যখন

দড়িতে টান দেয়। কোন মানুষকে যদি সমুদ্রের গভীরে মনের দুঃখে একলা থাকতে হোত তাহলে সেই নিংসঙ্গ বেচারাও হয়ত বঁড়শি দেখলে গিলেই বসত।

যেসব মাছকে এই নীলচে ধূসর কুয়াসার মধ্যে সারাজীবন ঘুরে বেড়াতে হয় তারা কিন্তু চোখের সামনে পড়লে কোন বস্তুকেই উপেক্ষা করতে পারবে না, কেননা তাদের কাছে আকর্ষণীয় কী-ই বা আছে জলের মধ্যে? প্রকৃতি তাই অনেক বিবেচনা করেই ডাঙার বাসিন্দা কয়েকটি প্রাণীর কাছে উজ্জ্বল, বর্ণময় জগৎটাকে আড়াল করে রেখে দিয়েছেন তাদের নিজের নিজের ব্যক্তিগত মরুভূমি যেখানে তারা শিকারকে আরো ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখতে পারবে।

চোখের আলোকসুবেদী কণাগুলি এমনভাবে তৈরি যে মস্তিষ্কে তারা যে সব খবর পাঠায় সেটা তাদের ওপর আপাতিত আলোকের তীব্রতার বার্তা নয়, তারা কেবল সামান্যতম পরিবর্তনের খবর। শঙ্কু আর বেলন-এরা মস্তিষ্কে সংকেত পাঠায় উজ্জ্বলতার সামান্যতম পরিবর্তনের খবর, তার পরে অপেক্ষা করে পরবর্তী পরিবর্তনটির জন্য, সেটা এলেই পাঠায় আবার একটা তারবার্তা। এইভাবে এরা কাজ করে যায়।

চক্ষুর আলোকসুবেদী কণাদের এই যে কৌতুহল জগোনো গুণ এটা প্রথম লক্ষ্য করা হয় একটা পরীক্ষায় যেখানে দেখা হচ্ছিল চোখের সামনে আলোকের উজ্জ্বলতার সাড়াতে বৈদ্যুতিক প্রতিক্রিয়া কী রকমের হয়। এই পরীক্ষাগুলির একটা তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এই ধারণাকে সমর্থন করছিল যে স্থির চক্ষু কোন নির্দিষ্ট বস্তুতে নিবিষ্ট হলে তাকে দেখতে পায় অতি অল্পকালের জন্য। পরীক্ষার দ্বারা এই ধারণাটাকে যাচাই করে দেখা সহজ ছিল না, কেননা চোখের নিরন্তর সন্ধিৎসু বিচরণ ছাড়াও সবসময় চোখ যেন একটু একটু ঝাঁকুনি খেতে থাকে। পরীক্ষার সাহায্যে অভিমতটার স্পষ্টীকরণের জন্য বিজ্ঞানীরা বেশ বুদ্ধিদীপ্ত একটা পরীক্ষার উদ্ভাবন করলেন। চোখের নড়া চড়া যদি বন্ধ করতে না পারলাম তাহলে চিত্রটাকেই না হয় অক্ষিগোলকে আটকে রাখি। চোখ করে চলুক তার নড়া চড়া কিন্তু চিত্রটাতো স্থিরভাবে চক্ষু-দর্পণ বা রেটিনার সেই একই কণাগোষ্ঠীতে কেন্দ্রিত রইল। পরীক্ষাটা প্রমাণ করল যে চক্ষু সত্যি সত্যি সম্পূর্ণ স্থির কোন চিত্র দেখতে পায় না।

মেরুদণ্ডী প্রাণীরা বিবর্তনের একেবারে আধুনিক পর্যায়ে এসে তাদের চোখ নাচাবার ক্ষমতাটার বিকাশ ঘটিয়েছে। প্রায় সব মাছেরই চক্ষু স্থির

তবে সেজন্য তাদের অসুবিধে হয় না কেননা জল তো আর নিশ্চল নয়, আর মাছের শরীরও অনড় নয়। শরীরের নড়াচড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের চোখও নড়ে চড়ে।

বহুকাল পূর্বে যখন মাছেরা বিবর্তিত হয়ে উভচর হয়ে গেল, ডাঙায় উঠে এলো হামা দিয়ে, শরীরের জন্য পেল শক্ত জমি, তখন তারা তাদের জগৎটাকে অবিচ্ছিন্নভাবে দেখতে পাওয়ার ক্ষমতাটা হারালো। এই লোকসানের ফলে উভচরদের একটা মস্ত ক্ষতি হয়ে গেল: দৃশ্য তথ্যের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহটা হারিয়ে তারা তাদের মৎস প্রপিতামহদের থেকে অনেকটা বোকা হয়ে গেল। মস্তিষ্ককে যদি হজম করবার জন্য তথ্য না দেওয়া হয় তাহলে সে তো অলস হয়ে যাবে, তার বিকাশ ঘটবে না।

উভচর দেখে একটা আশ্চর্য জগৎ। লক্ষ্য করে দেখ একটা সোনাব্যাঙ বা কুনোব্যাঙকে, অগভীর ডোবার ধারে রোদ পোহাচ্ছে। কত বিজ্ঞের মতো স্থৈর্য নিয়ে বসে বসে জগৎটাকে দেখছে। তা, ওর আর ভাবনার কিই বা আছে। ডোবার ওপরে উষ্ণ বায়ুর কুয়াসা, বাতাস বইছে না, নড়ছে না ঘাস বা পাতা, তাই কুনোব্যাঙটা তো এই ঝলমলে বর্ণশোভার কিছুই টের পাচ্ছে না। তার চোখের সামনে রয়েছে নীলচে ধূসর একটা ঝাপসা পর্দা, যেন সে সমুদ্রের গভীরে সাঁতার কাটছে বা অচল একটা টেলিভিশনের পর্দার সামনে বসে আছে।

উভচরের দৃশ্য-জগৎটা একঘেয়ে আর ক্লান্তিকর হলেও চক্ষু তার কাছে খুবই দরকারী। কোন জীবিত প্রাণী তার দৃষ্টি এড়াতে পারবে না। ব্যাঙের সামনে দিয়ে একটা মাছি উড়ে গেলে তার চিত্রটা তৎক্ষণাৎ টেলিভিশনের শূন্য পর্দায় আবির্ভূত হোল। ওই যে মাছিটা বসল ঘাসের ডগায়, ডগাটা দুলে উঠল, অল্প কালের জন্য সেটাও ভাসতে থাকল টেলিভিশনের পর্দায়, তার পরে আবার ব্যাঙটা দেখছে আর কিছুই নয় কেবল নীলচে ধূসর পশ্চাৎপটের ওপর বিচরণশীল একটা মাছি, সারা পৃথিবীতে একলা, ব্যাঙের ভুলটা হবে কি করে। এমন একটা মনযোগী দৃষ্টির থেকে শিকারের পালাবার পথটা কোথায়?

এই সাময়িক অন্ধত্ব কিন্তু উভচরের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বা স্থানিক সন্নিবেশের ধারণাকে ব্যাহত করে না। কোথাও সে ধাককা খায় না, কেননা যে মুহূর্তে দেহটা নড়ে উঠল, অমনি দৃশ্যমান জগৎটা ভেসে উঠল শূন্য টি. ভি.-র পর্দায়।

মোটের ওপর যাই হোক, উভচরেরা কিন্তু তাদের জ্ঞানসম্পর্কীয় বিশ্লেষকগুলির ব্যাপারে খুব একটা ভাগ্যশালী নয়। শব্দ ও গন্ধ অনুভবের অবস্থাগুলি বাতাসে এক ধরনের, জলের ভেতরে অন্যধরনের। উভচরের ক্ষেত্রে এই দুটি ইন্দ্রিয় ডাঙার ওপরে ব্যবহারের উপযোগী হয়ে পরিবর্তিত হয়ে উঠতে পারে নি। তাই উভচরকে খাদ্য সংগ্রহের জন্য কেবল চোখের ওপরই নির্ভর করতে হয়, তাও আবার সম্ভব যখন সেই খাদ্য বস্তুটা নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে।

তোমরা যদি কখনো ব্যাঙ পুষে থাকো, তাহলে তোমার জানা আছে যে ব্যাঙ কখনো স্থির হয়ে আছে এমন খাদ্য খাবে না। ব্যাঙের এই একটা ভারি দুঃখজনক বৈশিষ্ট্য। কোন ক্ষতি করবে না কত কষ্ট সহ্য করবে, ব্যাঙতো প্রাণীতত্ত্ববিদদের কাছে আর চিকিৎসাবিদ্যার গবেষণার জন্য কত উপযোগী আর আদরণীয় জীব। তাছাড়া ব্যাঙ দামে সস্তা, শীতকালে ঠান্ডা ঘরে আরামে থাকবে, কখনো খেতে চাইবে না। কেননা স্বাভাবিক অবস্থাতেও সারাশীত এরা ঘুমিয়ে কাটায়, খায়দায় না।

ব্যাঙ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য আদর্শ, কেবল একটা দোষ এই যে গরম পড়ল তো এদের নিয়ে পরীক্ষারও হোল শেষ। শীতের ঘুম ভাঙল তো কেবলই পুষ্টিকর খাবারের জন্য কান্নাকাটি শুরু হোল। তখন তাদের চাই পরিমাণে অনেক খাবার আর সব খাবার জ্যান্ত হওয়া চাই, না হলে খাবো না। পরীক্ষাগারে তাদের খাবারের ব্যবস্থা করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। যদি কয়েকশ ব্যাঙ থাকে জ্যান্ত খাদ্য সংগ্রহ করার খরচা ব্যাঙের দামের চেয়ে অনেক বেশি হয়ে যায়, তা সে কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। পাত্র থেকে মাংসের টুকরো তুলে নিয়ে খেতে শেখাবার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এর একমাত্র কারণ এই যে ব্যাঙ সে খাদ্য দেখতে পায় না। বহুকাল পর্যন্ত এই অসুবিধেটা দুর্ভেদ্য একটা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, শেষ পর্যন্ত কেউ একজন আবিষ্কার করলেন একটা ঘূর্ণ্যমান পাত্র, যেন একটা ঘূর্ণিদোলা, মাংসের টুকরোগুলো চড়ে আছে তার কিনারায়। ব্যাঙেরা শীঘ্রই দৃশ্যটাতে অভ্যস্ত হয়ে গেল, মাংসগুলিকে ঠোকরাতে শুরু করল, যেন কিছুই হয় নি।

প্রকৃতি শুরু থেকে নিশ্চয় এটা চান নি যে চোখের সংবেদনশীলতা বাড়ুক অনড় চক্ষুর বৈশিষ্ট্যের দ্বারাই। এমন তো ঘটে নি উচ্চতর প্রাণীদের ক্ষেত্রে যাদের চক্ষু সচল হয়েছে।

দৃষ্টিশক্তির আরো উন্নতি ঘটল যে রাস্তায় সেটা হোল আলোকসংবেদী কণাদের সংবেদনশীলতাকে বাড়িয়ে। সেটা করতে গিয়ে চোখের কার্যধারাতে নতুন সমস্যার সৃষ্টি হোল। অত্যন্ত সংবেদী ধারক যেগুলি, গোধূলির স্তিমিত আলোতে যারা ভাল কাজ করে, তারা আবার জোরালো আলো বরদাস্ত করতে পারে না। তাই শুরু থেকেই দৃষ্টি-ধারকগুলির জন্য একটা পর্দা লাগানো হয়েছে যেটা দৃষ্টির দেহলীর প্রসারকে কমাতে বা বাড়াতে পারে।

অন্ধকারে মানুষের চক্ষুমণির ছিদ্রটা (pupil) বড় হয়ে হয় 8 মিলিমিটার, উজ্জ্বল আলোতে এই ছিদ্রের যে ব্যাস তার থেকে বেশ কয়েক গুণ বেশি। ছিদ্র গুটিয়ে গেলে কেবল যে আলোকের পরিমাণই নিয়ন্ত্রিত হয় তা নয়, চিত্রের তীক্ষ্নতাও বাড়িয়ে দেয়, কেননা তখন আলোক রশ্মিগুলি করনিয়া বা চক্ষু মণির এবং দানাবাঁধা লেনসের কেন্দ্রের সন্নিহিত অঞ্চল দিয়ে চোখের মধ্যে ঢোকে অর্থাৎ আলোক প্রতিসরণ ব্যবস্থার সমতাগুণসম্পন্ন অংশ দিয়ে।

সকল বিশ্লেষক যন্ত্রের একটা বৈশিষ্ট্য হোল এই যে একটা উদ্দীপনার দরুণ যে সংবেদনা সেটা মিলিয়ে যায় না তার কারকটা চলে যাওয়া মাত্রই। এই কারণেই আমরা অবিচ্ছিন্ন শব্দ শুনতে পাই পরিবর্তনশীল চাপের আন্দোলনের বদলে এবং ঘন ঘন ঝিক্‌মিক্‌ করা আলোকের বদলে দেখি নিষ্কম্প আলোকদীপ্তি। মানুষ প্রতি সেকেণ্ডে 16 থেকে 18টি আলোক স্পন্দনের বেশি হলে আর তাদের আলাদা করে স্মরণ করতে পারে না। সিনেমা নামের নতুন শিল্প মাধ্যমটির জন্মের গোড়ার কথাটাই ছিল আমাদের দৃষ্টির এই গুণ বা ত্রুটি। ফিল্‌ম যখন দেখানো হয় তখন আলাদা আলাদা চিত্রের প্রেক্ষণ করা হয়ে থাকে প্রতি সেকেণ্ডে 24টি ফ্রেম, এই বেগে। এই কারণে আমরা আগাগোড়া সম্পর্কিত একটা চিত্র দেখতে থাকি আর আমাদের এই প্রমাদের দরুণ প্রকৃত গতির মায়া বা বিভ্রম জাগে।

আমরা মানুষেরা তো ধীর গতির প্রাণী, তাই পরের পর সংবেদনার স্থায়িত্বটা আমাদের উপলব্ধির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। পাখি আর উড্ডীন পতঙ্গদের বেলায় ব্যাপারটা কিন্তু অন্যরকম। একটা সংবেদনা আমাদের মস্তিষ্কে যতক্ষণ থাকে তাদের ক্ষেত্রে ততকাল যদি থাকত তাহলে দ্রুত ওড়ার কালে পৃথিবীটাকে তারা দেখতে পেত না। তবে আমাদের ফিলম কিন্তু তাদের ভাল লাগবে না। একটা পতঙ্গকে কোন ফিল্‌ম অবিচ্ছিন্নভাবে

দেখাতে হলে ফিলমটাকে চালাতে হবে প্রতি সেকেণ্ডে 200 টা চিত্রের ফ্রেম এই বেগে।

উচ্চতর প্রাণীদের প্রকোষ্ঠ-করা চক্ষু ভারি জটিল যন্ত্র এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই চক্ষু ব্যবহার করবার আগে বেশ ভাল মতো তালিম নিতে হয়। এই কাজটার ভার মস্তিষ্কের। চক্ষু ব্যবহার করবার আগে মস্তিষ্ককে শিখে নিতে হবে চক্ষু থেকে যে সব তথ্য আসছে তাদের পাঠোদ্ধার করে নেওয়া, যেমন ধরো নির্ণয় করতে হবে দুটা বস্তুর মধ্যে কোনটা কাছে আছে। রেটিনা বা চক্ষু-দর্পণে হয়ত দুটো চিত্রই সমান মাপের, বা দূরের বস্তুটা হয়ত কাছেরটার চেয়ে আকারে বড়ো।

সাধারণভাবে রেটিনার ওপরে কোন বস্তুর প্রতিবিম্ব একাই যথেষ্ট নয়, বস্তুটার আয়তন নির্ণয়ের জন্য। আকার নিরূপণের জন্য সংবেদী কণা থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে ভজিয়ে নিতে হবে মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট সেই তথ্যগুলির সঙ্গে যারা বলে দিয়েছে দুটি চক্ষুর অবস্থান (নির্ভুলভাবে বলতে গেলে, দুটি চোখের অক্ষ পরস্পর যে কোণ করে ছেদ করেছে) আর অভিযোজনের (accommodation) মাত্রা অর্থাৎ বলয়াকৃতি পেশীতে টান লাগিয়ে দানাবাঁধা লেনসের বক্রতা কতটা বদলানো হয়েছে সেই তথ্যও। কোন বস্তুকে এক চোখ দিয়ে দেখার কালে এই লেনসের বক্রতার মাত্রা যত বেশি হবে তত নির্ভুলভাবে আমরা ধারণা করতে পারব কোন বস্তুর আকার ও দূরত্ব। এই একই উপায়ে দেখে কতকগুলি প্রাণী, যেমন খরগোস, বন মোরগ আর মাছ, যাদের করোটির সামনের দিকটা এমনভাবে গঠিত যে তারা একসঙ্গে দুচোখ দিয়ে কোন বস্তুকে দেখতে পায় না।

দৃশ্যের অনুভূতি আর জঙ্গমতার অনুভূতির জন্য যে পাঠোদ্ধার আর ভজিয়ে নেবার ক্ষমতা এটা মস্তিষ্কের স্বয়ংসিদ্ধ ক্ষমতা কিন্তু এর ব্যবহারটা জানতে হলে প্রশিক্ষণের দরকার। ঠিক যেমন হাত-পায়ের সুসম্বন্ধ নাড়া চাড়ার জন্যও চাই প্রশিক্ষণ।

পতঙ্গরা তাদের জটিল চক্ষু দিয়ে পৃথিবীকে দেখে যেন একটা ঝিল্‌মিলে নকসা, কিন্তু তাদের একটা সুবিধে আছে এই যে তারা একটা বস্তুর প্রতিবিম্বটা সোজাসুজি দেখতে পায়। মেরুদণ্ডীদের প্রকোষ্ঠে রাখা চোখের দরুণ আছে আরো সমস্যা। আলোকরশ্মি চোখে তো প্রবেশ করল দুই দিকে উত্তল লেনস দিয়ে, সেখানে প্রতিসরিত হয়ে চোখের পেছনের দেয়ালে প্রতিবিম্বটা গিয়ে পড়ল উলটোভাবে। মস্তিষ্কের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ যে
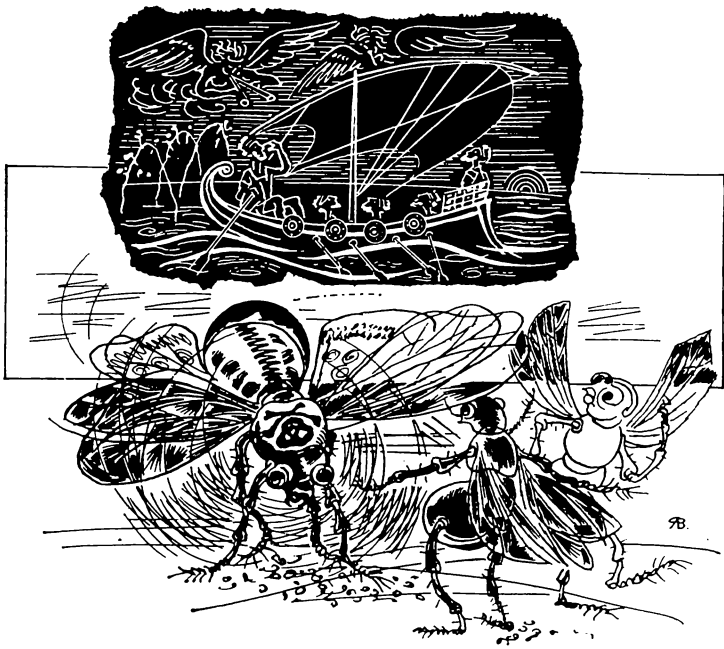
অতি শিশুকাল থেকেই সে শিখে নেয় তথ্যসমূহকে কেমন করে জুড়ে নিতে হবে, যেসব তথ্য আসছে চক্ষু আর অন্যান্য জ্ঞানেন্দ্রিয় থেকে, প্রথমত এবং মুখ্যত ত্বক আর পেশীর ধারকগুলি থেকে।

আচ্ছা, চোখের পেছনের দেয়ালে চিত্রটা যদি সোজাসুজিভাবে প্রতিবিম্বিত হোত? তাহলে আমরা কী দেখতাম?

বহু পরীক্ষার দ্বারা এটা অধ্যয়ন করা হয়েছে। রেটিনা বা চক্ষুদর্পণে চিত্রকে সোজাসুজি প্রতিবিম্বিত করতে তোমাকে পরতে হবে বিশেষ চশমা। প্রথম মনে হবে পৃথিবীটাকে তুমি উলটো দেখছ। কিন্তু তুমি চশমাটাকে মোটেই চোখ থেকে খুললে না, দিন চারেকের মধ্যে তোমার মস্তিষ্ক ব্যাপারটাকে মানিয়ে নেবে এবং তুমি পৃথিবীটাকে আবার সোজাসুজি দাঁড়ানোই দেখবে। দৃষ্টির উপলব্ধি এতই স্বাভাবিক হয়ে যাবে যে তুমি ছবি আকতে বা মোটর গাড়ি চালাতে পারবে। কিন্তু তার পরে, খুব সাবধান, চশমা খুলে ফেললেই কিন্তু বিশ্বটা আবার উলটে গেল। যদিও, এক্ষেত্রেও

আমাদের আজ্ঞাবহ মস্তিষ্ক আবার আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হয়ে যাবে তথ্য পাঠানোর পুরানো পদ্ধতিতে। প্রকৃত যেসব প্রক্রিয়া মস্তিষ্কে ঘটে যায় এই সব কাজের ব্যাপারে সেগুলি ভালভাবে এখনো বুঝে ওঠা যায় নি, কিন্তু সেটা তো অন্য একটা বিষয়ের সঙ্গে জড়িত, মস্তিষ্কের কার্যধারার বিষয়।

ফিসফিসকারী গ্রহ

আলোক আর শব্দ বিশ্লেষকগুলির মধ্যে আছে অনেকগুলি বুনিয়াদী প্রভেদ। কেবল কয়েকটি মাত্র প্রাণী আলোক বিচ্ছুরণ করতে পারে, শুনতে পায় যে বিপুল সংখ্যক প্রাণী তাদের প্রায় সকলেরই আছে বিশেষ যন্ত্রকৌশল যা দিয়ে তার বিশ্বকে পূর্ণ করে দেয় প্রাণের সূচকধ্বনি দিয়ে। প্রাণীদের মধ্যে শব্দসংকেত ব্যবস্থা কেমন করে গড়ে উঠল সে বিষয়ে উপলব্ধ ইঙ্গিত ও তথ্যসমুদয় পুর্ণগঠন ক'রেও আমরা সব খুঁটিনাটিগুলির হদিস পাই না। তবে আমরা ধরে নিতে পারি যে শব্দ বিশ্লেষক বা শ্রবণযন্ত্র এসেছিল আগে কেননা শত্রু বা শিকারের দ্বারা উদ্ভূত শব্দগুলি শুনতে পাওয়া জরুরী হয়ে উঠেছিল।

প্রাণীরা কান পাবার পরেই অবিষ্কার করেছিল যে তাদের জ্ঞাতি গোষ্ঠীর কাছ থেকেই অনেক দরকারী খবরাখবর পাওয়া যেতে পারে যদি একটু কষ্ট করে শোনা যায় কী কী শব্দ তারা সৃষ্টি করছে। এই সংকেতগুলি কেবল যে তাদের পরিবারের লোকেরা কেমন করে দিন কাটাচ্ছে সেই খবর তা নয়, চারপাশের পৃথিবীটা কেমন চলছে সে খবরও পাওয়া গেল। এর পরে একটা ধাপই বাকি রইল, সেটা হোল নিজের জ্ঞাতিদের কাছে শব্দসংকেত তৈরি করে পাঠানো।

প্রাণীরা শব্দ সৃষ্টি করবার ক্ষমতার বিকাশ ঘটালো পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে। নির্ভুলভাবে শব্দ পুণরুক্তি করতে হলে প্রাণীদের থাকা চাই যথাযথভাবে শোনার ক্ষমতা তাই, শব্দ প্রস্তুতের আর শব্দ শ্রবণের যন্ত্রগুলি বিকশিত হয়েছে একই সঙ্গে।

প্রকৃতই প্রাণীরা নিজেদের এবং নিজের প্রজাতির জ্ঞাতিদের সৃষ্ট শব্দগুলি শুনে বুঝতে বিশেষ পটু। স্বাভাবিকভাবেই তারা দেখেছিল যেশব্দ তারা সৃষ্টি করে তার থেকে একটা প্রতিধ্বনি উৎপন্ন হয় আর একই শব্দ বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করে। প্রকৃতি যখন এই

প্রভেদগুলির কারণ অণুধাবন করলেন তখন তিনি শুরু করলেন পরীক্ষা নিরীক্ষা যার ফলে এমন সব শব্দ প্রস্তুতের আর শব্দ অনুধাবনের যন্ত্রকৌশল উদ্ভাবিত হোল, যেগুলি প্রাণীরা ব্যবহার করতে সক্ষম হোল তাদের নিজের নিজের নানাবিধ প্রয়োজনে।

শ্রেষ্ঠ শব্দযন্ত্রাদি আছে পাখিদের আর স্তন্যপায়ীদের। তাদের কণ্ঠ যন্ত্রগুলি বাতাসের চলাচলের সাহায্যে নানা পাল্লার শব্দ সৃষ্টি করে থাকে। অবশ্য প্রকৃতির দাক্ষিণ্য সব জাতের প্রাণীরা পায় নি। কয়েক জাতের প্রতি তিনি মোটেই কৃপালু নন, তাই তারা রইল বোবা হয়ে। শব্দসমুদ্রে সৃষ্ট শব্দধারা ঢেলে দিতে, নিজেদের সঙ্গীত বিচিত্রার বিস্তার ঘটাতে এই সব প্রাণীদের নিজের নিজের বিশেষ উপায় উদ্ভাবন করে নিতে হোল, সেই একই উপায়ের সাহায্য নিতে হোল নিজেদের ভাবাবেগ ব্যক্ত করতে।

হাডসন পেচা নামক পাখির সাধারণ আওয়াজটা হোল দুটি চক্ষু দিয়ে জোরালো একটা তুড়ি। চক্ষুতে চক্ষুতে ঠোকাঠুকি করে সম্পূর্ণ রাগ রাগিনীর আলাপ করতে পারে এমন সঙ্গীত বিশারদও রয়েছে। সারসের চক্ষু থেকে নির্গত শব্দ ঠিক যেন কট্‌কটির আওয়াজ। ছন্দ আর তীব্রতার তারতম্য ঘটিয়ে সারস গাইতে পারে স্প্যানিশ রম্যগীতি।

প্রেমে মাতোয়ারা কাঠঠোকরা ভাবে শুধু ঠোঁট দিয়ে মনের আকুলতা যেন যথেষ্ট ব্যগ্রভাবে জানানো হচ্ছে না। তাই সে শুকনা গাছের গুঁড়ির ওপর ঢাক পিটিয়ে প্রণয়ীকে তুষ্ট করে বিলম্বিত সঙ্গীতালাপে। পুরুষ তিতির পাখি ডানা দিয়ে কাড়া-নাকাড়ায় আওয়াজ তোলে প্রতি মিনিটে বারচল্লিশ চড় বড় করে।

পতঙ্গদের গলায় শব্দযন্ত্র নেই, তারা শব্দ তৈরি করে ঘর্ষণের সাহায্যে। পঙ্গপাল একখানা পা ঘসে শক্ত পাখার ওপরে। গঙ্গাফড়িং পাখার কতকগুলি অংশ একযোগে ঘসে ধ্বনি তোলে। উচ্চিংড়ি বা ঝিঁঝিপোকার আছে 150 খানি ত্রিকোণী প্রিজম তার পাখার ঘর্ষণের জায়গায়, আর আছে চারখানা পর্দা যারা অনুনাদিতে হয়ে শব্দকে বাড়িয়ে তোলে। আশ্চর্য কি পতঙ্গের কান তাদের মাথাতে থাকে না, ঝিঁঝির কান আছে হাঁটুতে, পঙ্গপালের কান পায়ের মূলে। মাছেরা তাদের গিলস-এর প্লেটগুলি ঘসে ঘসে শব্দ সৃষ্টি করে। রুই মাছ শব্দ করে তার গলার ভেতরের দাঁতে দাঁত ঘসে। পারকয়েডদের (Percoids) আছে একটা বিশেষ শব্দপ্রস্তুতের যন্ত্র, গাইয়ে মাছ, সমুদ্রের রবিন আর গারনারড-দের (guarnards) ক্ষেত্রে যে

যন্ত্রের বিকাশ বেশ ভলেমতোই হয়েছে। এই জাতের মাছেরা শব্দ করে থাকে তাদের পটকা দিয়ে — বিশেষ পেশীর সঙ্কোচনের সাহায্যে পটকার দেয়ালে স্পন্দন তোলে।

অনেক প্রাণী শব্দ করে চলতে চলতে। স্নাইপ-এর যে ডাক আকাশ থেকে ভেসে আসতে আমরা শুনি সেটা তাদের রেট্রিসেস (retrices) বা লেজের বিশেষ পালকের স্পন্দন থেকে উদ্ভূত হয়, মিলনকালে ওড়ার সময়। ডাঁশ-এর বুক-কাঁপানো পোঁ পোঁ শব্দ যা শুনে থমকে দাঁড়িয়ে তোমার মনে হবে এই বুঝি কামড়ালো, সেটা কিন্তু বীরদর্পে যুদ্ধ ঘোষণা নয়। এই তীক্ষ্ন স্বরের গুঞ্জন সৃষ্ট হয় ডাঁশের পাখার চাঞ্চল্য থেকে, সময় সময় নীরব থাকতে চাইলেও বেচারা চুপ করে থাকতে পারে না।

সৃষ্টিকাল থেকেই মানুষ পশুপাখির ভাষা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে। পুরোহিতেরা, শিল্পীরা, কবিরা বারবার এই প্রসঙ্গে এসেছেন ফিরে ফিরে। এই বিষয়ে মোটা মোটা গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে, কতগুলি লিখেছেন বিশিষ্ট গ্রন্থকারেরা। এই সব গ্রন্থের কথা সবাই ভুলে গেছে, এমনকি বিশিষ্ট লেখকদের দ্বারা লেখা গ্রন্থগুলির কথাও।

নানা গবেষণা ব্যর্থ হয়ে গেছে পশুপাখির শব্দসংকেতে পাঠানো বার্তার পাঠোদ্ধারে। শব্দ-পঞ্জীকরণ পদ্ধতির যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের পরেই এবং অগুণতি শব্দলেখ উৎপাদন আর শব্দের সার্বিক বিশ্লেষণের পরেই বিজ্ঞানীরা এই চিত্তাকর্ষক সমস্যাটার যথাযথ মোকাবিলা করতে পারলেন।

শব্দসংকেত অনেকগুলি কাজের জন্য ব্যবহার করা হয়। কতকগুলি তো নাম ডাকাডাকির শব্দ, কতকগুলি বিপদসূচক, তৃতীয় রকমের ধ্বনি ঘোষণা করে খাদ্য খুঁজে পাওয়া গেছে, চতুর্থ রকমের ধ্বনি হোল প্রণয়ভিক্ষার জন্য দয়িতার কাছে আকুতি। আমাদের পরিচিত পাখিরা মিষ্টি সুন্দর কিচকিচ্ শব্দ করে প্রায় বেশির ভাগ সময় জানায় যে থাকবার বাসা একটা যোগাড় হয়েছে।

খুবই ঔৎসুক্য-জাগানো হলেও এখনো স্পষ্ট করে জানা যায় নি যে পাখির আর ব্যাঙের গান যার মধ্যে বস্তুনিষ্ঠ কোন তথ্য থাকে না, কেন সেগুলি এত জটিল এবং মাঝে মাঝে চিত্তহারী সঙ্গীতের, টুকরো হয়ে ওঠে। গান গাইবার ক্ষমতাটা ঈশ্বরদত্ত, তবে ভাল গান গাইতে হলে পাখিকে গান শিখতে হয়। সবেমাত্র ডানা গজাচ্ছে এমন কোন পাখি যদি সঙ্গী পাখিদের গলার স্বর কখনো না শুনে থাকে তাহলে সে কখনোই ভাল গায়ক হয়ে

উঠবে না। পাখিরা শুনে শুনে শিখতে পারে এই তথ্যটা তত বিস্ময়কর নয় যতটা সেই ঘটনা যে তাদের রুচি এত উচ্চ। ভাল গায়ক পাখি কখনোই মন্দ গায়কের গান গাইবার কায়দাগুলি নকল করবে না, তবে সাধারণত যে মন্দ গায় সে ভাল গায়কের নকল করে থাকে। এর থেকে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় কোন কোন অঞ্চলে কেন কেবল ভাল গায়ক পাখিরই বাস, অন্য কোন জায়গায় হয়ত সব গায়করাই মন্দ।

পশু পাখির ভাষা কিন্তু আগে যা ধারণা করা হোত তার থেকে অনেক বেশি সমৃদ্ধ। বিশেষত যেসব প্রাণী বড়ো সড়ো দল বেঁধে বাস করে তাদের ভাষা বিশেষ ঐশ্বর্যশালী। মুরগীদের বোকামির কথা নিয়ে তো প্রবাদবাক্যই কত রয়েছে, কিন্তু তাদের ভাষাতেও অন্তত ত্রিশটা শব্দসংকেত আছে।

প্রত্যেক জাতির প্রাণীর আছে নিজের নিজের সংকেততালিকা, আর যে-সব প্রজাতি বিশ্বের নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে, তাদের আলাদা আলাদা দেশবাসী বা আরেকটু সঠিকভাবে বলতে গেলে ভিন্ন ভাষাভাষী দলে ফেলা যায়।

প্রমাণিত হয়ে গেছে যে আমেরিকা বাসী কাক-এরা তাদের ফরাসী ভাইবোনদের কথা একেবারেই বুঝতে পারে না। কৃষ্ণসাগরের ডলফিন-এরা ভূমধ্যসাগরের বাসিন্দা জ্ঞাতিদের ভাষায় কথা বলতে পারে না।

আবার, এক পাড়াতে বাস ক'রে ভিন্ন জাতের পশু পাখিরা পড়শীদের শব্দসংকেতগুলি বেশ রপ্ত করে নেয়, বিশেষত বিপদসূচক ধ্বনিগুলি। ম্যাগপাই যে বিপদের সংকেত দেয় কাছাকাছি জঙ্গল বা মাঠের সকল বাসিন্দারাই সেটা বেশ বুঝতে পারে। বনপ্রান্তরের শ্লথগতি প্রভু ভাল্লুকরাজ বা দূর প্রাচ্যের জঙ্গলের বিপজ্জনক ডোরাকাটা ব্যাঘ্ররাজ, কেউই এই বিপদ-সংকেত অগ্রাহ্য করবার ঝুঁকি নেয় না। বহু ভাষাবিদ পাখিও দেখতে পাওয়া যায়। যেসব পাখি যাযাবর জীবন যাপন করে তারা তাদের ছাঁপোষা গৃহস্থজ্ঞাতি গোষ্ঠীর আঞ্চলিক ভাষাগুলি আয়ত্ত করে নেয়।

বিভিন্ন প্রজাতির পাখির গলার স্বরের এতই তারতম্য হয়ে থাকে যে গলার স্বর থেকেই তার মালিককে চেনা সহজ হয়। পক্ষীবিশারদ দোয়েলের গান শুনে তার প্রজাতির নাম বলে দিতে পারবেন কিন্তু হাতে ধরে পাখিটাকে চিনতে চাইলে তাঁর ভুল করে বসা খুবই স্বাভাবিক। স্বরের প্রভেদটা খুবই জরুরী। দেখতে একরকমের হলেও বিভিন্ন প্রজাতির দোয়েলদের বিবাহাদি কখনোই ভিন্ জাতের সঙ্গে হয় না, শব্দসংকেত

দিয়েই তারা পরস্পর পরস্পরকে চিনে নিয়ে জোড় বাঁধে। অনেক পতঙ্গের গানেরও একই উদ্দেশ্য। ডাঁশ-এরা তাদের মহিলাদের চিনে নেয় নিজের প্রজাতির বিশেষ গুঞ্জনধ্বনি থেকে, যেটা আবার নির্ভর করে পাখার আন্দোলনের কম্পনাঙ্কের ওপর।

পশু-পাখির সৃষ্ট শব্দসংকেতে তারতম্য ঘটে স্থায়িত্বে, কম্পনপ্রসার এবং কম্পনাঙ্কের মিশ্রণে, দুটি ভিন্ন ধ্বনি-বার্তার মধ্যেকার সময়ের ব্যবধানে, বিশেষ স্বর সপ্তকের আরোহ এবং অবরোহের তীক্ষ্ণতায় এবং আরো কয়েকটি চরিত্র লক্ষণে।

যেমন ধরো বাতাস থেকে নেমে-আসা বিপদের সংকেত সকল পাখি ও কয়েকটি পশুর ক্ষেত্রে একটা একটানা আস্তে, আস্তে তীব্র হয়ে ওঠা আওয়াজ। এমনি একটা অল্প তীব্রতায় বেড়ে ওঠা ধ্বনি দিয়ে বিপদের উৎসটাকে ধরা যায় না, কিন্তু এক্ষেত্রে তাতে কিছু যায় আসে না। ওপর থেকে শত্রু যখন ভয় দেখায়, যখন বাজ বা ঈগল যে কোন মুহূর্তে নেমে আসতে পারে ছোঁ মেরে, তখন দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করে লাভ নেই। আকাশের বিপদ-সংকেতটা প্রাণীটাকে কোন ইঙ্গিতই দিতে পারে না দুর্দৈবটা আসছে ডান দিক থেকে না বাঁ দিক থেকে, সামনে থেকে না পেছন থেকে, কোন দিকে দৌড়ুতে হবে সেটাও বলে দিতে পারে না। নিঃশ্বাস বন্ধ করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না, কেবল আশা করা যায় যে শত্রু তোমাকে দেখতে পাবে না, বা সন্নিকটে আশ্রয়স্থল থাকলে সেখানে লুকানো যায়। আকাশ থেকে আক্রমণ এলে বস্তুত রক্ষা পাবার এইগুলিই একমাত্র ভরসা।

ডাঙার বিপদের বেলায় সংকেতের প্রকৃতিটা যথেষ্ট ভিন্ন। এক্ষেত্রে জানা জরুরী বিপদটা আসছে কোথা থেকে তাই সংকেতের ঠিকানাটা জানা চাই। ডাঙার বিপদের সংকেত তাই হওয়া চাই এমন যে নির্ভুলভাবে বিপদের উৎস নির্ণয় যেন করা যায়। মুরগীরা এজন্য ব্যবহার করে হ্রস্ব স্বরের স্পন্দনসমষ্টি। শুরুতে তীব্রভাবে উঠে আস্তে আস্তে নেমে আসে। ডাঙার বিপদের সংকেত পেলে পাখিরা ডানা মেলে দেয়, পশুরা ছোটে যে দিক থেকে সংকেতটা আসছে তার উলটো দিকে।

পশু-পাখির ভাষার মনভোলানো ঐশ্বর্য যতই থাকুক, এই ভাষা শুধু শব্দসংকেতেই সীমাবদ্ধ তা নয়, তথাপি আমাদের এই ভাষাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাষা বলেই চিহ্নিত করতে হবে। আসল কথাটা এই যে পশুই হোক বা পাখি, তারা তাদের ভাষার সকল শব্দই পেয়ে থাকে জন্মসূত্রে, মানুষের

শিশুদের মতো উপায়ে সেটা তাদের শিখতে হয় না। জন্তুরা যেসব সংকেত উচ্চারণ করে থাকে সেগুলি অসচেষ্ট, নির্দিষ্ট মানসিক অবস্থা থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকে। ছোঁ মেরে নেমে আসা চিলকে দেখে ভয়ে যখন মুরগী চেঁচিয়ে ওঠে তখন সে তার মুরগী-বন্ধুদের সতর্ক করে দিতে চিৎকার করছে না। মুরগীর চিৎকার তেমনি স্বভাবজ যেমনটি তপ্ত লৌহশলাকায় হাত দিয়ে ফেলে চেঁচিয়ে ওঠার ব্যাপারটা। পশুপাখির, ভাষা আন্তর প্রকৃতিজ, তথ্য বিনিময়টা অসচেষ্ট। এটা একটা কারণ যে জন্য তাদের ভাষার উন্নতি ও বিকাশ হয় মানুষের তুলনায় অনেক বিলম্বে। অন্য কারণও অবশ্য আছে।

কোন এক দল প্রাণী যত বেশি দিন যাবৎ গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বাস করবে, পরিবেশ সম্বন্ধে তত বেশি খবরাখবর তারা পাবে সঙ্গী সাথীদের স্বতস্ফূর্ত শব্দসংকেতগুলি থেকে। একই বাড়িতে বসবাসকারী দুটো কুকুরের মধ্যে একজন জানালার বাইরে তাকিয়ে যদি দেখে যে পরিবারের একজন আসছে, তাহলে অন্য কুকুরটা সঙ্গীর গলার আওয়াজ ও হাবভাব থেকে বুঝতে পারে ঠিক কোনজন আসছে।

পশু পাখিকে শব্দসংকেতের আরো সক্রিয় প্রয়োগ শেখানো যায়। কুকুরকে সহজেই শেখানো যায় তেষ্টা পেলে একবার ডাকতে, খিদে পেলে বার বার ঘেউ ঘেউ করে ডাকতে আর বাইরে যাবার দরকার হলে কেঁউ কেঁউ করে ডাকতে।

তোতা পাখির স্বরযন্ত্র আকৃতিতে মানুষের স্বরযন্ত্রের প্রায় কাছাকাছি, তাই তাদের যে কোন ভাষাতে গোটা গোটা শব্দ বা বাক্যাংশ শেখানো যায়। শুধু তাই নয়, অবস্থা অনুযায়ী তাদের দিয়ে সেই শব্দ বা বাক্যাংশগুলি ব্যবহারও করানো যায়। আফ্রিকার একটা লভ-বার্ড নিয়ে এসেছিলেন ইংলণ্ডে একজন অবসরপ্রাপ্ত বানিজ্যজাহাজের নাবিক। এই পাখিটা তার বাটির জল ফুরিয়ে গেলে বলত 'ড্রিংক' পাতা সবজী চাইতে বলত 'গিভমি সাম লেটুস'। রাত্রে জানালার নিচে মাথাটি গুঁজে ঘুমোতে যাবার আগে তোতাটার 'গুডনাইট' বলতে কখনো ভুল হত না, তা সে ঘরে কেউ থাকুক বা নাই থাকুক।

পূর্বে বর্ণিত সহজাত সংকেত ব্যবস্থার চেয়ে এই ধরনের সাড়া-র অর্থ এক ধাপ অগ্রসর হওয়া, তবুও মানুষের ভাষা থেকে এটা নিকৃষ্ট। এগুলি আসলে কুকুরের ভোজনের পাত্রের ঝন্ ঝন্ শব্দ শুনে বা সেই পাত্রে ঝোল ঢালতে দেখে মুখ থেকে লালা নিঃসরণের মতো প্রতিবর্তী শিহরণ মাত্র।

পশু পাখিদের মধ্যে এর চেয়ে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা কি আছে?

আমেরিকান বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি ডলফিন-দের আচরণ চর্চা করতে গিয়ে বেশ ধাঁধায় পড়লেন। দুটি প্রাণী বাস করত একই জলাধারে। তাদের শেখানো হয়েছিল বাঁদিকের একটা ডাণ্ডায় ঠেলা দিতে যখন একটা বিশেষ আলোক সংকেত দেওয়া হোত, আর অন্য একটা সংকেতে ডান দিকের ডাণ্ডায় ঠেলা দিতে। তার পরে জলাধারে একটা বিভেদ প্রাচীর গড়ে দেওয়া হোল। যে ডলফিনটা জলাধারের ডানদিকে থাকত সেটা আলোকসংকেতগুলি দেখতে পায় কিন্তু ডাণ্ডাগুলির নাগাল পায় না। বামদিকের প্রকোষ্ঠের সঙ্গী ডলফিন ডাণ্ডাগুলি প্রাণ ভরে নাড়াতে পারে, কিন্তু ডাণ্ডা ঘোরানোর উদ্দীপনার জন্য প্রয়োজনীয় আলোক সংকেতগুলি দেখতে পায় না।

এই পরিচিত পরীক্ষাটা যখন প্রথম করা হয়, জলাধারে বিভেদ প্রাচীর তুলে দেবার পরে সংশ্লিষ্ট সকলে বিস্ময়ে হতচকিত হয়ে যান। বাঁদিকের অংশের ডলফিনটা, যে আলোক সংকেতগুলি একেবারেই দেখতে পাচ্ছে না, সে প্রত্যেক বার নির্ভুলভাবে ঠিক ঠিক ডাণ্ডা ঘোরাতে থাকে। অন্য ডলফিনটা আলোক সংকেত দেখা মাত্র খবরটা সঙ্গীকে পাঠিয়ে দিচ্ছে।

এই ডলফিনেরা শব্দসংকেত ব্যবহার করছিল। চৌম্বক-ফিতায় (magnetic tape) সেই সংকেতগুলির শব্দলেখও ধরা হয়েছে। এই শব্দময় তথ্য কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যায় নি। ডানদিকের ডলফিনটা কি দিয়ে সাড়া দেয় স্বতস্ফূর্তভাবে, জানালা দিয়ে প্রভুকে আসতে দেখা সেই কুকুরটার মতো? না হলে একটা ডলফিন অন্য আরেকটাকে পারিপার্শ্বিকের বিষয়ে সক্রিয়ভাবে কি খবর পাঠায়? শেষোক্ত অভিমতটা যদি খাটে তাহলে তার অর্থ এই হবে যে ডলফিনদের সংকেত ও তার সাড়াগুলি অন্য যে কোন প্রাণীর সঙ্গে তুলনায় মানুষের ভাষার কাছাকাছি।

শব্দসংকেতের বৈচিত্র্য আর সেই সঙ্গে কঠোরভাবে নির্দিষ্ট অর্থবহতা থেকে স্বভাবতই অনুকরণের প্রবণতা এসেছে। বিভিন্ন প্রাণীর কন্ঠস্বরের মিলটা অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য আকস্মিক। অনভিজ্ঞ শহরবাসী মানুষ কিন্তু শম্বর হরিণ দম্পতির বাসর রাত্রি যাপনের কালে যদি জঙ্গলে রাত কাটায় তাহলে ভয়ে সে কাঁপবে। প্রেমোন্মাদ পুরুষ হরিণের এই অস্বাভাবিক জোরালো কন্ঠস্বর বড় বড় শিকারী প্রাণীর গর্জনস্বরের সঙ্গে মিলে যায়। এই মিলটা কি নিতান্তই আকস্মিক? হতে পারে। প্রকৃতি তো মনের ভুল বশত পুরুষ হরিণের কর্কশ স্বর হরিণীর কানে শ্রুতিমধুর আবার একই সঙ্গে অন্য প্রাণীর কাছে ভয় জাগানো করে তোলেন নি? এই নিঃসহায়

লাজ্‌ক প্রকৃতির মুখচোরা প্রাণীদের আত্মরক্ষার জন্য আর কি উপায়ই বা তিনি করতে পারতেন?

বিশেষ উদ্দেশ্যে নকল করার দৃষ্টান্ত আরো অনেক বেশি দেখা যায়। বোলতাদের ঘাঁটানো বিপজ্জনক। তাই অন্য কোন প্রাণী বোলতাকে নকল করলে সেই প্রাণীরই সুবিধে হবে। তা এরকম কুশলী অভিনেতাও আছে। বোলতারা যেখানে থাকে সেসব অঞ্চলে বড় বড় মাছি দেখতে পাওয়া যায়। ওড়বার কালে বোলতা তার পাখাগুলি কাঁপায় প্রতি সেকেণ্ডে 150 বার। মাছিগুলিও তাদের পাখা কাঁপায় প্রায় একই বেগে, প্রতি সেকেণ্ডে 147 বার। এই সাদৃশ্যটাই যথেষ্ট, মাছির শত্রুদের বিভ্রান্ত করতে। তবে এই মাছিদের কান খুবই প্রখর। তাই বোলতাদের কখনো নিজের গোষ্ঠীর পতঙ্গ বলে ভুল করে প্রেমনিবেদন করতে যাবে না।

মৌচক একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ। এমনকি ভাল্লুকও সময় সময় দলবদ্ধ মৌমাছি পরিবারের মিলিত শক্তির কাছে রণে ভঙ্গ দিয়ে পালায়, অথচ মৌমাছিকে সম্মুখসমরে আক্রমণ করবার সাহস একমাত্র ভাল্লুকেরই আছে।

মৌচাকের ফটকের সামনে রাত্রি দিন প্রহরীরা টহল দিচ্ছে, অনুপ্রবেশকারীদের মেরে তাড়িয়ে দেবার জন্য। এই অতন্দ্র প্রহরীদের চোখের সামনে অলক্ষ্যে ঢুকে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। মধুর গন্ধে মন প্রাণ মেতে উঠছে অথচ ভাণ্ডারের দ্বারে কড়া প্রহরা।

তাই, প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা ভেবে কূল কিনারা পান না যে মাথার খুলি আর জোড়াহাড় আঁকা মথ-এরা (Sphinx) কেমন করে মৌচাকে ঢোকে। এই মথদের পাখা আর পেটের রং কালো আর হলদে, পিঠে হলদতে সাদাতে ছাপ দেখতে অনেকটা মড়ার মাথার খুলি আর জোড়াহাড়-এর মতো। মৌচাকে ঢুকে স্ফিংকস প্রাণভরে মধু খায়, খেয়ে এত ভারী হয় যে অতি কষ্টে আবার উড়ে বাসায় ফিরে যেতে পারে। স্ফিংকস-এরা অদ্ভুত ছোট ছোট তীব্র শব্দ করে, মৌচাকের প্রহরীরা তাই শুনে মোহগ্রস্ত হয়ে যায়। মৌমাছির কানে এই গানগুলি শোনায় যেন ইউলিসিস-এর সঙ্গীদের কানে সাইরেনদের সঙ্গীতের মতো। এই চমকপ্রদ রহস্যটা সম্প্রতি উদ্ঘাটিত হয়েছে—স্ফিংকস দেখা যাচ্ছে তরুণী রাণী মৌমাছিকে নকল করে।

রাণী না থাকলে মৌমাছিরা অনাথ। চাক থেকে রাণী যখন একটা দল নিয়ে ঘরবাড়ি ত্যাগ করে চলে যায়, তখন মৌচাকে বিষাদের ছায়া নামে। তবে কয়েক দিনের মধ্যেই নতুন রাণী বন্ধ-গুটি ভেঙে বেরিয়ে আসে, ঘোরটা

কেটে যায়, মৌচাক-পরিবারে আবার সাড়া পড়ে যায়। তরুণী রাণী মৌচাকটা ঘুরে দেখতে বেরিয়ে পড়ে। দ্রুত পায়ে প্রত্যেকটা মধুভাণ্ডের ওপর দিয়ে যেতে যেতে সে গান ধরে, ঘোষণা করে সারা দলের কাছে তার নিজের সিংহাসনে অভিষেক।

স্ফিংকস এই সদ্য-গুটি-ভেঙে বেরিয়ে আসা তরুণী রাণীর গানের নকল করে। মৌমাছিদের কানে এই সঙ্গীত কুহকী ঘোর লাগিয়ে দেয়। এই অল্পকালের বিমূঢ়তার সুযোগ নিয়ে স্ফিংকস মৌচাকের মধ্যে ঢুকে প'ড়ে যতটা পারে মধু শুষে নিয়ে মৌচাক ছেড়ে পালায়, সেখানকার বাসিন্দাদের হুঁস ফিরে আসার আগে। নৈসর্গিক শব্দাদি অণুকরণ করাও অনেক প্রাণী অভ্যাস করে। এই ব্যাপারটার অবশ্য খুব বেশি গবেষণা হয় নি। তবে আমরা জানি যে নৈসর্গিক শব্দাদি জলের প্রাণীরাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে করে, যাদের কাছে ডাঙার প্রাণীদের চেয়ে শব্দের গুরুত্ব বেশি। শিকারীপশুরা নৈসর্গিক ধ্বনির নকল করতে করতে অসতর্ক শিকারের কাছাকাছি এগিয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রেই এই উদ্দেশ্যে অতিশব্দ ব্যবহার করা হয়, কিন্তু অতিশব্দ মানুষের কানে অগ্রাহ্য হওয়ার কারণে এই কৌতুহল-জাগানো বিষয়টা নিয়ে নতুন আবিষ্কারের পথে অন্তরায় হয়ে রয়েছে।

নিশাচর প্রাণীরা অন্যান্য শব্দসংকেতের সঙ্গে অতিধ্বনির ব্যবহার করে খুব বেশি। পদ্ধতিটা খুবই সহজ: প্রাণীটা যে ধ্বনি তুলল সেটা ছড়িয়ে যাবার পথে যেসব বস্তুকে আঘাত করে সেখান থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে প্রাণীটার কাছে। শব্দটা ফিরে আসতে যে সময়টা লাগল তা থেকেই প্রাণীটা জানতে পারে বস্তুটার দূরত্ব, আর প্রতিধ্বনিটার প্রকৃতি থেকেই বস্তুটার গণাগুণ সমন্ধে খানিকটা ধারণা হয়।

উচ্চতর প্রাণীদের প্রায় সকলেরই প্রতিধ্বনি থেকে তথ্য উপলব্ধি করার ক্ষমতাটা আছে। চোখ বেঁধে রাখা কুকুর দু এক দিনের মধ্যে শিখে নিতে পারে দেয়াল বা কোন বড় বস্তুতে ধাক্কা না খেয়ে এড়িয়ে যেতে। তার শিক্ষিত কান উপলব্ধি করতে পারে নিজের পায়ের শব্দ কঠিন পদার্থের উপরিতলে প্রতিহত হয়ে ফিরে এলে। বেশিদিনের প্রশিক্ষণে আরো ছোট ছোট বস্তু এড়িয়ে যেতে শেখা সম্ভব হয়।

মানুষও প্রতিধ্বনি ব্যবহার করে থাকে বস্তুর আন্দাজ করতে। জন্মান্ধদের কান অত্যন্ত শিক্ষিত হয়ে যায়, তারা তাদের পায়ের বা হাতে ধরা ছড়ির শব্দ থেকে আন্দাজ করতে পারে এবং এড়িয়ে যেতে পারে এমনকি সরু সরু গাছ

পালাও। ডলফিন আর বাদুর বা চামচিকেদের সঙ্গে তুলনা করলে অবশ্য প্রতিধ্বনি থেকে এই ধরনের অবস্থান নির্ণয় নেহাৎই মামুলি, তবে মানুষ সীমিত পাল্লার শব্দ ব্যবহার করতে পারে তাই তার অনুভবের নির্ভুলতাও হয়ে যায় সীমিত।

মাছেরা এমনি একটা অবস্থাননির্ণয় পদ্ধতি ব্যবহার করে। তাদের চলাফেরার দরুণ স্থানীয় চাপের সৃষ্টি হয় যে চাপ তরঙ্গাকারে চতুর্দিকে ছড়িয়ে যায়। কাছাকাছি কোন বস্তু থাকলে তার থেকে প্রতিফলিত তরঙ্গগুলি ধরা পড়ে মাছের শরীরের পার্শ্ব বরাবর লম্বা রেখাকারে অবস্থিত একটি যন্ত্রে, যেটা আছে সকল মাছের আর উভচরের। এই যে তরঙ্গ-নির্ণয়, (মাছের সৃষ্ট তরঙ্গ থেকে শব্দ উৎপন্ন হয় না) এটা তাদের সাহায্য করে জলের তলায় অবস্থিত বাধাগুলিকে এড়াতে, এমনকি রাত্রিকালেও।

কোন বস্তুর অবস্থান নির্ণয় করার ক্ষমতার উন্নতি করতে গিয়ে প্রকৃতিকে পশু পাখির শব্দ-উৎপাদনের দেহযন্ত্রগুলি পুনর্গঠন করে নিতে হোল। প্রথমত প্রাণীদের পরস্পরের মধ্যে শব্দসংকেত বিনিময়ের জন্য শব্দকে সকল দিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়—কিন্তু শব্দ থেকে বস্তুর অবস্থান নির্ণয়ের জন্য সকল দিকে শব্দ পাঠানোর দরকার নেই। তার চেয়ে বেশ শক্ত বাঁধুনির এক গোছা শব্দকে যদি নির্দিষ্ট একদিকে পাঠানো যায় তাহলে সেটা হবে আরো কার্যকর। কোন অবরোধকারী বস্তু থেকে শব্দকে যদি ভালমতো প্রতিফলিত হয়ে আসতে হয় তাহলে বাধাসৃষ্টিকারী বস্তুটার আকৃতির অর্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ দৈর্ঘ্যের হতে হবে শব্দ-তরঙ্গের দৈর্ঘ্যকে। সেই কারণে সর্বদাই হ্রস্ব দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ ব্যবহৃত হয় অবস্থান নির্ণয়ের জন্য।

যেসব পাখি প্রতিধ্বনির শব্দ থেকে অবস্থান নির্ণয়ের পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে তাদের মধ্যে সব চেয়ে প্রসিদ্ধ হোল গুয়াচারো পাখি (the guacharo)।এরা থাকে ক্যারিবীয় সমুদ্রের দ্বীপগুলিতে আর ল্যাটিন আমেরিকাতে। এদের গায়ের রং চকোলেট আর তার ওপর সাদা ফুটকি। ডানা দুটি ছড়ালে তার বিস্তার হবে এক মিটার — এদের দেখতে অনেকটা বড় সাইজের বাজ পাখির মতন।

গুয়াচারো নিশাচর পাখি। অন্ধকার গুহার ভেতরে কোন পাথরের খাঁজ-এর মধ্যে এদের বাসা, সারাদিন থাকে সেখানেই। রাত্রে পাখিগুলি বেরিয়ে আসে খ্যাদ্যের সন্ধানে, খাদ্য হোল ক্রান্তীয় অঞ্চলের তাল-সুপারি জাতীয় গাছের ফল। বাসায় ফিরে আসে ভোরের আগে। মাটির নীচের আঁকা বাঁকা
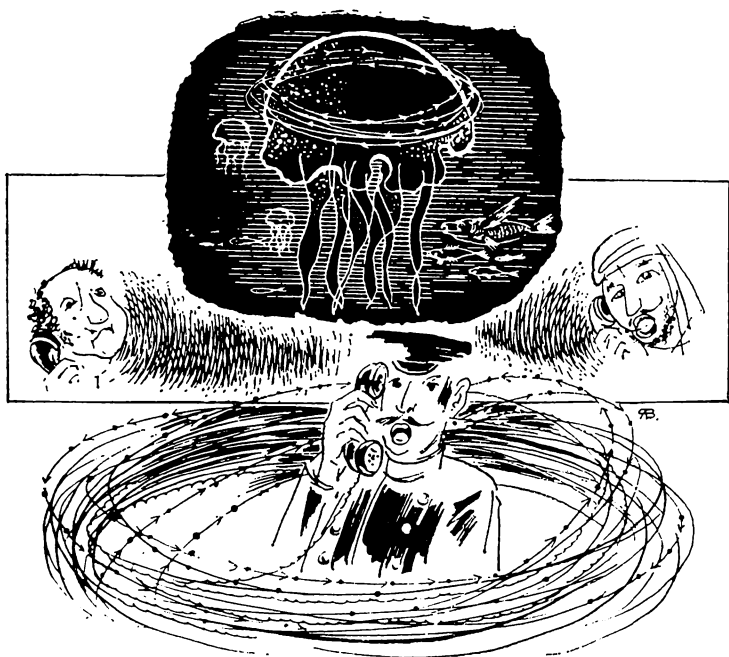
সুড়ঙ্গের মধ্যে পীচের মতো অন্ধকার, সেই অন্ধকূপের ভেতর দিয়ে উড়তে এদের কোন অসুবিধে হয় না, গুহার দেয়ালে বা বেরিয়ে থাকা পাথরে একবারও ধাক্কা খায় না। পাখিটা তার পথ চিনে চলতে পারে প্রতিধ্বনি থেকে অবস্থান নির্ণয়ের সাহায্যে।

ওড়বার কালে গুয়াচারো ছোট ছোট শব্দ করতে থাকে, ধ্বনিগুলি প্রতি সেকেন্ড 7000 কম্পনাঙ্কের। এই শব্দ মানুষের কর্ণগ্রাহ্য সীমার মধ্যে রয়েছে। বাতাসে শব্দের বেগ প্রতি সেকেন্ডে 340 মিটার বলেই আমরা জানি, তার মানে পাখিটা যে বেগে ওড়ে তার দশ বারো গুণ, তাই শব্দবার্তা প্রতিবন্ধকটা পর্যন্ত গিয়ে গুয়াচারোর কানে ফিরে আসার সময় সব সময়ই পাওয়া যাচ্ছে। পাখিটা তাই সময় মতো বিস্তারিত তথ্য পেয়ে যাচ্ছে তার সামনের পথটার বিষয়ে। সালানগান (The Salangan-এরা swallow জাতের পাখি, এদের বাসার ঝোল রেঁধে খাওয়া যায়) আর অন্য কয়েক জাতের নিশাচর পাখিও প্রতিধ্বনি থেকে অবস্থান নির্ণয় করতে পারে এই পদ্ধতিতে।

চামচিকে, বাদুড় আর ডলফিন-এরা প্রতিধ্বনি থেকে অবস্থান নির্ণয় করে থাকে কেবল বাধাগুলি এড়াবার জন্যই নয়, তা ছাড়া খাদ্য খোঁজার জন্যও। তাই তাদের ব্যবহার করতে হোল অতিশব্দ যার তরঙ্গগুলির কম্পনাঙ্ক প্রতি সেকেণ্ডে 40,000 থেকে 300,000 পর্যন্ত, এক একটি তরঙ্গের দৈর্ঘ্য এক থেকে তিন মিলিমিটার।

যেসব বাদুড় ফল পাকুড় আর গাছের ডালে বসে থাকা বড় বড় পতঙ্গ ধরে খায়, আর যেসব রক্ত-চোষা বাদুড় বড় জন্তুর রক্ত চুষে খায় তারা খাদ্য সন্ধান করে অল্প তীব্রতার আর প্রতি সেকেণ্ডে 150,000 পর্যন্ত কম্পনাঙ্কের শব্দ-তরঙ্গের সাহায্যে। এই প্রাণীদের এই অনুশীলনটা মোটামুটি সহজই—এদের খুঁজে পেতে হবে ছোট কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিশ্চল বস্তু, তাই এরা একটা নির্দিষ্ট কম্পনাঙ্কের তরঙ্গ পাঠায়। যেসব ডলফিন আর পাকড়াতে হবে চলন্ত শিকার তাদের কাজটা হাসিল করা আরো কঠিন। তাদের পেতে হবে কেবল যে শিকার কোথায় আছে সেই খবর তাই নয়, আবার সেই শিকারের চলাফেরার গতিও। সম্ভবত সেই কারণেই অধিকাংশ বাদুড় বিভিন্ন কম্পনাঙ্কের ধ্বনিবার্তা পাঠিয়ে থাকে।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। পতঙ্গভোজী বাদুড়েরা গাছের ডালে ঝুলতে থাকে মাথা নীচু করে, আর মাছি-ধরা পাখির মতো মাথাটা ঘোরাতে থাকে সব দিকে, প্রতি সেকেণ্ডে পাঠায় দশ থেকে কুড়িটা শব্দসংকেত। প্রতিটি সংকেতে আছে গোটাপঞ্চাশ শব্দ-তরঙ্গ, একেকটা তরঙ্গ 90,000 থেকে শুরু করে 45,000 কম্পনাঙ্কের প্রতি সেকেণ্ডে। কোন একটা বার্তাতে দুটি অভিন্ন কম্পনাঙ্কের শব্দ নেই। সম্ভাব্য শিকারকে আন্দাজ করবার পরে বাদুড়টা ধ্বনিবার্তা পাঠায় দমকে দমকে, প্রতি সেকেণ্ডে 200 টি দমক, প্রত্যেকটা দমকের স্থায়িত্ব কমিয়ে আনে 0·001 সেকেণ্ডে।

বলা হয়েছে শিকারের উড়ে যাওয়ার দিকটা নিরূপণ করে নিতে বাদুড়টা প্রতিধ্বনির শব্দ-তরঙ্গের পরিবর্তনটা পরিমাপ করে নেয়, নির্ণায়ক শব্দ-তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের সঙ্গে তুলনায়। শিকার যদি বাদুড়ের দিকে আসতে থাকে, প্রতিফলিত শব্দ-তরঙ্গগুলি তাহলে হ্রস্বতর হয়ে যায়, তরঙ্গগুলিকে উড়ন্ত শিকার চাপ দিয়ে যেন সংকুচিত করে দেয়। শিকারের ওড়ার গতিবেগ যত দ্রুত হবে প্রতিফলিত তরঙ্গগুলির সংকোচন হবে তত বেশী, প্রতিধ্বনিশব্দের কম্পনাঙ্কও বাড়বে। শিকার যদি বাদুড়ের থেকে দূরে সরে যেতে থাকে প্রতিধ্বনির শব্দ-তরঙ্গগুলি হবে দীর্ঘায়িত, যত দ্রুত সেটার

ওড়ার গতি হবে তত মৃদু হয়ে যাবে সেই ধ্বনি তাড্যমান প্রাণীটার কানে।

বাদুড়ের প্রতিধ্বনি নিরূপণ ব্যবস্থাটা এমনই নির্ভুল যে এরা সমান মাপের ভেলভেট, বালি, প্রলেপিত কাগজ আর প্লাইউডের প্রভেদ ধরতে পারে। প্রত্যেকটা বস্তু তার নিজের নিজের ধারায় শব্দকে প্রতিফলিত করে থাকে। মসৃণ ক্ষেত্র বা তল শব্দকে ভালভাবে প্রতিফলিত করতে পারে, অমসৃণ বা নরম ক্ষেত্র বা তল শব্দকে দমিয়ে দেয়। এর থেকে বোঝা যায় চামচিকে কেন মাঝে মাঝে জড়িয়ে যায় মেয়েদের মাথার চুলে। এই চামচিকে কিন্তু সন্ত্রস্ত চুলের মালিককে কোন বদ উদ্দেশ্যে কিছু করতে যায় নি। বেচারা কেবল মেয়েটার ঘন কেশদামে জড়িয়ে গেছে সেখান থেকে কোন প্রতিধ্বনি ফিরে না আসার জন্য।

বাদুড় বা চামচিকে-এরা যেসব পতঙ্গদের ধরে খায়, তারা আগেভাগে জেনে নিয়েছে শব্দ প্রতিফলনের এই বৈশিষ্ট্য। ওরা বুঝতে পেরেছিল কেমন করে নিজেদর অদৃশ্য করে নিতে হয়। রাত্রে ওড়ে যেসব মথ তাদের, আর কয়েক জাতের গুবরে পোকার সারা শরীর যে ঘন, কোমল রোম দিয়ে ঢাকা থাকে সেটা শুধু রাত্রের ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচবার জন্যই নয়। এই রোমগুলির জন্য এদের শরীর থেকে শব্দ প্রতিফলিত প্রায় হয়ই না, বা হলেও তা থেকে কোন হদিস পাওয়া যায় না। চামচিকে তার শিকারের পাশ দিয়েও চলে যেতে পারে তাকে লক্ষ্য না করে। আবার মথের যদি শব্দের উৎসনির্ণায়ক ধারক যন্ত্র থাকে যেটা রাত্রের ঘাতকের শব্দ-তরঙ্গের সুরে সুর বাঁধা, তাহলে তার বাঁচবার সম্ভাবনা আরো বাড়ে। পতঙ্গটা তখন ডানা দুটি গুটিয়ে ঝুপ করে বসে পড়বে ঘাসের ওপর, যেন একটা নুড়ি পাথর।

বাদুড়ের অত্যাশ্চর্য নির্ণায়ক কেবল বাতাসেই যে নিজের অবস্থান নির্ধারন করতে সক্ষম তাই নয়, ঘনতর মাধ্যমকেও একস-রে-এর মতো সেটা ভেদ করতে পারে। কোন কোন বাদুড় মাছ ধরে খেতে ভালবাসে। তারা জলের উপরিতলের খুব কাছাকাছি উড়তে থাকে, জলের গভীরে পাঠিয়ে দেয় শব্দসংকেতগুলি। ঠিক মতো সাড়া যেই পেল অমনি পায়ের থাবা দুটি জলে নামিয়ে দিয়ে শিকারকে টেনে তোলে।

বিজ্ঞানীদের অনেক চিন্তা করতে হোল বুঝে উঠতে যে কেমন করে বাদুড়েরা এটা করতে পারে। প্রথমত শব্দসংকেতগুলি জলের উপরিতলে খানিকটা প্রতিফলিত হয়েই থাকে, যার ফলে প্রতিধ্বনিটা অনেকাংশে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। তার ওপর, জলের আর মাছের শরীরের শব্দধারণ

গুণাগুণ এতই অভিন্ন যে বাদুড়ের সৃষ্ট শব্দ মাছের শরীর থেকে প্রতিফলিত প্রায় হয় না। সত্যিই তাই। মাছ বাদুড়ের কাছে অদৃশ্য, কিন্তু মাছের শরীরের মধ্যে আছে ছোট একটা সাঁতারের সহায়ক বাতাস-থলি (পটকা) যেটা গ্যাসে পূর্ণ থাকে, বাদুড় তো তার নির্ণায়ক ধ্বনি দিয়ে জলকে বাজিয়ে নিচ্ছে, এমন সময় সহজেই মাছের পেটের মধ্যে এই বাতাস-থলিটার অবস্থান টের পেয়ে যায়।

মেরু অঞ্চলের তিমি আর সীল-এরা প্রতিধ্বনির সাহায্যে অবস্থান নির্ণয়ের ব্যাপারে ভারি দক্ষ। বছরের মধ্যে অধিকাংশ সময় তাদের মাছ ধরতে হয় বরফ-ঢাকা জলের তলা থেকে। মেরু প্রদেশের সুদীর্ঘ রাত্রিকালে (মানে বেশ কয়েক মাস) জলের তলায় কোন আলোকই পৌঁছায় না, এমনকি অরোরা বোরিয়ালিস-এর আলোকও নয়। স্বভাবতই তাদের নির্ভর করতে হয় কানের ওপর।

জঙ্গলের ইঁদুর, শজারু আর অন্য কতকগুলি প্রাণীও শব্দ নির্ধারক ব্যবহার করে থাকে, তবে তাদের সৃষ্ট শব্দগুলি আমরা শুনতে পাই না।

চামচিকে কখনো ধরেছ? লক্ষ্য করেছ কি যে চামচিকেরা কখনো হঠাৎ করে উড়ে যায় না। ওড়বার আগে চামচিকে ঠোঁট ফোলায়, নাকটা বাতাসে ঘোরায় বৃত্তাকারে, প্রতিবার বৃত্তের ব্যাসার্দ্ধটা বাড়াতে থাকে।

অনেক বাদুড় আছে যারা অবস্থান নির্ণায়ক সংকেতধ্বনি মুখের বদলে নাকের গর্ত দিয়ে করতে থাকে। আগে প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা মনে করতেন যে বাদুড়েরা কান রকম শব্দই করতে পারে না। আমাদের কানগুলি যদি অন্তত কুকুরের কানের মতোও হোত তাহলে আমরা তাদের তৈরি শব্দের কিছু কিছু শুনতে পেতাম। রক্তচোষা বাদুড়েরা মানুষকে, গরু, ঘোড়াকে আক্রমণ করে কিন্তু কুকুরের রক্তের স্বাদ নেওয়া তাদের ভাগ্যে কদাচিৎ ঘটে। দেখা যাচ্ছে, তাদের এই অবস্থান নির্ণায়ক শব্দ-সংকেতগুলি শুনতে পেয়ে কুকুর জেগে উঠে সতর্ক হয়ে যায়।

একটি অত্যাশ্চর্য গ্রন্থি
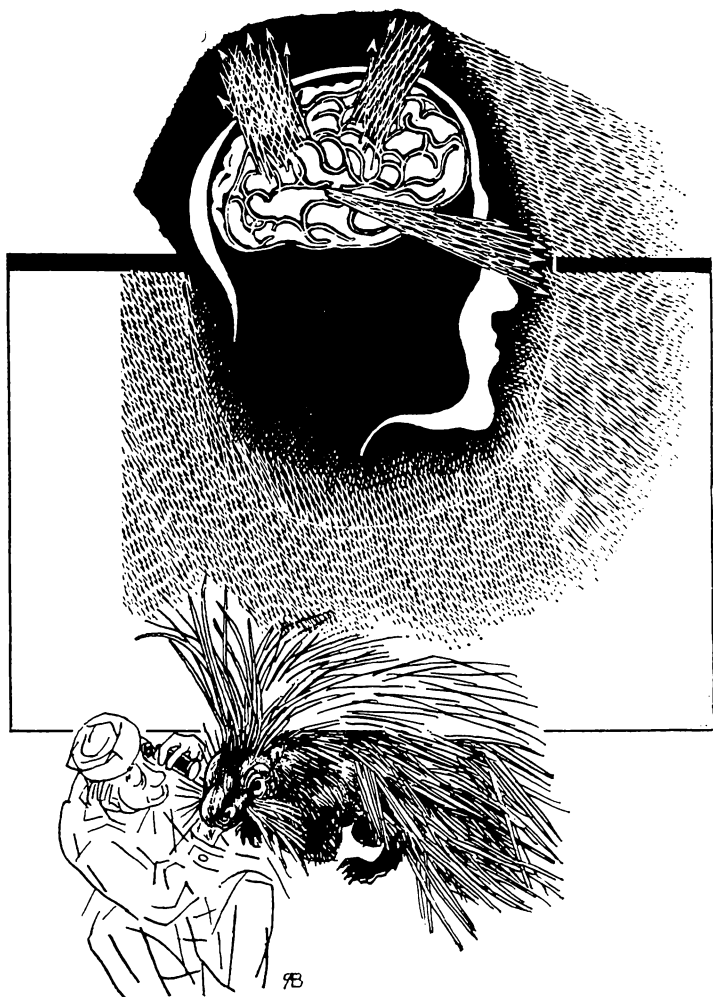
প্রাচীন পণ্ডিতদের লেখা গ্রন্থাদি পড়লে অবাক হয়ে ভাবতে হয় যে কত কিছু আবিষ্কার হয়েছে প্রথমে পর্যবেক্ষণ এবং তার পরে সেই বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করার ফলে। দু'হাজার বছরেরও বেশি আগে পণ্ডিতেরা আর চিকিৎসকেরা শরীরের সকল যন্ত্রাদি কী কী কাজ করে থাকে সে সম্বন্ধে বেশ অবহিত ছিলেন। তাহলেও মস্তিষ্কের কাজ কর্মের কোন ধারণাই তাঁদের ছিল না। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের বিশিষ্ট গ্রীক পণ্ডিত অ্যারিসটটল মনে করতেন মস্তিষ্ক একটা বড় গ্রন্থি যার কাজ হোল রক্তকে ঠাণ্ডা রাখা। এখন অবশ্য আমরা জানি যে মস্তিষ্ক আদপেই রেফ্রিজারেটর নয়। আমরা আরো জানি যে এই তথাকথিত গ্রন্থি কোন কোন কার্যসাধন করে থাকে যদিও কী করে কাজগুলি নিষ্পন্ন হয় সেটা বহুলাংশে এখনো রহস্যে ঢাকা।

মানুষের মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটেছে স্নায়বিক ব্যবস্থার সুদীর্ঘ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, যে বিবর্তন শুরু হয়েছিল সুপ্রাচীন কালের মহাসমুদ্রে, যখন পৃথক পৃথক জৈবিক অণুরা শেষ পর্যন্ত ছোট ছোট জৈব পদার্থের দলা হয়ে দাঁড়ালো। সেই প্রাথমিক জীবন্ত টুকরোগুলি এবং পরবর্তী আরো বড় এককোষী প্রাণীদের মধ্যে যারা বড় বড় বসতি তৈরি করল তাদের সকলের ইতিমধ্যে দুটি প্রধান গুণ বা ধর্ম আয়ত্ত হয়ে গেছে, একটি হোল উত্তেজিত হওয়া, অন্যটি পরিবাহিতা, যার মানে উত্তেজনা পড়শী কোষে পাঠিয়ে দেওয়া।

পরবর্তীকালে, বহুকোষী প্রাণীদের ক্ষেত্রে এই কাজ দুটির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়ে যায়। সিলেনটারেটা (Coelenterata) প্রথম যাদের শরীরে স্বতন্ত্র স্নায়ুকোষের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে। এই কোষগুলির উত্তেজিত হয়ে ওঠার ক্ষমতা আর পরিবাহিতার মাত্রা ছিল খুব বেশি। এই কোষগুলির কাজ ছিল বাহ্যিক প্রভাবের দ্বারা খুব বেশি সুবেদী হয়ে ওঠা এবং উত্তেজনা পরিবাহিত করে দেওয়া সেই সব দেহকোষে বা দেহযন্ত্রে যারা এমন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারবে যে প্রাণীটার পক্ষে সেটা হিতকর হয়।

আদিম সিলেনটারেটা-এর স্নায়ুকোষগুলি তাদের নিজের নিজের শুঁড় দিয়ে পরস্পর সংযুক্ত, যার থেকে সৃষ্টি হয় স্নায়ুজালের, বা আদিম

স্নায়ুতন্ত্রের। পরবর্তী ধাপের উন্নতিটা আলাদা আলাদা গুচ্ছবদ্ধ স্নায়ুকোষের উদ্ভব, এবং তার পরে তাদের আরো সংগঠিত বিকাশ ঘন সন্নধ্য স্নায়ুরজ্জুতে। এদের আবির্ভাবটা ঘটল যখন অনেকগুলি সংকোচনশীল স্নায়ুপ্রান্তের উজ্জীবনের জন্য দরকার হোল সম্মিলিত কার্যধারা। জেলিফিশ-এর ছত্রাকার মাথাকে ঘিরে বলয়াকৃতি স্নায়ুগুচ্ছ এই ভাবেই গড়ে উঠেছে, এদের কাজ হোল পুরো ছাতাটাকে ছড়িয়ে দেওয়া বা গুটিয়ে নেওয়া, প্রাণীটা এর ফলে জলের মধ্যে সক্রিয়ভাবে চলাফেরা করতে পারল।

সিলেনটারেটাদের বংশধর চ্যাপটা কৃমিদের সকল স্নায়ুকোষ ঘন সম্বন্ধ হয়ে থাকে শরীরের চার পাশে সুতো দিয়ে জটিল প্যাটার্ণে বিনুনি করা জালের আকারে। স্নায়ুর সুতোগুলি একটার ওপর অন্যটার চাপ পড়ায় অসংখ্য জায়গায় তারা সংকীর্ণ হয়ে আছে, কত জায়গায় পরস্পর সরাসরি স্পর্শ করে আছে। এর ফলে সম্পূর্ণ স্নায়ুতন্ত্রটা সম্মিলিতভাবে কাজ করতে পারে। জটবাঁধা স্নায়ুর সূত্রজাল নিঃসন্দেহে উন্নতির একটা ধাপ যখন তুলনা করি এলোমেলোভাবে ছড়ানো-ছিটানো স্নায়ুকোষের জালের সঙ্গে। কিন্তু এই পিপের আকারের স্নায়ুতন্ত্র দিয়ে প্রাণীটার ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যঙ্গ আর দেহযন্ত্রের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করা ক্রমশ জটিল আর জবড়জং হয়ে ওঠে তাই তাকে আবার নিয়ন্ত্রণ করতে আর একটা দেহযন্ত্রের প্রয়োজন দেখা দিল।

এমনি একটা কেন্দ্রীয় যন্ত্রের দেখা সর্বপ্রথম মিলল চ্যাপটা কৃমিদের উচ্চতর প্রতিনিধিদের মধ্যে। মূলত বহুসংখ্যক স্নায়ুকোষ আর তাদের সূত্রগুলি একত্রিত জট বেঁধে আকৃতি নিল স্নায়ুজট বা গ্যাংলিয়া-র (ganglia)। এই গ্যাংলিয়া-রা শুধু যে প্রাণীর দেহযাত্রার কঠিন কাজগুলি সাধন করবার ভার নিল তাই নয়, স্নায়ুতন্ত্রের অন্য অংশকে প্রভাবিত করতে এরা সক্ষম হোল। গ্যালিয়া বা স্নায়ুজটদের দেখা যায় প্রধানত জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির কাছাকাছি, যেমন চক্ষু, ভারসাম্য রক্ষার দেহযন্ত্রে, মুখ বিবরের কাছে, যেখান দিয়ে চ্যাপটা কৃমি শিকারকে ধরে ঠেলে দেয় পরিপাকনালীতে।

গ্যাংলিয়ান যুক্ত স্নায়ুতন্ত্র দেখা গেল বেশ সুবিধাজনক। অ্যানেলিডা (Annelida) বা জোঁক, কেঁচো গোষ্ঠীর প্রাণীদের ক্ষেত্রে (এরা নিশ্চয় চ্যাপটা কৃমিদের থেকেই বংশানুক্রমে এসেছে) সকল স্নায়ুকোষগুলিই গ্যাংলিয়াতে কেন্দ্রিত কেবল তাদের সঙ্গে সংযুক্ত স্নায়ুর সুতোগুলিকে স্নায়ুকোষের লম্বা

লম্বা শুঁড়গুলি আঁকড়ে ধরে আছে। প্রকৃতপক্ষে পোকাটার শরীরের প্রত্যেকটা গাঁঠে আছে এক জোড়া করে গ্যাংলিয়া যারা পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত। তা ছাড়া, প্রত্যেকটা গ্যাংলিয়ন আবার স্নায়ুর সুতো দিয়ে আগের আর পরের গাঁঠের সঙ্গে যুক্ত। স্নায়ুতন্ত্রটা দেখতে অনেকটা মই-এর মতো। আগার দিকের গ্যাংলিয়াগুলি আকারে বড় — তারাই প্রধান দেহকার্যগুলি করে থাকে এবং স্নায়ুতন্ত্রের বাকি অংশের ওপর খবরদারি করতে থাকে।

উচ্চস্তরের পোকাদের ক্ষেত্রে গ্যাংলিয়গুলি কাছাকাছি এসে একটা জমাট-বাঁধা আকৃতি নেয়। তাদের স্নায়ুতন্ত্রের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য এ যুগের মেরুদণ্ডীদের স্নায়ুতন্ত্রের অনুরূপ।

প্রথম মেরুদণ্ডীদের মস্তিষ্ক কী ধরনের ছিল সেটা অবশ্য আমরা জানি না। মেরুদণ্ডীদের সর্বপ্রাচীন প্রতিনিধি ল্যানসেলেটদের আছে একটা স্নায়ুরজ্জু কিন্তু তাদের মস্তিষ্ক নেই। মস্তিষ্ক সর্বপ্রথম দেখা গেল সাইক্লোস্টোমদের, কুঁচে এবং মাছদের মধ্যে।

এই সব আদিম প্রাণীদের মস্তিষ্ক সেই কয়টি অংশেই বিভক্ত যে কয়টি আছে মানুষের মস্তিষ্কে। এই বিভাগগুলিও একই তবে গঠন ব্যাপারে এবং বিশেষ করে কাজকর্মে মৌলিক প্রভেদ রয়েছে। মানুষের ক্ষেত্রে মস্তিস্কের সামনের অঞ্চলটাই প্রধান অংশ যেটা সকল মানসিক প্রক্রিয়াকেই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কুঁচে আর মাছদের মস্তিষ্কের এই অঞ্চল করে থাকে গন্ধবিচার। উভচরদের মস্তিষ্কের সামনের অঞ্চলের কাজকর্ম কিছুটা জটিল।

উভচরেরা যখন জল ছেড়ে ডাঙায় উঠে এলো, তাদের কতকগুলি সমস্যার মুখোমুখি হতে হোল। বিশেষত তাদের ঘ্রাণশক্তির তীক্ষ্নতা গেল কমে। মাছেরা জলের মধ্যে দ্রবীভূত পদার্থের গন্ধ উপলব্ধি করতে পারে। ডাঙার ওপর বিভিন্ন বস্তুর গন্ধের তারতম্য আন্দাজ করতে আদি যুগের ডাঙায় উঠে-আসা উভচরেরা পদার্থগুলিকে প্রথমে তাদের নাকের মধ্যেকার তরল পদার্থে দ্রবীভূত করে নিত। তাদের গন্ধ-বিচারের ধারকগুলি নতুন পরিবেশের সঙ্গে তাড়াতাড়ি খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি, মস্তিষ্কের সামনের দিকের অঞ্চল কোন খবরাদি না পেয়ে চুপচাপ বসেই থাকত। সম্ভবত সেই কারণেই উভচরদের মস্তিষ্কের সামনের অঞ্চল অন্য একটা কাজ নিল। কাজটা হোল দৃষ্টি, শ্রবণ এবং হয়ত অন্যান্য উদ্দীপনার বিশ্লেষণে সহায়তা করা।

এই প্রথম দেখা গেল মস্তিষ্কের একটা প্রকোষ্ঠ সকল রকমের তথ্য নিয়ে নাড়া চাড়া করছে।

স্তন্যপায়ীদের মস্তিষ্কের বিকাশ খুব দ্রুত হয়েছিল। প্রথমে আলাদা আলাদা অঞ্চলের বিকাশ ঘটল, এর আগে পর্যন্ত যেগুলির তেমন বিভিন্নতা গড়ে ওঠেনি। প্রত্যেকটি অঞ্চল এক এক ধরনের উদ্দীপনাকে বিশ্লেষণ করবার দায়িত্ব নিল — যেমন দৃষ্টি, শ্রবণ, গন্ধ বা ত্বকের উত্তেজনা। উচ্চতর স্তন্যপায়ীরা ছোট ছোট অঞ্চলের বিকাশ ঘটিয়ে নিল, তথাকথিত সংযোগ-করটেকস্, যেগুলি বিভিন্ন বিশ্লেষণের অঞ্চলগুলির অন্তর্বর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। এই অঞ্চলগুলি পর্যায়ক্রমে বড় হতে থাকে এবং বিকশিত হতে থাকে মস্তিষ্কের বিবর্তনের সাথে সাথে। বাঁদর আর মানুষের মস্তিষ্কে এরা মস্তিষ্কের অর্ধমণ্ডল দুটির উপরিতলের অনেকটা জুড়ে থাকে। ধারণা করতে অসুবিধে হয় না যে এই অঞ্চলগুলিই সব চেয়ে জটিল এবং একান্তভাবেই মানবীয় কাজকর্মগুলি করে থাকে।

মস্তিষ্কের জটলাগুলির কার্যাদি

এই গ্রহে প্রকৃতির আশ্চর্যতম সৃষ্টি হোল মানুষের মস্তিষ্ক। এর অত্যাশ্চর্য জটিলতার ব্যাপারটা বিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত বিজ্ঞান আয়ত্তে আনতে পারেনি। রাশিয়ার মহান শারীরতত্ত্ববিদ ইভান পাভলভ এবং তাঁর অসংখ্য শিষ্য মস্তিষ্ক নিয়ে চর্চার ক্ষেত্রে প্রথম বড় আবিষ্কার করেন। পাভলভের এই সাফল্যের কারণ সম্বন্ধে বলা যায় যে সৌভাগ্যক্রমে পাভলভ তাঁর চর্চার বিষয় নির্বাচনে এমনই একটা শারীরঘটনা বেছে নিয়েছিলেন যেটা একদিকে যেমন মনে করা যায় শারীরতত্ত্বেরই একটা কাজ এবং সেই মতো শারীরবিদ্যা চর্চার প্রথায় তিনি অনুসন্ধান চালালেন, অন্যদিকে বিষয়টা আসলে মনোবিজ্ঞানেরই একটা ব্যাপার। তা ছাড়া, পরে দেখা গেল যে ব্যাপারটা আসলে অতি সাধারণ একটা মানসিক ঘটনা যেটা পাভলভের মতে সমুদয় মানসিক কার্যধারার গোটা ইমারতটাকেই খাড়া রেখেছে — এটাকে আখ্যা দেওয়া হোল সাপেক্ষ প্রতিবর্তী বা Conditioned Reflex।

এ কথা বললে বাড়িয়ে বলা হবে যে সাপেক্ষ প্রতিবর্তীর তত্ত্বটা শুরু থেকেই স্বীকৃতি লাভ করেছিল। প্রবীণ গোষ্ঠীর বিজ্ঞানীরা সেকালের

কথা ভুলে যান নি যেকালে খুব কম সংখ্যক লোকে বিশ্বাস করত যে মানুষের মস্তিষ্কের অত্যন্ত জটিল কাজকর্মের ব্যাপারটা কখনো বুঝতে পারা সম্ভব হবে সেই আবস্থাটা অবশ্য এখন বদলেছে। কিন্তু এখনও কিছু লোক আছে যারা সন্দেহ করে যে মানসিক কাজকর্ম কেবল সাপেক্ষ প্রতিবর্তীর সমষ্টি (বা সাময়িক যোগাযোগ ব্যবস্থা) থেকে অর্থাৎ প্রাণীর শরীরের মধ্যেকার কতকগুলি সরল বিক্রিয়া থেকেই সম্পাদিত হয়।

নিঃসন্দেহে, মস্তিষ্কের মধ্যে মানসিক কাজকর্মের অনেকগুলি প্রক্রিয়া আছে যারা আজ পর্যন্ত আমাদের কাছে অজ্ঞাত, কিন্তু তারাও সকলেই সাপেক্ষ প্রতিবর্তীর ওপর নির্ভরশীল।

সাময়িক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠীত হয়, যখন দুটো ঘটনা যার একটা প্রাণীটার কাছে জরুরী এবং অপরটা জরুরী নয়, একই সময়ে ঘটে। কুকুরকে খাবার দেবার সময়ে যদি সে প্রত্যেকবার শোনে ভোজন পাত্রের ঝনঝন শব্দ, তাহলে অচিরেই তার মস্তিষ্কে গড়ে উঠবে একটা সাপেক্ষ প্রতিবর্তী এবং ক্রমশ ঝনঝন শব্দটাই যথেষ্ট হবে মুখ থেকে লালা নিঃসরণ এবং অন্যান্য প্রতিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশে — পূর্বে যেগুলি খাদ্যের কারণেই দেখা যেত।

সাপেক্ষ প্রতিবর্তী হোল প্রাণীটার চতুর্দিকের সম্বন্ধে একটা প্রাথমিক জ্ঞানের সারমর্ম। এই জ্ঞান সূচিত করে প্রাণীটার পরিবেশকে যে প্রাথমিক নিয়মনিচয় নিয়ন্ত্রণ করছে তাদেরকই। খাওয়ার ব্যাপারটার পূর্বে যদি ভোজনপাত্রের ঝনঝনানি শোনা যায় আর সেটা যদি ঘটে বার বার তাহলে কুকুরটা গড়ে নেয় একটা সাপেক্ষ প্রতিবর্তী যার অর্থ হোল এই যে প্রাণীটা লক্ষ করেছে ঘটনা দুটোর মধ্যে সম্পর্কটাকে। এই যে একটা সাপেক্ষ উদ্দীপনা (ভোজন পাত্রের ঝনঝনানি) এটা হয়ে দাঁড়িয়েছে যেন দ্বিতীয় উদ্দীপনার জন্য একটা সংকেত এরং তার পরে খাদ্য যেসব সাড়া জাগাতো সেগুলিও জেগে উঠবে। এই সংকেত ব্যবস্থা (সাময়িক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা) আমাদের গ্রহের সকল প্রাণীর ক্ষেত্রেই সর্বব্যাপী নিত্য ঘটনা। তা ছাড়া, বিশ্বাস করবার ভিত্তি আছে যে এই পদ্ধতিটা আরো ব্যাপক এবং সুপ্রতিষ্ঠিত সকল প্রাণীর ক্ষেত্রেই। তাই, ভিন্ন গ্রহেও হয়ত প্রাণীর সন্ধান পাওয়া গেলে দেখ্য যাবে তাদের মস্তিষ্কে এই সাময়িক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটা ঘটছে। মনে করার সঙ্গত কারণ আছে যে এই সাময়িক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটা প্রকৃতির একটা সর্বব্যাপী মৌল নিয়ম, সর্বপ্রকারের সুসম্বন্ধে (জৈব) পদার্থের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। সাময়িক

যোগাযোগের বিশেষ ধর্মগুলি অবশ্য প্রত্যেকটি ক্ষেত্র অনুসারে স্বতন্ত্র হতে পারে।

আমাদের গ্রহের প্রাণীদের আছে অদ্ভুত একটা খাপ-খাইয়ে নেবার ব্যবস্থা যেটা তাদের পরিবেশকে চিনে নিতে এবং জীবনভোর জ্ঞান সঞ্চয় করতে সহায়তা করে। এই ব্যবস্থাটা কতকাংশে নির্ভর করে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির কাজের ওপর। তাদের প্রধান বিশেষত্ব হোল এই যে তারা ক্রমে ক্রমে অভ্যস্ত হয়ে যায় সর্বপ্রকারের উদ্দীপনার অবিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতাতে এবং শেষে সাড়া দেওয়া বন্ধ করে দেয়, কিন্তু সেই একই সময়ে নতুন নতুন উদ্দীপনাতে সক্রিয়ভাবে সাড়া দিয়ে চলে।

এই ব্যাপারটা বোধহয় সকলেই লক্ষ্য করে থাকবে। বাইরে থেকে বাড়িতে ঢুকে হয়ত একটা উগ্র বা বদ গন্ধ নাকে এলো, কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যে লক্ষ্য করবে, কই গন্ধটা আর পীড়া দিচ্ছে না তো। তোমার নাক ওই গন্ধে অভ্যস্ত হয়ে গেছে এবং ওই গন্ধের বার্তা মস্তিষ্কে পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু, অল্প সময়ের জন্য বাইরে গিয়ে আবার ফিরে এসো ওই কামরায়, গন্ধটা আবার টের পাবে অচিরেই।

জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির এই বৈশিষ্ট্যের জন্য মস্তিষ্ক সদা সর্বদা পরিবেশ থেকে নতুন নতুন ঘটনার তথ্যগুলি পেয়ে যাচ্ছে। তার ওপর প্রত্যেক নতুন উদ্দীপনা জন্ম দেয় একটা ভারসাম্যদ্যোতক প্রতিক্রিয়ার, যা প্রাণীটাকে নতুন নতুন বিস্ময়ের জন্য প্রস্তুত করে। কোন একটা নতুন উদ্দীপনা হয়ত প্রাণীটার পক্ষে অপ্রয়োজনীয় কিন্তু পরবর্তী ঘটনাটা যদি জরুরী হয় তাহলে একটা সাপেক্ষ প্রতিবর্তীর সৃষ্টি হয়ে গেল, এবং নতুন উদ্দীপনাটা একটা জরুরী ঘটনার সংকেত হয়ে দাঁড়ালো।

অবশ্য এটা ঠিক যে মস্তিষ্কের কাজ কেবল সাময়িক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠাই নয়। খাদ্যগ্রহণ, আত্মরক্ষা, যৌন এবং অন্যান্য কয়েকটি সাপেক্ষ প্রতিবর্তী নিম্নস্তরের প্রাণীদের ক্ষেত্রে তাদের পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল সবচেয়ে জরুরী আচরণধারা। বিবর্তনের একটা পর্যায়ে এসে প্রাণীরা এই সাময়িক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার ক্ষমতার বিকাশ ঘটালো, এমনকি সেই সব উদ্দীপনার প্রত্যুত্তরেও যেগুলির কোন সরাসরি তাৎপর্য নেই প্রাণীটার কাছে। এই ক্ষমতাটা সরীসৃপদের ক্ষেত্রে এসে লক্ষ্য করা যায়, পাখি আর স্তন্যপায়ীদের বেলায় তো সম্পূর্ণ বিকাশ লাভ ঘটে গেছে। এর ফলে মস্তিষ্কের পরিচয়াত্মক ক্রিয়াকলাপের সীমারেখা বিস্তৃত হোল কারণ এই সাময়িক যোগাযোগ ব্যবস্থার

দরুণ পরিবেশ থেকে প্রতিনিয়ত উপলব্ধ যে কোন উদ্দীপনার প্রতিফলন মস্তিষ্কে হয়ে চলতে থাকল।

এক একটা ভিন্ন ভিন্ন উদ্দীপনা বা তাদের জটলার সঙ্গে অসংখ্য সাময়িক যোগাযোগ গড়ে তুলে আমরা আমাদের চতুষ্পার্শ্বের বিশ্ব সম্বন্ধে মানসিক প্রতিমাগুলি গড়ে তুলি। এই সাময়িক যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে যেগুলির বহিঃপ্রকাশ নেই তারাই মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিজ ক্রিয়াকলাপের মুখ্য ভান্ডার। যে কোন উদ্দীপনা, যেটা এই প্রকারের জটলার একটা অংশ, গড়ে তুলতে পারে কতকগুলি পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত সাময়িক যোগাযোগের লম্বা লম্বা শৃঙখলা।

মানুষ এবং অন্য প্রাণীদের সকলেরই আছে এমনি সাময়িক যোগাযোগ গড়ে তোলার ক্ষমতা। প্রভেদ যদি কিছু থাকে সেটা মাত্রাগত, গুণগত নয়। আমরা যে মানুষ হয়ে উঠলাম সেটা কেবল আমাদের বাক্‌শক্তির জন্য। মনুষ্যেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে উদ্দীপনাটা পাওয়া চাই সরাসরি — যেমন গন্ধ বা স্বাদ, উত্তাপ, শব্দ বা দৃশ্যগত — তবেই তারা প্রাণীটার কাছে একটা সংকেত হয়ে উঠতে পারে। মানুষের কাছে ব্যাপারটা অন্যরকম। তারা, এই সংকেতগুলির ওপরও তাদের বকলমে বাক্যাংশ বা শব্দ ব্যবহার করতে পারে। ভাষা হয়ে উঠেছে এই সংকতগুলির সংকেত (সে কারণে শারীরতত্ত্ব-বিদরা ভাষাকে উল্লেখ করেন দ্বিতীয় সংকেত ব্যবস্থা নামে)। যে আকারে বাক্যাংশের উপলব্ধি হয়ে থাকে তার গুরুত্ব তত নয়, সেগুলি কানে শোনা যেতে পারে, চোখে দেখে পড়ে নেওয়া যেতে পারে বা স্পর্শের দ্বারা অনুভব করা যেতে পারে (যেমন দৃষ্টিহীনদের জন্য ব্রেলপদ্ধতির বর্ণমালা), এমনকি ভাব সন্দর্শন থেকেও অর্থাৎ মনে মনে, উচ্চারণ না করেও (জিভ আর গলার পেশীর সংবেদন থেকে)।

কথা বলার ক্ষমতা থেকে মানুষ পেয়েছে দুটো সুবিধে। প্রথমত তথ্যকে পরিশীলন করে নেওয়া যায় বিশেষ একটা নতুন উপায়ে। এমনকি অতি সামান্য একটা সাপেক্ষ প্রতিবর্তীর জন্য দরকার হয় বেশ ভারী রকমের বিমূর্তন আর সামান্যকরণের। যেমন, কুকুর যখন খাদ্যের ব্যাপারে সাপেক্ষ প্রতিবর্তী গড়ে তোলে ভোজন পাত্রের ঝন ঝন শব্দ থেকে, তখনো ঘটে যায় এক ধরনের সামান্যকরণ — শব্দটার খাদ্যের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে। একই সঙ্গে কার্যত বিমূর্তনও ঘটছে: শব্দটা এখন খাদ্যজনিত প্রতিবর্তীটা ঘটাতে পারছে, কিন্তু তার মানে সেটা খাদ্য হয়ে যাচ্ছে না।
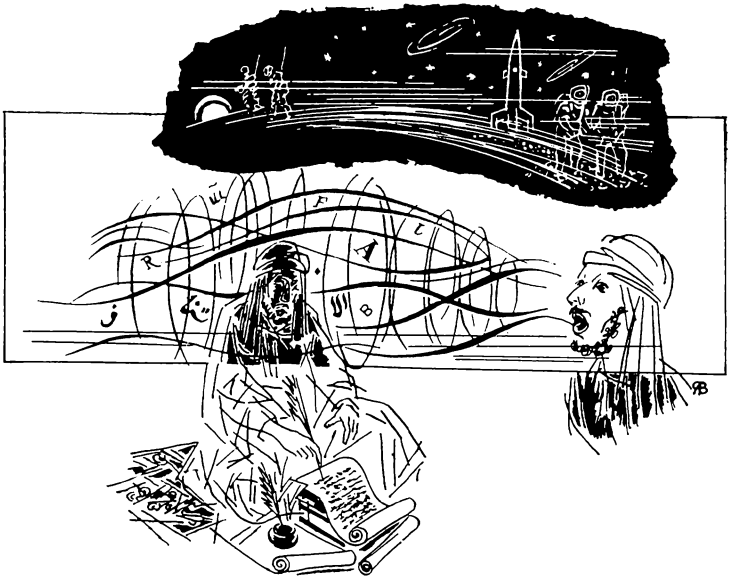
দ্বিতীয় সংকেত ব্যবস্থার সংকেতগুলি, মানে কথ্য শব্দগুলি আরো অনেক উচ্চ কোটির সামান্যকরণ আর বিমূর্তন ঘটাচ্ছে প্রথম সংকেত ব্যবস্থার চেয়ে। ভাষা মানুষকে ধারণা বা প্রত্যয় নিয়ে নাড়া চাড়া করতে শিখিয়েছে কেবল দৃশ্যচিত্র বা উদ্দীপনার সমষ্টি নিয়েই নয়, যার ফলে পরিচয়াত্মক প্রক্রিয়াটা সহজ এবং বর্ধমান হতে পেরেছে।

দ্বিতীয়ত মানুষের এই ভাষাই নতুন নতুন সাময়িক যোগাযোগ গড়ে তুলতে সাহায্য করছে। তার ওপর, এই দ্বিতীয় সংকেত ব্যবস্থাই মানুষের এই সাময়িক যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রায় সবটার জন্যই দায়ী, অন্যান্য সাধারণ উদ্দীপনাগুলির যোগদান ছাড়াই। কোন যোগসূত্র মানুষের মনে এসে পড়ার জন্য প্রতিবারই এই ঘটনা বা সেই ব্যাপার মনে আসার দরকার হচ্ছে না।

ভাষার সাহায্যে আমরা আগাগোড়া যোগসূত্র রেখে যেতে পারছি। তারই ফলে, জ্ঞানের আদান প্রদানের পক্ষে উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে। তাই তো আমাদের চতুর্পার্শ্বে দৃশ্যমান জগতের মূল নিয়মগুলি শিখে নিতে কত কম সময় লাগছে। লিপি আবিষ্কারের পরে প্রক্রিয়াটা আরো সহজ

হয়ে গেল, ব্যক্তিগত যোগাযোগের প্রয়োজন ঘুচে গেল। এর ফলে মানুষ জ্ঞানকে দীর্ঘকালের জন্য সঞ্চিত করে কেবল একজন থেকে অন্যজনের হাতেই নয়, এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষের হাতে তুলে দিতে পারল।

বিলম্ব মানেই মৃত্যু

প্রায় ত্রিশ শতাব্দী আগে পেলপোনেশিয়াতে, মানে আধুনিক গ্রীস দেশের দক্ষিণাঞ্চলে একটা শক্তিশালী লড়াকু রাজ্য ছিল যার নাম স্পার্টা। সে রাজ্য শাসন করতেন, আর পাঁচটি রাজ্যের মত্যেই, একজন রাজা। একদা এই স্পার্টার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হলেন চেয়ারিলাস, যিনি তখনো নাবালক। তাই স্বাভাবিক কারণেই খুব একটা কর্তৃত্ব করতে পারতেন না। দেশটা শাসন করতেন তাঁর কাকা লাইকারগাস, ভ্রাতুষ্পুত্রের অভিভাবক এবং প্রতিভূ হিসেবে। এই উচ্চ পদে থাকার জন্য লারকাইগাস-এর অনেকগুলি শত্রু জন্মেছিল, যেজন্য তাঁকে পরে দেশত্যাগী হতে হয়েছিল।

দেশান্তর বাসের বছরগুলি কিন্তু তাঁর পক্ষে নিষ্ফলা হয় নি। তিনি প্রচুর অবসর পেলেন নানা বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করতে এবং সেসব বিষয় নিয়ে ভাবতে। লাইকারগাস মিশর আর এশিয়া মাইনর-এ ব্যাপক পরিভ্রমণ করলেন। তিনি ক্রীট গিয়েছিলেন, অবশেষে যথাসময়ে নিজের দেশে ফিরে আসেন, সঙ্গে নিয়ে আসেন নতুন একটা সংবিধানের খসড়া। লাইকারগাস-এর সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রের প্রধান হবেন সমান ক্ষমতা-সম্পন্ন দুই রাজা, বংশানুক্রমে। তাদের সহায়তা করবেন বর্ষীয়ানদের একটা সভা — স্পার্টার 28জন বর্ষীয়ান ব্যক্তি হবেন সেই সভার সদস্য। তার ওপর, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হবে নাগরিকদের সভায়, ত্রিশের অধিক বয়সের নাগরিকদের ভোট দেবার অধিকার থাকবে। লাইকারগাস-এর আইন নাগরিকদের মধ্যে সাম্যের ভিত্তিতে সম্পত্তি বণ্টন এবং আরো অনেকগুলি গণতান্ত্রিক উদ্ভাবনার প্রবর্তন করেছিল।

কথিত আছে যে লাইকারগাস তাঁর দেশবাসীদের কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন যে তিনি বিদেশভ্রমণ সেরে ফিরে না আসা পর্যন্ত তাঁর আইনের যেন পরিবর্তন না করা হয়। তার পরে তিনি স্পার্টা ত্যাগ করলেন। দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় অবিচল রইলেন যে বনবাসে উপবাসী থেকে প্রাণ ত্যাগ

করবেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি আদেশ দিলেন যে তাঁকে যেন দাহ করা হয় এবং ভস্মাদি সমুদ্রে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। স্পার্টানরা যাতে তাঁর দেহাবশেষ ফিরিয়ে নিয়ে যেতে না পারে সে জন্য এইভাবে তাদেরই প্রতিজ্ঞার নিগড়ে তাদের আবদ্ধ রেখে তাঁর রচিত সংবিধান চিরস্থায়ী করতে চেয়েছিলেন।

লাইকারগাস-এর প্রবর্তিত আইনগুলির অধিকাংশই মানুষের জ্ঞানের চূড়ান্ত নির্দশন বলা যেতে পারে। আমাদের কাছে যেটা জরুরী সেটা হোল এই যে এই আইনগুলি মানুষের শারীরিক সক্রিয়তা বজায় রাখার দিকে নজর দিয়েছিল। এই লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে তারা স্পার্টার লোকেদের জীবনধারা পুঙখানুপুঙখরূপে নিয়ন্ত্রিত করতে চেয়েছিল। একই বিধানের দ্বারা ব্যক্তিগত সম্পত্তি সীমিত করা হয়েছিল, দেশের জনগণের জন্য স্বাস্থ্যপ্রদ আর পরিমিত জীবনযাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আমৃত্যু স্পার্টনদের প্রতিরক্ষা সেবার দায় নিতে হোত। রাষ্ট্র যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে তাতে ভাগ নিতেই হোত। ঘর-সংসারে বেশি মন দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল। খাওয়া দাওয়া করতে হোত সিসিটিয়া (sisitia)বা সাধারণ ভোজনাগারে। সাত বছর বয়স পর্যন্ত স্পার্টান শিশুদের শিক্ষাদীক্ষা নিতে হোত রাষ্ট্র পরিচালিত বিদ্যালয়ে বিজ্ঞ শিক্ষকদের কাছে। স্পার্টার কঠোর শিক্ষা ব্যবস্থার কথা প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছিল।

লাইকারকাস যে কেবল শিক্ষার তত্ত্ব উদ্ভাবন এবং তার গুরুত্ব নির্দেশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাই নয়, তাঁর ভাবনাগুলি প্রচার করতেও তিনি ছিলেন তেমনই দক্ষ। গল্প আছে একবার তিনি একটা কুকুর-মায়ের দুটি বাচ্চা নিয়ে তাদের রেখে দিয়েছিলেন গভীর একটা গর্তে। গর্তে কেউ নামত না, দড়ি দিয়ে জল আর খাবার নামিয়ে দেওয়া হোত কুকুর ছানাদের জন্য। ওই একই মায়ের অন্য দুটি ছানাকে লাইকারগাস বেড়ে উঠতে দিয়েছিলেন মানুষ ও অন্য জানোয়ারদের সাহচর্যে। বাচ্চারা সব বড় হয়ে উঠলে লাইকারগাস অনেক লোক জড়ো করে একটা পরীক্ষা করে দেখালেন সর্বসমক্ষে। এই কুকুরগুলির সামনে তিনি ছেড়ে দিলেন একটা খরগোসকে। লাইকারগাস-এর প্রত্যাশা অনুযায়ী যে কুকুর ছানাকে স্বাধীনভাবে বড় হয়ে উঠতে দেওয়া হয়েছিল সে খরগোসটাকে তাড়া করে মেরে ফেলল।

গর্তের মধ্যে যেটা বড় হয়ে উঠেছিল তার আচরণ হোল একেবারে আলাদা, ভাইকে সাহায্য করা দূরে থাকুক, খরগোস দেখে সে দিল ভোঁ দৌড়। চরিত্র গঠনের জন্য শিক্ষার উপযোগিতার এর থেকে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আর

কী হতে পারে? গল্পটা যদি সত্যি হয় তাহলে বলতে হবে প্রয়োগধর্মী প্রশিক্ষণ-বিজ্ঞানের প্রবর্তক ছিলেন লাইকারগাস।

লাইকারগাস-এর অনুগামী শিষ্যেরা ছিলেন বৈকি। বিজ্ঞানীরা আর শিক্ষাবিদেরা বহুদিন আগে থেকেই শিশুর ভবিষ্যৎ ব্যক্তিত্বের বিকাশে তার জীবনের প্রথম কয়েকটি বছরের ভূমিকার বিষয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন। লাইকারগাস-এর অনুগামীদের পাওয়া যাবে আজকের যুগেও, কিন্তু একেবারে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন করতে সাহসী হয়েছে এমন রাষ্ট্র একটিও পাওয়া যাবে না। সব বাবা-মায়েরাই বাচ্চাদের ভালবাসেন, তাদের জীবনের রাস্তা থেকে বাধাগুলি দূর করে, বিপদগুলি থেকে বাঁচিয়ে, রোগজবালা থেকে অড়াল করে রাখতে চান। আমরা কি আশা করব তাঁরা ভিন্ন প্রকারের আচরণ করবেন? শিশুকে ভালবাসা স্বাভাবিক, সেটা সবাই বোঝে। নিজেদের শিশু সন্তানদের প্রতি ভিন্ন প্রকারের আচরনের কথা চিন্তা করাই শক্ত। তবে প্রায়ই বাবামায়েরা বাড়াবাড়ি করে থাকেন এবং এইভাবে যারা তাঁদের কাছে প্রাণাধিক প্রিয় তাদের অপূরণীয় ক্ষতি করে থাকেন।

পরীক্ষা থেকে দেখানো গেছে যে ইঁদুরেরা ক্ষুধা, তৃষ্ণা আর শৈত্য আরো অনায়াসে সহ্য করতে পারে যদি তাদের যান্ত্রিক আর বৈদ্যুতিক উপায়ে সঞ্জীবিত করা যায়, অথবা খুব বাচ্চা বয়সে শীতল পরিবেশে মধ্যে মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়। গৃহপালিত পশুপাখিদের খুব বাচ্চা বয়সে প্রভাবিত করে দেখা গেছে তাদের কতকগুলি অভ্যাসের তারতম্য ঘটানো সম্ভব হয়েছে। কৃষকদের মধ্যে রেওয়াজ আছে সদ্যোজাত বাছুর, ভেড়া বা ছাগলের ছানাদের শীতল পরিবেশে রেখে দেওয়ার। এর ফলে প্রাণীগুলির শরীরে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় স্থিরতা আসে, তাই এই প্রাণীগুলি বয়ঃপ্রাপ্ত হলে শীতের কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা বাড়ে।

আমাদের ছেলে মেয়েদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা নিলে তাদের ভালই হবে। কিন্তু তাদের মজবুত করে গড়ে তোলা দূরে থাকুক আমরা তাদের পক্ষে জরুরী অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে দিতেও চাই না, জীবনে তুচ্ছতম অসুবিধার মধ্যেও তাদের পড়তে দিতে চাই না। বাবা-মায়েরা ছেলে মেয়েদের সব কিছু থেকে বাঁচাতে চান। তাঁরা ভাবেন, আহা বড় হয়ে উঠুক, তার পরে জ্ঞান হলে তারা সব শিখে নেবে কী করে জীবনের সমস্যাগুলির মোকাবিলা করতে হয়। এই মনোভাব এমনই অবাস্তব যে চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে

হয়, ওগো ভালোমানুষেরা, দাদুরা, দিদিমারা, মা-বাবারা তোমাদের ছেলেমেয়েদের তোমরা কী করে তুলছ জানো কি? কেন তোমরা তাদের সবাভাবিক বৃদ্ধি বিকাশের পথে বাগড়া দিচ্ছ?

এই সাবধানবাণী কিন্তু নিরর্থক উচ্চারণ করা হচ্ছে না। প্রত্যেকটা দক্ষতার বিকাশ হওয়া চাই ঠিক সেই সময়ে যখন শিক্ষাটা আত্মস্থ করা যায় সবচেয়ে সহজে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার পরে শেখাটা আর হয়েই উঠবে না, তা সে যত কঠোরভাবেই না চেষ্টা করা হোক।

মেনে নিলাম শিশুদের বিকাশ কী ভাবে ঘটে সে বিষয়ে এখনো আমরা অনেক কিছুই জানি না কিন্তু পশুপাখিদের ছানা-পোনাদের বিষয়ে অনেক তথ্য আমরা যোগাড় করেছি। নিম্নস্তরের কি উচ্চস্তরের, সকল প্রাণীরই সদ্যোজাত বাচ্চাদের মস্তিষ্কে তাদের আচরণবিধির জন্য অত্যন্ত নির্ভুল এবং বিশদ স্মারকলিপি যা না থাকলে তাঁরা বাঁচতেই পারত না। স্তন্যপায়ীদের শাবকেরা সকলেই জানে স্তন্য চুষে খেতে। পাখিদের শাবকেরা যখন এক সঙ্গে ডিম থেকে ফুটে বেরোয় তখন থেকেই তারা বাবা-মা খাওয়াবে বলে ঠোঁট দুটি খুব বড় করে ফাঁক করতে জানে। হাঁসের বাচ্চা, রাজহাঁসের বাচ্চা, মুরগীর বাচ্চা এবং খুরওয়ালা অনেক প্রাণীর শাবকেরা জন্মাবার পরমুহূর্ত থেকেই তাদের মাকে অণুসরণ করতে পারে। সব বাচ্চারাই বিপদ এলে কোথায় লুকোতে হবে সেটা জানে।

এই যে সব জটিল আচরণর প্রকাশ, এগুলি সব যেমন তেমন আপনা আপনি ঘটছে না, নির্দিষ্ট উদ্দীপনা থেকেই হচ্ছে তাদের উদ্ভব। মার্জার (সিংহ শিশু, বাঘের বাচ্চা, বেড়ালছানা) বা সারমেয় (কুকুর ছানা, নেকড়ের বাচ্চা, শিয়াল শিশু) জাতির সকল গোষ্ঠীর বাচ্চারাই মায়ের শরীরের লোমের মধ্যে নাক ঢুকিয়ে দিয়েই দুধ পান করতে শুরু করে। খুর-ওয়ালা প্রাণীর বাচ্চারা ছায়া পড়েছে বুঝতে পারলেই মাথাটি তোলে, স্তন্যপানের জন্য তৈরি হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় এটা ঘটে যখন তাদের মা এসে দাঁড়ায় বাচ্চার শরীরের পাশে।

পাখিদের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে বাচ্চারা হা করে যখনই বাসার ওপরটায় আলোতে আড়াল পড়ে, বা বাসাটি অল্প অল্প যদি নড়ে। আর বাবা-মা যখন বিপদ-সূচক ডাকটা ছাড়ে বাচ্চারা তখন ঢুকে যায় নিরাপদ আশ্রয়ে।

প্রকৃতি তো প্রত্যেক প্রাণীর জন্য বিশদভাবে অনেকগুলি করে আচরণবিধির স্মারকলিপি তৈরি করলেন, তবে জ্ঞাতসারে তাতে রেখে

দিলেন অনেকগুলি ফাঁক। যেমন ধরো আরগালি অঞ্চলের ভেড়ার বাচ্চারা স্বচালিতভাবে অনুসরণ করবে চলমান যে কোন বস্তুকে, কাকে অনুসরণ করতে হবে এবিষয়ে তাদের স্পষ্ট ধারণা নেই। এটা আকস্মিক ব্যাপার নয় মোটেই। আচরণবিধির স্মারকলিপি যদি হোত চুলচেরাভাবে বাঁধাধরা তাহলে বিবর্তন সেখানেই থেমে যেত।

দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। এই ভেড়াগুলিকে যদি উন্নতির দিকে বিবর্তনের এক ধাপ এগিয়ে যেতে হয়, যার ফলে বর্ণের পরিবর্তন (পুরোপুরি বা আংশিকভাবে) অথবা পশমের ঘনত্বের হেরফের, বা আকৃতির হ্রাসবৃদ্ধি ঘটবে, তাহলে নবজাত শাবকদের পক্ষে এই নতুন গুণগুলির, উত্তরাধিকারী হওয়া সম্ভব হবে না যদি সদ্যোজাত মেষ-শিশুর মনের মধ্যে তার মায়ের আকৃতি সম্বন্ধে একটা অপরিবর্তনীয় ধারণা থাকে। মেষশাবক তাহলে সেই মাকে চিনতেই পারবে না যার আকৃতি সামান্যতম পালটেছে, অনুসরণ তো করবেই না। তার মানে শীঘ্রই সে তার মাকে হারাবে আর শেষ পর্যন্ত হারাবে নিজের প্রাণ। এর ফলে মেষশাবকটা সংকর প্রজননের ফলে উপলব্ধ নতুন চরিত্র-লক্ষণ পরবর্তী প্রজন্মের দিকে এগিয়ে দিতে পারবে না। এমন যাতে না ঘটে সেজন্য প্রকৃতি স্থির করলেন যে মেষশাবককে মাকে চিনে নিতে শিখতে হবে আর এই শেখার কাজটা করতে হবে খুবই জলদি, যদি না মা-হারা হয়ে থাকতে সে চায়। বস্তুত এই ধরনের শিক্ষালাভ ঘটে যায় চোখের পলক ফেলার সময়ের ব্যবধানে। এই জ্ঞান দীর্ঘস্থায়ী হয়, কখনো কখনো সারা জীবন থাকে এই জ্ঞান।

এই ধরনের শিক্ষাকে বলা হয় মুদ্রিত জ্ঞান। এটা ঘটতে পারে জীবনের কেবল একটা সময়েই। সদ্যোজাত হাঁসের বাচ্চা প্রথম চলন্ত যে বস্তুটি দেখবে তাকেই মা বলে মেনে নেবে তা সেটা হাঁস বা ফুটবল, কুকুর ছানা বা কলের পুতুল যাই হোক না কেন, জন্মের পরে ঘণ্টা পাঁচ ছয় যদি কোন চলমান বস্তুকে সে অনুসরণ করে তাহলে তার প্রতি সে অনুভব করবে একটা ঘনিষ্ঠতা, তা সে তার নিজের মা হোক, কিংবা পালনকর্ত্রী-মা — তবে এই ঘনিষ্ঠতা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। মুদ্রণটা ভাল হয় ডিম ফুটে বেরোবার পরে তেরো থেকে সতের ঘণ্টার মধ্যে। এর পরে, যেমন ধরো ত্রিশ ঘণ্টা বয়সের একটা হংস শিশুর ক্ষেত্রে এই মুদ্রণ ঘটবেই না, তাই সারা জীবনের জন্য সে হয়ে থাকবে অনাথের মত, মা-বাবার পাশে বসবাস করেও। কোন একজন বা কিছু একটাকে অনুসরণ একটা জটিল প্রতিক্রিয়া। বাচ্চারা কেবল

মায়ের পেছন পেছন দৌড়বেই না, তারা তাকে অনুসরণ করবে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে, যাতে মাকে দেখতে পায় ঠিক ঠিক কৌণিক অবস্থান থেকে। তাই হাঁসের বাচ্চাকে দেখা যাবে পালিকা মা যদি রাজহংসী হয় তাহলে বেশ দূরে থেকে তাকে অনুসরণ করছে, পালিকা মা পাতিহাঁস হলে ধেয়ে যাচ্ছে ঠিক তার পেছনে পেছনে।

অস্ট্রিয়ান জীববিদ্যাবিদ কনরাড লোরেনজ করেছিলেন একটা নির্ণায়ক পরীক্ষা, যে পরীক্ষাতে তিনি নিজেই হয়েছিলেন কতকগুলি হংস শাবকের পালিকা মা। লোরেনজ যখন বাগানে বেড়াতেন তখন হাঁসের বাচ্চারা তাঁকে অনুসরণ করত বেশ দূর থেকে, আর যখন জলে নেমে যেতে যেতে আস্তে আস্তে ছোট হয়ে যেতেন তখন তারা চলে আসত একেবারে কাছে, যখন তাঁর মাথাটা কেবল জলের ওপর থাকত তখন হাঁসেরা সেই মাথার ওপরে উঠতে চেষ্টা করত।

অনেক দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখান যায় যে একটা প্রাণীর জীবনটাই বরবাদ হয়ে যেতে পারে যদি ঠিক সময়ে তাকে ঠিক শিক্ষা না দেওয়া হয়। বাচ্চাবয়সে মা-হারা মেষ-শিশু বড় হয়ে না পারে পালের মধ্যে মিশে যেতে, না শিখবে দলের নিয়ম কানুন, তার জাতের অন্য ভেড়াদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারবে না, ঘর-সংসার করতেও শিখবে না। অস্ট্রেলিয়ার মেষপালকেরা এই ব্যাপারটা ভালরূপেই জানে তাই মা-হারা মেষশিশুদের তারা দয়া মায়া না দেখিয়ে মেরে ফেলে।

আর একটি বিস্ময়-জাগানো দৃষ্টান্ত কুকুর, প্রথম যে প্রাণী পোষ মেনেছিল মানুষের কাছে, মানুষের নিঃস্বার্থ ভজমান বন্ধু। মাকসিম গোর্কি তো আর মিছামিছি লেখেন নি, 'আমরা জানি কুকুর অনেক সময় প্রিয় বন্ধুর থেকে সততার দিক থেকে শ্রেষ্ঠতর'।

তোমাদের মনে হবে যে এই বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে ধীরে ধীরে, হাজার হাজার বছর মানুষের সংসর্গে থাকার ফলে, কিন্তু আসলে তা নয়। কুকুরের সঙ্গে আমাদের বন্ধুতাটা বহুলাংশে সেই মুদ্রণের ঘটনারই ফলশ্রুতি। একটা কুকুর যদি বেড়ে ওঠে সেই সব শব্দ, চিত্র আর গন্ধের সাহচর্য ছাড়া যেগুলি মানুষেরই নিজস্ব, তাহলে বড় হয়ে সে হবে বড় জোর একটা পোষমানা নেকড়ে। এমনি একটা কুকুর কখনো মানুষকে পুরোপুরি বিশ্বাস করবে না, বা তার বন্ধুও হবে না।

মানুষের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু কুকুর মানবজাতির বিকাশে একটা গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা নিয়েছে, যে ভূমিকার গুরুত্ব সঠিকভাবে উপলব্ধি করা কঠিন। কল্পনা করা কঠিন মানুষের সমাজের উন্নতি ও বিকাশ কতটা বিঘ্নিত হোত যদি কুকুরের এই বিশেষ ক্ষমতা না থাকত যার সহায়তায় খুব বাচ্চাবয়সেও তারা নিজের প্রজাতির বা সাধারণভাবে অন্য প্রাণীর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে নিতে পারে। রাশিয়ান প্রাণীতত্ত্ববেত্তা মডেস্ট বগদানফ-এর সঙ্গে একমত হতেই হয়, তিনি যথার্থই বলেছেন যে কুকুরই মানুষকে জীবনের রাস্তায় এগিয়ে নিয়ে গেছে।

পশুপাখিরা অনেকগুলি অভ্যাস রপ্ত করে নেয় কত জটিল চেষ্টার সহায়তায়, আমরা ভেবে নেই যে সেগুলি তারা জন্ম থেকেই পেয়েছে। পাখিকে তো কেউ হাতে ধরে শেখায় না কী করে বাসা বাঁধতে হয়, কিন্তু বাচ্চা পাখিকে মসৃণ দাঁড়যুক্ত খাঁচায় যদি পালন করা হয় তাহলে সে আর ভাল করে বাসা বাঁধতেই শিখবে না।

খাঁচার মসৃণ দাঁড়গুলি পালটে যদি শক্ত, রুক্ষ, এবড়ো খেবড়ো, বাঁকানো, গাঁঠযুক্ত গাছের ডাল দিয়ে বানিয়ে দেওয়া হয় তখন কিন্তু পরিস্থিতিটা হবে অন্যরকম। পাখিরা তখন সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত লাফ দিয়ে বেড়াবে, পাগুলিকে সুসম্বন্ধে নাড়াচাড়ায় শিক্ষিত করে তুলবে, পরবর্তী কালে বাসা বাঁধার সময় কাজে লাগবে এই শিক্ষা।

পাখিদের সঙ্গীত শিক্ষার ব্যাপারেও একই কথা বলা যায়। গান গাইবার ক্ষমতাটা জন্মাবধি প্রাপ্ত একটা প্রতিক্রিয়া, কিন্তু ভাল গায়ক হতে গেলে পাখিকে অন্তত একবারও শুনতে হবে নিজের জাতের পাখির গলার আওয়াজ। পাখিটা যদি বড় হয়ে ওঠে নিজের জাতের সঙ্গীদের সাহচর্য ছাড়াই তাহলে কিন্তু সে তাদের মতো গান গাইতে শিখবেই না। গান গাইতে শেখাটাও মুদ্রণেরই একটা ব্যাপার।

কয়েক জাতের সামুদ্রিক মাছ আছে, যারা মিঠে জলে ডিম পাড়ে — ডিম ফুটে বেরোয় মিঠে জলেই, মানে সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত নদীতে বা হ্রদে, ছেলেবেলাটা তারা কাটায় সেখানেই। কৈশোরে তারা নেমে যায় সাগরে, কখনো কখনো জন্মস্থান থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে। অনেকগুলি বছর দূর সমুদ্রে কাটিয়ে পূর্ণবয়সে তার ফিরে আসে ঠিক যে নদীতে জন্মেছিল সেই জলে। মহাসমুদ্রে তারা রাস্তা চিনতে পারে কী করে সেটা একটা দুরূহ সমস্যা, সে বিষয়ে সঠিকভাবে অনুসন্ধানই করা হয় নি — এই পরিচ্ছেদের প্রসঙ্গও সেটা নয়। বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন কেবল মাছেরা কেমন করে

তাদের জন্মস্থানের নদীটাকে চিনতে পারে এবং উজান ঠেলে চলতে চলতে সঠিক বাঁক নিয়ে পৌঁছে যায় ঠিক সেই উপনদীতে, এমন কি সেই শীর্ণ ধারাটিতে যেখানে তাদের জন্ম হয়েছিল। জানা গেছে, প্রত্যেক নদীর আছে নিজস্ব বিশেষ গন্ধ, যেটা নির্ভর করে সেখানকার অধিবাসী গাছপালা ও জলজীবী প্রাণীদের ওপর। জলজ উদ্ভিদ আর প্রাণীদের গন্ধগুলি মিলে মিশে তৈরি হয় একটা মার্কা-মারা গন্ধ যেটা পাওয়া যায় শুধু সেই নদীতেই। এই গন্ধটা মাছেরা মনে রাখে অনেক বছর ধরে। মুদ্রণের এ এক তাক-লাগানো দৃষ্টান্ত।

আমাদের ছেলেমেয়েদের বেলাতেও, কতকগুলি সময় আছ যেগুলি বিশেষ বিশেষ কাজে পটুতা লাভ করতে বা অভ্যাসে রপ্ত হতে সবিশেষ উপযোগী। বিজ্ঞানীরা মনে করেন একেবারে বাচ্চা শিশুর হাসির সঙ্গে মস্তিষ্কের যন্ত্রব্যবস্থার মুদ্রণ-সংক্রান্ত ব্যাপারে যোগাযোগ রয়েছে।

শিশুদের কথা বলতে শেখানো যায় তাদের জীবনের প্রথম ছয় বছরের ভেতরে। মনে হয় এই তথ্যটা প্রাচীন কালেও জানা ছিল। অন্তত হেরোডোটাস বলেন, সামেটিকাস (Psammetichus) নামের মিশরীয় নৃপতি, যিনি ছাব্বিশতম রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং জীবিত ছিলেন 25 টি শতাব্দী আগে, তিনি স্থির করলেন কোন জাতির লোক সবচেয়ে প্রাচীন সেটা জানতে হবে। আদেশ দিলেন যে সাধারণ চাষার ঘরের দুটি শিশুকে পালন করবে একজন মেষপালক। মেষপালককে আদেশ দিলেন যে সেই শিশুদের সামনে কোন কথা সে বলতে পারবে না, কেউ যেন শিশু দুটির সঙ্গে দেখা না করতে পারে। শিশু দুটি বাস করবে সম্পূর্ণ একলা। কেবল মাত্র ছাগল নিয়ে তাদের কাছে আসতে পারবে তাদের দুধ খাওয়াতে আর নিতান্ত না করলেই নয় এমন দু'একটা কাজ করে দিতে। এই নিষ্ঠুর পরীক্ষাটা করা হয়েছিল জানবার জন্য যে শিশু দুটি কথা বলতে শিখে প্রথম কথাগুলি বলবে কোন ভাষায়। এর থেকে জানা যাবে কোন জাতির লোক সবচেয়ে প্রাচীন।

দুহাজার বছর পরে অনুরূপ একটা পরীক্ষা করা হয়েছিল আরো বিস্তারিত ভাবে, করেছিলেন ভারত সম্রাট জালালুদ্দিন মহম্মদ আকবর। তাঁর সভাসদদের মধ্যে একটা তর্ক উঠেছিল যার বিষয় ছিল প্রাচীনতম জাতির লোকেরা কোন ভাষায় কথা বলত। তিনি সামেটিকাস-এর ব্যবহৃত পরীক্ষাটার পুণরনুষ্ঠান করলেন। আজ্ঞাবহদের নির্দেশ দিলেন বারোটি সদ্যোজাত শিশুদের মায়ের বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে একটি স্তম্ভে রেখে দিতে।

তারা যাতে মরে না যায় সেজন্য আকবর তাদের জন্য নিযুক্ত করলেন বোবা-কালা দুধ-মায়ের একটি দলকে। বারো বছর পর্যন্ত এই শিশুরা শুনতে পাবে না কোন শব্দ।

এই অন্তর্বর্তী সময়টা কেটে গেলে আকবর স্থির করলেন এই শিশুদের পরীক্ষা করবেন সর্বসমক্ষে। এই উদ্দেশ্যে তিনি আমন্ত্রণ করে আনলেন বিভিন্ন ভাষার বিশারদ জ্ঞানী গুণীদের: ইহুদী, পারসিক, হিন্দু, আরব, চ্যালডীয় এবং আরো অনেককে। যাই হোক, প্রত্যাশিত ফল কিন্তু পাওয়া গেল না। শিশুরা প্রচলিত কোন ভাষাই তো উচ্চারণ করতে পারল না, এবং নিজেদের মধ্যে যোগসূত্রহীন শব্দ বা ইঙ্গিত দিয়ে ভাব বিনিময় করে দেখাল মাত্র।

এই গল্পটা সত্যি কি না সঠিক করে সে কথা বলতে পারব না। এই নিষ্ঠুর পরীক্ষার ফলের কথা ভেবে দেখলে মনে হবে সত্যিই এই পরীক্ষাটা করা হয়েছিল। অন্তত বিজ্ঞানীদের জানা সবগুলি ক্ষেত্রেই যেসব শিশু বয়স্ক লোকের সঙ্গ ছাড়াই বড় হয়েছে, শৈশবে শুনতে পায়নি মুখের ভাষা তারা কথা বলতে শেখে নি কোন ভাষাতেই।

আজ অবশ্য কেউ আর বিস্মিত হবে না এই সংবাদে যে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গভাবে শিশুকে বড় হতে দিলে তারা একেবারেই কথা বলতে শিখবে না। বহুকাল আগে থেকেই জানা গেছে যে শিশুরা কথা বলতে শেখে বড়দের কথা শুনে শুনে। আশ্চর্যের কথা এই যে বড় হয়ে কেন তারা মানুষের ভাষা অধিগত করতে পারে না এবং চিরকালের জন্য মানসিক জড়তা নিয়ে বেঁচে থাকে।

এখন এটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে শিশুরা ভাষা শিখতে পারে তাদের জীবনের প্রথম ছয় বছরেই এবং শেখার এই ক্ষমতাটা এর পর থেকে ক্রমে ক্রমে ভুলে যায়। কোন মানুষ শৈশবে একটা ভাষা শিখলে পরবর্তী কালে অপর একটা, তার পরে তৃতীয় একটা এবং চেষ্টা করলে ডজন খানেক ভাষা শিখে নিতে পারবে। কিন্তু যে বয়সটা কথা বলা এবং ভাষা শিক্ষার জন্য সব চেয়ে প্রশস্ত সেই কালটা পেরিয়ে গেলে ক্ষতিটা আর পুরিয়ে নেওয়া যায় না এবং শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের সমস্ত প্রযত্নও খুবই নিম্নমানের ফল দেখাবে।

ফরাসী রাজন্যপুরুষ টেলির‍্যাণ্ড-এর একটা বহুকথিত উক্তি আছে যে মানুষকে ভাষা দেওয়া হয়েছিল তার চিন্তাগুলিকে গোপন রাখার জন্য।

এই উক্তির মধ্যে খানিকটা সত্য হয়ত আছে, কিন্তু জন্মাবধি মানুষের প্রয়োজন ভাবনা বিনিময়ের। মনে করে দেখ আকবরের পরীক্ষাটার কথা, যে শিশুগুলিকে স্তম্ভের মধ্যেধ রাখা হয়েছিল বারো বছর, তারা ইশারা করে ভাব প্রকাশ করত। গল্পটা যে সত্যি সেটা বাঝা যায় এথেকে। অন্তত দুটি বা তার বেশি সংখ্যক শিশু যখন ভাষার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য হয়ে একত্রে বড় হয়ে উঠল, তারা নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময়ের জন্য নিজস্ব ভাষা তৈরি করে নিল যার সঙ্গে অবশ্য তাদের মাতৃভাষা বা অন্য কোন ভাষার কোন সম্পর্ক নেই। মুখ্যত, সে ভাষায় আছে শুধু কয়েকটি আদিম শব্দ আর কয়েকটি ভঙ্গি।

বিশেষভাবে চর্চা-করা একটি ক্ষেত্রে শিশুদের দ্বারা উদ্ভাবিত ভাষায় ছিল 21টি মূল ভঙ্গি বা ইশারা, তার সঙ্গে সেগুলিরই মিশ্রণ বা সামান্য ব্যতয় করে সেই শিশুরা তাদের বয়সে উপলব্ধ সকল তথ্যই ব্যক্ত করতে পারত। লক্ষণীয় এই যে, শিশুর যে দলটা ভাবভঙ্গি দিয়ে নিজেদের ভাষা গড়ে তুলেছে তারা কথ্য কোন ভাষা আয়ত্ত করতে পারে না যতক্ষণ না তাদের একজনকে অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং তারা যেভাবে ভাব বিনিময় করতে অভ্যস্ত সেটা বন্ধ করে দিলে তবেই তা সম্ভব।

জীবনের প্রথম কয়েকটি বছর বিশেষভাবে জরুরী, কারণ এই সময়ে শিশুর মস্তিষ্কর বৃদ্ধি, পুষ্টি ও বিকাশ ঘটে থাকে। এই সময়েই মস্তিষ্কের কোষগুলির মধ্যে পরস্পরের সম্পর্ক চিরতরে নির্ণীত হয়ে যায়, এবং এই সময়েই মস্তিষ্ক সব চেয়ে বেশি পরিবর্তনশীল।

বয়স্ক লোকের সঙ্গ থেকে শিশু মাতৃভাষা সব চেয়ে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে শেখে। তার চারপাশে লোকে যদি কয়েকটি ভাষায় কথা বলে, শিশু সেগুলিও আয়ত্ত করবে। কিন্তু কোন শিশুর যদি সে সুযোগ না থাকে তবে বছরের পর বছর স্কুলে এবং তার পরে উচ্চশিক্ষার কোন প্রতিষ্ঠানে কঠোর পরিশ্রম করলে পরেই কোন বিদেশী ভাষা সে শিখতে পারবে। কিন্তু, প্রায় সর্বক্ষেত্রেই, সে বিদেশী ভাষায় স্বচ্ছন্দে কথা বলতে শিখবে না। এই কারণে বিদেশী ভাষা শেখাতে হলে শিশুকে যত কম বয়সে সম্ভব শেখানো উচিত।

এলিজাবেথা দ্রাচিনস্‌কায়া ভারি চমৎকার মেয়ে। শুধু যে বড় সার্জন তাই নয়, প্রতিভাময়ী অধ্যাপিকাও। ঘোড়ায় চড়া-তে তাঁর উৎসাহ প্রচুর, সাহিত্য আর শিল্পে যেমন দরদ, তেমনি রসবোধ। জ্ঞানের প্রায় সবগুলি ক্ষেত্রে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য থাকার দরুণ তাঁর অধ্যাপনা অত্যন্ত আগ্রহের সঞ্চার করত। আশ্চর্য কি, তাঁর বক্তৃতা কেবল যে সবগুলি বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা শুনত তাই নয়, শিক্ষক আর চিকিৎসকেরাও তাঁর ক্লাসে যোগ দিতেন।

দ্রাচিনসকায়া-র ফরাসী সংস্কৃতি আর বিজ্ঞানের বড় বড় কীর্তিগুলির বিষয়ে ছিল গভীর জ্ঞান, সে দেশের প্রতিভাধর ব্যক্তিদের প্রতি ছিল তাঁর প্রকৃত শ্রদ্ধা। বক্তৃতার কালে ফ্রানসের বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের কীর্তির কথা প্রসঙ্গক্রমে বলতে তাঁর কখনো ভুল হোত না, আর কেবল বিজ্ঞানীদের বিষয়েই নয়। বস্তুত, তিনি প্রায় সকলের নামই উল্লেখ করতেন। যেমন ধরো, পচন নিবারণের বিষয়ে বলতে গিয়ে সঙ্গতভাবেই লুই পাস্তুর আর তাঁর সহাধ্যায়ীদের উল্লেখ তিনি করলেন, তখন কাজে কাজেই এসে পড়ে সরবন শিক্ষালয়ের কথা। একথা থেকে কেমন করে আলোচনা মোড় নেয় জ্যাঁ পল সাত্র-এর বা লুই আরাঁগ-এর প্রসঙ্গে। বিজ্ঞান আর কলার মধ্যে তিনি আশ্চর্য রকমের মিল খুঁজে বের করতেন।

শ্রোতৃমণ্ডলী বিনা ব্যতিক্রমে এই রকমের কাব্যিক বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে পরিক্রমা তন্ময় হয়ে শুনতে থাকে। অধ্যাপিকা বা শ্রোতা কারুরই হুঁস নেই সময় কখন কিভাবে কেটে যাচ্ছে — ঘণ্টা বেজে গেলেই কেবল দ্রাচিনসকায়া সংবৃত হন, লজ্জিতভাবে হেসে বলেন, ‘ওঃ, ফ্রেনচম্যানদের কথা বলতে আমি পাগল।’

এই যে ব্যাপারটা, যার ফলে আমাদের চিন্তা ঘুরে ফিরে একই বিষয়ে চলে আসে শারীরতত্ত্ববিদেরা এর নাম দিয়েছেন প্রবলভাব। সহজভাবে বলতে গেলে, নানা কারণে মস্তিষ্কের কোন একটা অঞ্চলে উত্তেজনার প্রবণতা বেড়ে যায়, যে অঞ্চলে দেখা যায় মস্তিষ্কের অন্যান্য জায়গা থেকে উত্তেজনার সকল স্পন্দনগুলিই আকর্ষিত হয়ে তার সক্রিয়তা বাড়িয়ে দেয়।

এই প্রবলভাব আমরা সকলেই কোন না কোন সময়ে বোধ করেছি। যখন একটা চিত্তাকর্ষক আর গুরুত্বপূর্ণ কাজে কেউ ব্যস্ত থাকে যেমন

পরীক্ষার পড়া তৈরি করা বা নতুন নাটকে অভিনয়ের পাঠ নেওয়া, সে সময় খুবই কঠিন হয়ে পড়ে বা হয়ত একেবারে অসম্ভব হয়ে যায় অন্য কোন কাজে মন দেওয়া। মস্তিষ্কের কার্যধারার এটা একটা বিশেষত্ব এই যে, যে কাজটাকে সব চেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয় জীবনের এক একটা সময়ে, তখন দেহমনের সকল গুণ, সম্পদ বা ক্ষমতাকে কেন্দ্রিত ক'রে তাতেই মগ্ন করে দেয়।

কেন একজন লোক কোন একটা প্রবলভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে যায় তার অনেকগুলি কারণ থাকতে পারে। যেমন উত্তুঙ্গ দেশপ্রেম, নিজের কাজে প্রাণ-পোড়ানো স্পৃহা, প্রেমাস্পদার প্রতি ভালবাসা বা মাতৃত্বের উৎকন্ঠা। প্রবলভাবের সৃষ্টি করে এই আবেশগুলি মানুষকে তার সকল ক্ষমতাগুলির পূর্ণ ব্যবহার করিয়ে নেয়, সব বাধা-বিপত্তি দূরে ঠেলে দিতে সক্ষম করে। মানুষের প্রতি ভালবাসা মস্তিষ্কে তজ্জনিত প্রবলভাবের সৃষ্টি করে রাশিয়ান বিপ্লবীদের সাহায্য করেছিল জেলের মধ্যে বা কঠোর কায়িকশ্রমের কলোনীতে হতোদ্যম না হয়ে আবার সুযোগ আসলেই জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। এমনি একটা প্রবলভাবের দরুণ লড়াই করার কালে সৈন্যেরা তাদের ভয়কে দাবিয়ে রাখতে পারে, অবিচলভাবে সহ্য করতে পারে শৈত্য, উষ্ণতা। ক্ষুধা, তৃষ্ণা আর ক্লান্তির সঙ্গে যুঝতে পারে, সমস্ত উদ্যম নিযুক্ত করতে পারে দেশরক্ষার কাজে।

তবে এই প্রবলভাবটা সকল সময়ে দরকারী নাও হতে পারে। প্রবলভাবের কারণটা যদি অকিঞ্চিৎকর হয় অথচ মস্তিষ্কের সমস্ত কাজকর্মকে আচ্ছন্ন করে যদি থাকে তাহলে কিন্তু আরো দরকারী কাজে এটা বাধার সৃষ্টি করতে পারে।

হয়ত একটা প্রবলভাবের দরুণ কেউ হয়ে গেল অত্যন্ত এক দেশদর্শী। কখনো কখনো অল্পবয়সী কোন মায়ের মুখে তার বাচ্চার কথা শুনতে শুনতে বিরক্তি ধরে যায়, থিয়েটারে কিংবা বক্তৃতা শুনতে গিয়ে বা ভোজসভায়। অপরপক্ষে সেই মা হয়ত ভাঁর বুদ্ধিদীপ্ত তুলনা বা মজার ঘটনার উল্লেখ করতে পারেন যেগুলি তোমার মাথায়ও আসে না।

একটা প্রবলভাব যদি মাসের পর মাস বা বছরের পর বছর স্থায়ী হয় তাহলে কিন্তু তার অধিকারীর আগ্রহের বিষয়গুলির সংখ্যা দারুণভাবে কমে আসে এবং তার মানসিক বিকাশ হয় বড়ই অসমঞ্জস। এতে হয়ত তুমি যে পেশার লোক সেই কাজের সুবিধা হোল, কিন্তু সেই প্রবাদটা মনে

পড়ে গেল: বিশেষজ্ঞ-এরা যেন মাঢ়ীর ফোঁড়া, তারা সব একপেশে। অপরপক্ষে, একটা প্রবলভাবের কেন্দ্র যদি অন্য সব দুর্বলতর প্রবলভাবকে দাবিয়ে রাখতে পারে, তবেই একজন বিদ্বান ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হয় মস্তিষ্কের গভীরে ডুব দিয়ে প্রচুর দরকারী তথ্য উদ্ধার করে আনা। এমনি একজন বিশেষজ্ঞের নিত্যদিনের বক্তৃতা হয়ে উঠতে পারে স্মরণীয় ঘটনা।

মস্তিষ্কের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে একটা নিয়মিত ঘটনা হোল এই প্রবলভাব। এমনকি আদিম প্রাণীদেরও প্রবলভাবের হাত থেকে মুক্তি নেই, যদিও তাদের ক্ষেত্রে এই ভাবগুলি জেগে ওঠে সাদামাঠা কারণ থেকেই, যেমন ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আত্মরক্ষা আর প্রজননের প্রেরণায়। কোন একটা প্রবলভাবের প্রাবল্য কমে বা বেড়ে যেতে পারে প্রাণীটার প্রয়োজন অনুসারে। একটা প্রবলভাবের উত্তেজনার কেন্দ্র অন্যান্য প্রবলভাবকে শান্ত করতে বা দাবিয়ে দিতে পারে।

ক্ষুধার্ত কুকুর প্রভুরসংকেত অনুসারে তার খাদ্যের বাটিটার দিকে প্রত্যেক বার ছুটে যাবে — কেননা তার প্রবলভাবটা এখন খাদ্য। কিন্তু কুকুরটাকে নিয়ে যাও একটা নতুন অজানা পরিবেশে, তক্ষুণি সে খিদে ভুলে লেজ গুটিয়ে বসে থাকবে। এখন যে কোন শব্দে, যে কোন নতুন গন্ধে সে কেবল গজরাবে বা দাঁত দেখাবে। শেষতঃ, বছরে দুবার যখন স্ত্রী-কুকুরের শরীরে অন্তঃশ্রাবী গ্রন্হি থেকে যৌন হরমোনের প্লাবন নেমে আসে তাকে সন্তানধারণের উপযোগী করে তুলতে, তখন কুকুরটা ভয় ভুলে যাবে, ক্ষুধা ভুলে যাবে, প্রভুকে ভুলে যাবে, তার সমস্ত আচরণ একাগ্র হয়ে উঠবে প্রজজনের কাজে।

মস্তিষ্কের স্বাভাবিক ক্রিয়া পদ্ধতি ছাড়াও রোগ ঘটিত কারণের দরুণও, বিশেষত সেই রোগ ঘটিত কারণ যদি মস্তিষ্কের করটেকস, বা উপরিতলে সীমায়িত থাকে, স্থায়ী প্রবলভাবের কেন্দ্র তৈরি হতে পারে। এই ধরনের কেন্দ্র মস্তিষ্কের অন্য অংশে উদ্ভূত উত্তেজনাকে আকর্ষিত করতে পারে ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণে এই রোগঘটিত কারণে উত্থিত প্রবলভাবের কেন্দ্র জনিত উত্তেজনা পৌঁছে যায় একটা উচ্চ সীমাতে। তার পর এই উত্তেজনাটা ছড়াতে থাকে বিপরীত দিকে, আশপাশের অঞ্চলকে প্রভাবিত করতে থাকে। অতি উত্তেজনার একটা ব্যাধিগ্রস্ত কেন্দ্র মস্তিষ্কের উপরিতলের সামনের দিকে আশ্রয় নিলে তা থেকে মৃগীর আক্রমণ সম্ভব।

ব্যাধিজনিত উত্তেজনার কেন্দ্রের উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানি না। এই কেন্দ্রের অতি উত্তেজনার ফল সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আরো কম, এমনকি মানুষের মস্তিষ্কের ব্যাপারেও। 'কুরু' শব্দের প্রতিশব্দ 'হাসতে হাসতে মৃত্যু'। রোগটায় আক্রান্ত হয় স্ত্রীলোকে আর শিশুরা রোগের শুরুতে, শরীরটা অল্পদিনে দুর্বল হয়ে আসে, তার পর আসে পক্ষাঘাত, তার পরে মুখের পেশীগুলিতে খিল ধরে যায় — মৃত্যু আসে যার শেষে। মৃতব্যক্তির মুখের চেহারাতে হাসির একটা মুখোস যেন লেগে থাকে। রোগটার কারণ বা মস্তিষ্কের কোন অংশে ব্যাধিজনিত কেন্দ্রটির অবস্থান সেটা আজো জানা যায় নি।

জন্তু-জানোয়ারদের স্নায়ুতন্ত্রের কার্যধারার বিষয়েই আমরা এখনো অনেক কিছু জেনে উঠতে পারি নি, নিম্নস্তরের প্রাণীদের বিষয়ে তো নয়ই। তবে এই অজ্ঞাত ভূমি থেকেই চাঞ্চল্যকর আবিষ্কারগুলির প্রত্যাশা আমরা করতে পারি।

গরু-ভেড়াদের কষ্ট দেয় ভারি পাজি একটা পরজীবী ল্যানসেট কৃমি। এরা মানুষের পক্ষেও বিপজ্জনক। পরজীবীটা বাস করে খামারের পশুদের যকৃতে কিন্তু এদের শুককীটেরা বেঁচে থাকতে পারে কেবলমাত্র পিঁপড়েদের শরীরে।

চরতে গিয়ে গরুরা পিঁপড়ে খেয়ে ফেললেই এই কৃমির দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে, অনেক কাল এটা একটা রহস্য ছিল যে পিঁপড়ের মতো চটপটে প্রাণী কী করে নিজেদের কেউ জ্যান্ত খেয়ে ফেলবে এমনটা ঘটতে দেয়। তার ওপর, আক্রান্ত পিঁপড়ের সংখ্যা বেশ কম, প্রতি দশহাজারে একটা এই অনুপাতে। কিন্তু গরুদের মধ্যে রোগটা বেশ ব্যাপক। কতগুলো পিঁপড়ে একটা গরুকে খেতে হবে, অন্তত একটা আক্রান্ত পিঁপড়েকে গিলতে হলে? তার মানে এই রোগ-অধ্যুষিত অঞ্চলের গরুরা কি শুধু পিঁপড়েই খায়?

এই ল্যানসেট কৃমির বিরুদ্ধে অভিযান চালানো বেশ দুরূহ কাজ। আক্রান্ত চারণক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করাও কম কঠিন নয় — কেননা একটা পিঁপড়ের পেটের মধ্যে এই শুককীট আছে কি না জানতে হলে অনেক সময় ব্যয় করতে হবে। পিঁপড়েটাকে ধরে প্রথমে কাটতে হবে, পাকস্থলীটা বের করতে হবে, অণুবীক্ষণ যন্ত্রে সেটা দেখতে হবে, খুঁজে বের করতে হবে কালো কালো বিন্দুগুলি, সেই নালীগুলির চিহ্ন যেগুলি সারকেরিয়ারা (শুককীটের ক্রমবিকাশের একটা পর্যায়ের নাম)

পিঁপড়ের পাকস্থলীর দেয়াল খুঁড়ে খেতে বেরিয়ে যাবার কালে রেখে গেছে। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা দেখতে চাইলেন সারকেরিয়ারা পিঁপড়ের পাকস্থলী থেকে বেরিয়ে কোথায় যায় — আশ্চর্য হয়ে তারা আবিষ্কার করলেন যে প্রায় সবাই থাকে তলপেটে কিন্তু অন্তত একটা সারকেরিয়া গলার নীচের স্নায়ুজট ভেদ করে যায় — পতঙ্গটার স্নায়ুতন্ত্রের সবচেয়ে জরুরী বিভাগ হোল এই অঞ্চল। এই স্নায়ুগ্রন্থির সামনের দিকে শূককীটটা আশয় নেয়, পিঁপড়েটার চোয়াল থেকে আসা স্নায়ু দুটির মূলে, এখানে এসে সে বেড়ে উঠে মেটাসারকেরিয়া হয়ে যায়, শূককীট হিসেবে তার বিকাশের শেষ ধাপে এসে পেঁছায়। এখনো আমরা জানি না যে সারকেরিয়াদের মধ্যে কোনটা যায় স্নায়ুজটে আর বাকি সারকেরিয়ার দল সে খবর পায় কি করে। কিন্তু এক্ষুণি তোমরা জানতে পারবে যে পিঁপড়ের স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান কার্যালয়ে তাদের প্রেরিত একজন প্রতিনিধির থাকবার কত দরকার।

আক্রান্ত পিঁপড়েদের ভাগ্যে কী ঘটে স্বভাবতই বিজ্ঞানীরা সেটা দেখতে আগ্রহী ছিলেন। পতঙ্গের মস্তিষ্কে একটা জীবিত প্রাণীর অনুপ্রবেশ নিশ্চয় তার আচরণকে প্রভাবিত করবে। দীর্ঘকাল পর্যবেক্ষণ করেও তাদের আচরণের

কোন তারতম্য দেখা গেল না কেবল এইটেই প্রতিষ্ঠিত হোল যে বাতাসের উষ্ণতা যতক্ষণ থাকে বেশি বেশি ততক্ষণ পিঁপড়েরা স্বাভাবিক আচরণ করেই চলে। তাদের চিরপরিচিত রাস্তাগুলি দিয়ে এদিকে সেদিকে ধায়, খাদ্য নিয়ে আসে, নিয়ে আসে পিঁপড়ের ঢিবির মেরামতির মালমসলা, অর্থাৎ পিঁপড়ে সমাজে সকল ব্যাপারে সক্রিয় ভাগ নেয়। কিন্তু রাত্রিতে ঠাণ্ডা পড়লে এই সারকেরিয়া-আক্রান্ত পিঁপড়ে বেয়ে ওঠে একটা ঘাসের আগায়, এবং তার চোয়াল দিয়ে ঘাসের প্রান্তটা প্রাণপণে কামড়ে ধরে থাকে, এত জোরে যে তুমি তাকে টেনে ছাড়াতে পারবে না। নিশ্চল অবস্থায় এইভাবে সে থাকে সকাল পর্যন্ত যতক্ষণ না সূর্য উঠে মাটিকে আবার উত্তপ্ত করে তোলে। সকাল আর সন্ধ্যের দিকে গরুরা ঘাসের সঙ্গে এই পিঁপড়ে খায়। যত ঠাণ্ডা পড়বে পিঁপড়েদের এই আচ্ছন্ন অবস্থার কালটা তত থাকবে, গরুদের আক্রান্ত হবার সম্ভবনাও বাড়বে সেই হারে।

আবিষ্কারটা যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি দরকারী। এখন তো পিঁপড়েকে রেফ্রিজারেটরে রেখে দিলেই তার আচরণ থেকে জানা যায় তাদের মধ্যে আক্রান্ত পিঁপড়ে কোনগুলি।

সাধারণভাবে, নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মস্তিষ্কের ব্যাধি নিয়ে অনুসন্ধান এখনো শুরু হয় নি কিন্তু সকল বিজ্ঞানীই একমত হবেন যে এই সমস্যাটা নিয়ে কাজ করবার সময় হয়ে এসেছে।

বৈজ্ঞানিকদের সন্দেহ আর জল্পনা

আধুনিক জীববিদ্যার কঠিনতম কাজ হোল স্মৃতির রহস্যের ব্যাপারটার সমাধান করা। সারা বিশ্বজুড়ে শত শত বিজ্ঞানী এই সমস্যা নিয়ে কাজ করছেন। স্মৃতি ব্যাপারটা আসলে কী সে সম্পর্কে এই মুহূর্তে আমরা প্রায় কিছুই জানি না, মস্তিষ্কের কোন অঞ্চলে আমাদের স্মৃতিগুলি ন্যস্ত থাকে আর বিপুল যে জ্ঞানসম্ভার একটু একটু করে আমরা গড়ে তুলি সারা জীবন ধরে তারাই বা কোথায় থাকে তাও আমাদের অজানা। যার চেয়ে বড় কথা, এই সব তথ্য মস্তিষ্কে কেমনভাবেই বা লিপিবদ্ধ থাকে। অন্য কথায়, বিজ্ঞানীদের জানতে হবে মস্তিষ্ক কী ধরনের কাগজ, কালি আর বর্ণমালার ব্যবহার করে থাকে, মনের মধ্যে মুদ্রিত করে দিতে সেই সব তথ্য যেগুলি সে আহরণ করে।

স্মৃতি সম্পর্কিত অসংখ্য সমস্যার মধ্যে এগুলি হোল কয়েকটি মাত্র। যেমন ধরো জানতে পারলে ভাল হোত মস্তিষ্ক কী করে তথ্যগুলির প্রকারভেদ করে থাকে, তাদের মধ্যে কোন একটাকে বেছে নিয়ে থাকে বা স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতে থাকে। এই ধারণার পেছনে যুক্তি আছে যে মানুষের মস্তিষ্ক যত কিছু তথ্য সংগ্রহ করে তার সবটাই মজুত করে রেখে দেয়, এবং কেবল তাদের উদ্ধার করে নিয়ে আসার কৌশলে ত্রুটি থাকার জন্যই সংরক্ষিত জ্ঞানভাণ্ডারের নগণ্য এক অংশ মাত্র আমরা ব্যবহার করতে পারি।

স্মৃতি সম্বন্ধে যে কয়টি তত্ত্ব আছে তাদের দুই শ্রেণীতে ফেলা যায়। প্রথমটা হোল স্মৃতি সম্পর্কিত জৈব রসায়ন তত্ত্ব যেটা বলে মস্তিষ্কের ভেতরে তথ্য সমুদয় লিপিবদ্ধ থাকে রাইবো-নিউক্লিইক-অ্যাসিড বা RNA অণুর মধ্যে বা অন্য কোন বড় অণুর মধ্যে। এই তত্ত্বের অনুকূলে প্রথম যুক্তি হোল জৈব রয়ায়ন লিপির সাহায্যে প্রায় অফুরন্ত পরিমাণে তথ্য ধরে রাখা যায়। দ্বিতীয় যুক্তি, যেটা আরো জোরালো, সেটা হোল এই যে তথ্য সঞ্চয়ের এই যে পদ্ধতি, এটা তো চালু রয়েছে প্রাণের উন্মেষের শুরু থেকে এবং প্রকৃতি আজও এই পদ্ধতির প্রয়োগ করে চলেছেন এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে তথ্য পৌঁছে দেবার কাজে।

এর অর্থ হোল সেই তথাকথিত পুরুষানুক্রমিক তথ্য ব্যবস্থা, এক গোছা খুব কঠোর বিধানাবলী আর চাহিদাসমষ্টি যারা বলে দেয় একটি প্রজাতির এক একটি প্রাণী আকৃতিতে বা আচার-ব্যবহারে কেমন হবে। এই বিধানগুলি কেবল যে প্রাণীটার চেহারা, শারীরিক যন্ত্রাদির কার্যধারাকেই নিয়ন্ত্রণ করবে তা নয়, পরন্তু তার আচরণের কাঠামোটাকেও। সিংহ-পিঁপড়েকে (Antlions) কেউ তো শেখায় না ফাঁদ পেতে বসে থেকে শিকারকে ধরতে, মাকড়সাকে জাল বোনা কেউ দেখিয়ে দেয় না। বাঁধাকপির মতো সাদা প্রজাপতি নিজে নিজে চিনে নেয় নিজের প্রজাতির পুরুষকে, নানাজাতের উপাসকের মধ্যে থেকে। এই যে অন্তর্নিহিত জ্ঞান যা নিয়ে প্রাণীটা জন্মেছে এটা তেমনি চিরস্থায়ী যেমনটি প্রাণীটার অন্যান্য শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলি। রাশিয়ান জীববিজ্ঞানী ওয়াগনার (Wagner) যথার্থই বলেছেন যে মাকড়সাদের শ্রেণীবিভাগ করা উচিত আকৃতির বদলে তাদের আচরণ অনুসারে — এই মত যুক্তিসিদ্ধ, কেননা অনেকগুলি ভিন্ন জাতের মাকড়সা আকৃতিতে প্রায় অভিন্ন।

উচ্চতর প্রাণীদের এমনকি মানুষেরও আচরণের ধারাটা জন্মসূত্রে পাওয়া যায়। সদ্যোজাত শিশুকে কেউ শেখায় না স্তন্য চুষে খেতে। তার শরীরের এটা হোল একটা আন্তরিক প্রতিক্রিয়া। এমনি অনেকগুলি প্রতিক্রিয়া আছে যদিও তাদের সম্বন্ধে খুবই কম জানা আছে।

বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি খুব আশ্চর্য হয়ে যান এটা লক্ষ্য করে যে ডিম ফুটে বেরিয়ে-আসা মুরগীর বাচ্চা খুব সহজেই শিকারী পাখিকে চিনতে পারে। এমনকি যে মুরগী শিকারী পাখি আদপেই দেখে নি সারা জীবনে তার ডিম থেকে ফুটে রেরুনো বাচ্চারও আছে এই ক্ষমতা। সদ্যোজাত মুরগীর ছানাদের উড্ডীয়মান চিলের একটা চলন্ত ছায়া দেখানো হলে পরে তারা ভয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে যায় (চিলটার মাথাটা ছোট, কাঁধের দিকে ঘোরানো, বড় বড় ছড়ানো ডানা, লম্বা রোগা শরীর আর লেজ)। ছায়াটাকে যদি উলটো দিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তখন মনে হবে একটা বেলে হাঁস বা রাজ হাঁস উড়ছে (লেজটা হয়ে যায় মাথা, ঘাড়টা লম্বা সামনের দিকে বাড়ানো, ছোট মাথাটা হয়ে যায় লেজ)। মুরগীর ছানা এটা দেখে কিন্তু নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায়।

এর অর্থ হোল এই যে শিকারী পাখির চিত্রটা ছোট মুরগীর ছানার মনের মধ্যে মুদ্রিত হয়ে আছে এবং এই তথ্যটা বাপ-মায়ের থেকে সে পেয়েছে জন্মসূত্রে, জৈব রসায়ণের একটা লিপির সাহায্যে। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া চিত্র যদি জৈব রসায়ণ লিপিতে মুদ্রণ করা সম্ভব তাহলে একই উপায়ে অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া চিত্র কেনই বা এই ভাবে মুদ্রিত হয়ে থাকবে না? বার বার আমরা দেখেছি যে যদি ভাল একটা কিছু পেয়ে যান, প্রকৃতি কখনো তাকে উপেক্ষা করেন না। এক্ষেত্রেও কেনই বা তিনি ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করবেন?

দ্বিতীয় মত অনুসারে, স্মরণ রাখার ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে নতুন একটা পদ্ধতির সৃষ্টি এবং স্নায়ুকোষদের মধ্যে নতুন যোগসূত্র গড়ে ওঠা। এই যে স্নায়ুগত সম্ভাব্য যোগসূত্র, সারা জীবনব্যাপী স্থায়ী কি এটা হতে পারে? বৃদ্ধবয়সের স্মৃতিভ্রংশের ব্যাপারটা (নতুন ঘটনা মনে রাখার ক্ষমতা কমে যায়) এই ভাবে কি ব্যাখ্যা করা যায় যে স্নায়ুতন্ত্রের সব সঞ্চয় ফুরিয়ে যায় ততদিনে? গনিতজ্ঞেরা এ ব্যাপারে কোন আলোক পাত করতে পারেন না। তবে একথা যদি চিন্তা করি যে একটা স্নায়ুকোষে এসে মিলিত হয় কয়েক হাজার স্নায়ুরজ্জুর প্রান্ত তাহলে সম্ভব মনে হয় যে

মানুষের মস্তিষ্কের সমস্ত স্নায়ুজাল দরকারী সকল তথ্যই সঞ্চয় করে রাখতে পারে।

এই মতোর স্বপক্ষে একটা যুক্তি দেওয়া হয়ে থাকে যে বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ুকোষগুলি কিন্তু বিশেষ বিবর্তিত হয় নি। জৈব রসায়ণ-প্রক্রিয়া যেগুলি ঘটে নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীর স্নায়ুকোষে তারা কিন্তু একই রকমের। বিকাশ যেটা ঘটেছে সেটা শুধু স্নায়ুকোষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে আর স্নায়ুতন্ত্রের বন্দিশটার উন্নতি ঘটেছে।

স্মৃতি সম্বন্ধে বর্তমানে আমরা যত কিছু জেনেছি তা কিন্তু এই তত্ত্বকে সমর্থন করে না। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। কোন পতঙ্গের শূককীট, যেমন ময়দার ঘুণ-পোকার শূককে হয়ত শেখানো হোল যে একটা ভুলভুলাইয়া-র মধ্যে দিয়ে যাবার কালে তাকে কেবল ডানদিকেই মোড় নিতে হবে, পূর্ণাঙ্গ পোকাটা এই অভ্যাসটা মনে রাখে কিন্তু। দেখা যাচ্ছে তার স্মৃতি মোটই বিঘ্নিত হয় নি, যদিও শূকটার শরীর বদলে সে মূককীটে পরিবর্তিত হয়েছে, স্নায়ুর যোগসূত্র সবগুলিই এবং শতকরা নব্বুই ভাগ স্নায়ুকোষ বিনষ্ট হয়ে গেছে। স্মৃতিটা কী করে বজায় রইল সেটা রহস্যই থেকে গেছে।

এই মুহূর্তে বলা কঠিন দুটি মতের কোনটি ঠিক। তবে সাপেক্ষ-প্রতিবর্তী-স্মৃতির সম্বন্ধে একটা সর্ববাদীসম্মত মত পাওয়া যায় যে স্নায়ুকেন্দ্রগুলির মধ্যে সাময়িক যোগসূত্রের সৃষ্টি হয়ে থাকে, যার দরুণ কোন সাপেক্ষ উদ্দীপনার ফলে উদ্ভূত স্মৃতিটাকে মস্তিষ্ক ধরে রাখে, এবং মস্তিষ্কের একটা আজ্ঞাকারী অংশ তজ্জনিত সাড়াটা কী হবে সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করে। তবে, এর পরেও অনেক কিছু ব্যাখ্যা করা বাকি থেকে যায়।

এই যোগসূত্র কেমন করে গড়ে ওঠে সেটা অস্পষ্ট রইল। কোন কোন বৈজ্ঞানিক বলেছেন যে বন্ধনটা নিছক কার্যগত এবং এটা কেবল উত্তেজনাকে কতকগুলি স্নায়ুপথ-সন্ধির মধ্য দিয়ে আরো তৎপরভাবে প্রবাহিত করে দেয়। অন্যেরা মনে করেন যে সাপেক্ষ প্রতিবর্তীর উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ুকোষদের মধ্যে যোগাযোগটা গড়ে ওঠে তাদের শুঁড়গুলি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে অথবা এই শুঁড়গুলি দিয়েই নতুন নতুন স্নায়ুপথ সন্ধি গড়ে তুলে।

সে যাই হোক, মস্তিষ্কের কার্যধারা বা উচ্চতর স্নায়বিক তৎপরতা স্নায়ুকোষের ক্রিয়াশীলতার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। সকলেই এ বিষয়ে একমত, কোন সন্দেহ, কোন দ্বিমত নেই এই ব্যাপারে। ঠিক এই কারণেই, যখন কয়েক বছর আগে একজন প্রখ্যাত আমেরিকান শারীরতত্ত্ববিদ রবার্ট গ্যামবস

একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন, তখন অনেক মতবিরোধ দেখা দিল। এই বিজ্ঞানী বলতে চাইলেন যে বহির্জগতের উপলব্ধি, সাপেক্ষ প্রতিবর্তীর উদ্ভব, স্মৃতি অর্থাৎ মস্তিষ্কের প্রধান কাজগুলির সঙ্গে স্নায়ুকোষের কোন ভূমিকা নেই, যাদের আছে তারা হোল গ্লিয়া (Glia), সেই ছোট ছোট কোষগুলি যারা স্নায়ুকোষের বাইরে ভিড় করে থাকে এবং স্নায়ুকোষের শুঁড়গুলির অন্তর্বর্তী ফাঁকগুলি ভরাট করে থাকে।

জীববিদ্যার ব্যাপারে অবাস্তব মত কিছু নতুন কথা নয়, তবে সাধারণত সেগুলি জনপ্রিয় হবার আগেই তাদের কথা লোকে ভুলে যায়। গ্যালামবস-এর ধ্যান-ধারণার কথা সোভিয়েট ইউনিয়নেও এসে পৌঁছাল, যেখানে পরম্পরাগতভাবে স্নায়ুতন্ত্র নিয়ে অনুসন্ধান চলে আসছে। সে সময়ে বিজ্ঞানীরা গ্লিয়ার কাজকর্ম নিয়ে কোন আলোচনা করতে প্রস্তুত ছিলেন না কেননা তাঁদের মতের স্বপক্ষে প্রমাণ করে দেখানোর মতো কোন ঘটনা ছিল না। গ্লিয়া সম্বন্ধে কিছুই জানা ছিল না যদিও সংখ্যায় তার স্নায়ুকোষদের থেকে অনেক বেশি। এর আগে ভাবা হোত তারা স্নায়ুকোষদের মদত দিয়ে থাকে, তাদের প্রয়োজনীয় রসদ যোগায়, কেননা শিরা-ধমনীর জালকগুলি কখনো সরাসরি স্নায়ুকোষের সংস্পর্শে আসে না।

গ্যালামবস-এর প্রস্তাবিত মতটা এতই ভিত্তিহীন ছিল যে সেটা বেশিদিন টিঁকবে বলে মনে হয় নি। বিভিন্ন দেশে যদিও এই মতকে সমর্থন করতে কিছু অনুগামী লুব্ধ হয়েছিলন, এমন কি সোভিয়েট ইউনিয়নেও। যেমন ধরো জর্জিয়াতে কিছু কিছু শারীরতত্ত্ববিদ তাঁদের ধারণা ব্যক্ত করেছিলেন যে পূর্বের ধারণা থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ গ্লিয়া কোষেরা করে থাকে। গ্যালামবস-এর মতো তাঁরা অবশ্য দাবী করেন না যে চেতনা বা স্মৃতির কাজ গ্লিয়া করে থাকে, তবে তাঁরা দাবী করেন যে সাপেক্ষ প্রতিবর্তী যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সাময়িক যোগসূত্রের বন্ধনটা সম্পূর্ণ করে এই গ্লিয়া কোষেরা।

দীর্ঘদিন ধরে দেহকোষ-বিজ্ঞানীরা জেনে এসেছেন যে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের স্নায়ু-শুঁড়গুলির অনেকগুলি প্রান্তই একেবারে নগ্ন, মাইয়োলিন বা পেশীকোষের পর্দা দিয়ে তারা আবৃত নয়। হিসেব করে দেখা গেছে যে তড়িতপ্রবাহ এই নগ্ন স্নায়ুপ্রান্ত দিয়ে বেরিয়ে এলে তাকে ছড়িয়ে দিতে হবে। আর, তারা সংলগ্ন স্নায়ুতন্তুতে উত্তেজনা প্রচালিত করে দেবার পক্ষে অনুপযুক্ত। জর্জিয়ার বিজ্ঞানীরা ধারণা করলেন যে পথটা সম্পূর্ণ করবার প্রক্রিয়াটা নিষ্পন্ন হয় এইভাবে: আগে যে স্নায়ুপ্রান্তটা নগ্ন ছিল, সেটা পেয়ে যায় মাইয়োলিন-এর খোলস এবং সেজন্য আরো সক্রিয় হয়ে ওঠে। তড়িৎ-অপরিবাহী খোলসটা তৈরি হয় গ্লিয়া কোষ দিয়ে, যাদের শুঁড়গুলি নগ্ন স্নায়ুগাত্রকে ঢেকে দিয়ে তাকে উপহার দেয় কয়েকটি স্তরের একটা মাইয়োলিনের খোলস।

এখনো পর্যন্ত বলা কঠিন যে এই সব মতগুলি সত্য বলে প্রমাণিত হবে কি না, কেননা গ্লিয়া নিয়ে অনুসন্ধান সবে মাত্র শুরু হয়েছে। সন্দেহ নেই যে এই অনুসন্ধানের ফলে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান কার্যধারার বিষয়ে নতুন একটা শারীরতত্ত্বভিত্তিক দিগন্ত খুলে যাবে।

সাহসী প্রতারক

মানুষের সঙ্গে মনুষ্যেতর প্রাণীদের অনেক তুলনা করা হয়েছে। এই সব তুলনা থেকে অনেকগুলি কৌতুহলজনক নামের উদ্ভব হয়েছে। সার্জন মাছের নাম দেওয়া হয়েছে তার লেজের ধারালো পাখনার দিকে লক্ষ রেখে

যেগুলি আকৃতিতে ঠিক যেন শল্যবিদের ছুরি। তপস্বী-সীল নাম পেয়েছে সমুদ্রের কিনারায় পাথরের পাশে তার বসে থাকার ভঙ্গি থেকে — ঠিক যেন মুনি ঋষিদের কেউ মাথা হেঁট করে পুজো করছেন। সৈনিক কাঁকড়াদের নাম তাদের দল বেঁধে চলার ভঙ্গি থেকে — যেন সৈনিকেরা কুচকাওয়াজ করতে করতে চলেছে।

এদিকে মানুষকেও আবার অনেক সময় তুলনা করা হয়ে থাকে জন্তু জানোয়ারদের সঙ্গে। আমার ছোট মেয়েকে যখন আমি বলি যে সে একটা শেয়াল, সে বুঝতে পারে যে আমি বলতে চাইছি যে সে একটা দুষ্টু। দুষ্টুমির জন্য বকুনি খেয়ে সে যখন রাগ করে তখন আমি বলি 'কাঁটাগুলো নামাও, ছোট শজারু' তার মানে দোষটা তারই তাই বাবার ওপর রাগ করা তার উচিত নয়।

দুঃখের বিষয় জন্তুর সঙ্গে তুলনা করলে অনেকে রেগে যান। লোকে অনেক সময় অন্য লোকের তুলনা করে 'ঘাসের মধ্যেকার সাপ', শুকর-ছানা বা ধাড়ি শুকর বলে। সর্বত্রই জন্তুর সঙ্গে তুলনার প্রচলন আছে। আমেরিকাতে গেলে শুনতে পাবে একটা জনপ্রিয় বাক্যাংশ, 'অপোসামের ভাণ করা'। এই কথাটার উৎপত্তি কোথা থেকে হোল? মানেটাই বা কি? বললে কি লোকে দোষ ধরবে?

অপোসাম একটা ছোট প্রাণী, 40 থেকে 45 সেন্টিমিটার লম্বায়, আকৃতিতে অনেকটা ইঁদুরের মতো। এদের লম্বা সুঁচালো নাক, বড় বড় গোঁফ আর খুব লম্বা লেজ। মা-অপোসাম বাচ্চাদের পিঠে করে নিয়ে বেড়ায়। মায়ের লেজে নিজেদের লেজগুলি পাকিয়ে নিয়ে বাচ্চারা মায়ের পিঠ আঁকড়ে ধরে বসে থাকে, পড়ে যায় না।

অপোসামদের পাওয়া যায় কেবল আমেরিকাতেই। ইয়োরোপে তাদের নাম শুনেছেন কেবল বিজ্ঞানীরা, তাও যাঁরা অঙ্ক-গর্ভ প্রাণীদের বিষয়ে আগ্রহী, কেননা অস্ট্রেলিয়ার ক্যাঙারুদের মতোই মা-অপোসাম বাচ্চাদের রেখে দেয় একটা থলির ভেতরে, যতদিন না তারা নিজেরা চলে ফিরে বেড়াতে শেখে। তা না হলে বাচ্চাগুলি বাঁচতোই না।

নিজেদের দেশে অপোসামের যথেষ্ট খ্যাতি, তাই অপোসামের ভাণ করা একটা নিত্যকার কথার কথা। ধরো, তরুণ ফুটবল খেলোয়াড়, খেলতে খেলতে পড়ে গিয়ে আর উঠছে না, তার বন্ধুরা চেঁচিয়ে বলল, 'আর অপসামের ভাণ করতে হবে না'। অর্থাৎ যেন মরে গেছে এমন ভাণ সে না করে। ছেলেটা

তাতে রেগে যায় না, কেননা তার বন্ধুরা বুঝতে পেরেছে যে তার বেশি লাগেনি, তাই শুয়ে আছে বলে ঠাট্টা করছে।

আবার এই বাক্যাংশের অর্থটা হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন যদি ধরো,, স্কুলের ছুটির পরে ক্লাসের সব ছেলে ঘিরে তাদেরই একজনকে বলে যে সে অপসামের ভাণ করছে। এই ক্ষেত্রে ছেলেটার মনে নিশ্চয় লাগবে কেন না তার বন্ধুরা মনে করে যে সে প্রতারণা করেছে।

অপোসামের নির্লজ্জ প্রতারণার খ্যাতিটা ছড়িয়েছে তার একটা অদ্ভুত আচরণের জন্য। বিপদে পড়লে, হঠাৎ শিকারী জানোয়ারের মুখোমুখি পড়ে গেলে, বা যে তাকে তাড়া করেছে তার হাত থেকে পালাতে না পেরে অপোসাম মরে গেছ এমনি ভাণ কর। এই ধরনের আত্মরক্ষা যতটা আজগুবি বলে মনে হয় ততটা নয় কিন্তু; তা হলে তো পৃথিবী থেকে কতদিন আগেই অপোসামেরা লোপ পেয়ে যেত।

এই যে নিঃসন্দেহে মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ করে আত্মরক্ষা করা, এর ভিত্তি হোল সব প্রাণীদের মধ্যে লক্ষণীয় অজানার প্রতি ভীতি বা বিজ্ঞানীদের ভাষায় আত্মস্থতা-ব্যগ্র-সুরক্ষার প্রতিক্রিয়া। শিকারীই ভয় পেয়ে, ক্ষুধা ভুলে তাড়া করা ছেড়ে দেয়।

কোন শিকারী পশু, তা সে যতই ভয়ানক হোক না কেন, শেয়াল বা নেকড়ে, সিংহ কি বাঘ, সদ্য হত্যা করা হয়েছে এমনি একটা প্রাণীর কাছে কখনোই ছুটে আসবে না। শিকারটা মোটেই নড়ছে না, পড়ে আছে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে, এই ব্যাপারটাতেই তারা ভয় পেয়ে যায়। মৃত প্রাণীটার চার পাশে কেবলই ঘুরতে থাকবে, নিশ্চিত হতে চায় যে কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই, তবেই তার আত্মস্থতা-ব্যগ্র-সুরক্ষার প্রতিক্রিয়াটা প্রশমিত হবে। তার পরেই জানোয়ারটা শিকারের দিকে এগিয়ে যাবার ঝুঁকি নেবে।

কত সময় খিদেকে ছাপিয়ে ভয়টা প্রবল হয়, সুস্বাদু খাবার পড়ে থাকে অনাস্বাদিত। এই উপায়ে অপোসাম তক্কে তক্কে থেকে ঠিক সময় বুঝে পালায়। সাধারণত তাকে আবার তাড়া করা হয় না, কেননা মড়ার মতো যে পড়ে আছে তার আবার তড়িৎ গতিতে দৌড়, এটাও অস্বাভাবিক ঘটনা, শিকারীর আর একবার পিলে চমকে যায়।

এই মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আত্মরক্ষার ব্যবহার অপোসাম এমনই কার্যকরভাবে করে থাকে যে সময় সময় শিকারীর চোয়াল থেকেও সে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। কেবল মাত্র বুড়ো, ধুরন্ধর শিকারীপশুরাই
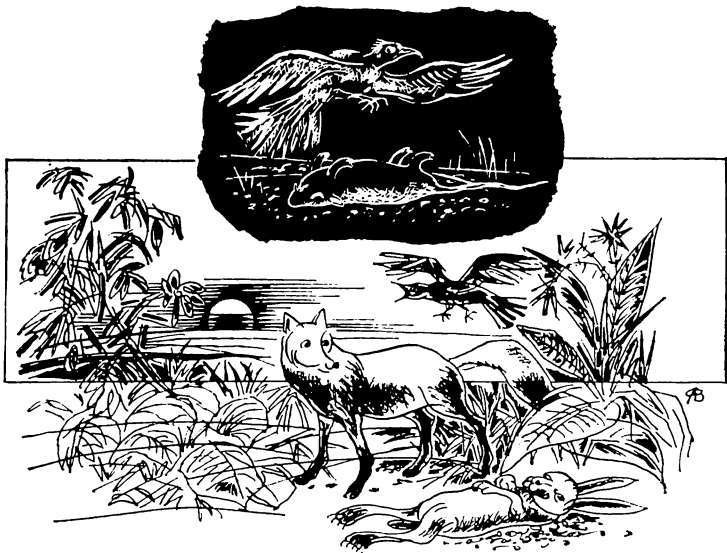
প্রতারিত হয় না। তখন অবশ্য অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে অপোসামের রেহাই নেই।

শত শত বছর অপোসামের অখ্যাতি প্রতারক হিসেবে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বরাবরই সন্দেহ করেছেন তার এই প্রতারণার ব্যাপারটা খাঁটি কি না সঠিকভাবে জানা তো যায় নি যে অপোসাম মরার ভাণ করে না সত্যি সত্যি ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়।

তবে সম্প্রতি তড়িৎ-শারীরতত্ত্বের বিজ্ঞানীরা সমস্যাটার সমাধান করেছেন। সকলের জানা আছে এই তথ্য যে মস্তিষ্কের কোষে কোষে নিয়মিতভাবে তড়িৎ-স্পন্দন বহে যায়। বিজ্ঞানীরা এই স্পন্দনগুলির নাম দিয়েছেন জৈব তড়িৎপ্রবাহ এবং তাদের প্রকৃতি অনুসারে বলতে পারেন প্রাণীটা সত্যি সত্যি ঘুমাচ্ছে, কি ওষুধের প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, না কি অজ্ঞান হয়ে আছে, বা তার মস্তিষ্ক স্বাভাবিকভাবে কাজ করছে। অপোসামের জীবনের বিভিন্ন সময়ের জৈব তড়িৎ-প্রবাহ নথিভুক্ত করে দেখা গেছে যে অপোসাম যখন মরে যাবার ভাণ করে তখন তার মস্তিষ্ক বিন্দুমাত্র প্রদমিত নয় যেমন হয়ে থাকে নিদ্রিত অবস্থায় বা সুপ্তিজনক ওষুধের প্রভাবে। বরং সেই সময়ে তার মস্তিষ্ক সব চেয়ে প্রখরভাবে কাজ করে চলে। অপোসাম সত্যি সত্যিই প্রতারক এবং খ্যাতিটা তার যথার্থই প্রাপ্য।

জীবজন্তুরা কি মনোকষ্টে ভোগে?

অনেক দিন থেকেই জানা আছে যে মনোকষ্টে কেবল মানুষ একাই ভোগে না। যেমন ধরো এক জোড়া রাজহাসের একটা মরে গেলে অন্যটা কান্নাকাটি করে, কুকুর — মায়ের ছানা কেড়ে নিলে সে বড় চঞ্চল হয়। পোষা জানোয়ারের মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এমনই নিবিড় হয় যে প্রভু বাড়িতে না থাকলে তারা কাঁদে। মিলান শহরে একটা কুকুর বারো বছর ধরে রোজ রেলের লোকোশেডে যেত প্রভুর সঙ্গে দেখা হবে বলে, প্রভু বহুকাল আগে মারা গেছে। ইঞ্জিনটা ঢুকলো, স্টীম ছেড়ে দেওয়া হোল, ড্রাইভার, ফায়ারম্যান সবাই চলে গেল, কেবল তখনই কুকুরটা মাথা হেঁট করে লেজ গুটিয়ে কোন রকমে দেহটাকে টেনে নিয়ে বাড়ি ফিরত। তাহলে দেখা যাচ্ছে জানোয়ারেরা যে মনোকষ্টে ভোগে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

উচ্চতর প্রাণীদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা তো দেখা গেল সত্যি, কিন্তু আরো আদিম প্রাণীদের বেলায়? তারা কিছু অনুভব করতে পারে না কি? মাঠে উড়ে বেড়াচ্ছে যে প্রজাপতি তার মেজাজের খবর কেমন করে পাবো? তাকে জিগগেস করলে তো আর জবাব পাবো না, তাই একমাত্র উপায় হোল এই ধরনের অবস্থার মধ্যে বিভিন্ন প্রাণীর আচরণ লক্ষ্য করা। যেমন, দেখা যেতে পারে নির্জনতা তারা কেমন করে সহ্য করতে পারে, বা নিজের জাতির সঙ্গে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে তারা কি করে।

মানুষের কাছে তো নিঃসঙ্গতা একটা ভয়ানক পরীক্ষা। রবিনসন ক্রুসোর মতো কত গল্প আছে জন মানব শূন্য দ্বীপে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গভাবে মানুষ কেমন করে কাল কাটিয়েছে, অনেকের তো সাংঘাতিক মানসিক ব্যাধি ধরে গেছে। আশ্চর্য কি, কেননা মানুষ তো আসলে সমাজবদ্ধ জীব। জীবজন্তুদের ক্ষেত্রে যারা দলবদ্ধ হয়ে জীবন কাটায়, তা সে আদিম জীব হোক বা আধুনিক, নিঃসঙ্গতা সহ্য করতে তাদের বড় কষ্ট হয়। আদিম জীবদের নিজের গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন করলে তারা অত্যন্ত ক্লেশ বোধ করে। উচ্চতর প্রাণীরা হয়ত নিঃসঙ্গতাতে নিজেদের মানিয়ে নিয়ে চলতে পারবে। অনেকে তো মানুষের সাহচর্যে কিছুটা সান্তনা পায়। বাঁদরেরা তো

আমাদের মনে করে তাদের একটু পাগলা গোছের ভাই, আমাদের সঙ্গে বনিবনা করে কাটিয়ে দেয় নিজের জাতের কারুর সঙ্গ ছাড়াও।

নিম্নস্তরে প্রাণীদের পক্ষে কাজটা বড় কঠিন। আমরা তো তাদের সঙ্গ দিতে পারি না, ছোট ছোট পাখি, যেমন কাঠঠোকরা বা লেজ-ঝোলানো ফিঙে বন্দীদশায় কেঁদে কেঁদে শেষ পর্যন্ত মরে যায় অল্পকালেই, যদি নিঃসঙ্গ রাখা যায়। কিন্তু বড়ো খাঁচায় একত্রে অনেকগুলি পাখি রাখলে তারা বেশ খুশি দেখবে।

অনেক মাছ আছে যারা সঙ্গ পছন্দ করে। অ্যাকোয়রিয়ামে যদি একটা হেরিং মাছ রেখে দাও দেখতে পাবে মনমরা হয়ে সেটা মরে যাবে কয়েক দিনের মধ্যে, কিন্তু সেটার কষ্ট গভীর সমুদ্রের জন্য নয়, যেমন এক কালে ভাবা হোত, বরং অন্য হেরিং মাছের সঙ্গের অভাবে সে বিষন্ন।

কতকগুলি পতঙ্গ আছে, তারাও সঙ্গ ছাড়া বাঁচে না। ইয়োরোপীয় প্রসেশনারি মথ-এর শুঁয়োপোকারা বেড়ে ওঠে দল বেঁধে। আমাদের দেশের জঙ্গলে এরা বড় বেশি উৎপাত করে। ডাল থেকে ডালে, গাছ থেকে গাছে এরা গুটিগুটি চলে সারি দিয়ে, পথে যেসব সবুজ পাতা পায় সেগুলি খেয়ে নিঃশেষ করে। কিন্তু একটা শুঁয়োপোকা যদি পেছিয়ে পড়ে হারায়, তার ধ্বংস অনিবার্য। সেটা মুহ্যমান হয়ে পড়ে, তার খিদে চলে যায়, বিপাকজ-শারীর ক্রিয়াতে পড়ে মন্দা। সেটা পূর্ণাঙ্গ পরিণতি কখনোই লাভ করবে না। কিন্তু এমনি একটা বিষন্ন পোকাকে যদি দেখাও তার সঙ্গীদের দু'একজনকে বা কাঁচের আড়াল থেকে একটা নকল পোকাকে, তাহলেই তার মনটা আবার প্রফুল্ল হয়, বিপাকের বেগ বাড়ে।

মৌমাছিদের মতো সামাজিক জীব, পিঁপড়ে বা উইপোকা, নিঃসঙ্গতা একেবারেই বরদাস্ত করতে পারে না। একলা থাকলে, বা কখনো কখনো দলটা যদি খুব ছোট হয়ে যায়, তারা খাওয়া বন্ধ করে দেয়, অচিরেই প্রাণ হারায়। দলটা যথেষ্ট বড়ো হলেই তাদের জীবনের স্বাভাবিক ছন্দটা বজায় থাকে। পিঁপড়ে আর মৌমাছিদের বেলায় এই সংখ্যাটা হওয়া চাই অন্তত পঁচিশ। কেননা জনবহুল যৌথ বাসস্থানে বাস করার অভ্যাসের দরুণ পঁচিশের চেয়ে সংখ্যায় কমে গেলে এদের বিষন্নতা বেড়ে যায়।

উত্তরআমেরিকাবাসী শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে যাঁরা নিগ্রোদের মানবিক অধিকারের স্বপক্ষে আন্দোলন করেন, তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে যদি দেখ তাঁরাও মনে করেন নিগ্রোরা মানুষ হিসেবে নিকৃষ্টতর তাহলে তুমি কি অবাক হবে না? বর্তমান যুগে সকলেই জানে মানুষের মধ্যে শরীরের গঠনের দিক দিয়ে, যেমন পেশীর কাজ বা আভ্যন্তরিক দেহযন্ত্র ব্যবস্থায় কোন প্রভেদ নেই। তাই যারা জাতিভেদতত্ত্বের মুরুব্বী তারা বলে থাকে তফাৎটা হোল মনের রাজ্যে, মানে মস্তিষ্কের কার্যকলাপে।

এই ধরনের মতের ভিত্তি হোল এই যে সাংস্কৃতিক বিকাশের স্তরের বিরাট ব্যবধান থেকে গেছে বিভিন্ন জাতির মধ্যে। তিন-চারটা বছর আগে বিরাট বিরাট ভৌগোলিক আবিষ্কারগুলির কালে যে ব্যবধান প্রথম লক্ষ্য করা হয় আজও তারা পুরোপুরি সমতায় এসে পেঁৗছয়নি। এশিয়া, আফ্রিকা, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়া থেকে অনেক মহান ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়েছে তবে মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে মোট সহায়তার পরিমাণ অনেক জাতিরই প্রায় নগন্য। এই সব জাতির জীবনযাত্রার হীন অবস্থাই এজন্য দায়ী, মানুষ হিসেবে আন্তরিক কোন ন্যূনতা নয়। জাতিগত বৈষম্যের প্রবক্তারা অবশ্য দাবী করবেন যে সাংস্কৃতিক বিকাশের স্তরভেদ প্রমাণ করে অন-ইয়োরোপীয় বাসিন্দাদের হীনত্ব।

বিভিন্ন জাতির মানুষের মস্তিষ্কের কাজকর্মের কোন পার্থক্য আছে কি? বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের এবং পশুর মস্তিষ্কের কাজকর্মের মধ্যে প্রধান প্রভেদটা হোল ভাষার ব্যবহারে, পাভলভ যার নাম দিয়েছেন 'দ্বিতীয় সংকেত ব্যবস্থা'। ভাষা একান্তভাবেই একটা মানব ব্যাপার, এবং জাতিগতভাবে প্রভেদ যদি সত্যিই কিছু থাকে তাহলে সেটা প্রকাশ পাবে ভাষা ব্যবহারে মস্তিষ্কের যন্ত্রব্যবস্থাতে। চিকিৎসকদের মানুষের মস্তিষ্কের কাজকর্মের বিষয়ে জ্ঞান প্রচুর, কেননা মস্তিষ্কের বিভিন্ন ব্যাধির ক্ষেত্রে রোগীর মানসিক পরিবর্তন তাঁরা দীর্ঘকাল ধরে পর্যবেক্ষণ করে আসছেন। দীর্ঘকাল ধরে তাঁরা দেখে আসছেন যে মস্তিষ্কের অর্ধমণ্ডলের বিশেষ অঞ্চল যদি আঘাতপ্রাপ্ত হয় তাহলে রোগী পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে, অন্য অঞ্চলের আঘাত থেকে দৃষ্টি বা শ্রবণশক্তি আক্রান্ত হয়। মস্তিষ্কের একটি বিশেষ অঞ্চলের আঘাত বাকশক্তিকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে। বাম অর্ধমণ্ডলের কপালের

পাশের দিকের অঞ্চলে যদি আঘাত লাগে রোগী শুনতে পাবে কিন্তু বুঝতে পারবে না। ওই একই অর্ধমণ্ডলের সামনের দিকের অঞ্চল যদি আহত হয় তাহলে জিহ্বা আর ওষ্ঠ দিয়ে ভাষাবদ্ধ শব্দের উচ্চারণ বিঘ্নিত হয়, আর মস্তিষ্কের পিছনের দিকের দেয়ালে আঘাতের ফলে রোগী গণনা করতে ভুলে যায়।

মস্তিষ্কের কতকগুলি রোগজনিত আঘাত লেখবার বা পড়বার ক্ষমতার ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।

অনেকগুলি পর্যবেক্ষণ করার পরে দেখা গেল যে মস্তিষ্কের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কোন আঘাত পেলে ইয়োরোপীয়রা লিখিত ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা হারায় কিন্তু জাপানীদের ক্ষেত্রে এই ক্ষমতা ততটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, চীনদেশীয়দের আদৌ কোন ক্ষতি হয় না। অপরপক্ষে, পেছনের দিকে ভেতরের দেয়ালে আঘাতের দরুণ ইয়োরোপীয়দের বেলায় অর্থবহ লেখার ক্ষমতা আদৌ কমে না, জাপানীদের যথেষ্ট ক্ষতি হয়, চীনারা অর্থবহ কোন কিছুই লিখতে পারে না।

তার মানে কি মস্তিষ্কের কাজকর্মের ব্যাপারে জাতিগত প্রভেদ রয়েছে? প্রশ্নটার উত্তর দেবার আগে মস্তিষ্কের বাকশক্তির কার্যধারার ব্যবস্থাটা একটু আলোচনা করে নেওয়া যাক।

মানুষের ভাষাতে আছে মিশ্রশব্দর জটিল বুনট। কথা বলতে গেলে, ভাল শ্রবণশক্তি থাকলেই চলবে না। দু'এক মাস বয়সের শিশুর কাছে কথা মানে এক ধরনের কোলাহল। বাক্‌শক্তি আয়ত্ত করতে হলে শিশুকে শিখতে হবে একটা শব্দপ্রবাহ থেকে মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি বা ভাষার ধ্বনিগুলিকে আলাদাভাবে চিনতে। বাকশক্তি আত্মগত করতে গেলে দরকার শুধু তীক্ষ্ন শ্রবণশক্তিই নয়, কানটার থাকা চাই কোন একটা ভাষার শব্দ ব্যবস্থাতে সম্পূর্ণ প্রশিক্ষণ।

তুমি একটা বিদেশী ভাষা জানো না, তাই তুমি সেই ভাষায় কথিত শব্দপ্রবাহ থেকে বিশেষ শব্দকণাগুলিকে আলাদা করে চিনতে পারবে না। তুমি যেসব শব্দ বা বাক্যাংশ শুনছ সেগুলির পুণরুক্তি করতে পারবে না, বুঝতে পারা তো দূরের কথা।

মজার কথা এবং জরুরী ঘটনাটা হোল এই যে শব্দ বিশ্লেষণের এই যে প্রক্রিয়া এটা অনুষ্ঠিত হয় মস্তিষ্কের মধ্যে কেবল শ্রবণ ব্যাপারের জন্য ভারপ্রাপ্ত অঞ্চলেই নয়, তা ছাড়াও উচ্চারণ নির্ণয় করে যে অঞ্চল সেখানেও

এবং একই সঙ্গে মস্তিষ্কের সেই অঞ্চলেও যেখান থেকে বাক সম্পর্কীয় পেশীদের সচল করা হয়। এমনকি বয়স্ক লোকেরাও, যদিও তারা বুঝতে পারে না, বাক্‌শক্তির উপলব্ধি করে শব্দের থেকে বা দৃষ্টির সাহায্যে নয় (লিখিত বাক্যের ক্ষেত্রে), পরন্তু তথাকথিত চলচ্চিত্র-নান্দনিক উপলব্ধির সাহায্যে, একটা অস্পষ্ট, আভ্যন্তরিক অনুভূতির সাহায্যে যেটা উদ্বেলিত হয় সেই সব পেশী বা পেশীরজ্জুতে যেগুলি কথা বলার কালে ব্যবহৃত হয়।

শব্দ সম্পর্কিত তথ্য মস্তিষ্কের উপিরতলে সামনের দিকের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিশ্লেষিত হয়। মানুষের মস্তিষ্কের অন্য অঞ্চলে যেমন, উপরিতলের এই পাশের দিকের অঞ্চলে আছে প্রাথমিক বা অভিক্ষেপ অঞ্চল যেখানে দুই কান থেকে স্নায়ুতন্তুগুলি এসেছে, আর আছে গৌন অঞ্চল যেখানে তথ্য এসে পেঁছায় কিনারা থেকে নয়, বরঞ্চ মুখ্য অঞ্চলে বিশ্লেষিত হয়ে যাবার পরে।

মুখ্য অঞ্চল যদি ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় তাহলে রোগীর শ্রবণশক্তি ব্যাহত হয়। বাম অর্ধমন্ডলের গৌণ অঞ্চল যদি আঘাতপ্রাপ্ত হয় তাহলে ফলটা হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন। শ্রবণশক্তি প্রায় পুরোপুরি বজায় রয়েছে কিন্তু কথা বা ভাষা শুনতে পাওয়ার ক্ষমতা বিঘ্নিত হবে। রোগী তখন শুনতে গিয়ে 'ড'-এর সঙ্গে 'ট', 'প'-এর সঙ্গে 'ব', 'জ'-এর সঙ্গে 'স' গোলমাল করে ফেলবে। দেখা যাচ্ছে তারা শব্দের ধ্বনিগুলিকে আলাদা করে চিনতে পারছে না, তাই কথা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে।

এই ধরনের রোগীকে যদি বলো ডট্‌, তার কাছে সেটা মনে হবে টট্‌ বা লট্‌ বা কট্‌। রোগী পরিষ্কারভাবে এই শব্দগুলি আলাদা করে চিনে নিয়ে শুনতেও পাবে না, সঠিকভাবে উচ্চারণও করতে পারবে না। যথাযথ শব্দটা খুঁজে না পেয়ে হয়ত চিরুণী বলতে চাইলে বলবে 'সেই যে মাথার চুলে কাজে লাগে সেই জিনিসটা', মরুভূমি বোঝাতে বলবে 'জল নেই যে জায়গায়'। ব্যাধি কঠিন হলে রোগীর কাছে 'কঠিন' শব্দের সংখ্যা এত বেশি মনে হবে আর তাদের উচ্চারণ করতে গিয়ে সে এত ভুল করবে যে তার কথাগুলি অসংলগ্ন হয়ে যাবে।

স্বভাবতই যদি কেউ ডট্‌, টট্‌ বা কট্‌ আলাদা করে বুঝতে না পারে তার মানে কথা শুনে বুঝতে পারার ক্ষমতা তার বিশেষ ব্যাহত হয়েছে। বিস্ময়ের কথা, এবং এখনো যার কারণ জানা যায় নি সেটা হোল এই যে রোগীরা বিশেষ করে বিশেষ্য শব্দগুলি শুনে বুঝতে বা বলতে পারে না তাই

তরাা কেবল অব্যয়, ক্রিয়ার বিশেণ বা ক্রিয়া দিয়ে এবং এমনি নানান শব্দ দিয়ে কোন বস্তু বা বিষয়কে বোঝাতে চেষ্টা করবে।

আর একটা মজার ব্যাপার হোল এই যে ভাষা বুঝবার ক্ষমতা যখন আক্রান্ত হয়, তখন কিন্তু রোগীর সুরজ্ঞান চলে যায় না। কতকগুলি দৃষ্টান্ত রয়েছে যেখানে প্রতিভাধর সঙ্গীতশ্রষ্টারা কথা শোনার ব্যাপারে বধির হয়ে গেছেন এবং কথা বলার ক্ষমতাও হারিয়েছেন হয়ত কোন সাংঘাতিক ব্যাধিতে, কিন্তু তখনও সৃজনধর্মী সঙ্গীত সৃষ্টি করে লিপিবদ্ধ করে চলেছে। অপরপক্ষে, দক্ষিণ অর্ধমণ্ডলের অনুরূপ অংশ আঘাতপ্রাপ্ত হলে কথা বলার ক্ষমতা লোপ পাবে না কিন্তু সুরজ্ঞানের ব্যাপারে রোগী বধির হয়ে যাবে।

শ্রবণ-বিশ্লেষকের গৌণ অঞ্চলে আঘাত বা ক্ষত থাকলেও লিখিত ভাষা প্রয়োগের ব্যাপারটাও বিঘ্নিত হয়। রোগী নকল করতে পারে, সাধারণ প্রচলিত শব্দ 'মা' বা 'চাঁদ' লিখতে পারে, নামসই করতে পারে, প্রচলিত সংকেত শব্দ O.K. বা I.O.U. লিখে দিতে পারে, কিন্তু দু'এক ছত্র অর্থবহ ভাষায় বক্তব্য নিজে বানিয়ে বা শ্রুতি লিখনেও লিখতে পারবে না। তাদের পড়বার ক্ষমতাও আক্রান্ত হয়। দু'একটা চেনা শব্দ বা বাক্যাংশ চিনতে বা বুঝতে হয়ত পারবে কিন্তু, আলাদা আলাদা অক্ষর বা পদবিন্যাস বা অপরিচিত শব্দ পড়তে পারবে না।

অর্থাৎ কিনা, ধ্বন্যাত্মক শ্রবণশক্তিতে গোলযোগ দেখা দিয়ে রোগীকে পড়বার বা লেখবার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করেছে, দৃষ্টিশক্তির গোলমাল থেকে নয়। এর ফলে বোঝা যায় কেন এই ক্ষত বা আঘাতগুলির দরুণ চীনা রোগীর পড়বার ক্ষমতা কমে না। চীনা লেখনপদ্ধতি আসলে চিত্র-লেখ, সরাসরি ধ্বন্যাত্মক শ্রবণশক্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়। চীনা রোগী লিখিত পাঠ থেকে লিখতে বা বুঝতে পারে, কিন্তু সে সেই পাঠ চেঁচিয়ে পড়ে শোনাতে পারবে না। সেই একই রোগী যদি কোন ইয়োরোপীয় ভাষায় কথা বলতে পারদর্শী হয়, তাহলে সেই ভাষায় সে পড়তে বা লিখতে পারবে না (তার ক্ষতের দরুণ)।

অন্যদিক থেকে, একজন ইয়োরোপীয় রোগী হয়ত অনর্গল চীনাভাষায় কথা বলতে পারে, নিজের ভাষায় সে পড়তে বা লিখতে পারবে না, কিন্তু চীনা ভাষায় লিখিত লিপির পাঠোদ্ধার সে করতে পারবে।

জাপানী ভাষাতে লেখাটা চিত্রলেখ আর ধ্বন্যাত্মক ভাষার একটা মিশ্রণ, তাই বোঝা যায় যে মস্তিষ্কের এই ধরনের ক্ষত-এ জাপানী রোগীর কেন

ইয়োরোপীয় রোগীর তুলনায় কম অসুবিধে হবে লিখিত পাঠ পড়তে।

চিত্রলেখ থেকে অর্থ উপলব্ধির ব্যাপারটা মস্তিষ্কের পেছন দিকের ভেতরের তলের অংশের কার্যধারার সঙ্গে সম্বদ্ধযুক্ত। মস্তিষ্কের এই অঞ্চলের আঘাত দৃষ্টিশক্তির বিঘ্ন ঘটায়। রোগী চোখ দিয়ে একটা চিত্র দেখতে পায় কিন্তু সেটাকে চিহ্নিত করতে পারে না। কোন প্রতিকৃতি দেখে রোগী দেখতে পায় নাক, চোখ, কিন্তু খুঁটিনাটি অংশগুলি একত্র করতে পারে না। সম্পূর্ণ চিত্রটা অস্পষ্ট থেকে যায় এবং সে নিশ্চয় করে বলতে পারে না চিত্রটা মানুষের কিনা। চিত্রের মানুষটার গোঁফ থাকলে রোগী হয়ত বলবে চিত্রটা বেড়ালের।

তাই, আশ্চর্য কি যে এই ধরনের রোগী চিত্রলেখ পদ্ধতির লিপি আদৌ বুঝতে পারবে না। অক্ষরগুলি অনেক কম জটিল কয়েকটি চিহ্ন, তাই অক্ষর চিনতে পারার ক্ষমতা বজায় থাকলে রোগী হয়ত বিদেশী ভাষা পড়তে বা লিখতে সক্ষম থাকবে। এই ব্যাপারটার সঙ্গে দেশ বা জাতির কোন সম্পর্ক নেই। যেসব চীনা রোগী ইয়োরোপীয় ভাষায় কথা বলতে পারে, রোগাক্রমণের ফলেও সেই ভাষায় তারা লিখতে বা পড়তে বা কথা বলতে পারবে, কিন্তু যেসব ইয়োরোপীয় ব্যক্তি চিত্রলেখ পদ্ধতির লিপি বুঝতে শিখেছিল তারা পারবে না (রোগাক্রমণের পরে)।

মানসিক কার্যধারার এই যে অভিনবত্ব, এগুলি কোন ব্যক্তি কোন্ জাতীয়, তার সঙ্গে সম্পর্ক শূন্য। তবে তারা নির্ভর করে তার বেড়ে ওঠা ও শিক্ষার ধারার ওপর, অর্থাৎ কি না সাপেক্ষ প্রতিবর্তীর একটা জটিল পদ্ধতি নির্মাণের ওপর।

সর্বদা দুটো কেন চাই?

আমাদের এই গ্রহে বাস করে কয়েক নিযুত প্রজাতির প্রাণী যাদের বৈচিত্র্য অপরিসীম। কেউ থাকে জলে, কেউ বা ডাঙায়। ঠাণ্ডায় থাকতে কেউ ভালবাসে কারুর বা পছন্দ গরম। পরিমণ্ডলের বায়ুর চাপ বেশি না হলে কারুর চলে না, কেউ বা প্রায় শূন্য আবহচাপেও বেঁচে থাকে। এত বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও একটা ব্যাপারে সকলের মিল রয়েছে — তারা সবাই পুরুষ আর স্ত্রী — এই দুই জাতে বিভক্ত। কেবল একেবারে আদিম প্রাণীদের লিঙ্গভেদ নেই।

আচ্ছা, প্রকৃতি কেনই বা সকল জীবিত প্রাণীকে দুই দলে ভাগ করলেন? কী এমন কঠিন কাজ যা একদলে করা সম্ভব হচ্ছিল না?

দুটি সম্পূর্ণ আলাদা লিঙ্গ কেন আছে এটা সাধারণত ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে সন্তানোৎপাদনের কথাটা উল্লেখ করে। কিন্তু দুটি বিভিন্ন লিঙ্গ থাকার এইটেই প্রধান কারণ বলে মনে করা ঠিক হবে না। কতকগুলি আদিম প্রাণীদের মধ্যে লিঙ্গভেদ না থাকলেও তারা বেশ চমৎকার বংশবৃদ্ধি করতে পারে। আবার, কতকগুলি প্রাণীর লিঙ্গভেদ থাকলেও তারা এক প্রকারের অযোনিজ প্রজননের ব্যবস্থা বজায় রেখেছে।

অযোনিজ প্রজনন বেশ ব্যাপক কিন্তু। সহজতম উপায় হোল বিভাজন, যে প্রক্রিয়াটা প্রয়োগ করে থাকে অ্যামিবা, ইনফিউসোরিয়া এবং আরো অনেকগুলি এককোষী প্রাণী। এই প্রক্রিয়াতে সমস্ত কোষটা, তার নিউক্লিয়াস এবং নিউক্লিয়াসস্থিত সবগুলি ক্রোমোসোম দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়, একটা কোষ থেকে উৎপন্ন হয় দুটি অভিন্ন কোষের, আগেকার কোষটা থেকে যাদের কোন প্রভেদ নেই।

কখনো কখনো দরকার হয় অন্য পদ্ধতি চেষ্টা করে দেখার। থেকামিবা বাস করে একটা বহিরাবরণের মধ্যে, তারা কেমন করে বিভক্ত হয় সেটা দেখতে ভারি মজার। প্রথমে মাতৃকোষটা, মানে বিভক্ত হবে যেটা, বেরিয়ে আসে বহিরাবরণের একটা ছিদ্র দিয়ে এবং তৈরি করে আর একটা বহিরাবরণ যেটা প্রথমটার প্রতিবিম্ব। দুটো বহিরাবরণ কিছুকাল যুক্ত থাকে। নতুন বাসাটা তৈরি করার পরে থেকামিবা একবার এগিয়ে যায় নতুন বাসায়, এক

বার পিছলে ফিরে আসে পুরানোটায়, এমনি চলে বেশ কয়েকবার, যেন সে দেখে নেয় সব ঠিকঠাক আছে কি না। শরীরটা এবার দুটিভাগে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, দুটি কোষ আলাদা হয়ে যায়। এখন থেকে প্রাণী দুটো স্বাধীনভাবে বাস করে।

অযৌনিজ প্রজননের আর একটা পদ্ধতি হোল মাতৃশরীর থেকে খানিকটা অংশ আলাদা হয়ে যাওয়া, এই পদ্ধতির নাম মুকুলিত হওয়া। এককোষী প্রাণীদের ক্ষেত্রে যে অংশটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তার একটা ছোট নিউক্লিয়াস থাকে। বহুকোষী প্রাণীদের ক্ষেত্রে, একদল কোষ আলাদা হয়ে যায়, তার পরে তাদের প্রত্যেকে হয়ে যায় আলাদা আলাদা প্রাণী। এককোষী ইসট্-এরা এইভাবে বংশবৃদ্ধি করে থাকে, বহুকোষী প্রাণীদের ক্ষেত্রে হাইড্রারা।

অযৌনিজ প্রজননের তৃতীয় পদ্ধতি হোল রেণুর সাহায্যে। মাতৃশরীরের নিউক্লিয়াস কতকগুলি টুকরোয় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কোষটাই এর পরে ততগুলি অংশে স্বতন্ত্র হয়ে যায়।

নতুন কোষ যেগুলি হোল, অর্থাৎ এই রেণুগুলি আকৃতিতে কিন্তু মাতৃশরীর থেকে বেশ আলাদা। তারা অত্যন্ত ক্ষুদ্র, আর বেশ মজবুত একটা খোলস দিয়ে শরীরটা ঢাকা থাকে দুষ্কর পরিবেশ থেকে রক্ষা পাবার জন্য। এই কারণে রেণুগুলি শুষ্কতা, অত্যধিক গরম বা শৈত্য সহ্য করে টিকে থাকতে পারে।

রেণুর সাহায্যে প্রজননের পদ্ধতিটা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে থাকে প্লাজমোডিয়া-এরা। মানুষের রক্তের লোহিত কণার মধ্যে পরজীবী হয়ে এরা বাস করে, ম্যালেরিয়া রোগের কারণও এরাই। একবার রক্তকণায় প্রবেশ করলেই এক একটা প্লাজমোডিয়োম 12 বা 24টা রেণুতে বিভক্ত হয়ে যায়। সমস্ত রেণুগুলি, সংখ্যায় তারা যতই হোক একসঙ্গে তখন রক্তকণা ছেড়ে বেরিয়ে আসে, তখন রক্তকণিকাগুলি টুকরো টুকরো হয়ে যায়, ম্যালেরিয়ার আক্রমণ ঘটে তখনই। প্লাজমোডিয়া-রা কেবল অযৌনিজ প্রজননই করে না। মশারা যখন মানুষের রক্ত পান করে তখন সেই রক্তের সঙ্গে এরা মশার অন্ত্রে পোঁছে যায় — সেখানে তারা যৌনিজ পদ্ধতিতেই প্রজনন করে থাকে।

প্রকৃতি তো নানা ধরনের অযৌনিজ প্রজননের ব্যবস্থা রেখেছেন, তাহলে এর থেকে বলা যায় যে স্ত্রী-পুরুষ এই দুই লিঙ্গের অস্তিত্ব কেবল প্রজননের জন্যই নয়। আর কী কারণ থাকতে পারে?

বলা হয়ে থাকে যে যদি দীর্ঘকাল ধরে প্রজনন অযৌনিজ পদ্ধতিতেই চলতে থাকে, তাহলে তার ফলে বংশগতির লিপিতে গোলমাল বেঁধে গিয়ে অবনতির সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে যেমন দেখা যায় নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ ব্যবস্থা চালু থাকলে। কিন্তু শুধু বললেই তো হবে না, বিজ্ঞানীরা তাই স্থির করলেন যে এমন একটা প্রাণী নিয়ে তার ওপর পরীক্ষা চালাবেন এবং তথ্য সংগ্রহ করবেন যারা অযৌনিজ এবং যৌনিজ এই দুই প্রক্রিয়াতেই প্রজনন করে থাকে।

এই উদ্দেশ্যে তাঁরা বেছে নিলেন ইনফিউসোরিয়া গোষ্ঠীর পিচ্ছিল একটা ক্ষুদ্র প্রাণীকে। বেশ বড়ো সড়ো এককোষী জীব, দেহের গঠন মোটামুটি জটিল। পরীক্ষাটা এমনভাবে চালানো হোল যে একা থাকতে থাকতে প্রাণীটা যেই দুটো টুকরোতে বিভাজিত হয়ে দুটো আলাদা প্রাণী হয়ে গেল অমনি তাদের আলাদা করে দেওয়া হোল যাতে তারা যৌনিজ প্রজনন করতে না পারে। পরীক্ষার কালে এই প্রাণীরা দিনে দু'বার মোটামুটি হারে বিভাজিত হয়েছিল। বিজ্ঞানীরা এই পরীক্ষাটা চালিয়েছিলেন 22 বছর ধরে, সেই একই ইনফিউসোরিয়াদের প্রজনন পর্যবেক্ষণ করতে। এই সময়টাতে মোট 13,500টি প্রজন্ম হয়েছিল। পূর্ব ধারণামতো কোন প্রকারের অবক্ষয় বা বংশগতির বিচ্যুতি ঘটতে দেখা গেল না।

তবে তো সেই সব প্রাণীদের ক্ষেত্রেও, যারা যৌনিজ এবং অযৌনিজ উভয়বিধ পদ্ধতিতে প্রজনন করে থাকে, দেখা গেল অযৌনিজ প্রজননে কোন প্রকারের ক্ষতি হয় না — হাজার হাজার প্রজন্ম একাদিক্রমে কেবল অযৌনিজ উপায়ে বংশবৃদ্ধি করলেও। তার মানে দুই লিঙ্গের প্রয়োজন তাহলে আর কোন কারণে। প্রজননের প্রক্রিয়াতে দুটি লিঙ্গের প্রত্যেকটির ভূমিকা বিশ্লেষণ করে দেখলে হয়ত সমস্যাটাতে কিছু আলোকপাত করা যাবে।

প্রাণের ধারা অবিচ্ছিন্ন রাখবার জন্য সকল প্রকারের প্রাণীকেই যথেষ্ট সংখ্যায় এমন সন্তান উৎপাদন করে যেতে হবে যারা বেঁচে থাকার জন্য প্রস্তুত। কয়েকটা ব্যতিক্রম বাদ দিলে সন্তানের সংখ্যা নির্ভর করে কতজন পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী-জাতীয় প্রাণী আছে তারই ওপর, কেননা একজন পুরুষতো কয়েকটি স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হতে পারে।

পুরুষের কাজটা তাহলে কী? দেখা যাচ্ছে পুরুষের প্রয়োজন কেবল গুণগত মান বজায় রাখার জন্য। সব পুরুষ ঘর-সংসার পায় না, স্ত্রী লাভের জন্য দাঙ্গা হাঙ্গামাও করতে হয় প্রচুর। তার মানে ঘর-সংসার

করতে পারে সেই পুরুষেরাই যারা বেঁচে থাকার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত।

প্রশ্নটা শুধু গায়ের জোরেরই নয়, যদিও ঘর গড়া ও তার চৌহদ্দিটা বজায় রাখার এবং নানা প্রজাতির প্রাণীদের পুরুষদের মধ্যে অবধারিত লড়াই-এর জন্য, গায়ের জোর না থাকলেই নয়। সন্তানেরা বিনা ব্যতিক্রমে বাবা-মায়ের মতোই হয়ে থাকে, তাই যেসব পুরুষ বেঁচে থকার জন্য বেশি উপযুক্ত তারা উন্নততর সন্তান উৎপাদন করতে পারবে।

পুরুষদের কাজ, এই যে গুণগত মান বজায় রাখা, এর জন্য তাদের সব দিকে নজর রাখতে হবে, পরিবেশে কী কী পরিবর্তন ঘটছে সেটা খেয়াল রাখতে হবে। এজন্য তাদের প্রথমত, জীবননির্বাহের জন্য স্ত্রীদের থেকে কম মানিয়ে নেবার ক্ষমতা থাকতে হবে। প্রাণধারণের অবস্থার সামান্যতম হানি অনুভব করবার ক্ষমতা তাদের থাকতে হবে। তার ওপর তাদের মধ্যে পরস্পরে বেশ কঠোরভাবে নানাবিধ বিচিত্র কর্তব্যের উপযোগী দল বিভাগ থাকতে হবে যার ফলে কেউ হয়ত আবহাওয়ার অবস্থান্তর লক্ষ্য করতে পটু, কেউ বা খাদ্য সংগ্রহে পারঙ্গম, আরো কেউ হয়ত শত্রুদমনে সুদক্ষ।

সাধারণ বিশ্বাসের বিপরীত হলেও, পুরুষই দুর্বলতর জাতি, স্ত্রী নয়। মানুষের বেলায়ও এই তথ্য খাঁটি সত্য। জীবৎকালের বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে সকল জাতির মানুষের মধ্যেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশি, পুরুষের থেকে। শতায়ুদের পরিসংখ্যান নিয়ে দেখা গেছে যে প্রতি একশ জনে ষাট জনই স্ত্রীলোক। তবে দীর্ঘজীবীদের চ্যাম্পিয়ন পুরুষই। সমস্ত দলটাকে ধরলে পুরুষেরা দুর্বল ঠিকই, কিন্তু তাদের মধ্যে মানের তারতম্য এত বেশি রয়েছে যে একজন বা দুজন চ্যাম্পিয়ন থাকবেই এই কথা মনে রাখলে সহজেই বুঝতে পারবে যে স্ত্রী ও পুরুষদের বুদ্ধিমত্তার স্তরের উচ্চ বা নিম্ন মান নিয়ে এক কালে যে তর্ক করা হোত সেটা কত নিরর্থক। আসলে স্ত্রীলোকদের মধ্যে অভিন্নতা এত বেশি, তারা সকলেই মোটামুটি একই মানের হওয়ার জন্য পৃথিবীতে উত্তুঙ্গ ব্যক্তিত্বের স্ত্রীলোক বেশি পাওয়া যায় না। কিন্তু সেই ঘাটতি পুরিয়ে নিতে জড়বুদ্ধি স্ত্রীলোকও অনেক কম পাওয়া যায় পুরুষের সঙ্গে তুলনায়।

অর্থাৎ দুটি লিঙ্গের অস্তিত্বের প্রধান কারণ হোল এই যে যথাযথ গুণমানবিশিষ্ট ও পর্যাপ্ত সংখ্যায় উত্তরাধিকারী রেখে যেতে হলে অন্য কোন উপায়েই সেটা সম্ভবপর হোত না।

দুটি লিঙ্গ থাকার আর একটা কারণ হোল এই যে এর ফলে বিবর্তন ত্বরান্বিত হয়েছে। অযোনিজ প্রজননের ক্ষেত্রে 'শিশু' আর তার মা যেন দুটি মটরদানা — 'শিশু'র সঙ্গে মায়ের কোন পার্থক্য থাকে না, যদি বা থাকে সেটা দৈবাৎ। অতএব অযোনিজ প্রজনন থেকে নতুন চরিত্রলক্ষণের উদ্ভব হয় কদাচিৎ, বা তার বিকাশ হয় অত্যন্ত বিলম্বিত লয়ে।

কিন্তু যখন একজন বাবা আর একজন মা থাকে, তখন ব্যাপারটা অন্যরকম। সন্তান উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু গুণাগুণ পায় বাবার থেকে, কিছু বা মায়ের থেকে। এখন আর পাইকারী হারে উৎপাদন নয়, প্রত্যেকটা প্রজন্মের উৎপত্তি হয় যেন একটা নিজস্ব ধাঁচা অনুসারে — যদি সেটা সফল হোল তাহলে অচিরেই নতুন, উন্নত চরিত্রলক্ষণগুলি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে।

বিবাহ এবং পরিবার

আমাদের গ্রহে প্রায় সকল প্রাণীই বংশবৃদ্ধি করে যোনিজ পদ্ধতিতে। এককোষী প্রাণীদের বেলায় যৌন আচারটা সীমিত থাকে দুটি কোষের মিলিত অবস্থায় নিউক্লিয়াসের পদার্থ বিনিময়ের মধ্যে।

দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ইনফিউসোরিয়া নামক পিচ্ছিল ক্ষুদ্র প্রাণীদের ক্ষেত্রে দুটি প্রাণী যখন যৌনআচার শুরু করতে যাচ্ছে তখন তাদের পেটের দিকটা পরস্পরের দিকে চেপে ধরে যাতে তাদের মুখের ছিদ্র দুটি একত্রিত হয়। সংযুক্ত প্রাণী দুটির প্রত্যেকের নিউক্লিয়াস এর পরে বার বার বিভাজিত হতে থাকে। সেই সঙ্গে তাদের ঘটে কতকগুলি পরিবর্তন, যার শেষে প্রত্যেকটা প্রাণীর থেকে যায় দুটি করে নিউক্লিয়াস, একটা অচল স্ত্রী, আর একটা চরমান পুরুষ — এই প্রক্রিয়াতে ক্রোমোসোমের সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যায়।

ইনফিউসোরিয়া এবার চরমান নিউক্লিয়াস বিনিময় করে, যাদের একটা করে আশ্রয়দাত্রীর অচল নিউক্লিয়াসের সঙ্গে মিশে যায় — এর ফলে প্রত্যেকটা প্রাণীতে এখন গড়ে ওঠে পূর্ণ ক্রোমোসোম সংখ্যা নিয়ে নতুন নিউক্লিয়াস। এককোষী প্রাণীদের যৌন মিলনের ক্ষেত্রে দুটি প্রাণী হতে পারে সম্পূর্ণ অভিন্ন, যেমন হয় ইনফিউসেরিয় গোষ্ঠীর পিচ্ছিল ক্ষুদ্র প্রাণীদের ক্ষেত্রে, প্রাণী দুটির মধ্যে কোন প্রকারের মিল নাও থাকতে পারে। ম্যালেরিয়া জীবাণু প্লাজমোডিয়া-দের কথা আগে বলা হয়েছে। এদের

মধ্যে দেখা যায় একেবারে অভিন্ন রেণু থেকে গড়ে ওঠা প্রভেদশূন্য অ্যামিবার মতো কয়েকটা প্রজন্মের পরে দশম বা একাদশ দিনে লিঙ্গযুক্ত একটা প্রজন্ম আসে যাদের পুরুষগুলি আকারে ছোট, স্ত্রীদের আকার বড়ো — এরা যৌন উপায়ে বংশবৃদ্ধি করে।

বহুকোষী প্রাণীদের আছে বিশেষ অঙ্কুরকোষ বা গ্যামেটস, যাদের মিলন বা আর একটু নির্ভুলভাবে বলতে গেলে নিষেক থেকে নতুন প্রাণীর উৎপত্তি হয়ে থাকে। প্রজনন প্রক্রিয়াটা এর ফলে অত্যন্ত জটিল হয়েছে — প্রকৃতিকে কত বিভিন্ন কৌশল উদ্ভাবন করতে হয়েছে স্ত্রী ও পুরুষ অঙ্কুরকোষের সফল মিলন ঘটাবার জন্য।

নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মিলনটা ঘটে মা-বাবার দেহের বাইরে, এবং দুটি অঙ্কুরকোষ একত্রিত হোল কিনা সেটা সুনিশ্চিত করতে বাবা-মাকে কষ্ট করতে হয় না। সন্তান উৎপাদন করতে চিন্তাহীন বাবা-মা অঙ্কুরকোষের একটা করে বিরাট ভান্ডার গড়ে তুলল, বাতাসে তাদের ছেড়ে দিল, গাছেরা যেমন পরাগ ছড়িয়ে দেয়। প্রাণীদের ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যাপারটা ঘটে জলে এবং সীমিত পরিসরে।

যৌন কোষগুলি দৈবাৎ মিলনের ঝুঁকি নেয় না। স্পারমাটোজোয়া বা পুরুষ অঙ্কুরকোষ সাধারণত স্বচ্ছন্দে চলা ফেরা করতে পারে, সময় সময় বেশ দ্রুতগতিতে তথাপি স্ত্রী-অঙ্কুরকোষকে নিষিক্তকরণ সুনিশ্চিত করতে পুংকোষগুলির স্ত্রী-অঙ্কুরকোষদের থেকে সংখ্যায় অনেক বেশি হওয়া চাই। এই প্রথায় প্রজনন করে থাকে শ্লথগতি তারামাছ, গায়ে-কাঁটা সী-আরচিন (sea-urchins) এবং সমুদ্রে বসবাসকারী আরো কতকগুলি প্রাণী।

দল বেঁধে বাস করছে যে সব জলজীবী প্রাণী তাদের অঙ্কুরকোষদের পক্ষে একের অন্যকে খুঁজে নেওয়া সহজ হয় কিন্তু সেটা সম্ভবপর করতে গেলে দুজনকে একই সময়ে একই জলে থাকতে হবে। কিন্তু সে ব্যবস্থা প্রাণীরা করে কী করে?

জীবের বিকাশের এই পর্যায়ে কেবল রসায়ণের ভাষাই একের অন্যের কাছে বোধগম্য হয়। কতকগুলি পদার্থ অঙ্কুরকোষের মধ্যে থেকেই হোক বা তাদের সঙ্গে মিশ্রিতভাবেই হোক জলে ঢালা হয়। এই পদার্থগুলি প্রাণীদের নিজেদের লিঙ্গের বা অপর লিঙ্গের শরীর থেকে যৌন পদার্থ নিঃসরণকে সঞ্জীবিত করে তোলে। একটা সংকেত পাওয়া গেলে সমস্ত দলটা প্রজননের কাজ শুরু করে দেয় এবং অসংখ্য পুং ও স্ত্রী-জীবকোষ একটা

নির্দিষ্ট জায়গায় একই সময়ে জমা হয়। সফল নিষিক্তকরণ এর ফলে সুনিশ্চিত হয়।

এই সহজ ভাষাটা অনেক দিন থেকেই অবগত আছে সেই বিশেষজ্ঞ-রা যারা শুক্তি পালন করে থাকে। তাই তারা শুক্তিদের 'আদেশ' দিতে পারে প্রজনন শুরু করতে। বছরের ঠিক সময়টিতে শত শত বা হাজার হাজার শুক্তির যৌন পদার্থ নিয়ে পালিত শুক্তিদের পুকুরে বা চৌবাচ্চায় ছেড়ে দেওয়া হয়। এর থেকে স্বচ্ছন্দে বসবাসকারী শুক্তিদের মধ্যে ব্যাপক হারে ডিম ছাড়া সঞ্জীবিত হয় ও তার পরে সেই ডিম পুং-অঙ্কুরকোষের দ্বারা নিষিক্ত হয়। কৃত্রিম উপায়ে সঞ্জীবিত অঙ্কুরকোষ বিমোচনের দরুণ শুক্তিচাষে উৎপাদন অনেক গুণ বেড়ে যায়।

মিলনঋতুতে, যেসব প্রাণীর জীবনযাত্রা চলমান তারা হয় জোড় বাঁধে কিংবা জমায়েত হয় ছোট বা বড় দলে। চলনশীল মাছদের পুরুষদের বিশেষ আচরণ ধারার কেবল একটাই উদ্দেশ্য — সেটা হোল স্ত্রী-মাছটা যাতে ডিম ছাড়ে, সে নিজেও অনতি পরেই নতুন-ছাড়া ডিমের ওপর তার পুংবীজ দেয় ছড়িয়ে।

উভচরদের বেলায় স্ত্রী-পুরুষের সংসর্গটা হয় আরো ঘনিষ্ঠ। ডিম ছাড়ার সময় আসন্ন হলে পুরুষ ব্যাঙ একটা সঙ্গিনী খুঁজে নেয়। সামনের দুটো পা দিয়ে স্ত্রী-ব্যাঙের কোমর জড়িয়ে ধরে এবং স্ত্রী-ব্যাঙ ডিম ছাড়া পর্যন্ত তাকে ছাড়ে না। কখনো কখনো পুরুষ আর স্ত্রী-ব্যাঙের মিলন হোল শুকনো ডাঙায়, জল থেকে খানিক দূরে। তখন স্ত্রী-ব্যাঙ এলোমেলোভাবে লাফ দিতে দিতে চলে জলের দিকে তার সন্তানের পিতাকে পিঠে নিয়ে। পুরুষটা স্ত্রী-ব্যাঙের পিঠ থেকে নামে না ডিম ছাড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত। এর সুবিধে হোল এই যে তার পুংবীজ স্ত্রী-ব্যাঙের ডিমের ওপর পড়ে, ডিম ছাড়ার কালে।

উচ্চতর প্রাণীদের ক্ষেত্রে অঙ্কুরকোষগুলি মিলিত হয় মায়ের শরীরের অভ্যন্তরে এবং উভয় লিঙ্গের প্রাণীদেরই আছে বহিস্থ প্রজনন যন্ত্র। অঙ্কুরকোষগুলির মিলিত হওয়া নিশ্চিত করতে স্ত্রী ও পুরুষ ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসে যার নাম হোল সঙ্গম।

অধিকাংশ প্রাণীই মিলিত হয়ে থাকে প্রাণীটার প্রজাতি অনুসারে এক একটা বিশেষ ঋতুতে। এর কারণ হোল এই যে ঠিক সেই সময়েই স্ত্রী-প্রাণীটার শরীরে পরিপুষ্ট গর্ভকোষ তৈরি হয়েছে। এবং তাদের জীবনের

অন্য সময়ে শরীর বংশবৃদ্ধির জন্য তৈরি থাকে না, ভ্রূণের বিকাশের নিশ্চয়তা থাকে না। উষ্ণ রক্তের প্রাণীদের পুরুষেরা সারা বছরই সঙ্গম করতে সক্ষম থাকে কেবল কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া, যেমন হরিণ যাদের শরীরে পুংবীজ থাকে কেবল মিলন ঋতুতেই। নিঃসন্দেহে, সন্তানোৎপাদন একটা বিশেষ ঋতুতেই সম্ভব হওয়ার ব্যবস্থাটা ভালই কারণ অন্য ঋতুতে সন্তান জন্মালে, যে সময় হয়ত পরিবেশ প্রতিকূল তাদের বৃদ্ধি ও পুষ্টির পক্ষে, তাই সেই সন্তান হয়ত বাঁচবেই না।

কতকগুলি প্রজাতির প্রাণী সঙ্গম করতে পারে সারা বছর কিন্তু মিলন সফল হয় যদি স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের শরীরে পুষ্ট অঙ্কুরকোষ থাকে। মানুষের ক্ষেত্রে সারা বছরে তেরটি এমনি সময় আসে কিন্তু প্রত্যেকটি ঋতুকাল স্থায়ী হয় মাত্র 24 ঘণ্টা। স্ত্রীলোকের গর্ভসঞ্চার সম্ভবপর হতে পারে কেবল এই তের দিনেই।

আভ্যন্তরিক নিষিক্তকরণ সব সময়ে যে সঙ্গমের ফলেই হয় তা কিন্তু নয়। অনেক পতঙ্গ, লেজযুক্ত ব্যাঙ (newts), অ্যাকসোলটল্ (axolotl), সালামানডার এবং আরো কতকগুলি প্রাণী আছে যারা কিন্তু সঙ্গম বলতে যা বোঝায় তা করে না। পুরুষটা পাড়ে একটা পুংবীজ-থলি (spermatophore)। এর পরে হয় সে নিজে নয় তো স্ত্রী তার যোনিপথে সেটা তুলে নিয়ে রাখে। অনেক সময় পুংবীজ থলির গলাটা মাত্র প্রবিষ্ট করা হয়ে থাকে এবং তার একটা ছিদ্র দিয়ে পুংবীজ প্রবেশ করে স্ত্রীর যোনি পথে। পুংবীজ থলি যাতে পড়ে না যায় তার জন্য আঁকড়ে ধরবার বিশেষ প্রত্যঙ্গ আছে। এই প্রত্যঙ্গগুলির সাহায্যে অথবা পুরুষের শরীরস্থ বিশেষ গ্রন্থি থেকে নিঃসরিত চটচটে পদার্থ পুংবীজ থলিটাকে স্ত্রীর শরীরে আটকে রাখে। অনেক স্ত্রী-পতঙ্গ খালি হয়ে যাওয়া পুংবীজ থলিটা খেয়েই ফেলে।

কতকগুলি পতঙ্গের ক্ষেত্রে পদ্ধতিটা আরো সরল। পুংবীজ নিঃসরণ হলে পুরুষ পতঙ্গটা তার মুখের সংলগ্ন প্রত্যঙ্গের সাহায্যে সেটা তুলে নিয়ে স্ত্রী-পতঙ্গের যোনি পথে রেখে দেয়।

পুরুষের সঙ্গম-যন্ত্র আর স্ত্রীর যোনিছিদ্র শরীরের নানা স্থানে থাকতে পারে, পায়ে, মাথায় বা অন্য কোন অঞ্চলে। বাগানের মাকড়সা চোয়ালের সংলগ্ন একটা প্রত্যঙ্গের তীক্ষ্ন প্রান্তটাকে সঙ্গম-যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। মিলিত হবার পূর্বে মাকড়সাটা একটা জাল বুনে পুংবীজ রাখে সেই জালে।

তার পর এই চোয়ালের সংলগ্ন প্রত্যঙ্গের একটা বিশেষ অংশে সে এক ফোঁটা পুংবীজ তুলে নেয়, যেন একটা পিপেট (pipette) দিয়ে তুলে নিল। এখন সে সঙ্গমের জন্য তৈরি।

গেঁড়ির মাথায় থাকে তার সঙ্গম-যন্ত্র। অকটোপাসের আটটা শুঁড়ের একটাতে থাকে পুংবীজ, সঙ্গমের কালে যেটা সে স্ত্রীর যোনিপথে প্রবিষ্ট করেদেয়। বিস্ময়ের কথা এই যে পুং বীজবাহী এই শুঁড়টা আকটো-পাসের শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকতে পারে।

আগে মনে করা হোত এই শুঁড়গুলি বুঝি স্বতন্ত্র প্রাণী, নামও তাদের দেওয়া হয়েছিল হেটরোকর্টিলিয়া। কেউ সন্দেহ করেন নি যে এরা আসলে শিরঃপাদ কম্বোজ গোষ্ঠীর শরীরেরই একটা অঙ্গ। স্ত্রী-অকটোপাসের দেখা পেলে হেটরোকর্টিলিয়া সাঁতার দিয়ে পৌঁছে যায় তাদের যোনিপথে এবং তার মধ্যে নিংড়ে দেয় পুংবীজ।

কতকগুলি স্ত্রী-পতঙ্গের যোনিদ্বার বলতে বিশেষ কোন ছিদ্র নেই। পুরুষ পতঙ্গটা তার তীক্ষ্ম সঙ্গম-যন্ত্র স্ত্রীর শরীরের যে কোন জায়গায় প্রবিষ্ট করে পুংবীজ নিঃসরণ করে। পুংবীজ স্ত্রীর দেহাভ্যন্তরের মধ্যে ফাঁক ফোকর দিয়ে চলতে চলতে পৌঁছায় ডিম্বকোষে। রোটিফার (Rotifers) আর জোঁকেরা এই পদ্ধতির প্রয়োগ করে থাকে কিন্তু তারা পুংবীজ থলিটাকেই ঠেলে ঢুকিয়ে দেয় স্ত্রীর শরীরে।

সঙ্গম প্রক্রিয়াটা স্থায়ী হতে পারে কয়েক সেকেন্ড থেকে কয়েক দিন। ব্যাঙদের ঝুটো সঙ্গম তিন দিন পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। প্রজাপতিদের বেলায় সঙ্গম স্থায়ী হয় কয়েক ঘণ্টা, পুরুষটা বিশেষ চটচটে একটা পদার্থ নিঃসরণ করে যেটা কিছুক্ষণের মধ্যেই হাওয়া লেগে কঠিন হয়ে যায়, স্ত্রীর দেহের সঙ্গে এর সাহায্যে পুরুষটা বেশ পাকাপোক্তভাবে লেগে যায়।

কখনো কখনো সঙ্গমে থাকে বিপদের ঝুঁকি। যেমন ধরো পুরুষ মাকড়সা স্ত্রীর দিকে এগোয় চোরের মতো। স্ত্রী যদি তাকে দেখতে পায় তো তক্ষুণি নির্ঘাত তাকে তেড়ে এসে খেয়েই ফেলবে। সঙ্গমের শেষেও স্ত্রীরদ্বারা ভক্ষিত হবার নিয়তি এড়াতে পারে মুষ্টিমেয় দু'একটা ভাগ্যবান পুরুষ। সঙ্গম চলা কালেও পুরুষের প্রাণ সংশয়ের সম্ভাবনাটা থেকে যায় তাই কয়েক জাতের মাকড়সা তাদের সামনের পায়ের বিশেষ আংটা দিয়ে স্ত্রীর মুখ প্রাণপণে চেপে ধরে থাকে। আশ্চর্য কি, দাক্ষিণাঞ্চলের অনেকজাতের মাকড়সার মধ্যে পুরুষেরা সংখ্যায় স্ত্রীদের থেকে কয়েক দশগুণ বা এমনকি

কয়েক শত গুণ বেশি। এত বেশি সংখ্যায় পুরুষ আছে বলেই বেপরোয়া কয়েকজনকে পাওয়া যায় যারা সঙ্গমের ঝুঁকিটা নিয়ে ফেলে।

কতকগুলির প্রাণীর ক্ষেত্রে সঙ্গম মানে একটি সঙ্গীর অবধারিত মৃত্যু। পুরুষ মৌমাছি, মানে যেটা স্ত্রী লাভ প্রতিযোগিতার ওড়ার কালে প্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়ে দিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গমে মিলিত হয়, সঙ্গমের শেষেই তার মৃত্যু হয়। হাত-জড়ো-করা ম্যানটিস (The praying mantis)-স্ত্রী সঙ্গমের মধ্যেই পুরুষটাকে খেতে থাকে, মুড়োটা দিয়েই আরম্ভ করে।

একজাতের পলিকিটাস (Polychaetous) পোকার মিলন অভ্যাসটা আরো দুঃখজনক। এরা ঠিক সঙ্গমে মিলিত হয় না। পুরুষটা স্ত্রীর মুখের মধ্যে পুংবীজ ত্যাগ করে। তার পরে স্ত্রীর শরীরটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলে, যার ফলে ডিমগুলি পুংবীজ-নিষিক্ত হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

কয়েক জাতের প্রাণী আছে যাদের প্রজননটা যোনিজ পদ্ধতিতেই হয়। কিন্তু তারা ঠিক ঘর-সংসার পাতে না। সত্যি করে বলতে গেলে গৃহস্থালি পাততে হয় শুধু বাচ্চাদের পালন, পোষণ, রক্ষা আর শিক্ষার প্রয়োজনে এবং সন্তানেরাই নির্ধারন করে ঘর-সংসার হবে কোন ধরনের।

প্রায়ই বাপ-মা তাদের কাজকর্ম ভাগ করে নেয়, কার কাজ কোনটা সেটার এমন কড়াকড়ি যে বাচ্চাদের খাইয়ে দাইয়ে বড়ো করে তোলা সম্ভব কেবল মাত্র যৌথ প্রচেষ্টায়। চড়ুই-বাজ-এর বাসাতে ডিম ফুটে বাচ্চারা বেরিয়ে এলেও কিন্তু মা বাসা ছেড়ে বাইরে আসে না, বাচ্চাদের আগলায়, তাদের ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচায়। বাবার কাজ হোল মায়ের আর বাচ্চাদের জন্য খাবার খুঁজে আনা। সারা দিন ধরে সে শিকার করে বেড়ায় খাবার নিয়ে এসে পৌঁছে দেয় স্ত্রীর কাছে। (অনেক প্রাণী আছে যারা বাবাকে বাসাতে ঢুকতেই দেয় না)। বাবা জানেই না শিকার করা খাদ্যকে কেমন করে ছাড়িয়ে টুকরো করে বাচ্চাদের উপযোগী করে নিয়ে তাদের খাওয়াতে হয়।

পরিবারের বাবাটা হয়ত মরে গেল, মা যদি অভিজ্ঞা হয় তাহলে বাচ্চাদের বড়ো করে তুলতে হয়ত পারবে, যদিও খাদ্য খুঁজে বাসায় নিয়ে আসার অভ্যাস তার নেই।

কিন্তু কোন পরিবারে মায়ের যদি মৃত্যু ঘটে, তাহলে সেই দুর্ভাগা সন্তানেরা উপোস করে মরে যাবে। বাবা আগের মতোই খাদ্য খুঁজে বাসার গোড়ায় এনে রাখবে, কিন্তু বাচ্চাদের খাওয়াবার চেষ্টাই করবে না।

বিচক্ষণ মা-বাবার গার্হস্থ্য জীবনটা দীর্ঘস্থায়ী হয়, অনেক সময় আমৃত্যু। টিঁকতে পারে বিবাহবন্ধন। তার মানে এই নয় যে স্ত্রী ও স্বামীর মধ্যে বিচ্ছেদ কখনো হবে না। প্রাণীদের মধ্যে সেরকম জুটির দেখা মেলে দৈবাৎ। স্বামী-স্ত্রী একত্রে থাকে সাধারণত যখন তাদের ভাবতে হয় সন্তানের কথা। এমনটি প্রায়ই ঘটতে দেখা যায় ভ্রাম্যমান পাখিদের মধ্যে। তাদের শীত যাপনের দেশে পুরুষ আর স্ত্রীরা আলাদা বাস করে। এক দেশ থেকে অন্য দেশে উড়ে যাবার কালেও স্বামী-স্ত্রী দূরে দূরে থাকে, যেখানে তাদের ঘর-সংসার সেই দেশে এসেই তারা একত্রে বসবাস করে।

বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, যেসব প্রাণী বিবাহ করে সারা জীবনের জন্য, একত্রে বসবাস তারা করে পরস্পরের প্রতি গভীর আকর্ষণের জন্য নয়, বরং বাসার প্রতি উভয়ের টানের জন্যই। এমনকি সারস-এরাও, যাদের প্রবাদ বাক্যের মতোই খ্যাতি আছে সৎ দাম্পত্য জীবনের, নিঃসংকোচে তারাও দুম্ করে এনে ফেলে আরেকটা বৌ। বসন্ত ঋতুর সমাগমে পুরুষটাই আগে বাসায় ফিরে আসে। তখন হয়ত কম বয়সী নতুন একটি স্ত্রী এলো তার সঙ্গে, সে তাকে সাদরে গ্রহণ করল। দু'দিন বাদে বাড়ির আসল কর্ত্রী যখন ফিরে আসে কর্তামশাই তখন দুই স্ত্রীর চুলোচুলি উদাসীনভাবে দেখে যান। কোন্দলে যে জয়ী হোল সে-ই হবে তার গিন্নি।

গার্হস্থ্য জীবনের ধরন অন্যরকমের হয় সেইসব ক্ষেত্রে যেখানে সন্তানেরা সবল ও স্বনির্ভর হয়ে জন্মায়। এসব ক্ষেত্রে মা-বাবা দুজনকে বাচ্চাদের যত্ন নেবার দরকার পড়ে না। গার্হস্থ্য জীবনধারা বিচিত্র রকমের হতে পারে। কোন এক বসন্তের প্রভাতে এক ঝাঁক পুরুষ-আড়ট্যাংরা মাছ হয়ত ফিরে এলো তার শৈশবের ডিম-ফুটে-জন্মানোর স্থানে। ঝাঁকটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল, প্রত্যেকটা মাছ জলের তলায় খুঁজে নিল একটা করে কোণ, জায়গাটা পরিষ্কার করে নিয়ে জলজ উদ্ভিদের শিকড় দিয়ে বাঁধল সেখানে বাসা।

সব মাছই যে যেখানে সেখানে ডিম ছেড়ে দেয় তা নয়, অনেকে ভারি বিচিত্র, জটিল বাসা বাঁধতে পারে।

বাসা বাঁধা হলে, পুরুষেরা প্রতীক্ষা করতে থাকে স্ত্রীদের জন্য। তারা আসে, ডিম পেড়ে যায়, বেড়াতে বেড়াতে চলে যায়, যেন কিছুই হয় নি। ডিমগুলি রক্ষা করতে পুরুষটা থেকে যায় বাসাতে, কিন্তু ডিম ফুটে বাচ্চারা বেরিয়ে এলে বাসা ছেড়ে সে বাইরে আসে, নিজের সন্তানদের খেয়ে যে

ফেলে না তার কারণ আকৃতিতে এই সন্তানেরা এতই ছোট যে তাদের ধরে খাওয়ার পরিশ্রমটা মজুরীতে পোষায় না।

মাছদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় ঘর সংসার দেখে পুরুষেরা এমনি অস্বাভাবিক পরিবার পাখিদের মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়। ফ্যালারোপিসদের (phalaropes) ছোট স্ত্রী-পাখির ডিম পেড়েই কাজ শেষ। বাপের ওপর তা দিয়ে ডিম ফুটিয়ে খাইয়ে দাইয়ে বড় করে তোলার ভার।

হেমিপোডিস (hemipodes) পাখিদের পরিবার আরো বিচিত্র, এরা থাকে সোভিয়েট ইউনিয়নের পূর্বপ্রান্তে। বসন্তকালে, মিলন ঋতুতে আর পাঁচটা আত্মসম্মানযুক্ত পাখির মতো স্ত্রী-পাখি বাসা বাঁধে, গোটা চারেক ডিম পাড়ে, তার পর পুরুষের ওপর তদারকির ভারটা দিয়ে সরে পড়ে। তার পর সে আবার বাসা বাঁধে, খুঁজে নেয় আরেকটা পুরুষ সঙ্গী, আরো কয়েকটা ডিম পেড়ে আবার পালায়। এমনি সে করে থাকে বার কয়েক।

বহুপতিত্ব (এক ধরনের বিবাহ যেখানে স্ত্রীর থাকে দুই বা ততোধিক স্বামী) খুব বেশি দেখা যায় না, তবে বহুদার পরিগ্রহ (অর্থাৎ একটি পুরুষের দুই বা তার বেশি স্ত্রীথাকা) বেশ ব্যাপকভাবে চালু আছে। বলশালী পূর্ণবয়স্ক সীল আর সিন্ধু-সিংহদের (see lions) থাকে বড়ো সড়ো অন্তঃপুর যেখানে কয়েক কুড়ি স্ত্রী বাস করে। বহুবিবাহের চলন বাঁদরদের মধ্যে আর কিছু পাখি আর বিশেষ করে হাঁস-মুরগীর পুরুষদের মধ্যে বেশ ব্যাপক।

অনেক সময় বাবা-মা নিজেদের সন্তানদের দেখাশোনা করে না। মা খুঁজে বার করে একজন ধাত্রীকে বা আরো নির্ভুলভাবে বলতে গেলে পালিকা বাবা-মাকে এবং সন্তানদের রেখে দেয় তাদেরই হেফাজতে। আছে অনেক জাতের ধূর্ত পাখি। কোকিলদের অন্তত পঞ্চাশটা প্রজাতি আছে যারা অন্য পাখির বাসায় ডিম পাড়ে। আছে দশটি প্রজাতির মৌসন্ধানী, চারটি প্রজাতির বাবুই আছে আফ্রিকাতে, আমেরিকার বৃষ-ঠোকরা, এরা সবাই করে ওই একই কর্ম।

কোকিলদের কুখ্যাতি এত বেশি ছড়িয়েছে যে, যেসব স্ত্রীলোক নিজের বাচ্চাদের মানুষ করে তুলতে চায় না তাদের কোকিল বলা হয়ে থাকে, কোকিলদের অন্য পাখির বাসাতে ডিম পেড়ে রেখে আসার অভ্যাসের কথা ভেবে। বেচারা পাখিটাকে দুষবে সবাই কিন্তু সেই কারণটা কেউ খুঁজে দেখবে না যে কেন এই অসুখী পাখিটা এমন আচরণ করে থাকে।

বর্তমান কালে সকলেই নিশ্চিতরূপে জানে যে কোকিলদের পূর্বপুরুষদের আত্মসম্মানজ্ঞান ছিল, তাদের স্ত্রী-পাখিরা সুগৃহিনীর মতোই ঘরবসত করত। শুধু তাই নয়, বর্তমান যুগেও কিছু কোকিল আছে যারা বাবা-মা হিসেবে খুবই বিবেকজ্ঞান সম্পন্ন। বসন্তকালে, মিলনের পরে তারা বাসা বাঁধে, ডিম পাড়ে, পালাক্রমে তা দেয়, তাই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া করে না, বাচ্চাদের খাওয়ায়। এমনি আচরণবিধি মেনে চলে আমেরিকার মাঠের কোকিল আর ভারত-শ্রীলঙ্কার তীক্ষ্ন-নখ কোকিল।

আধুনিক যুগের কোকিলদের পূর্বপুরুষেরা বাবা-মায়ের শ্রমসাধ্য কিন্তু আনন্দদায়ক কর্তব্যগুলিতে অবহেলা করা শুরু করল কী কারণে? হয়ত বা বাসস্থানের সমস্যা ছিল, অর্থাৎ কোন এক কালে হয়ত বাসা বাঁধবার উপযোগী জায়গার হয়েছিল অসঙ্কুলান। হাঁসের তো কত সুনাম পাখিদের মধ্যে ভাল গিন্নি, যত্নশীল বাবা-মা বলে, তবে তারা কেন বাসা তৈরি করার জায়গা না পেলে আত্মীয়দের বাসায় গিয়ে ডিম পেড়ে আসে? শুধু তারাই বা কেন, সিবাশ হ্রদের বাসিন্দা মালার্ড, সোনালি চোখ আর শেলড্রেক হাঁসেরাও তো এমনি করে থাকে।

বাসা বাঁধা নিয়ে পরজীবীভাব হাডসন উপসাগরের পশ্চিম উপকূলে ব্যাপকভাবে চালু আছে। সেখানে এক লক্ষ নীল রাজহাঁস প্রত্যেক বছর আসে বাসা করতে। তার মানে অন্য পাখিদের বাসা বাঁধবার আর জায়গাই থাকে না, বিশেষত গ্রীষ্মের প্রথম দিকে বরফ তখনও গলে যায় নি। কানাড়ার রাজহাঁসেরা যখন নিজেদের গৃহহীন লক্ষ্য করে তখন তারা আইডার আর নীল রাজহাঁসের বাসায় ডিম পাড়ে, আইডারেরা (eiders) ব্রান্টদের বাসায় ডিম পাড়ে, উইলো ঝোপের কাদাখোঁচারা তাদের ডিমগুলি রেখে আসে নীল হাঁস বা সুচালো-লেজদের বাসায়। অন্যের বাসায় ডিম পাড়া মানে ডিমগুলি নষ্ট হওয়া। কেবল মাত্র নীল হাঁস আর ব্রান্ট-এরা অন্যের বাচ্চা পালন করতে পারে।

কদাচিৎ পরজীবীত্ব থেকে অচিরেই এসে যেতে পারে পাকাপাকি অভ্যাস। দক্ষিণ আমেরিকার কালোটুপিরা ঘর বাঁধার অভ্যাস একেবারেই ছেড়ে দিয়েছে, বাসা কখনোই বাঁধে না, ডিমগুলি অন্য পাখির বাসার আশে পাশে ছড়িয়ে রেখে আসে। তাদের ভ্রুক্ষেপ নেই যে পালক পিতামাতারা তাদের বাচ্চাদের যত্ন নিতে পারবে কি না। এই কালোটুপি হাঁস অবলুপ্ত হয়ে যায়

নি তার কারণ এই যে এত বেশি সংখ্যায় ডিম তারা পেড়ে থাকে যে কিছু না কিছু বাচ্চা পালিত হয়ে বড়ো হয়ে উঠবেই।

বাসার সমস্যা দূর করতে কোন কোন পাখি আলাদা আলাদা বাসার বদলে হস্টেল বানায়। দক্ষিণ আমেরিকার কোকিল আনি-রা (আনি, আনি, আনি স্বরে তারা ডাকে তাই এই নাম) ছোটখাট একটা দল বেঁধে মস্ত বড়ো এক গভীর বাসা তৈরি করে। তার পর স্ত্রী-কোকিলেরা সেই বাসাতে ডিম পাড়তে থাকে। 15, 20 বা কখনো কখনো 50 টা ডিম একত্রে থাকতে পারে। ডিমপূর্ণ এই বিরাট ঝুড়িটাতে কয়েকটা পাখি একসঙ্গে তা দেয়, পালা করে সবাই মিলে। পুরুষেরা স্ত্রীদের সঙ্গে সমান পরিশ্রম করে।

খুবই স্বাভাবিক যে বড়ো দলের মধ্যে দু'একজন কুঁড়ে থাকবেই, যারা সংসারের কাজে ফাঁকি দিয়ে থাকে, যেন ডিম পাড়া হয়ে গেলেই আর কিছু করতে হবে না। যারা এমনি সহজ জীবন ভোগ করতে চায় তারা অন্য একটা আনির দলে বেড়াতে গিয়ে কয়েকটা ডিম পেড়ে আসে, যেন উপহার দিচ্ছে। তবে আনিদের পরজীবীত্ব নিজেদের প্রজাতির, মধ্যেই সীমাবদ্ধ তারা কখনো অন্য জাতের পাখির বাসায় ডিম পাড়ে না।

আর একটা প্রজাতি, গুইরা কোকিল, নিজেদের আলাদা আলাদা বাসা বাঁধে, ডিম পাড়ে, নিজেরা তা দেয়। কিন্তু মধ্যে মধ্যে কোন কোন গুইরার কুঁড়েমি এসে যায় — এটা প্রায়ই ঘটে — তখন সে অন্য একটা গুইরার বাসা খুঁজে নিয়ে সেখানে ডিম পেড়ে আসে।

হলদে-ঠোঁট কোকিলেরা বংশবৃদ্ধি করতে আসে উত্তর আমেরিকাতে। গ্রীষ্মের শুরুতে এক জোড়া পাখি বড়ো সড়ো একটা বাসা বুনে ফেলে, স্ত্রী-পাখি সেখানে এক একে প্রায় দশটা ডিম পাড়ে — দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে। এমনি বিবেচনাহীন ডিম পাড়ার ফলে বাচ্চা আর সদ্য-পাড়া ডিম একই বাসায় থাকা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। কখনো কখনো বাচ্চার যত্ন নিতে এত সময়, এত রিশ্রম ব্যয় করতে হয় যে তখনো যেসব ডিম পাড়া বাকি রয়েছে তাদের তা দেওয়া হয়ে উঠবে না। হলদে-ঠোঁট কোকিল তাই কোন পড়শীর বাসায় ডিম পেড়ে আসে, মানে অন্য জাতের পাখির বাসাতে। লাল-চক্ষু কোকিলদের আচরণও অনুরূপ। কালোটুপিদের মতোই তারা তাদের সন্তানদের পালক বাবা-মা হিসেবে নির্দিষ্ট কোন জাতের পাখিকে বেছে নেয় নি।

আরো এক জাতের কোকিল আছে যারা বাসা মোটেই বানায় না। তার

বদলে তারা নজর রেখে চলে কোন ভিন্ন জাতের পাখির বাসা বাঁধার প্রচেষ্টা, যারা বেশ আরামদায়ক মজবুত বাসা তৈরি করতে পারে। বাসা তৈরি হয়ে গেলে কোকিলটা তৈরি বাসাটা দখল করে নিতে একটুও লজ্জা বোধ করে না। তবে তাদের ধিক্কৃত আচরণের এখানেই সমাপ্তি হয় — এখন থেকে তাদের আচরণ যে কোন শ্রদ্ধাভাজন পরিবারের মতোই। এই কোকিলেরা ডিমে তা দেয় বাচ্চাদের পালন পোষণও করে।

আফ্রিকার বড়ো বড়ো বুটিদার কোকিলেরা (আফ্রিকাতে বেশ কয়েক জাতের কোকিলের বাস) ডিমে তা দেওয়া থেকে শুরু করে বাচ্চা বড় করে তোলা এই সব দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দেয় পালক বাবা-মার ঘাড়ে। বাচ্চাদের ডানা গজবার পরে যখন তারা বাসা ছেড়ে দেবার উপেযাগী হয়, কেবল তখনই তারা বাচ্চাদের বোর্ডিং থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে নিজের ধারায় পালন পোষণ করে থাকে। কোকিলেরা বহুকাল আগে থেকে জেনে নিয়েছে যে ধাত্রী হিসেবে কোন পাখি সব চেয়ে উপযোগী এবং জুৎসই বাসা না পাওয়া পর্যন্ত তারা ডিম পাড়বেই না। সবশেষে, বাকি যেসব কোকিল, যেমন সাধারণ কোকিলেরা যারা রাশিয়াতে বাস করে তারা তাদের ডিম পেড়ে রাখে অপেক্ষাকৃত ছোট পাখিদের বাসাতে, সন্তানদের কী হোল সে বিষয়ে ভ্রূক্ষেপও করে না। বাসাটা কিন্তু নির্বাচন করে নেয় খুব যত্ন করে। সাধারণ কোকিলেরা হয়ত দেখা যাবে অন্তত দেড়শ প্রজাতির পাখির সহায়তা নিয়ে থাকে, তার মানে কিন্তু এই নয় যে স্ত্রী-পাখি যে কোন একটা বাসা পেলেই মহানন্দে সেখানে ডিম পেড়ে রাখবে।

কোকিলের ডিম হয় নানা রঙের। প্রত্যেক স্ত্রী-পাখি এমন একটা পাখির বাসা খোঁজে যাদের ডিমের রং নিজের ডিমের অনুরূপ। এর কারণ হয়ত এই যে স্ত্রী-পাখিটা নিজেই হয়ত জন্মেছিল এমনি একটা বাসায় সদৃশ ডিমের সঙ্গে।

বেশির ভাগ কোকিল একটা করেই ডিম রেখে আসে অন্য পাখির বাসাতে। তাই দুটো বাচ্চা হয়ত একই বাসাতে ডিম ফুটে বেরিয়ে এলো কোন ছোট পাখির বাসাতে, তার মানে তারা কিন্তু সহোদর নয়, তবে তাদের বাবা একজনও হতে পারে। রাশিয়ার কোকিলেরা কখনোই একই বাসাতে দুটো ডিম পাড়ে না — আবার অন্যদিকে আফ্রিকার বড়ো বড়ো বুটিদার কোকিল আর পশ্চিম ইয়োরোপের কোকিলেরাও একই বাসাতে দুটি থেকে চারটি ডিম পেড়ে থাকে। তারা তাদের ধাত্রী-পালক প্রশিক্ষক হিসেবে কাক

জাতীয় পাখিদের বেছে নেয় এবং এই কারণেই এই ছোট পাখিদের ডিমগুলি অন্য জাতের কোকিলের ডিম থেকে আকারে বড়ো।

বাসা নির্বাচন করা মজার ব্যাপার মোটেই নয়। প্রথমত দেখতে হবে যে বাসার মালিক জালিয়াতিটা ধরতে যেন না পারে। রেন (wrens) আর ওয়ারব্‌লার (warblers)-এরা তাদের বাসাতে ভিন্‌ জাতের পাখির ডিম দেখলেই নিজেদের কয়েকটি ডিম সহ বাসাটা ত্যাগ করে। রীডওয়ারব্‌লার আর রেড স্টার্ট-এরা আর একটু মিতব্যয়ী প্রাণী। তারা বোঝে যে কোকিলদের জন্য বারবার বাসা তৈরি করা যায় না। তাই তারা যে ডিমগুলি পাড়া হয়ে গেছে তারই ওপর আর এক দফা বিছানা পাতে, নতুন করে ডিম পাড়ে সেই বিছানায়। অনেক পাখি আছে যারা ভিন্‌ জাতের পাখির ডিম নিজের বাসায় দেখলেই ফেলে দেয়। তাই সাধারণ কোকিলেরা এমন একটা বাসা বেছে নেয় যেখানে সবগুলি ডিম পাড়া শেষ হয় নি বা বাসা থেকে ডিম ফেলে দিয়ে জায়গা করে নেয় নিজের ডিম পেড়ে রাখার জন্য।

যখন তারা বেশ বড়ো বড়ো মজবুত বাসা খুঁজে পায় কোকিলটা সেখানে বসেই একটা ডিম পাড়ে। নির্বাচিত বাসাটা যদি ছোট হয় বা তার ছাদ থেকে বা যদি সেটা হয় গাছের গুঁড়ির কোন ফাটল বা গর্ত যেখানে ঢোকা যাবে না, তাহলে কোকিলটা ডিমটাকে ঠোঁটে করে নিয়ে এসে ঢুকিয়ে দেয় সেই বাসাতে। পালক বাবা-মা নিজদের বাচ্চার সঙ্গে এই উড়ে-এসে জুড়ে-বসা বাচ্চার প্রভেদটা ধরতে পারে না। সদ্য ডিম ফুটে বেরিয়ে আসা কোকিল ছানাদের তাদের বৈমাত্রীয় ভাইবোনদের মতোই দেখতে, গলার আওয়াজও একই রকম। শুধু তাই নয় জার-কোকিলদের বাচ্চার মুখের দাগগুলি আর মুখের কোণের গর্তগুলিও এক রকমের হয়ে থাকে।

একটা ভিন্‌জাতের বাড়িতে টিঁকে থাকতে হলে বাচ্চা কোকিলকে কেবল সৎ-ভাইবোনদের মতো দেখতে হলেই চলবে না, তাকে হতে হবে অত্যন্ত তীক্ষ্নবুদ্ধি, চটপটে, কর্মদক্ষ। কোকিলের ডিমগুলি ফুটে বাচ্চা হয়ে বেরিয়ে আসতে হবে পালিকা মায়ের ডিমগুলির থেকে কিছু জলদি। তাছাড়া বাচ্চা কোকিলকে বড় হয়ে উঠতে হবে খুব তাড়াতাড়ি। তবে আরো সহজ একটা উপায় আছে প্রতিদ্বন্দ্বীদের সরিয়ে দেবার, বাচ্চা কোকিলেরা বাসা থেকে ডিম বা অন্য বাচ্চাকে ফেলে দিতে পারে, ঠিক এই কাজটি করে থাকে রাশিয়াতে বসবাসকারী কোকিলদের বাচ্চারা। বৃষ-ঠোকরা (ox—peckers)

এরা তাদের নিজেদের বাচ্চাদের এই ব্যাপারে সাহায্য করে থাকে। তারা পালিকা মায়ের ডিমগুলি ভেঙে দেয় তাই কুড়িয়ে পাওয়া ছেলেটাই হয়ে ওঠে বাড়ির একমাত্র আদরের নিধি।

বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের কোকিলেরা ছোট পাখিদের মোট বাসস্থান যত আছে তার শতকরা দুই থেকে চার অংশ খুঁজে নিয়ে কাজে লাগায়, কিন্তু কেবল জলপিপি-এরাই বলতে পারে যে তাদের বাসায় পালিত কোকিল-শাবকদের মধ্যে শতকরা 76 ভাগ রক্ষা পায় — অন্য পাখিদের বাসায় পালিত কোকিল ছানাদের অর্ধেক মরে যায়।

খুব পারদর্শী জোচ্চোর হতে গিয়ে বা বাসার ব্যাপারে পরজীবীত্ব-এর জন্য জরুরী দক্ষতাগুলি অর্জন করতে কোকিলদের উন্নতির একটা দীর্ঘ সড়ক পেরিয়ে আসতে হয়েছে। তাদের পদ্ধতিগুলি এখনো তারা উন্নততর করে চলেছে। আমেরিকার বৃষ-ঠোকরা-এরা (এরা কোকিল বর্গের পাখি নয়), সম্প্রতি শিখেছে কেমন করে সাদা-ঝুঁটি চড়ুইদের বাসাতে তাদের বাচ্চাদের পালন করিয়ে নিতে হবে — এই বাসাগুলি তারা এর আগে কখনো ব্যবহার করত না।

কয়েকটি প্রজাতির পাখি আছে যারা তাদের বাচ্চাদের পালন করে যৌথভাবে। কুমেরু অঞ্চলের সম্রাট-পেঙ্গুইনেরা তাদের বাচ্চাদের নিয়ে যায় একটা কিনডারগার্টেনে যেখানে তারা নিজেদের বয়সের অন্যান্য পেঙ্গুইন শিশুদের সঙ্গে সারা দিনটা কাটায়, এদিকে মা-বাবারা তখন মাছ ধরে। বাচ্চারা একত্রে মানুষ হচ্ছে কিন্তু তাদের খেতে দেওয়া হচ্ছে স্বতন্ত্রভাবে। বাবা-মায়েরা ডজন ডজন ছোট ছোট বলের মতো শিশুর দলের ভেতর থেকে নিজেদের সন্তানদের ঠিক চিনতে পারে এবং তাদের খুঁজে নিয়ে যত্ন করে খাওয়ায়।

সমাজবদ্ধ পতঙ্গদের পরিবার ব্যবস্থা অত্যন্ত জটিল, এক একটা পরিবারের সদস্যসংখ্যা বিপুল। একটা মৌমাছি পরিবারে থাকে কয়েক অযুত সদস্য, পিঁপড়ে বা উইপোকার পরিবারে থাকতে পারে কয়েক নিযুত।

এমনি বিরাট পরিবারে স্তরভেদ থাকবেই, রাণী আর পুরুষ হোল পরিবারের বাবা-মা, আর আছে কর্মী আর সৈনিক, বড়পাখা, ছোটপাখা এবং আরো শ্রেণীর সদস্য। পরিবারের সবাই পরস্পরের মুখাপেক্ষী। একজন যদি পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল তো তার ধ্বংস অনিবার্য, যদিও খাদ্য বা জলের কোন অভাব নেই। যারা গোটা পরিবারের জন্য খাদ্য আর

জল বয়ে আনছে তারা এককভাবে নিজেদের জন্য খাদ্য বা জল যোগাতে পারে না।

সমাজবদ্ধ পতঙ্গদের ক্ষেত্রে বাচ্চাদের পালন পোষণ অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। শূককীটেরা বাঁচতে পারবে না যত্নশীল ধাত্রীর সাহায্য ছাড়া, কেননা বাবা-মা শিশুদের বড়ো করে তোলার ব্যাপারে কোন অংশ নেয় না। রাণী মৌমাছির কাজ হোল শুধুই ডিম পেড়ে যাওয়া। পিঁপড়ে আর উইপোকার বাবা-মায়েরা নতুন একটা বসতি গড়ে তোলার সময়ে বাচ্চাদের দেখাশোনা করে কেবল ততদিন যতদিনে তারা পর্যাপ্ত সংখ্যায় বড় হয়ে উঠে গোটা পরিবারের ভারটা তুলেনিতে পারে নিজেদের কাঁধে। বাবা-মায়েরা তার পর থেকে শুধু খায় দায় আর বংশ বৃদ্ধি করে।

সমাজবদ্ধ পতঙ্গদের একটা চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য হোল এই যে তারা বেশ একটা যৌথ বিবাহ ব্যবস্থা চালু রেখেছে। সাধারণত ওড়বার সময় এলে পিঁপড়ে আর উইপোকাদের মধ্যে যারা বাসা ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে, তারা নিজেদের পাখাগুলি ফেলে দয়, জোড়ায় জোড়ায় আলাদা হয়ে খুঁজতে বেরোয় সুবিধে মতো একটা গর্ত। তেমনি একটা গর্ত খুঁজে পেলে তারা তার মধ্যে ঢুকে পড়ে ঘর-সংসার গড়ে তোলবার জন্য। কিছুই অস্বাভাবিক নয় যে কতকগুলি পুরুষ ও স্ত্রী হয়ত খুঁজে পেয়েছে একটাই গর্ত। এতে তাদের সুবিধেই হয় কেননা দলটা একটু একটু বড় হলে বাধা-বিপত্তিগুলি কাটিয়ে পরিবার গড়ে তোলাটা সহজই হয়ে থাকে। পরিবারটা গড়ে উঠলে তখন সেখানে কেবল একজন বয়স্ক পুরুষ ও স্ত্রীই বাস করে।

সমাজবদ্ধ পতঙ্গদের পরিবারের আছে কতকগুলি বিচিত্র বৈশিষ্ট্য। যেমন ধরো তাদের মিলন স্থায়ী হয় আমৃত্যু। বিয়েটা কখনো ভেঙে যায় না তবে এর কারণ স্বামীস্ত্রীর পরস্পরের পতি গভীর আকর্ষণ নয়। এই আনুগত্যের কারণ জানতে হলে এইসব পতঙ্গ পরিবারের বিচিত্র জীবন ধারার কথা জানতে হবে।

উৎস দুটি

উচ্চতর প্রাণীদের বংশবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন পুরুষ আর স্ত্রী-অঙ্কুর-কোষ বা গ্যামেটস। আকৃতিতে দুই প্রকারের অঙ্কুর-কোষের মধ্যে অনেক প্রভেদ, শরীরের অন্যান্য কোষ থেকেও তারা স্বতন্ত্র।

স্ত্রী-অঙ্কুর-কোষের নাম ডিম্বকোষ, এরা আকৃতিতে বড়, ডিম্বাকার বা বর্তুলাকার। এর মধ্যে আছে প্রচুর পরিমাণে ডিউটেরোপ্লাজম (কুসুম) — বর্ধমান ভ্রূণশরীরের বিকাশ ও পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় গঠনের মালমসলা স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে পুষ্টিটা যোগানো হয় কেবল নিষিক্তকরণের অব্যবহিত পরে অল্পকালের জন্য, অন্য প্রাণীদের ক্ষেত্রে যতদিন না ভ্রূণটা পূর্ণাঙ্গতা পাচ্ছে। শেষোক্তদের ক্ষেত্রে এই কোষগুলি যথার্থই দৈত্যাকার কোষ।

এই গ্রহে প্রাণীদের মধ্যে সব চেয়ে বড় ডিম্বকোষ (মানে তার সবগুলি বহিরাবরণকে ধরে। পাখিদের ক্ষেত্রে ডিমের খোলা ও সাদা অংশ এর মধ্যে পড়ে) দেখতে পাওয়া যায় উটপাখির ডিমে। এই কোষের ওজন 2 থেকে 3 কিলোগ্রাম। অধুনালুপ্ত প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপ আর ডোডোদের (যারা বেঁচে ছিল কয়েকশ বছর আগেও) ডিম আকৃতিতে একটা বালতির মতো বড় ছিল। মানুষের ডিম্বকোষ সেই তুলনায় সব চেয়ে ছোটদের কাছাকাছি, এর ব্যাস 0.2 থেকে 0.3 মিলিমিটার। অমেরুদণ্ডীদের মধ্যে আরো ছোট ডিম্বকোষ আছে, 0.04 মি. মি.

ডিমগুলি পুষ্ট হয়ে থাকে স্ত্রী-প্রাণীটার প্রজননের যন্ত্রাংশে অর্থাৎ ডিম্বাশয়ে। মানুষের ক্ষেত্রে ডিম্বাশয়ের বিকাশ ঘটে খুব শিশুকালে, মেয়েটির বয়স যখন দুই বা তিন বছর, এর পরে আর বিশেষ পরিবর্তন হয় না ডিম্বকোষগুলির। নির্ণয় করা হয়েছে যে এই বয়সের একটি মেয়ের প্রত্যেকটি ডিম্বাশয়ে থাকে 30,000-এর মতো ডিম্বকোষ। আরো অল্প বয়সে এই কোষগুলির সংখ্যা আরো অনেক বেশি, কিন্তু জরায়ুতে বসবাসের ছয় মাস নাগাত ভ্রূণের ডিম্বাশয়ের মধ্যে কিছু কিছু ডিম্বকোষ বিকাশ লাভ করলেও তাদের বেশির ভাগ পুরোপুরি পুষ্ট হয়ে ওঠে না।

পুষ্ট অবস্থায় ডিম্বকোষ দুবার বিভাজিত হয় এবং তার ফলে ক্রোমোসোমের সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যায়। মেয়েটির যৌবনোদগমেই ডিম্বকোষ পুষ্ট হয় এবং ডিম্বচ্যুতি অর্থাৎ ডিম্বাশয় থেকে একটি কোষ বিচ্যুত হয়। একজন স্ত্রীলোকের সারা জীবনে চারশ'র কিছু বেশি ডিম্বকোষ পুষ্ট হয়, বছরে তেরটা করেই।

পুরুষ অঙ্কুরকোষ বা স্পারমাটোজোয়া (spermatozoa) বা শুক্রকীট আকৃতিতে অভিনব, শরীরের অন্য সকল প্রকারের কোষ থেকে স্বতন্ত্র। বিভিন্ন প্রাণীদের ক্ষেত্রে তাদের আকারও হল নানা প্রকারের। কিন্তু তাদের

সকলেরই আছে একটা বৈশিষ্ট্য: তারা সবাই চলমান আর ডিম্বকোষের থেকে ছোট।

স্তন্যপায়ীদের শুক্রকীটের ছোট মাথা,লম্বা লেজ, যে লেজ-এর সাহায্যে তারা নিজেদের এগিয়ে নিয়ে চলে। মানুষের শুক্রকীট 50 থেকে 70 মাইক্রন দীর্ঘ, মাথাটা মোটে চার বা পাঁচ মাইক্রন। শুক্রকীটের গঠন অত্যন্ত জটিল, নিম্নতম শ্রেণীর প্রাণীদের ক্ষেত্রে। শুক্রকীটের প্রায়ই থাকে একটা করে ফুটো করবার যন্ত্র, ছেনি বা কর্কস্ক্রু বা বড়কিনের আকারে — ডিম্বকোষের বহিরাবরণকে ভেদ করবার জন্য। তা ছাড়া থাকতে পারে ক্ষুর, সূচ এবং আরো অন্যান্য যন্ত্র।

শুক্রকীট বেড়ে ওঠে পুরুষের অংকুরগ্রন্থির মধ্যে বা শুক্রাশয়ে। মেরুদণ্ডীদের ক্ষেত্রে এই গ্রন্থি থাকে এক জোড়া — শরীরের গহ্বরের মধ্যেই এর অবস্থান। কেবলমাত্র মানুষ আর কয়েক জাতির স্তন্যপায়ীর বেলাতেই শুক্রাশয় থাকে চামড়ার ঠিক নীচে বিশেষ থলিতে। গর্ভের মধ্যে বসবাস কালে অজাত শিশুর পুং-জননগ্রন্থি দুটি তাদের উৎপত্তিস্থল থেকে নেমে আসে কোষথলির মধ্যে। কোন কারণে যদি তা না হয় তাহলে তেমন জননগ্রন্থির মধ্যে শুক্রকীট জন্মাবেই না। বলা হয়েছে যে পেটের গহ্বরের ভেতরের অত্যধিক উষ্ণতার জন্যই নাকি এমন হয়। সে যাই হোক, হাতিদের কোষ দুটি তাদের দেহ গহ্বরের মধ্যেই আছে, হাতিদের দেহের আভ্যন্তরিক উষ্ণতাও বেশি, তাই বুঝি হাতিরা মিলনঋতুতে উঠে যায় পাহাড়ের ওপর যেখানে বাতাবরণ শীতল। না হলে গর্ভাধান হবেই না। এই দৈত্যাকার জানোয়ারদের যখন রাশিয়াতে শীতল উত্তরাঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হয় তখন বছর বছর তাদের বাচ্চা হয় — বন্দীদশায় এই হাতিদের নিজেদের দেশেই বাচ্চা হয় কদাচিৎ।

পুরুষের শুক্রাশয়ে আছে হাজার খানেক প্যাঁচালো নালী (এদের নাম জট-বাঁধা নালিকাপুঞ্জ (convoluted tubules) যাদের দেয়ালে আছে বড় বড় ডিম্বাকৃতি কোষ, যেগুলি বিভাজিত হয়ে, হয়ে যায় শুক্রকীট। স্ত্রীর অঙ্কুরকোষের মতো বিভাজনের পরে এদের ক্রোমোসোমের সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যায়। আকৃতিগত কতকগুলি জটিল পুর্ণগঠনের শেষে একটা সাধারণ ডিম্বাকার কোষ বিকশিত হয়ে ওঠে একটা পুষ্ট শুক্রকীটে।

শুক্রকীট নিজে নিজে চলতে পারে না, এই নালীকাগুলির মধ্যে দিয়ে তাদের ঠেলে ঠেলে পৌঁছে দেওয়া হয় এপিডিডাইমিস-এ (epididymis) —

এটা একটা অত্যন্ত প্যাঁচালো নালী যেখানে শুক্রকীট সঞ্চিত থাকে বীর্যের তরলে যার মধ্যে শুক্রকীটের বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য পুষ্টিকর পদার্থগুলি আছে, যেমন দ্রাক্ষাচিনি আর ফলচিনি।

শুক্রকীটের আর ডিম্বকোষের মিলন স্ত্রীর জননপথের ভেতরেই হোক বা তার বাইরেই হোক, প্রত্যেকটা শুক্রকীটের পক্ষে এক একটা ডিম্বকোষের কাছে পেঁছানার সম্ভাবনা থাকতে পারে না। মানুষের শুক্রকীটকে স্ত্রীর যোনিপথে বহুদূর যেতে হয় প্রতি মিনিটে 1.5 থেকে 3 মিলিমিটার গতিবেগে।

জননকোষগুলির মিলন নিশ্চিত করতে হলে চাই বহু সংখ্যায় শুক্রকীট। যদিও হয়ত একটা ডিম্বকোষকেই নিষিক্ত করতে হবে। তাই সঙ্গমের কালে প্রায় কুড়ি কোটি শুক্রকীট নির্গত হয়ে স্ত্রীর যোনিপথে পড়ে যেখানে একটি মাত্র ডিম্বকোষ থাকলেও থাকতে পারে।

অবস্থাটা যে আরো সঙ্গীন সেটা বুঝতে পারবে যখন জানবে যে শুক্রকীট বা ডিম্বকোষ উভয়েরই জীবৎকাল অত্যন্ত হ্রস্ব। ডিম্বকোষ মরে যায় ডিম্বাশয় থেকে বিচ্যুতির চব্বিশ ঘন্টা পরে। শুক্রকীটের আয়ু আর একটু বেশি, চব্বিশ থেকে আটচল্লিশ ঘন্টা।

· কেবল যে প্রজননের জন্য প্রয়োজনীয় মৌল পদার্থগুলির আয়ুকালই বিশেষ জরুরী তা নয়, তাদের নিষিক্ত করবার বা হওয়ার ক্ষমতার সময়টাও। স্যামন মাছের ডিম জলের সংস্পর্শে এলেই তার খোলসটা এত শক্ত হয়ে যায় যে শুক্তকীট আর সেটা ভেদ করতে পারে না। তার ওপর শুক্রকীটও জলের মধ্যে চলে বেড়াতে পারে খুবই কম সময়ের জন্য। স্যামনদের ক্ষেত্রে সময়টা 45 সেকেন্ড — পাহাড়ী নদীর ট্রাউট মাছের বেলায় মোটে 23 সেকেন্ড। দুটি অঙ্কুর-কোষকে মিলতে হবে এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে। তাই মৎসচাষীরা কৃত্রিম পদ্ধতিতে স্যামন উৎপাদনের কালে ডিমগুলিকে জলে ছাড়ে শুক্রকীটের দ্বারা জলটা ঘোলা হয়ে যাবার পরে।

শুক্রকীটের আয়ু বা চলৎশক্তি বাড়িয়ে দেওয়া যায় যদি তাদেরকে জলের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে সংরক্ষিত করা যায়। 'শুকনো' রাখতে পারলে কোন কোন মাছের শুক্রকীট এক থেকে দুই সপ্তাহ বাঁচে কখনো বা আরো বেশি দিন।

কোন কোন প্রাণীর স্ত্রী-যোনিপথে শুক্রকীট দীর্ঘ কাল বেঁচে থাকে। বাদুড় বা চামচিকেরা সঙ্গমে মিলিত হয় শীতকালে কিন্তু গর্ভাধান হয় তার

অনেক পরে। তাদের স্ত্রীদের যোনিপথে শুক্রকীট সংরক্ষিত থাকে বসন্তকাল পর্যন্ত। গোঁড়দের বেলায় শুক্রকীট সংরক্ষীত থাকতে পারে কয়েক বছর। মৌমাছিরা তো সারা জীবনেএকবারই সঙ্গমে মিলিত হয়। তাদের স্ত্রী-যোনিপথের সংলগ্ন একটা থলিতে শুক্রকীট জমা করে রাখা থাকে। ডিম পাড়বার কালে রাণী মৌমাছি শুক্রভাণ্ডারের একটা মুখ খুলে দেয়, যে ডিমটা পাড়ছে সেটাকে নিষিক্ত করবার জন্য। ডিম পাড়বার কালে থলির মুখ না খুললে সেই ডিমগুলি আর নিষিক্ত হোল না।

অংকুরকোষগুলি কেমন করে মিলিত হয় সে বিষয়ে আজও আমরা প্রায় কিছুই জানি না। প্রচুর সংখ্যায় শুক্রকীট নিঃসৃত হয়, তারই একটা দৈবাৎ ডিম্বকোষের কাছে পৌঁছে যায় ভাগ্যক্রমে। তবে এই উদ্দেশ্যে বিশেষ উপায়ও ব্যবহৃত হয় কখনো কখনো। কোন কোন প্রাণীর ডিম্বকোষে আছে কয়েকটি বিশেষ পদার্থ যেগুলি পরিপাশ্বের মাধ্যমে মিশ্রিত হয় খুব সামান্য পরিমাণে, যার ফলে শুক্রকোষের জীবনকালটা হয়ত বিলম্বিত হয় অথবা তারা আকর্ষিত হয়।

শুক্রকীট যে বহু সংখ্যায় উৎপাদিত হতেই হবে তা নয় কিন্তু। সেই সব জাতের প্রাণীরা অল্প সংখ্যায় অংকুরকোষ দিয়ে কাজ চালিয়ে নেয় যাদের ডিম্বকোষের আর শুক্রকীটের মিলিত হবার সুবিধা আছে। যেমন জলের মাছি বা ড্যাফনিয়া।

এদের দুটো ডিম্বকোষ সঞ্চিত থাকে ছোট একটা ডিম্বাধারে। সঙ্গমের কালে শুক্রকীট এই ডিম্বাধারটা ভেদ করে যায় একটা ছিদ্র দিয়ে। ছিদ্রটা তার পরে বন্ধ হয়ে যায়। জলের মাছির শুক্রকীট আকারে বেশ বড়, এদের চলাফেরা ধীর গতিতে, সংখ্যায় এরা কয়েকটা মাত্র। সঙ্গমের কালে খুব বেশি হলে পাঁচটা শুক্রকীট ডিম্বাধারের ছিদ্র দিয়ে ঢোকে। পুরুষ মাছির সর্বমোট আছেই কুড়িটা শুক্রকীট।

নিষিক্তকরণ শুরু হয়, যখন শুক্রকীটটা নিজেকে ডিম্বকোষের বহিরাবরণে সংলগ্ন করে নেয়। এখন তাকে ডিম্বকোষটাকে ভেদ করতে হবে কিন্তু এই বহিরাবরণটা বাধা দেয় সেটা হতে দিতে। কতকগুলি জীব, যেমন উভচর আর একিনোডার্ম (echinoderms) গোষ্ঠীর প্রাণীদের ক্ষেত্রে খোলসটা বেশ পুরু। কখনো কখনো শুক্রকীট খোলসটা মোটেই ভেদ করতে পারে না, তাকে ঢুকতে হয় অতি সংকীর্ণ একটি নালী পথে যার নাম মাইক্রোপাইল। এজন্য শুক্রকীটকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়। শুক্রকীটের

আকার একেবারে নগণ্য, বড় বড় জলজীবী প্রাণীর ডিম্বকোষের তুলনায় কিন্তু হাজার হাজার শুক্রকীটের বাহিনী যখন তাদের ছেঁকে ধরে আক্রমণ করে তখন ডিম্বাণুগুলি নড়াচড়া করতে বা ঘুরপাক খেতে শুরু করে।

আসল খোলসটা ছাড়াও মানুষের ডিম্বাণুকে ঢেকে রেখেছে একস্তর কোষ দিয়ে যাদের নাম করোনা রেডিয়াটা (corona radiata), বাংলায় বলা যেতে পারে বিকিরিত চূড়া, তাই একা কোন শুক্রকীট ভেদ করতে পারে না ডিম্বকোষের খোলস। কেবল কয়েক হাজার শুক্রকীট তাদের মিলিত প্রয়াসে আগড়-বাধা চূর্ণ করতে সক্ষম হয়, একটি এনজাইমের সাহায্যে তাকে ধ্বংস করে যার নাম হায়ালিউরোনিডেজ (hyaliuronidase), এই এনজাইম প্রত্যেক শুক্রকীটের মাথায় থাকে খুব সামান্য পরিমাণে। এই পদার্থটা করোনা রেডিয়াটার সব কোষগুলিকে ঝালাই করে দেয় একসঙ্গে। এই কাজটা সম্পন্ন হলে পরেই একটা শুক্রকীট সেই ডিম্বাণুর মধ্যে ঢুকতে পারে।

শুক্রকীট ডিম্বাণুর খোলস ভেদ করে ঢুকলেই কয়েকটা পরিবর্তন ঘটতে থাকে। যেমন, একটা নতুন খোলস বা নিষেক-খোলস গড়ে ওঠে। সেটা এমন পুরু যে আর কোন শুক্রকীট ডিম্বাণুর দেয়াল ভেদ করতে পারে না। এর ফলে একাধিক শুক্রকীটের দ্বারা ডিম্বাণু নিষিক্ত হতে পারে না।

ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াসের সঙ্গে অনুপ্রবিষ্ট শুক্রকীটের নিউক্লিয়াসটা মিশে যায়। তাই দুটি জননকোষের মিলনের ফলে সৃষ্ট নতুন কোষটার নিউক্লিয়াসে ক্রোমোসোমের সংখ্যা সম্পূর্ণ হয়। এই বার শুরু হয় প্রথম বিভাজন। কতকগুলি ক্ষেত্রে নিষেক-কৃত খোলসটা সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয়ে ওঠে না তাই ডিম্বাণুর মধ্যে প্রবেশ করে কয়েকটা শুক্রকীট। তাদের নিউক্লিয়াসগুলি ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াসের সঙ্গে মিশে যাবার ফলে মোট ক্রোমোসোমের সংখ্যা স্বাভাবিকের থেকে অনেক বেশি হয়ে যায়। কতকগুলি জাতের প্রাণীর ক্ষেত্রে এমন প্রায়ই ঘটে। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও একটা শুক্রকীটই মিশে যায় ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াসের সঙ্গে, অন্যগুলি নষ্ট হয়ে যায় নিউক্লিয়াসের উপরিতলের কাছেই এবং তারা ব্যবহৃত হয় ডিম্বকোষটার পুষ্টি যোগানোর কাজে। ক্বচিৎ কখনো একাধিক শুক্রকীট নিউক্লিয়াসে মিশে যাওয়াতে ভাগ নেয়। সাধারণত তেমন একটা ডিম্বকোষের বিকাশ হয় অস্বাভাবিকভাবে এবং কিছুকালের মধ্যেই সেটা মরে যায় তবে কিছু কিছু পতঙ্গ, পাখি আর অন্য প্রাণীর থেকে একাধিক শুক্রকীটের দ্বারা নিষিক্ত

ডিম্বাণুর নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষামূলকভাবে পালন করা এবং পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় আনা সম্ভব হয়েছে।

পলিপ্লয়েড প্রাণী, অর্থাৎ একাধিক ক্রোমোসোমগুচ্ছ আছে এমন প্রাণী জন্মানো সম্ভব অন্যভাবেও, যেমন একটি ডিম্বকোষকে একটি শুক্রকীটই নিষিক্ত করে থাকলে ও যদি পরবর্তী কোষ বিভাজন ব্যাহত হয়। গাছ পালার ক্ষেত্রে পলিপ্লয়েডি (Polyploidy) খুব ব্যাপক। পলিপ্লয়েড উদ্ভিদের কোষগুলি আকারে সাধারণের থেকে বড়, গাছগুলিও তাই হয় সাধারণের থেকে অনেক বড়। চাষ করা সব গাছপালাই পলিপ্লয়েড। প্রাণীদের ক্ষেত্রে পলিপ্লয়েডি দেখা যায় অনেক কম, সম্ভবত লিঙ্গ নির্ণয়ে গোলমাল বাঁধে বলেই। ক্রোমোসোমের স্বাভাবিক বিভাজন হয় না এ সব ক্ষেত্রে, ডিম্বকোষের বিভাজন ব্যাহত হয়, ভ্রূণটা মরে যায়। কেবল মাত্র একলিঙ্গ প্রাণীর ক্ষেত্রে পলিপ্লয়েডি সহজেই ঘটে।

নিষিক্তকরণের আর একটা বৈশিষ্ট্য হোল এর অবিপরীতমুখিত্ব। ডিম্বাণুতে প্রবিষ্ট শুক্রকীটটা যদি কোন কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, ডিম্বকোষটার পরিণতি বা বিভাজন কিন্তু চলতে থাকবে, যেন কিছুই হয় নি। এই বৃদ্ধি ও বিকাশ কিন্তু চলতে থাকবে শুক্রকীটটাকে ডিম্বাণু থেকে সযত্নে সরিয়ে ফেলা হলেও।

ত্রুটি-বিচ্যুতি সমেত নিষিক্ত ভ্রূণ বেশি দূর বৃদ্ধির আগেই সচরাচর লয়প্রাপ্ত হয়, কদাচিৎ সেটা পূর্ণাবয়ব পায়। অনুপ্রবিষ্ট শুক্রকীটের বিনাশের বা তাকে সরিয়ে নেবার পরেও ডিম্বকোষের বৃদ্ধি-পরিণতি তার একটা জরুরী বৈশিষ্ট্য। এই কারণেই ডিম্বকোষের অস্বাভাবিক পরিণতি সম্ভবপর হয়।

প্রণয়কাতর সালমেসিস-এর প্রার্থনা

গ্রীক পুরাণে কথিত আছে, কেরিয়াতে (caria) কোন এক ছোট নদীতে বাস করত অতি সুন্দরী এক জলপরী, নাম তার সালমেসিস (salmacis)। সে প্রেমে পড়ে যায় অপরূপ রূপবান তরুণ হারমাফ্রোডিটাস-এর, ছেলেটি হারমিস আর আফ্রোদিতি-র সন্তান। দেবতাদের কাছে সালমেসিস প্রার্থনা করল তার এই নিবিড় প্রেমকে চিরন্তন করতে তাঁরা যেন করুণা করে হারমাফ্রোডিটাসের সঙ্গে তাকে পাকাপাকিভাবে মিলিত করে দেন। দেবতারা

তার প্রার্থনা শুনলেন — তাঁরা তাদের দুজনকে জুড়ে দিলেন একই শরীরে। এই প্রাণীটি তার পর থেকে হয়ে গেল উভলিঙ্গ।

কৌতুক যে কেবল গ্রীক দেবতারাই পছন্দ করতেন তা নয়, প্রকৃতিও কম যান না। আসল হারমাফ্রোডাইট বা উভলিঙ্গ প্রাণী এই পৃথিবীতে আকছার দেখা যায়।

উভলিঙ্গত্ব আছে দু'প্রকারের, একটা স্বাভাবিক, অন্যটা রোগজনিত, জন্মসূত্রে পাওয়া অস্বাভাবিকত্ব বলা যেতে পারে। উভলিঙ্গ প্রাণীরা কেমন দেখতে?

আসল উভলিঙ্গ প্রাণীর থাকে দুই প্রকারেরই লিঙ্গবহিরঙ্গ, প্রথমটা পুরুষ অঙ্কুরকোষের সৃষ্টি করে, দ্বিতীয়টা সৃষ্টি করে স্ত্রী-অঙ্কুরকোষের। তবে এই উভলিঙ্গ প্রাণীদের প্রজননযন্ত্রগুলির পূর্ণবিকাশ হয় না, তাদের শরীরে উৎপন্ন শুক্রকীটও ডিম্বাণু ব্যবহার করে নতুন জীবিত প্রাণী তারা সৃষ্টি করতে পারে না। তবে, তেমন প্রাণী, সংখ্যায় খুব কম হলেও আছে যারা এ কাজ পারে। বেশির ভাগ উভলিঙ্গ প্রাণীর ক্ষেত্রেই অন্যান্য সাধারণ জীবের মতোই প্রজননের জন্য দরকার পড়ে দুজনের।

স্ব-নিষেক সাধারণত দেখতে পাওয়া যায় পরজীবীদের মধ্যে। হবেই তো, পরজীবীরা বাস করে তার আশ্রয়দাতার দেহের মধ্যে, বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্কছিন্ন অবস্থায়, তাই এভাবে না হলে তারা সন্তান উৎপাদন করবে কী করে?

স্ব-নিষেক অনেক সময় সঙ্গমের আচরণবিধিই অনুসরণ করে থাকে। অঙ্কুরকোষগুলির মিলন সুনিশ্চিত করতে এক প্রকারের লেজযুক্ত কীটাণুকে প্রবেশ করতে হয় নিজেরই দেহের যৌন অঙ্গরূপ বিশেষ ছিদ্রে।

কিছু প্রাণী আছে যাদের আত্মরতির চেষ্টা না করলেও চলে কেননা তাদের প্রজনন যন্ত্রাদির গঠনই এমন যে অঙ্কুরকোষগুলির মিলন সুনিশ্চিত হয়। হাঙরের অন্ত্রে পরজীবীরূপে বাস করে এক জাতের চ্যাপটা কৃমি। এদের পুংবীজবাহী আর স্ত্রী-কোষবাহী নলগুলি একই ক্লোয়াকা-তে (cloaca) এসে মিশেছে যেখানে অঙ্কুরকোষগুলি মিলিত হয়।

কিছু কিছু উভলিঙ্গ প্রাণী আত্মরতির সাহায্যে প্রজনন করতে পারে। কিন্তু করে না, একজন সঙ্গীকে নিয়েই কাজটা করা পছন্দ করে। ব্যাঙের মূত্রাশয়ে বসবাসকারী বহুমুখী কৃমির ক্ষেত্রে দুজনে মিলে সঙ্গম করাটাই রীতি। সঙ্গী না থাকলে অগত্যা আত্মরতির ব্যবহার করতে হয়।

অনেক উভলিঙ্গ প্রাণী আত্মরতির সাহায্যে প্রজনন করতে পারে না বিবিধ কারণে। সাধারণত ডিম্বকোষ যখন পুষ্ট হয়, পুংবীজ তখন তৈরি নেই। কোন কোন ক্ষেত্রে নিজের শরীরের পুংবীজ ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করতে পারে না। অ্যাসকিডিয়ানদের (ascidians) ক্ষেত্রে এটা ঘটতে দেখা গেছে, তবে ঘটনাটার কারণটা রহস্যই থেকে গেছে।

বেশির ভাগ উভলিঙ্গ প্রাণী, যারা স্বনিষেকের দ্বারা বংশবৃদ্ধি করতে পারে না, মিলনঋতুতে তারা স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের কাজটাই করে থাকে বা জীবনের কোন সময়ে স্ত্রীরূপে, কোন সময়ে পুরুষরূপে প্রজননের ভূমিকাটা চালিয়ে যায়।

প্রথম দলে আছে সাধারণ কেঁচো। প্রত্যেক কেঁচের আছে দুটি আলাদা লিঙ্গদ্বার তাদের শরীরের পনের নম্বর অংশে। একটা ছিদ্র দিয়ে পুংবীজ বেরোয়, অন্যটা দিয়ে শরীরে ঢোকে। সঙ্গমকালে দুটি কেঁচো পরস্পরের শরীর দুটো এমনভাবে লেপ্টে জড়িয়ে থাকে যাতে একটার পুংবীজনিঃসরণকারী ছিদ্র অন্যটার পুংবীজগ্রহণকারী ছিদ্রের সঙ্গে মিলে

যায়। এই প্রক্রিয়া চলার কালে নিঃসৃত চটচটে শ্লেষ্মা দুটি প্রাণীকে এই অবস্থায় দীর্ঘকাল জুড়ে রেখে দেয়।

এই দলের উভলিঙ্গদের আর এক প্রতিনিধি আছে যারা বাস করে সাইপ্রিনিডদের (cyprinids) গিলস্-এর পরজীবী হয়ে। বয়ঃপ্রাপ্ত হবার আগে পরজীবীগুলি স্বতন্ত্রভাবে বাস করে, কিন্তু তার পর তারা জোড়ায় জোড়ায় মিলিত হয়ে একত্রে বাড়ে, জীবনের বাকি সময়টা এইভাবেই কাটায়। এই প্রাণীগুলি উভলিঙ্গ এবং তাদের নিষিক্তকরণ পরস্পরের মুখাপেক্ষী। পাখিদের গলায় বসবাসকারী পরজীবী সিনগ্যামিডি-এর (syngamidae) তাদের পুরো জীবনটাই সঙ্গমে মিলিত অবস্থায় কাটিয়ে দেয়, এক এক জোড়া মিলিত পরজীবীকে দেখায় যেন ইংরেজি হরফ V-এর মতো। তেমন জাতের উভলিঙ্গ প্রাণীও অনেক দেখা যায় যারা লিঙ্গ বদল করে কোন প্রকারের অঙ্কুরকোষ শরীরে পুষ্ট হয়েছে সেটা বিচার করে নিয়ে। গোলকৃমি এই দলে পড়ে, এরা থাকে পরজীবী হয়ে ব্যাঙের ফুসফুসে। এছাড়া আছে পিলবাগ (pillbugs) আর কয়েক জাতের শামুক, যারা অল্পবয়সে পুরুষের মতো আচরণ করে, বয়স বাড়লে লিঙ্গ পালটে স্ত্রী হয়ে যায়।

উচ্চ বিবর্তিত স্ত্রী-পুরুষ মিলে যুগ্ম যৌন জীবনযাপনকারী প্রাণীদের মধ্যেও দৃষ্টান্ত আছে যেখানে লিঙ্গ বদলায়। অ্যাকোরিয়ামে মাছ পোষাতে যদি আগ্রহ থাকে তাহলে তোমরা সোর্ডটেল (sword tails) বা মিনো (minnows) মাছের আচরণ পর্যবেক্ষণ করতে পারবে। মাছটা খুবই সাধারণ এরা সরাসরি বাচ্চা জন্মায়। প্রায়ই দেখা যায় বাচ্চা দেবার পরে একটা কমবয়সী স্ত্রী-মাছ বদলে পুরোপুরি পুরুষে পরিবর্তিত হয়ে গেল। এমনটি দেখা যায় ব্যাঙদের ক্ষেত্রেও।

এখানে উল্লেখ করা সঙ্গত যে প্রকৃতিতে একটা ব্যাপার বহুবার লক্ষ্য করা গেছে যেটাকে মনে হবে হয়ত উভলিঙ্গত্ব কিন্তু আসলে যেটা একলিঙ্গের জীবের অপর লিঙ্গের জীবের শরীরে পরজীবীরূপে বাস ছাড়া আর কিছু নয়।

কোন কোন জাতের স্ত্রী-পোকার যোনিপথে বাস করে থাকে কয়েকটা করে পুরুষ। দেখতে তারা স্ত্রী-পোকা থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র এবং তাদের হয়ত অন্য প্রজাতির প্রাণী বলে শ্রেণীভুক্ত করাও যেত। বস্তুত দীর্ঘকাল ধরে এই নিয়ে খানিকটা ধাঁধাও ছিল। খুবই স্বাভাবিক স্ত্রীর যোনিপথে বাস করলে পুরুষের পক্ষে স্ত্রীর ডিম্বকোষকে নিষিক্ত করা সহজ হয়।

পুরুষের শরীরে স্ত্রী বাস করছে এমনও দেখা যায়। মানুষের শরীরের মধ্যে বসবাসকারী পরজীবী পুরুষ ডাইষ্টোম তার শরীরের মধ্যে স্ত্রীকে রেখে দেয় যেন একটা নলের মধ্যে পুরে — নল থেকে মাথাটা আর পেছনটা বেরিয়ে থাকে। ছিপ-ফেলা মাছের পুরুষ স্ত্রীর শরীরে পরজীবী হয়ে বাস করে সে কথা আগেই বলা হয়েছে।

নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে উভলিঙ্গত্ব প্রায়ই দেখা যায়, কিন্তু সেই তুলনায় উচ্চতর প্রাণীদের মধ্যে উভলিঙ্গত্ব অনেক বিরল এবং ঘটনাটা অস্বাভাবিক। এই ধরনের গঠনবৈষম্য মানুষের মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়। যে ধরনের অসঙ্গতি বেশি পাওয়া যায় তারা হোল কোন ব্যক্তির আকৃতিতে বিপরীত লিঙ্গের আকৃতির চিহ্নগুলি প্রকট হওয়া। পুরুষের হয়ত গোঁফদাড়ি গজালো না, স্তনোদগম হোল পুরুষের পক্ষে স্বাভাবিকের থেকে একটু বড় আকারে, নিতম্ব ভারী, গোলালো হোল স্ত্রীলোকের মতো। অপরপক্ষে মেয়েদের বেলায় সারা মুখ কেশে ভরে গেল, গায়ে ও পায়ে লোম গজালো, স্তন ভাল করে উঠলই না, গলার আওয়াজ হোল ভারী মোটা।

যৌন বহিরঙ্গ বদলে অন্য লিঙ্গের আকার নেবার দৃষ্টান্ত তত দেখা যায় না। কখনো কখনো ভালভাবে পরিণতই হয়ে ওঠে না বা তেমন সুস্পষ্টই নয়, তাই ব্যক্তিটির লিঙ্গ নির্ণয় করাই দুরূহ হয়ে ওঠে।

এমনি ব্যাপারকে বলা হয় ঝুটো উভলিঙ্গত্ব, কেননা পরিবর্তনগুলি বাইরের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই সীমিত থাকে। এই সব ব্যক্তিদের যৌন গ্রন্থিগুলি একটি লিঙ্গের বৈশিষ্ট্যকেই সূচিত করে, তবে অনেক ক্ষেত্রে সেটা অপরিণত হতে পারে।

প্রকৃত উভলিঙ্গত্ব মানে যেখানে উভয় প্রকারের যৌন অঙ্গ উপস্থিত থাকে, মানুষের মধ্যে অত্যন্ত বিরল। সত্যিকারের ঘটনা দু'একটা মাত্র জানা আছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই একটি লিঙ্গের গ্রন্থিরই কার্যকর বিকাশ সম্পূর্ণ হয়েছে।

উভলিঙ্গ শিশুর জন্মকালে (এবং তার পরবর্তী কালেও) বলে দেওয়া খুবই কঠিন, যদিও জন্মের ব্যাপারটা নথিভুক্ত করতে ডাক্তারকে বলতেই হবে, তাই কিছু কিছু ভুল থেকে যেতে পারে। পরবর্তী কালে শিশুকে পালন পোষণ করতে গিয়ে বিপরীতধর্মী প্রশিক্ষণজনিত গরমিলের জন্য বর্ধমান মানুষটার মনের ভিত্তিটা এমন হয়ে উঠতে পারে যে সেটা তার যৌনগ্রন্থির সঙ্গে মিলছে না। আবার, প্রকৃত উভলিঙ্গত্বের ক্ষেত্রে মানসিকতা

বা বিশেষ লিঙ্গের অনুরূপে যৌনপ্রবণতা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বদলাতে পারে।

আজকাল শল্যচিকিৎসার বিশেষ উন্নতির ফলে দৈহিক গঠনের এই ত্রুটি অপসারণ করা সম্ভব হয়েছে, রোগীর পক্ষে বিশেষ কোন ক্ষতির ঝুঁকিও এড়ানো যাচ্ছে। কোন্ যৌনগ্রন্থি অপসারিত করতে হবে সেটা নির্ণয় করার কালে শল্যবিদ সর্বাগ্রে বিচার করেন রোগীর মানসিকতার কথা, যৌনগ্রন্থির কার্যক্ষমতার কথা সেই তুলনায় গৌনভাবে বিচার্য। এবং সেই অনুসারেই অপারেশন করা হয়। যখন শল্যবিদের মনে রোগীর যৌন মানসিকতা নিয়ে কোন দ্বন্দ্বের অবকাশ থাকে কেবল তখনই তাঁর কাছে রোগীর যৌনগ্রন্থির অবস্থাটা নির্ণায়ক নির্দেশরূপে বিবেচিত হয়।

অপাপবিদ্ধ গর্ভসঞ্চার

আমরা চিন্তা করতে অভ্যস্ত যে, যেসব জীবিত প্রাণীর শরীরে অংকুরকোষ আছে তাদের ভ্রূণের সৃষ্টি হয় একটি ডিম্বাণুর সঙ্গে একটি শুক্রকীটের মিলন ঘটলেই। কিন্তু আসল ব্যাপার, সর্ব ক্ষেত্রে তা নাও হতে পারে। কোন কোন প্রজাতিতে ডিম্বকোষ আপনা আপনি বিকশিত হয়ে উঠতে পারে পুংবীজ ছাড়াও। এই ঘটনাটা সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেছিলেন অ্যানটনি ভ্যান লিউয়েনহোয়েক, ওলন্দাজ অণুবীক্ষণ যন্ত্র বিশারদ, অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায়। এই ব্যাপারটা আখ্যায়িত হয়েছে কুমারী প্রজন্ম বা পারথেনোজেনিসিস (Parthenogenesis) বা অপুংজনিত্ব নামে।

প্রজননের যে কোন পদ্ধতি উপযোগ করা হোক না কেন, কিছু সংখ্যায় ডিম্বাণু অনিষিক্ত থেকেই যাবে, কিন্তু তারা সব অল্পকালের মধ্যেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তবে অসংখ্য ব্যতয় আছে এই ব্যাপারে। একিনোডার্ম বা সী-আরচিন জাতীয় প্রাণী, কতকগুলি পোকা আর সন্ধিপদ গোষ্ঠীর প্রাণীদের বেলায় অনিষিক্ত ডিম আপনা আপনি বিভাজন শুরু করতে পারে নিষিক্ত ডিমের মতোই, তবে তারা কখনোই পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় না। বিকাশের একটা পর্যায়ে এসে সেটা থেমে যায়, ভ্রূণটা লয়প্রাপ্ত হয়। এই সব প্রাণীদের ক্ষেত্রে অনিষিক্ত ডিম থেকে পূর্ণাঙ্গ জীবদের উদ্ভব কদাচিৎ হয়।

তবে কয়েক জাতের ফড়িং আর অন্য পতঙ্গ আছে যাদের অনিষিক্ত ডিম যথাযথভাবে পরিণতি লাভ করে থাকে এবং তার থেকে উদ্ভূত শূককীটেরা

পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গ হয়ে ওঠে। বংশবৃদ্ধি তাহলে দেখা যাচ্ছে সাধারণ পদ্ধতির বাইরেও হওয়া সম্ভব।

যেসব প্রাণীর কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে অপুংজনিত্ব বা পার্থেনোজেনেসিস্ তাদের কাছে অস্বাভাবিক ঘটনা এবং তাদের প্রজাতির পক্ষে মৌল গুরুত্বের ব্যাপারেই নয়। অন্যপক্ষে, কতকগুলি প্রজাতি আছে যাদের অস্তিত্বই থাকবে না এই পদ্ধতি না থাকলে এবং তারা হয় পার্থেনোজেনেসিস প্রক্রিয়াতেই বংশবৃদ্ধি করবে বা পালাক্রমে সাধারণ পদ্ধতি আর পার্থেনোজেনেসিস প্রথা ব্যবহার করবে। এই ব্যবস্থার নাম ঋতুগত অপুংজনিত্ব। ফড়িং জাতীয় এবং আরো অন্য অনেক জাতের পতঙ্গের আছে এই বৈশিষ্ট্য।

আঙুরলতার পতঙ্গ ফাইলোকসেরা (Phylloxera) শীতের শুরুতে যে ডিম পেড়ে থাকে বসন্তকালে তার থেকে নির্গত হবে কেবল স্ত্রী-পতঙ্গের ঝাঁক। এদের প্রত্যেকে পঞ্চাশটা করে ডিম পাড়বে — বিনা নিষেকে সেগুলি থেকে অনুরূপ স্ত্রী-পতঙ্গ বেরোবে। তার পরে তারাও অনিষিক্ত ডিম পাড়বে। গ্রীষ্মকালে কয়েকটা প্রজন্ম আসবে, একটার পরে একটা, যার মধ্যে একটাও পুরুষ নেই। শরৎ এলে অনিষিক্ত ডিম থেকে পাখাওয়ালা দুজাতের স্ত্রী-পতঙ্গ বেরোবে। এদের কয়েকজন বড় আকারের ডিম পাড়বে যার থেকে ফুটে বেরোবে স্ত্রী-পতঙ্গ, অপর কয়েকজন ছোট সাইজের ডিম পাড়বে যার থেকে জন্মাবে পুরুষ শাবক। এই ডিমগুলিও কিন্তু আপনা আপনিই পরিণত পতঙ্গে বিকশিত হয়েছে। কেবল পুরুষের আবির্ভাবের পর থেকেই যৌনিজ প্রজনন সম্ভবপর হয়ে থাকে।

পারথেনোজেনিসিস থেকে উদ্ভূত প্রাণীদের লিঙ্গ তাহলে কী হয়ে থাকে? ফাইলোকসেরাদের তো দেখা গেল পুরুষ ও স্ত্রী দুই প্রকারের লিঙ্গ হওয়া সম্ভব। তবে সচরাচর অপুংজনি থেকে পুরুষ পতঙ্গই জন্মে থাকে। রাণী মৌমাছি সঙ্গমের কালে সঞ্চয় করা পুংবীজের সবটা খরচ করে ফেলার পরে যত ডিম পাড়ে সেগুলি পরিণত হয় পুরুষ-মৌমাছিতে। এটা নিশ্চয় কার্যকর ব্যবস্থা কারণ প্রজাতিটা যাতে টিঁকে থাকতে পারে সেটা এর ফলে নিশ্চিত হয়। এই পর্যায়ে পুরুষেরা আবির্ভূত হয়ে তরুণী রাণী মৌমাছিদের নিষিক্ত করতে পারে।

অনেক প্রাণীই যৌনিজ প্রজনন না করেই বেশ কাজ চালিয়ে দেয়। এক জাতের ছোট ছোট সাইমোথোইডি (cymothoidae)-দের পর্যবেক্ষণ করা

হয়েছে 28 বছর ধরে। এই সময়টাতে 124 টা প্রজন্ম পাওয়া যায় কিন্তু তার মধ্যে একটাও পুরুষ ছিল না। এতগুলি প্রজন্ম বিনা যৌন সংসর্গেই বিকাশ লাভ করেছে। এমনিতর শুধুই অযোনিজ প্রজনন দেখা গেছে কিছু কিছু পিঁপড়ে, করাত-মাছি, গল-বোলতা এবং অন্যান্য পতঙ্গদের মধ্যে। সকল প্রজন্মে সকলেই স্ত্রী, বিনা ব্যতিক্রমে। তাদের বংশানুক্রমে কোন পুরুষ জন্মায় না, দৈবাৎ যদি দু'একটা জন্মে যায় তো সেগুলির থাকে কোন না কোন খুঁত — প্রজননে তারা কোন অংশ নেয় না।

মনে কোরো না যেন পারথেনোজেনিসিস অতি আদিম প্রাণীদেরই বৈশিষ্ট্য। আমেরিকাতে আছে ছটি জাতের পাহাড়ী গিরগিটি। তাদের তিনটিতে পুরুষ একেবারেই নেই। স্ত্রী-গিরগিটি অনিষিক্ত ডিম পাড়ে, যেগুলি থেকে অপুংজনি প্রথায় বাচ্চা জন্ম নেয়।

পারথেনোজেনিসিস-এর সব চেয়ে অদ্ভুত প্রকার হোল পেডোজেনিসিস (pedogenesis)। গল-মাছির স্নেহপ্রবণ মায়ের শরীরটা তার শূককীটেরা খেয়ে ফেলে সে কথা আগেই বলেছি। আর একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় এই পেডোজেনিসিস-এর, সেটা হোল ফ্লুক (fluke) মাছের শরীরে বসবাসকারী

পরজীবী, মা-ফ্লুক-এর শরীরে আছে একটা ডিম, যেটা বিকাশ লাভ করে হয় একটা ভ্রূণ। এই ভ্রূণটা থেকে আবার পারথেনোজেনিসস প্রথায় পরিণত হয় আরেকটা ভ্রূণ। এই শেষেরটা থেকে পাওয়া যায় তৃতীয় প্রজন্মের একটা ভ্রূণ। এইভাবেই চলে। পর পর পাঁচটা প্রজন্ম একত্রে বেড়ে চলে একজনের পেটের ভেতর একজন। কেবল ষষ্ঠ প্রজন্মে এসেই যৌনবিচারে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীটাকে পাওয়া যায়।

প্রশ্ন আসে, আচ্ছা কেবল স্ত্রী-অংকুরকোষই কি পারথেনোজেনিসিস প্রথায় পরিণত হতে পারে? দেখা গেছে পুংবীজেরও এই গুণ খানিকটা আছে। তবে পুংবীজের তো পারথেনোজেনিসিস প্রথায় বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টির ভান্ডার সঞ্চিত নেই। তাই, খুব ভাল ফল পাওয়া যায় যদি ডিম্বকোষ থেকে নিউক্লিয়াস সরিয়ে নিয়ে স্বাভাবিক শুক্রকীট দিয়ে তাকে নিষিক্ত করা যায়। শুক্রকীট পেয়ে যাবে বেশ পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য যা তার বেড়ে ওঠা সুনিশ্চিত করবে। সী-আরচিন নিয়ে পরীক্ষার কালে ছোট ছোট ভ্রূণ পাওয়া গেছে নিউক্লিয়াস-বিচ্ছিন্ন ডিম্বকোষের খুব ছোট ছোট টুকরোকে নিষিক্ত করে, এক একটা টুকরো ডিম্বকোষের সাঁয়ত্রিশ ভাগের এক ভাগ মাত্র।

পারথেনোজেনিসিস বা অপুংজনি যখন এমনই একটা সাধারণ ঘটনা, তখন চেষ্টা করে দেখা হোল কৃত্রিম উপায়ে এটা ঘটানো যায় কি না। উত্তাপ, শৈত্য, অতিবেগুনী এবং তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রয়োগ করা হয়েছে এই সব পরীক্ষায়। অ্যাসিড, ক্ষার, কম বা বেশি ঘনত্বের দ্রবণ, চর্বি গলানোর দ্রবণ, উপক্ষার এবং অন্যান্য পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে। শুষ্ককরণ, ঘর্ষণ, ইনজেকশন প্রভৃতি চেষ্টাও করা হয়েছে। ডিমের পরিণতিকে সঞ্জীবিত করতে এই সব প্রক্রিয়াগুলিই প্রয়োগ করা হয়েছে। সম্পূর্ণ পরিণতি সব সময়ে পাওয়া যায় নি, কেন না ভ্রূণের বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থাগুলি পরীক্ষাগারে যোগাড় করা খুবই শক্ত।

কোন কোন সময় কৃত্রিম উপায়ে সঞ্জীবিত ডিমের বিকাশ বিভিন্ন কারণে দোষযুক্ত হয়। একটা কারণ এই যে ভবিষ্যৎ ভ্রূণটার গঠনগত প্রতিসাম্য বিঘ্নিত হয়। অধিকাংশ প্রাণীর ক্ষেত্রে শুক্রকীট যে জায়গা দিয়ে ডিমের মধ্যে প্রবেশ করে সেই জায়গাটাই নির্ণয় করে দেয় ভ্রূণের দুই পার্শ্ব বরাবর প্রতিসাম্যের তল বা অক্ষ। এই উদ্দেশ্যে শুক্রকীটের যে কাজ তারই বিকল্প হিসেবে ডিম্বকোষের একটা সীমাবদ্ধ অংশকে সঞ্জীবিত করেও, যতগুলি

প্রক্রিয়ার প্রয়োগ করা হয়েছে তারা সবই বিফল হয়েছে। সূঁচ দিয়ে বিদ্ধ করেও শুক্রকীটের কাজটার পুরোপুরি নকল করা যয়া নি, কারণ সম্ভবত ডিমের বহিচ্ছদকে ভেদ করতে শুক্রকীট অনেক বেশি সময় নিয়ে থাকে। তথাপি, অনেক প্রাণীর ক্ষেত্রে যেমন চিংড়ি, মাছ, ব্যাঙ এবং স্তন্যপায়ী জীবের ক্ষেত্রেও স্বাভাবিক পূর্ণগঠিত জীব পাওয়া গেছে।

ডিমকে বিভিন্ন কৃত্রিম উপায়ের সাহায্যে সক্রিয় করে তোলার বিভিন্ন প্রক্রিয়ার প্রয়োগ থেকেই ব্যাখ্যা করা যায় কতকগুলি স্বতস্ফূর্ত পারথেনোজেনিসিস। প্রদাহকারী আর বিশেষত অবক্ষয়ী কতকগুলি ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া এজন্য দায়ী। স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে স্বতস্ফূর্ত পার্থেনোজেনিসিস পদ্ধতিতে ভ্রূণের বিকাশের সঠিকভাবে জানা ঘটনা অত্যন্ত বিরল। তবে যথার্থ চিত্রটা পাওয়া যায় না কারণ বিভাজনের গোড়ার দিকেই ডিম্বকোষটা লয়প্রাপ্ত হয়।

মানুষের স্ত্রী-অঙ্কুরকোষও পার্থেনোজেনিসিস প্রক্রিয়াতে পরিণত হতে পারে। তবে অনেকগুলি অনুকূল অবস্থার ভাগ্যক্রমে একত্রে সন্নিবেশ, যা বাস্তবে ঘটা প্রায় অসম্ভব, যদি সত্যিই ঘটে কেবল তবেই সন্তানের জন্ম হতে পারে। স্ত্রীলোকের ডিম্বকোষকে কৃত্রিম উপায়ে পার্থেনোজেনিসিস-এর সাহায্যে সঞ্জীবিত করা যেতে পারে। মানুষের ডিম্বকোষ রক্ত রসে রেখে তার বিভাজন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে পরীক্ষামূলক অবস্থায়। ডিমগুলি লয়প্রাপ্ত হয়েছে কেননা বিজ্ঞানীরা তাদের স্বাভাবিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থাগুলি তৈরি করে দিতে পারেন নি। ইটালিয়ান বিজ্ঞানী পেতরুচ্চি (Petrucci) কর্তৃক পরিচালিত কয়েকটি সফল পরীক্ষা থেকে আমরা আশান্বিত হই যে ভবিষ্যতে পারথেনোজেনিসিস প্রক্রিয়ায় মানুষের ভ্রূণের বিকাশের সম্ভাবনা আরো উজ্জ্বল হবে।

একটা ডিম থেকে কটা মুরগীর বাচ্চা হয়?

ঝুড়িতে পনেরটা মুরগীর ডিম রেখে বুড়ি যখন একটা মুরগীকে তা দিতে বসিয়ে দেয় তখন সে আশা করবে না ত্রিশটা ছানা হবে বলে। সে চাইবে ডিম পিছু একটা করেই ছানা হোক। বস্তুতঃ জীবীত সকল প্রাণীর প্রত্যেকটা নিষিক্ত ডিম থেকে একটাই ভ্রূণের বিকাশ হয়।

যাই হোক, অস্বাভাবিক পরিণতি, যার কারণ এখনো অজ্ঞাত, কখনো

কখনো দুটি কোষের সৃষ্টি করতে পারে প্রাথমিক বিভাজনের কালে — এই কোষগুলির নাম ব্লাসটোমিয়ারস (bleastomeres), পরে এরা আলাদাভাবে বেড়ে উঠে দুটি ভ্রূণের সৃষ্টি করাত পারে। পরিণত হয়ে এরা মনোজাইগোটিক জমজ প্রাণীর সৃষ্টি করে, অর্থাৎ একটা নিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে উৎপন্ন যমজ।

মনোজাইগোটিক যমজ বিভিন্ন প্রাণীর ক্ষেত্রেই দেখা যায়, মানুষেরও। হাঁস-মুরগীর বেলায় কিন্তু মনোজাইগোটিক যমজ কদাচিৎ জন্মায়। একটা ঘটনা জানা আছে যেখানে একটা মুরগীর ডিম ফুটে দুটো ছানা হয়েছিল, একটার ওজন 11 গ্রাম, অন্যটার 16 গ্রাম। গভীর অনুসন্ধান চালিয়ে জানা গেছে যে পাখির ডিমও দুভাগে বিভক্ত হয়ে থাকে, তবে তার ফলে উৎপন্ন ভ্রূণগুলি বিনষ্ট হয়ে যায়।

যেসব প্রাণীর মনোজাইগোটিক যমজ জন্মায় কখনো কখনো, তাদের বাদ দিলেও অন্য অনেক প্রাণী আছে যারা স্বাভাবিক নিয়মেই এমনি যমজের জন্ম দিয়ে থাকে। এদের মধ্যে আছে অতি উন্নত সব প্রাণী যেমন আমেরিকার স্তন্যপায়ী আরমাডিলো। টেকসাস-এর আরমাডিলোদের (এই বিচিত্র প্রাণীটার প্রত্যেক গর্ভাধানের পূর্বে নিষিক্ত হবার জন্য একটা করেই ডিম্বকোষ থাকে) এক একটা নিষিক্ত ডিম থেকে নিয়মিতভাবেই চারটেকরে ভ্রূণ উৎপন্ন হয়। আরো দক্ষিণাঞ্চলের আরমাডিলেদের ক্ষেত্রে সংখ্যাটাতে তারতম্য থাকে, তবে সাধারণত নটার বেশি কখনো হয় না। এক বিয়ানের সব বাচ্চারা একই লিঙ্গের হয়ে থাকে।

একটা ডিম থেকে কতকগুলি ভ্রূণের উৎপত্তি সচরাচর পরজীবীদের ক্ষেত্রে খুব বেশি দেখা যায়। এদের পক্ষে এটা জরুরী কেননা এর ফলে প্রজাতিটা টিঁকে থাকতে পারে, বিশেষত সেই সব পরজীবীরা যাদের পক্ষে ভবিষৎ পোষক বা আশ্রয়দাতা খুঁজে নিয়ে তার শরীরে ঢুকে পড়া খুব কঠিন ব্যাপার এমনি একটা পরজীবী ডিম পাড়ে চট-এর মাছির ওপরে। পরজীবীর ডিমটা বিভাজিত হয়ে ষোলটা কোষে পরিণত হয়, যেগুলি আবার বিভাজিত হয়ে একটা করে বা দুটো করে ভ্রূণে পরিণত হতে পারে। এইভাবে একটা ডিম থেকে 23 টা নতুন প্রাণীতে পরিণত হতে পারে। যাই হোক, সাধারণত এইভাবে উৎপন্ন শাবকের সংখ্যা আটের বেশি হয় না।

কোন কোন জাতের ইকনিউমন মাছির এক একটা ডিম থেকে 1000

থেকে 1500 পর্যন্ত শাবক জন্মায়। স্বভাবতই এত অধিক সংখ্যার ভ্রূণকে পুষ্টি যোগাতে পারে না একটা ডিম, তাই ভ্রূণগুলি বৃদ্ধিপুষ্টি লাভ করতে পারে তার শিকারের শরীরের ধ্বংসাবশেষ থেকেই। এই জাতের ইকনিউমনের ডিমে খাদ্য আদৌ সঞ্চিত থাকে না, কেননা তার দরকারই হয় না।

মনোজাইগোটিক যমজের উদ্ভব ডিমের অসম্পূর্ণ বিভাজন থেকেও হতে পারে, তবে এক্ষেত্রে বাচ্চারা শরীরের কোন না কোন স্থান জুড়ে থাকা অবস্থায় জন্মায়। ডিমটা যদি খুব সামান্যই বিভাজিত হয়ে থাকে তাহলে বিদঘুটে সন্তান জন্মে থাকে। চারপেয়ে মুরগীর ছানা, দু-মাথা বাছুর, দুই লেজওয়ালা গাধা বা মাছের বা দুইমাথাওয়ালা ভরত পাখির অনেক দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়। একবার ধরা পড়েছিল দুমাথাওয়ালা একটা ডলফিন।

সরীসৃপদের মধ্যে এমনি ধরনের অস্বাভাবিকত্ব বেশি দেখা যায়। দুই বা তিন মাথাওয়ালা সাপ অনেক, অনেক বার দেখা গেছে। তাদের দেখেই বোধ হয় পুরাণে বহুমাথাওয়ালা ড্রাগনের বা বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যের রাজকীয় প্রতীক দুই মাথাওয়ালা ঈগলের উল্লেখ পাওয়া যায়। পরে এই প্রতীক আবার ব্যবহার করেন রাশিয়ান জার তৃতীয় ইভান।

পরীক্ষাগারে কি একটি ডিম থেকে কতকগুলি বাচ্চা উৎপাদন করে দেখানো যায়? ডিমের দুটি অর্ধ যদি বিভাজনের ঠিক পরেই সযত্নে আলাদা করে দেওয়া যায় তাহলে প্রত্যেকটা অংশ পূর্ণাঙ্গ প্রাণী হয়ে উঠতে পারে। দ্বিতীয় বার বিভাজিত হবার হরেও স্বতন্ত্র এবং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক প্রাণী জন্মানো সম্ভব চারটে কোষের প্রত্যেকটা থেকে। তৃতীয় এবং চতুর্থ বিভাজন থেকেও আট বা ষোলটা কোষ স্বাভাবিকভাবেই পরিণতি লাভ করতে পারে।

তবে ভ্রূণগুলি বিকাশের গোড়ার দিকেই সচরাচর বিনষ্ট হয়ে যায়। কৃত্রিম উপায়ে ডিমকে আরো পরের পর্যায়ে বিভাজিত করে আলাদা আলাদা কোষগুলি অর্থাৎ ব্লাসটোমিয়ারগুলি থেকে ফল পাওয়া যায় নি।

তাহলে দেখা গেল, একটা ডিম ফুটিয়ে একাধিক মুরগীর ছানা পাওয়া যায়।